# জীবনানন্দ দাশের
## গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত
# কবিতাসমগ্র

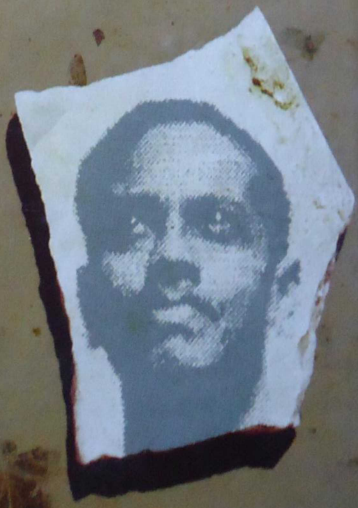

# জীবনানন্দ দাশের
# গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতাসমগ্র

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলা কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বাঁকের নাম। চর্যার দোহাকারদের থেকে শুরু ক'রে আদি ও মধ্যযুগ পাড়ি দিয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাংলা কবিতায় মুকুন্দরাম, বড়ু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিজয় গুপ্ত, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের নাম যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, জীবনানন্দও ঠিক ততখানিই গুরুত্ব রাখেন। এমনকি আধুনিকতার একরৈখিক বর্গকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যে-উত্তরআধুনিক বহুরৈখিকতার নতুন ঢেউ লেগেছে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়, তারও প্রথম ইশারা জীবনানন্দের কবিতাতেই আমরা পাই। সমকালীন বিশ্বকবিতার সমান্তরালে তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার উজ্জ্বলতম কবি। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে অনেকেই প্রথমে তাঁর কবিতাকে চিনে উঠতে না পারলেও পরবর্তীকালে মতপরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত রচনাবলির বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হ'লে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর নাম।

জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সর্বাধিক কবিতার সমষ্টি এই কবিতাসমগ্র। বানানে ও পাঠে কবিকৃত সর্বশেষ পরিমার্জন অনুসরণ, বিশ্লেষণী ভূমিকা, ভূমিকা-সমান্তরাল সম্পূরক-মূল্যায়ন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে বাজারলভ্য জীবনানন্দের যে কোনও কাব্যসমগ্রের চেয়ে এই 'কবিতাসমগ্র' অনেক বেশি স্বচ্ছ ও প্রামাণিক। জীবনানন্দের জীবদ্দশায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে কবিকৃত শেষ সংশোধনীকে গ্রহণ করা হয়েছে এই সমগ্রে। বর্জন করা হয়েছে একই কবিতার প্রকাশ-পুনরাবৃত্তি। সর্বোপরি কবিতাসমগ্রটি সম্পাদনা করেছেন কবি-প্রাবন্ধিক আবু হাসান শাহরিয়ার, যার সম্পাদিত *খোলা জানালা* বাংলা সাহিত্যের নিকট-ইতিহাসে একটি কিংবদন্তিতুল্য ঘটনা। জীবনানন্দ দাশের কবিতার সামগ্রিক মূল্যায়নধর্মী একটি অসামান্য ভূমিকা লেখার পরও বহুল মতের ভিত্তিতে একটি সম্পূরক ভূমিকাও তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, যা এ-জাতীয় সম্পাদনা-গ্রন্থে সম্পূর্ণ নতুন একটি ঘটনা। সামগ্রিক কারণেই কবিতার নিবিড় পাঠক ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য প্রকাশনা—*জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কবিতাসমগ্র*।

# জীবনানন্দ দাশের

## গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত

# কবিতাসমগ্র

# জীবনানন্দ দাশের

গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত

# কবিতাসমগ্র

আবু হাসান শাহরিয়ার
সম্পাদিত

সাহিত্য বিকাশ

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
অন্তর্ভুক্ত নম্বর
ডাক সংখ্যা
কপি সংখ্যা
সূচীকরণ
কার্ড টাইপ করণ
শিরদাঁড়ে লিখন
পরীক্ষা করণ

প্রকাশক
ফজলুর রহমান
সাহিত্য বিকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
সেলফোন : ০১৮১৯১২২৯১৩

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

পরিবেশক
নব প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

**মূল্য ৫০০.০০ টাকা**

ISBN-984-8320-00-8

Jibonanondo Dasher Gronthito-Ogronthito Kobitashomogro
[Collected Poems by Jibonanondo Dash]
Edited by : Abu Hasan Shahriar
Published by : Fazlur Rahman, Shahittya Bikash,
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : 500.00 US $ 20

# প্রকাশকের কথা

দীর্ঘদিন ধ'রে প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত আছি। বইয়ের সঙ্গে, কবি-লেখকদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করি পেশাগত কারণেই। কারও-কারও সঙ্গে সম্পর্কটা আরও গভীর– যারা আমার প্রিয় কবি বা প্রিয় লেখক। জীবনানন্দ দাশ তাঁদেরই একজন। তাঁর একটি কবিতাসমগ্র প্রকাশ করাও আমার অনেকদিনের সাধ। এক সময় বাজারে জীবনানন্দের পূর্ণাঙ্গ কবিতাসমগ্রের অভাব ছিল। গত এক দশকে সেই অভাব অনেকখানি দূর হয়েছে। কিন্তু তারপরও পাঠকের অতৃপ্তি দূর হয়নি। জীবনানন্দের সব রকম কবিতাসমগ্র বিক্রি ক'রেই পাঠকদের এই মনোভাব জেনেছি। তাদের সেই অতৃপ্তি দূর করতেই নিজের প্রকাশনী থেকে জীবনানন্দ দাশের একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতাসমগ্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই।

এই কবিতাসমগ্র সম্পাদনা করেছেন কবি-প্রাবন্ধিক আবু হাসান শাহরিয়ার। তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য সাময়িকী *খোলা জানালা* একসময় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বোদ্ধা পাঠকদের মনোযোগ কেড়েছিল। সাহিত্যের যোগ্য সম্পাদক হিসেবে অনেকেই তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। কবিতা বিষয়ক তাঁর বিশ্লেষণী গদ্যেরও পাঠক অনেক। জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাসমগ্র সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর কর্মদক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। ভূমিকায় অপ্রাসঙ্গিক তথ্য জড়ো ক'রে পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করেননি। বিশ্লেষণে জোর দিয়েছেন কবিতার উপর। উপরন্তু জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে গত অর্ধ শতাব্দিরও বেশি সময়ের চিন্তাশীল মূল্যায়নগুলি ভূমিকার সমান্তরালে পরিবেশন ক'রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। জীবনানন্দ-প্রেমিকদের জন্য এটা একটি বড প্রাপ্তি ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। এই মত-মতান্তরে সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরাও উপকৃত হবেন। আরও একটি কাজ পাঠকদের জন্য করেছেন সম্পাদক– *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থে কবিকৃত মূল পাণ্ডুলিপিকে অনুসরণ ক'রে ৭৩টি কবিতাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া পুরো কবিতাসমগ্রেই কবিকৃত সর্বশেষ পরিমার্জন ও বানান-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন তিনি। সংযোজন করেছেন কবিকৃত ইংরেজি কবিতা ও স্বকৃত অনুবাদসহ সর্বশেষ উদ্ধারকৃত কবিতাগুলোও। ফলে বাজারলভ্য জীবনানন্দের যে-কোনও কবিতাসমগ্রের চেয়ে এই সমগ্রে কবিতার সংখ্যা বেশি।

জীবনানন্দের কবিতাসমগ্রের নামকরণে 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত' কথাটি যুক্তিযুক্ত নয় ব'লেই মনে করি আমরা। কারণ অন্যান্য সম্পাদকগণ কবির যে কবিতাগুলোকে 'অপ্রকাশিত' বলছেন, সেগুলো তাঁদের সম্পাদিত কবিতাসমগ্রের আগেই কোথাও না কোথাও প্রকাশিত। তাই 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত'র চেয়ে 'গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত' কথাটিই এ ক্ষেত্রে বেশি যৌক্তিক ব'লে মনে হয়েছে সম্পাদকের কাছে। নামকরণে তাই দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করেছেন তিনি। নির্ভুল পাঠ রাখার জন্য কম্পোজ থেকে শুরু ক'রে প্রুফ-সংশোধন পর্যন্ত প্রতিটি কাজের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

সম্মিলিত মেধা-শ্রমের ফসল এই কবিতাসমগ্র পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

**ফজলুর রহমান**
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

সূচি

আত্মকথন ৮
ভূমিকা ১৩

বরা পালক ৬৯
ধূসর পাণ্ডুলিপি ১১৯
বনলতা সেন ১৮৩
মহাপৃথিবী ২০৭
সাতটি তারার তিমির ২৩৫
শ্রেষ্ঠ কবিতা ২৭৯
রূপসী বাংলা ৩০৭
বেলা অবেলা কালবেলা ৩৫১
অগ্রন্থিত কবিতা ৩৯৬

পরিশিষ্ট
জীবনানন্দ দাশের বংশলতিকা ৭৩৭
কবিজীবন ৭৩৯
প্রকাশকালানুসারে কাব্যগ্রন্থের তালিকা ৭৪৩
বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কবিকৃত ভূমিকা ৭৪৪
অগ্রন্থিত কবিতার প্রকাশতালিকা ৭৪৭
বিবরণপঞ্জি ৭৫৬
প্রথম ছত্রানুসারে কবিতার সূচিপত্র ৭৫৯

# আঁতুড়কথন

কবিতার নিবিড় পাঠকদের জন্য এই কবিতাসমগ্র। সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও।

জীবনানন্দের দুই রকম কবিতাসমগ্র চোখে পড়ে : কাজের ও অকাজের। অকাজেরগুলো আমরা ধর্তব্যের বাইরেই রাখছি। কাজের সমগ্রগুলোর মধ্যেও ভূমিকায় ও সংযোজনে বাহুল্য লক্ষণীয়। কবিতার চেয়েও কবিজীবন, কবির অপ্রকাশিত কবিতার উদ্ধার-কাহিনী এবং আরও অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় বেশি গুরুত্ব পেয়েছে কারও-কারও সম্পাদনায়। উল্লেখ্য, জীবনানন্দের মৃত্যুর আগে ও পরে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। প্রকাশিত কবিতাবলির সবই আবার কবির জীবদ্দশায় গ্রন্থিত হয়নি। কবির মৃত্যুর (১৯৫৪) পর ল্যান্সডাউন রোডের কবিগৃহে যে ট্রাংকগুলো পাওয়া গিয়েছিল, তার ভাই অশোকানন্দ দাশ সেগুলো নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো থেকে উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপি ও খসড়া লেখাগুলোই 'অপ্রকাশিত' শিরোনামে কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হতে থাকে। আজ যত সহজে কথাটি বলতে পারছি, পাণ্ডুলিপির এই উদ্ধারপর্বের কাজ তত সহজ ছিল না। লিপি-উদ্ধারকর্মী ভূমেন্দ্র গুহের বিভিন্ন লেখা থেকে আমরা জেনেছি– কত জটিল আর কষ্টসাধ্য ছিল এই পর্বের কাজগুলো। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারোপযোগী বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতায় লিখতেন জীবনানন্দ। কবিতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই খুঁতখুঁতে। লিখিত হওয়ার পরও বহুদিন ধ'রে কাটাকুটি করতেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত কোনও-কোনও শব্দের পাশে বিকল্প শব্দও প্রস্তাবনার আকারে বসিয়ে রাখতেন। মাত্র ১০ দিনে *মাল্যবান* এবং ১ মাসে *জলপাইহাটি* নামের উপন্যাস দুটি শেষ করলেও কোনও-কোনও কবিতার সংশোধনে-পরিমার্জনায় সময় নিয়েছেন বছরের পর বছর। প্রকাশিত কবিতার শব্দও তিনি পরিবর্তন করেছেন। অকস্মাৎমৃত্যুর কারণে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত অনেক কবিতারই চূড়ান্ত গ্রহণ-বর্জন কবি নিজে ক'রে যেতে পারেননি। এত সব জট ছাড়ানোর প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছেন যারা, তাদের জন্যই আজ 'অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত' জীবনানন্দের এক বিশাল ভাণ্ডার আমাদের নাগালে এসেছে। কবির ভাই অশোকানন্দ দাশ, লিপিউদ্ধারকর্মী ভূমেন্দ্র গুহ ও কবির বোন সুচরিতা দাশের সমবায়ী প্রচেষ্টায় উদ্ধারপর্বের কাজ সুসম্পন্ন হয়। লিপি-উদ্ধার ও অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত রচনাবলিতে মরণোত্তর গ্রন্থপ্রকাশের বিষয়টি এত জটিল ছিল যে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেও কিছু নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়। সেগুলোর নিরসনে আরও যারা সযত্ন চেষ্টা করেছেন, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের অন্যতম। তাই বাহুল্য সত্ত্বেও তাদের সম্পাদিত কবিতাসমগ্র দুটির কাছে আমরা ঋণী। তারা পশ্চাদভূম রচনা ক'রে গেছেন ব'লেই আজ জীবনানন্দের কবিতাসমগ্রে আরও স্বচ্ছতা আনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। স্মরণ করতে হয় রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার* গ্রন্থটিকেও, দাশকাব্যের নতুন অনুরাগী সৃষ্টিতে একদা যা ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। সম্প্রতি ক্ষেত্র গুপ্তও জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতাসমগ্র সম্পাদনা করেছেন। তার সম্পাদনায় অপ্রয়োজনীয় তথ্যের জঞ্জাল কিছুটা দূর হলেও পাঠ-সংস্কারের কাজটি অপূর্ণই থেকে গেছে।

মৃত্যুর আগেই জীবনানন্দ দাশের ৫টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ– *ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী* ও *সাতটি তারার তিমির*– প্রকাশিত হয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*ও এই পর্বের প্রকাশনা।

মৃত্যুপরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭) এবং ৭ বছরের মধ্যে *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুলিপি ও হস্তলিপির উদ্ধারকাজে জড়িত ভূমেন্দ্র গুহ ও সংশ্লিষ্ট আরও দু-একজনের ভাষ্য অনুসারে– জীবনানন্দ নিজেই শেষ বই দু'টির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ক'রে রেখে গিয়েছিলেন। জীবদ্দশায় প্রকাশিত ৬টি বইএর সঙ্গে মৃত্যুপরবর্তী এই দুটি প্রকাশনাও এই কবিতাসমগ্রে গ্রন্থমর্যাদায় গৃহীত হয়েছে। যদিও *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থটির ক্ষেত্রে কবির পূর্ণ-অনুমোদনের প্রমাণ মেলে না। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিজস্ব মতামত ভূমিকায় পাওয়া যাবে। কবির জীবদ্দশাতেই গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কবিতা দিয়ে তার *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে তিনি কিছু পাঠ-পরিবর্তন করেছিলেন। পরিবর্তন এনেছিলেন পঙ্‌ক্তিবিন্যাসেও। কবিকৃত এই পরিবর্তন-পরিমার্জনকে সর্বশেষ পাঠ হিসেবে বিবেচনা করাই উত্তম। মান্নান সৈয়দকৃত সম্পাদনায় বানানে কিছু পাঠ-সংস্কার আছে, যা দেবীপ্রসাদে বা ক্ষেত্র গুপ্তে নেই। যেমন সেদিনো/সেদিনও, আমাদেরি/আমাদেরই, আমারো/আমারও, আজো/আজও ইত্যাদি প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের বানানে প্রথমটিই *শ্রেষ্ঠ কবিতা*সম্মত, যা মান্নান সৈয়দ গ্রহণ করেছেন; অন্য দুজন করেননি। আবার খেতে/ক্ষেতে, খুদ/ক্ষুদ ইত্যাদির বানানে প্রথমটিই *শ্রেষ্ঠ কবিতা*সম্মত হলেও তিনজনই তারা গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয়টিকে। অর্থাৎ বানানের এই গ্রহণবর্জনে আমরা কোনও শৃঙ্খলা লক্ষ করি না। নিবিড়পাঠ থেকে এই গ্রহণ-বর্জন সম্পাদিত হয়নি ব'লেই মান্নান সৈয়দ 'আমাদেরি', 'তারি', 'তাদেরি', 'ইহাদেরি', 'মানুষেরি' ইত্যাদি বানান অনুসরণ করলেও 'তারাটিরি' ব্যবহারে ভরসা পান না। তাই তার সম্পাদিত কবিতাসমগ্রে আমরা পাই 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়'। অনবধানতাবশত তিনি কোথাও-কোথাও 'তারই'-ও ব্যবহার করেন। কিংবা কোনো/কোনও দু-রকম ব্যবহারই নজরে পড়ে তার সম্পাদিত সমগ্রে। বানানের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ নিজেও কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন। একই শব্দের দু-রকম বানান তার *শ্রেষ্ঠ কবিতা*তেও আছে। তবে কোন বানান-রীতির প্রতি কবির ঝোঁক ছিল, তা নাভানা থেকে প্রকাশিত *শ্রেষ্ঠ কবিতা*র প্রথম সংস্করণপাঠে সহজেই অনুমেয়। যেমন, ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর মতো ও-কার-অন্ত। উল্লেখিত তিন সম্পাদকের কেউ-ই এটি অনুসরণ করেননি। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই এই কবিতাসমগ্রে বানান-শৃঙ্খলা রক্ষার একটি চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়াও পাঠের ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যগুলো জমা হয়েছে, তা নিরসনের চেষ্টাও আছে। উদাহরণ হিসেবে *বনলতা সেন*-এর 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি উদ্ধার করছি (পাঠের পরিবর্তন বাঁকা হরফে দ্যাখানো হল)–

**জীবনানন্দকৃত *শ্রেষ্ঠ কবিতা*র পাঠ :**
হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে *পিরামিড– কাফনের ঘ্রাণ;*
বালির উপরে জ্যোৎস্না– *খেজুর-ছায়ারা* ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো: *এশিরিয়*– দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে *মমির* ঘ্রাণ আমাদের– ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে ?' সুধালো সে– সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'

**আবদুল মান্নান সৈয়দ ও ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত সমগ্রের পাঠ :**
হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে *চিরদিন রাত্রির নিধান;*
বালির উপরে জ্যোৎস্না– *দেবদারু ছায়া* ইতস্তত

বিচূর্ণ থামের মতো: *দ্বারকার;*– দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের– ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে ?' শুধাল সে– শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'

তবে দেবীপ্রসাদ এই কবিতার পাঠে *শ্রেষ্ঠ কবিতার* অনুসারী। কিন্তু একটু পরই দেখি– *বনলতা সেন*-এর 'বিড়াল' কবিতার বানানে তিনি শ্রেষ্ঠানুসারী হলেও শিরোনামে 'বেড়াল' লিখছেন। বাকি দুজন সর্বত্রই 'বেড়াল'। একই কাব্যগ্রন্থের 'অন্ধকার' কবিতার চতুর্থ স্তবকের শুরু থেকে 'কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি' পঙ্‌ক্তিটি বর্জন করেছিলেন জীবনানন্দ তার *শ্রেষ্ঠ কবিতায়*; দেবীপ্রসাদ এই পঙ্‌ক্তিটিকে বর্জন করলেও মান্নান সৈয়দ ও ক্ষেত্র গুপ্ত করেননি। আবার *ঝরাপালক*-এর 'নীলিমা' কবিতায় যে মার্জিনে সংশোধন এনেছিলেন জীবনানন্দ, তিন সম্পাদকের কেউই তা অনুসরণ করেননি। একইভাবে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*র 'বোধ' ও 'অবসরের গান' কবিতায় মার্জিনে বিভ্রাট এবং *বনলতা সেন*-এর 'বুনো হাঁস' কবিতায় স্তবকে বিভ্রাট ঘটেছে। এমন অসংখ্য পাঠ-বিশৃঙ্খলা থেকে গেছে তাদের সম্পাদিত কবিতাসমগ্রে। যেহেতু কবির অনুমোদন সাপেক্ষে মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশিত হয়েছিল, বানান-রীতির ব্যাপারে এই বইটিকে আদর্শ মানা যায়। এই কবিতাসমগ্রে সেটাই করা হয়েছে। পরন্তু *শ্রেষ্ঠ কবিতার* নাভানা-সংস্করণই হচ্ছে সেই বইয়ে প্রকাশিত কবিতাগুলোর জন্য কবিকৃত সর্বশেষ পরিমার্জিত পাঠ। বইটি প্রকাশমাত্র সেখানে প্রকাশিত কবিতাগুলোর পূর্ববর্তী পাঠ আপনাআপনিই খারিজ হয়ে যায়। এই কবিতাসমগ্রে সেই নীতিই মান্য করা হয়েছে। তবে *শ্রেষ্ঠ কবিতাও* পুরোপুরি প্রমাদমুক্ত নয়। তার সংশোধনে সামগ্রিক নিবিড়পাঠ পদ্ধতির উপরই ভরসা রাখতে হয়েছে। বইটিতে *বনলতা সেন* ও *মহাপৃথিবীর* কবিতাবণ্টনে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল– *বনলতা সেন*-এর কিছু কবিতাকে কবি *মহাপৃথিবীর* অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আমরা জানি, ইতিপূর্বে সিগনেট-সংস্করণ *মহাপৃথিবীতেও বনলতা সেন* যুক্ত হয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশকালে বই দুটিতে কবিতাবণ্টনের ক্ষেত্রে কবি নিজেও সঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়ে উঠতে পারেননি। এই সমগ্রে সেই কবিতাগুলোকে কবিকৃত সর্বশেষ পাঠে মূলগ্রন্থ দুটিতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। প্রকাশপুনরাবৃত্ত পরিহারে *শ্রেষ্ঠ কবিতায়* কেবল মূলগ্রন্থবহির্ভূত সংযোজিত কবিতাগুলোই পাওয়া যাবে (তবে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য *শ্রেষ্ঠ কবিতা* অধ্যায়ের শুরুতে প্রমাণ-সূচির অপর পৃষ্ঠায় আদি-সূচিটিও থাকছে)। কিন্তু যে বইগুলোতে কবির মৃত্যুর পর সংযোজন ঘটেছে, সেগুলো আমরা অগ্রন্থিত অধ্যায়ে রেখেছি।

এবার আসা যাক *রূপসী বাংলা* প্রসঙ্গে। *রূপসী বাংলা* জীবনানন্দ দাশের মরণোত্তর প্রকাশনা। কবির মৃত্যুর তিন বছর পর (১৯৫৭) কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে বইটি বেরুলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে *রূপসী বাংলার* কবিকৃত মূল পাণ্ডুলিপিটি (ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে) আমাদের গোচরে এলে সিগনেট থেকে প্রকাশিত *রূপসী বাংলা* নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মূল পাণ্ডুলিপিতে ৭৩টি কবিতা থাকলেও সিগনেট-সংস্করণে আছে ৬১টি। সূচনা কবিতাটি আবার পাণ্ডুলিপির ৭৩ ও ৬৮ নম্বর কবিতা দুটির যৌগ। ফলে দৃশ্যত সেখানে ৬০টি কবিতার দ্যাখা পাই আমরা। অর্থাৎ কবিকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে ১২টি কবিতা কম। কবির মৃত্যুর পর তার ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে যে ট্রাংকগুলো উদ্ধার ক'রে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গিয়েছিলেন ভাই অশোকানন্দ দাশ, সেগুলোরই কোনওটিতে অপ্রকাশিত কবিতার সঙ্গে *রূপসী বাংলার* কবিকৃত পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গিয়েছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারোপযোগী খাতায় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন কবি নিজেই। একই কবিতা বহুবার সংশোধন-পরিমার্জন করতেন কবি। এক খাতা থেকে আরেক খাতায়

কবিতা তোলার সময় অনেক শব্দ ও পঙ্‌ক্তি বদলে দিতেন। সংশোধন-পরিমার্জনের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার পরও অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণে *রূপসী বাংলার* চূড়ান্ত পাঠ-সংস্কার কবি নিজে ক'রে যেতে পারেননি। তাই কবিকৃত পাণ্ডুলিপিতেই আমরা কোনও-কোনও শব্দের উপরে/নিচে/পাশে বিকল্প শব্দ পাই। নিবিড়পাঠ পদ্ধতিতে এই বিকল্প শব্দগুলি থেকে যে-কোনও একটিকে বেছে নিয়ে আরও আগেই কবিকৃত মূল পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এই বইটি নিয়ে তর্কের অনেকখানি অবসান হত। অবশ্য দেবেশ রায় সম্পাদিত *রূপসী বাংলার* পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর সংস্করণে এই তর্কের অনেকখানি উপশম আছে। আরও উল্লেখ্য, একটি-দুটি ছাড়া *রূপসী বাংলার* অধিকাংশ কবিতারই কোনও নাম দেননি কবি, দিয়েছিলেন ক্রমিক নম্বর। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তেও তিনি 'জীবন' কবিতাটিকে একইরকম ক্রমানুসারে সাজিয়েছিলেন। সেখানে ৩৪টি সর্গের দ্যাখা পাই আমরা। এরকম একাধিক কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ তার জীবনে। এই কবিতাগুলো মূলত মহাকাব্যিক ঘরানায় লেখা কবিতাপুঞ্জ। যেমন পর্বে-পর্বে লেখা হয়েছিল এজরা পাউণ্ডের *ক্যান্টোজ* : ১৯২৫ সালে শুরু হয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধ'রে প্রকাশিত। জীবনানন্দ দাশ নিজেও তার *কবিতার কথায়* আধুনিক মহাকাব্য হিসেবে দেখেছেন পাউণ্ডের *ক্যান্টোজ*কে। তেমনই হারানো বাংলার পশ্চাদভূমে রচিত শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত বাংলার প্রতিচ্ছবি : জীবনানন্দ দাশের *রূপসী বাংলা*। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম মহাকাব্য হিসেবেও তাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। ৭৩টি সর্গে তার একক সামগ্রিকতা। যারা এই সর্গগুলোর আলাদা-আলাদা নাম দিয়েছেন, তারা এই কাব্যগ্রন্থের চরিত্রহরণ করেছেন। তাদের জন্যই এই সর্গগুলোকে পৃথক কবিতা হিসেবে দেখতে/ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন সবাই। এ নিয়ে ভবিষ্যতে পৃথক প্রবন্ধে বিস্তারে লেখার ইচ্ছে রাখি। আপাতত 'সর্গ'কে 'কবিতা' ধ'রে নিয়েই একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়গুলোর দিকে ফিরে তাকানো যাক—

- *রূপসী বাংলার* কবিকৃত পাণ্ডুলিপিতে ৭৩টি কবিতা ছিল। সিগনেট-সংস্করণ থেকে ১২টি কবিতা বাদ পড়েছে।
- মূল পাণ্ডুলিপির ৭৩ ও ৬৮ নম্বর কবিতা দুটিকে জোড়া লাগিয়ে সিগনেট-সংস্করণের সূচনা-কবিতাটি তৈরি করা হয়েছে, যে বিষয়ে কবির অনুমোদনের কোনও প্রমাণ মেলে না।
- দু-একটি ছাড়া কোনও কবিতারই শিরোনাম নেই পাণ্ডুলিপিতে; আছে ক্রমিক নম্বর। তাই জীবনানন্দ দাশের বিভিন্ন কবিতাসমগ্রে অথবা *রূপসী বাংলার* কোনও-কোনও সংস্করণে এই বইয়ের কবিতাগুলোর যে শিরোনামকরণ চোখে পড়ে, তা-ও কবিকৃত নয়।
- পাণ্ডুলিপি থেকে ১, ২, ১৩ ও ১৪ নম্বর কবিতা চারটির পৃষ্ঠা খোয়া গেছে। ৬১টি কবিতার সিগনেট-সংস্করণে খোয়া যাওয়া কবিতা চারটির সন্ধান মেলে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ ও ক্ষেত্র গুপ্ত অনুসরণ করেছেন সিগনেট-সংস্করণ *রূপসী বাংলা*। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সিগনেট-সংস্করণকে অনুসরণ করলেও কবিকৃত মূল পাণ্ডুলিপির কবিতাগুলোও নিয়েছেন। যৌগ কবিতাটি তিনি পাণ্ডুলিপি-অনুসরণে দুটি পৃথক কবিতা হিসেবেই ছেপেছেন। তবে সিগনেট-সংস্করণের অনুসরণে বইয়ের শুরুতে এসেছে সে-দুটি কবিতা। কিন্তু এই কবিতাসমগ্রে আমরা *রূপসী বাংলার* মূল পাণ্ডুলিপির নিকটবর্তী থাকতে চেষ্টা করেছি। খোয়া যাওয়া চারটি কবিতার জন্যই কেবল সিগনেট-সংস্করণের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। যদিও এটি প্রামাণ্য নয় যে সিগনেট-সংস্করণ থেকে নেয়া ঐ চারটি কবিতাই পাণ্ডুলিপি

থেকে খোয়া যাওয়া কবিতাগুলো কিনা। তবু মনে করি, মূল পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করায় *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থের পাঠ নিয়ে যে বিতর্ক আছে, তার অনেকখানি সুরাহা মিলবে এই কবিতাসমগ্রে। বিকল্প শব্দগুলি থেকে একটিকে বেছে নেওয়াই সম্পাদকের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে কবিতার নিচে বিকল্পপাঠ রেখে আমরা পাঠককে বিব্রত করতে চাইনি। তবে কৌতূহলী পাঠকদের কথা মনে রেখে গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে বিকল্প শব্দাবলির উল্লেখ থাকল।

কবির মৃত্যুর পর উদ্ধারকৃত কবিতায় আরও তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়– *সুদর্শনা* (১৯৭৩), *মনবিহঙ্গম* (১৯৭৮) ও *আলোপৃথিবী* (১৯৮২)। এই তিনটি প্রকাশনাকে কবির পৃথক কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা দিতে রাজি হননি কাব্যবোদ্ধাদের কেউই। আমরাও তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করি। উপর্যুক্ত গ্রহণ-বর্জনের পর যা অবশিষ্ট থাকল, তাই এই কবিতাসমগ্রে অগ্রন্থিত বলে বিবেচিত হয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে যত বিচিত্র লেখালেখি হয়েছে, বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে নিয়েই তা হয়নি। শুধু প্রাবন্ধিকরাই নন, কবিরাও স্বতঃস্ফূর্ত গদ্য লিখেছেন দাশকাব্যের বিশ্লেষণ করে। উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাগুলো বাদ দিলে, কবিদের হাতে রচিত এইসব গদ্যে শুধু জীবনানন্দই নন, স্বয়ং কাব্যলক্ষ্মীও বিশ্লেষিত হয়েছেন। কবি-প্রাবন্ধিকদের লেখা ঐ সব বিশ্লেষণী গদ্য থেকে সারকথা তুলে এনে মূল ভূমিকার সমান্তরালে পরিবেশন করা হল। মূল ভূমিকার সূত্রধর বক্তব্যটিও থাকল একই সঙ্গে– বাকা হরফে। বিকল্প এই ভূমিকার কারণে সম্পাদকের একার মত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে না পাঠকে। এছাড়াও পরিশিষ্টে পরিবেশিত কবিজীবনীতে থাকছে জীবনানন্দকালীন বিশ্বকবিতার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি।

এই সম্পাদনা-কর্মে আমার সঙ্গে আগাগোড়া যুক্ত ছিলেন স্নেহাস্পদ কবি-প্রাবন্ধিক পলাশ দত্ত। পরিশিষ্টে পরিবেশিত বিকল্প পাঠ, প্রথম ছত্রানুসারে সূচি ও কবি-জীবনকথা গ্রন্থনায় তার সযত্ন-প্রয়াস কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণে আমি নিজে যেমন নিবিড়পাঠ-পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছি, আমাকে সহযোগিতা করার জন্য তাকেও করতে হয়েছে একই কাজ। সব কিছুই তিনি করেছেন জীবনানন্দ ও কবিতার প্রতি ভালবাসা থেকে।

আরও যারা মূল্যবান পরামর্শ ও বই পত্র-পত্রিকা দিয়ে, তথ্য সরবরাহ ক'রে এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে কবি শামসুর রাহমানের নাম স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নামটি যদি হয় জীবনানন্দ দাশ, তবে জীবনানন্দের পর সেই উল্লেখযোগ্যতার অনেকখানি দাবি রাখেন শামসুর রাহমান। সে-কারণেই এই কাজের শুরু থেকেই তার মতামতকে আমি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে শুনবার চেষ্টা করেছি। তিনি ছাড়াও রবীন্দ্র-নজরুল-গবেষক অধ্যাপক শরফউদ্দিন আহম্মদ এবং অধ্যাপনা পেশায় জড়িত দুই জীবনানন্দ-অনুরাগী আফরোজা বেগম ও মাহবুব আরা মালার নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা সব রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছিলেন। এ ছাড়াও শিল্পী ধ্রুব এষ, কবি ও প্রাবন্ধিক আমিনুর রহমান সুলতান, 'জীবনানন্দ' পত্রিকার সম্পাদক কবি হেনরী স্বপন, প্রাবন্ধিক সাইফুল ইসলাম ও কবি ফেরদৌস মাহমুদ-এর কাছেও নানা কারণে কৃতজ্ঞ আমি। কৃতজ্ঞ কালজয়ী কম্পিউটার্সের শাহজাহান বাবু ও ফারুক আহমেদ খানের কাছেও। সাহিত্য বিকাশের কর্ণধার ফজলুর রহমানের বিশেষ আগ্রহের কথা না-ই বা বললাম। এই কাজের ব্যাপারে আমার চেয়ে তার আন্তরিকতা এতটুকু কম ছিল না।

২০ জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯

**আবু হাসান শাহরিয়ার**
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

# ভূমিকা সম্পর্কিত

*শ্রেষ্ঠ কবিতা*র ভূমিকায় জীবননান্দ লিখেছিলেন– 'কবিতা অনেক রকম'। শুধু কবিতাই নয়, কবিতার পাঠকও অনেক রকম। এবং বহুলপাঠেই উন্মোচিত হয় কবিতার বহুরৈখিকতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে যাদের পূর্বধারণা আছে, তারা ভূমিকার মধ্য দিয়ে এই কবিতাসমগ্রে প্রবেশ করলে, ভিন্ন মূল্যায়নের আলোকে দাশকাব্য সম্পর্কে নিজের মূল্যায়নকে নবায়ন ক'রে নিতে পারবেন। জীবনানন্দের কবিতার যিনি নবীন পাঠক, তার প্রতি অনুরোধ– ভূমিকার আগে কবিতায় প্রবেশ করুন।

কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে রবার্ট ফ্রস্টের সেই বিখ্যাত উক্তিটি অনেকেরই জানা আছে– কবিতা হচ্ছে তাই, যা অনুবাদে হারায় (Poetry is what is lost in translation)। এর পর-পরই আরও একটি কথা বলেছিলেন ফ্রস্ট, যে-কথা কমই উচ্চারিত হতে শোনা যায়– এবং এটি (কবিতা) হচ্ছে তা-ও, যা ব্যাখ্যায় হারায় (It is also what is lost in interpretation)। অতএব কবিতার ব্যাখ্যা কবিতা নিজেই। আবার এও সত্যি, কবিতার পাশাপাশি তাকে নিয়ে ভাববার অবকাশও আছে পৃথিবীতে। নইলে ফ্রস্টের সাবধানবাণীই বা আমাদের কাছে পৌঁছল কীভাবে ? কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ নিজেও গদ্য লিখেছেন। তার কবিতা নিয়েও হয়েছে অনেক লেখালেখি। অতএব তাকে নিয়ে, তার কবিতা নিয়ে নতুন লেখালেখিও হবে; হতেই পারে। বহু বছর ধ'রেই বহু কবির কবিতার মতো দাশকাব্যেরও আমি নিবিড় পাঠক। তারই আলোকে এই গদ্য– পাণ্ডিত্যের কৌষ্ঠকাঠিন্যে বা গবেষণার তত্ত্বতালাশে নয়– কবিতার পাঠোদ্ধারে লেখা।

তবু একক ভূমিকায় একটি সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। শেষতক তা একজন পাঠকের মূল্যায়ন। হতে পারেন তিনি কবিতার বোদ্ধা পাঠক। তবু কারও একার মতে কোনও কবির সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ভূমিকার সমান্তরালে বহুল মতের ভিত্তিতে একটি সম্পূরক পাঠও দেয়া হল প্রতি পৃষ্ঠায় ভেদরেখা টেনে। অর্থাৎ ভেদরেখার উপর দিয়ে গেলে সম্পাদককৃত মূল ভূমিকাটি এবং নিচ দিয়ে গেলে সম্পূরক মূল্যায়নগুলি পেয়ে যাবেন পাঠক। পাবেন সম্পূর্ণ ভিন্নমতও। জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে কবির জীবদ্দশা থেকেই আলোচনা-সমালোচনা চ'লে আসছে। সমালোচক-প্রাবন্ধিকরাই শুধু নন, কবিদেরও অনেকে তার কবিতা সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তাদের সবাই জীবনানন্দের কবিতাসমগ্র সম্পাদনা করেননি। কিন্তু সবার সামষ্টিক মতেই দাশকাব্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন। সূত্র হিসেবে মূল ভূমিকা থেকে আকর-মূল্যায়নগুলি বাঁকা হরফে পেশ ক'রে তারই প্রাসঙ্গিকতায় লেখকের নাম ও প্রকাশের উৎস সহকারে বিন্যস্ত হল সম্পূরক মূল্যায়নগুলি। তবে আবারও সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পাঠককে– কবিতাই হচ্ছে কবিতার শেষ কথা।

– সম্পাদক

## ভূমিকা অথবা জীবনানন্দকে নিয়ে লেখা একটি সার্বভৌম গদ্য

কালের আরও একটি মঞ্চ ছিল নিকট-অতীতেই। তার কুশীলব ছিল সৌম্য আকাশ, শুভ্র মেঘ, শান্ত প্রকৃতি আর নিষ্কলুষ জীবন। মঞ্চটির অধিষ্ঠাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) পা বাড়ালেন নিবিড় নিসর্গ, জমাট অন্ধকার, গলিত জীবন, নিস্তব্ধ শ্মশান আর অজস্র প্রাণসত্তা নিয়ে এক মৃত্যুমহাদেশের দিকেও–

এই ব্যথা,– এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে,–
কোথাও ফরিঙে-কীটে,– মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

[ক্যাম্পে/ধূসর পাণ্ডুলিপি]

যেহেতু আগের কালমঞ্চটি ছিল রবীন্দ্রনাথের, দাশকাব্যের বিশ্লেষণে শুরুতেই এসে যায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ– অনিবার্যভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে সামান্যই। জীবনানন্দের প্রথম দিককার লেখা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেনি। চিঠিতে সরাসরিই

---

## সম্পূরক মূল্যায়ন

০১.

*কালের আরও একটি মঞ্চ ছিল নিকট-অতীতেই। তার কুশীলব ছিল সৌম্য আকাশ, শুভ্র মেঘ, শান্ত প্রকৃতি আর নিষ্কলুষ জীবন। মঞ্চটির অধিষ্ঠাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) পা বাড়ালেন নিবিড় নিসর্গ, জমাট অন্ধকার, গলিত জীবন, নিস্তব্ধ শ্মশান আর অজস্র আকাশ নিয়ে এক মৃত্যুমহাদেশের দিকেও।*

### সম্পূরক পাঠ

**হুমায়ূন কবির**

বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের পর যে কালচেতনাবান পুরুষের স্পর্শধন্য তিনি জীবনানন্দ দাশ। মৃত্যুই তাঁর চেতনার মহারাজাধিরাজ। হাজার বছর প্রলম্বিত মৃত্যুর মহাউত্থানের প্রেক্ষিতেই তাঁর কবিতা। এসিরিয়া ব্যাবিলোনের পর মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের বঙ্গ 'সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মত এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ।' জীবনানন্দের মৃত্যুবোধ ও ইতিহাসচেতনা আজ উপকথার সামগ্রী। কিন্তু আজ অবধি দেখা হয়নি এই দুই চেতনার অন্তর্গত সংযোগসূত্র কতটুকু। এবং কেন

জানিয়েছিলেন সেকথা রবীন্দ্রনাথ। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তার সংরক্ষিত কাগজ-পত্র থেকে চিঠিটি উদ্ধার করেন ভূমেন্দ্র গুহ। উদ্ধার করেন জীবনানন্দের জবাবি দীর্ঘপত্রটিও। দুটি চিঠিই বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *চিঠিপত্র*র ষোড়শ খণ্ডে মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিটি খুবই ছোট। চিঠির সন-তারিখে গোলমাল আছে। অনুমান করা হয়, জীবনানন্দের *ঝরা পালক*-এর পাঠপ্রতিক্রিয়ায় এই চিঠি। জীবনানন্দ তখন বরিশালে থাকেন। উদ্ধার করা যাক রবীন্দ্রনাথের চিঠির পুরো বক্তব্যই–

> তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই।– কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।
>
> বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্‌টো।

জবাবে জীবনানন্দ যে দীর্ঘপত্রটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, অনুমান, শেষতক তিনি তা পাঠাননি। কারণ বিশ্বভারতীর সংগ্রহে মূলচিঠিটি নেই। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিঠির শেষের কথাগুলি জীবনানন্দকে ধাক্কা দিয়েছিল। কালের যে মঞ্চটি নির্মাণের জন্য জীবনানন্দ প্রস্তুত হচ্ছিলেন তলে-তলে, তা ছিল রবীন্দ্রভাবনা-বলয়ের ঠিক বিপরীত। জীবনের অন্ধকার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে

---

জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর যুগে সর্বাপেক্ষা জটিল ও মহাকবি।
[হাজার বছর ধরে শুধু খেলা করে/*হুমায়ূন কবির রচনাবলী*]

**আবদুল মান্নান সৈয়দ**

মূলত জীবনানন্দ চিত্রকল্পের কবি। তাঁর বিরাট কৃতিত্বের একটি প্রধান নির্ভর কাব্যপ্রচলকে বর্জন এবং নতুন কাব্যভাষা সৃষ্টি। একটির পর একটি চিত্রকল্প জড়ো ক'রে যে ভাষা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর কবিতার প্রেম ও প্রকৃতি, তাঁর কবিতার ইতিহাস-চেতনা ও সমাজ-রাজনীতি-চেতনা, তাঁর কবিতার ব্যক্তি ও স্বদেশ, তাঁর জীবন ও মৃত্যুচিন্তা– সমস্ত মিলে তাঁর কবিতার এক আলাদা ও একক পৃথিবী তৈরি করেছে। সে পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের মতো কল্যাণময়ী নয়, নজরুলের মতো আশাবাদী নয়;– সে-পৃথিবী আমাদেরই, যেখানে আশা ও নিরাশা হাত ধরাধরি ক'রে চলে– সে-পৃথিবীর আবহমান বাণী সমাহৃত হয় এরকম একটি বাক্যে : 'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ'।
[জীবনানন্দ দাশের কবিতা : একটি পরিক্রমা / *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ*]

০২.

***জীবনের অন্ধকার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা একরৈখিক আধুনিকতা থেকে মুক্তির***

রাখা একরৈখিক আধুনিকতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল যে বিশশতকীয় বিশ্বকবিতা, বাংলা ভাষায় জীবনানন্দই তা সর্বাধিক আঁচ করেছিলেন তার সময়ে। আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রান্তিকতার ধারণাও তিনিই প্রথম দিলেন। কুলীনের সভায় প্রবেশ করলেন ব্রাত্য-পরিচয়ে। তাই মেনে নিতে পারলেন না তিনি রবীন্দ্রনাথের একরৈখিক কাব্যভাবনাকে। জীবনানন্দের জবাবি পত্রেই তার আভাস মেলে। নিচে তার অংশবিশেষ তুলে ধরছি–

> পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসচে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন,– পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জ্জর হ'য়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকেরা serenity জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না।

*ঝরা পালক*-এ অসন্তুষ্ট রবীন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*র পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় জীবনানন্দকে লিখেছিলেন– "তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা

---

*পথ খুঁজছিল যে-বিশশতকীয় বিশ্বকবিতা, বাংলা ভাষায় জীবনানন্দই তা সর্বাধিক আঁচ করেছিলেন তার সময়ে। আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রান্তিকতার ধারণাও তিনিই প্রথম দিলেন। কুলীনের সভায় প্রবেশ করলেন ব্রাত্য-পরিচয়ে। তাই মেনে নিতে পারলেন না তিনি রবীন্দ্রনাথের একরৈখিক কাব্যভাবনাকে।*

## সম্পূরক পাঠ

### শৈলেশ্বর ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বুঝে ওঠার সময় পাননি। সময় পেলেও দুজনের চেতনারাজ্যের দূরত্ব এত বেশি ছিল যে তিনি জীবনান্দকে বুঝে উঠতে পারতেন কিনা, সে-সন্দেহ থেকে যায়। কমিউনিস্ট কবিরা, অন্তত তাঁদের বড় অংশই জীবনানন্দকে জীবনবিরোধী এবং মানব-বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন। ওঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, মানুষের মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ কেবল তাঁদের কবিতাতেই হচ্ছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মনে হয়েছিল, জীবনানন্দের শব্দপ্রয়োগ হাস্যকর। গুরুত্বহীন মনে হয়েছিল তাঁর, জীবনানন্দের কবিতাকে। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের প্রকৃতিকে চিনলেও, জীবনানন্দের মানুষকে চিনতে পারেননি। সজনীকান্ত দাশের বিকৃত আক্রমণ (জিহ্বানন্দ) প্রসঙ্গগুলি এবং পঞ্চাশের দশকের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আক্রমণ

আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।" এর আগেই, বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক চিঠিতে (৩ অক্টোবর ১৯৩৫), জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি প'ড়ে, রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন– "জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।" রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি *কবিতা* পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লে এই মন্তব্যটি বহুলপ্রচার পায়।

প্রথম কাব্যগ্রন্থে বিরূপ হলেও, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আগেই জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হোক তা সংক্ষিপ্ত। তাই জীবদ্দশায় জীবনানন্দ খুব অবহেলিত ছিলেন ব'লে যে ধারণাটি প্রচলিত, তা সর্বাংশে সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার আলোচনায় বিস্তারিত কিছু না বললেও, প্রমথ চৌধুরী তাকে নিরাশ করলেও, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তার সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও, সজনীকান্ত দাশ খড়্গহস্ত হলেও একা বুদ্ধদেব বসুই জীবনানন্দকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন সব অপ্রাপ্তির দেনা। বরিশালের জীবনানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাতে ছিল বিরক্তির প্রকাশ। চিঠির শেষে রবীন্দ্রস্বভাবী আশীর্বাদসূচক কোনও বাক্য বা শব্দও ছিল না। যদি *ঝরা পালক*-এর প্রতিক্রিয়াতেই লেখা হয় সেই চিঠি, এতটা উপেক্ষা বোধহয় প্রাপ্য ছিল না জীবনানন্দের। সম্ভাবনার অনেক বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গই সেই বইয়ের একাধিক কবিতায় ছিল। নিকটঅগ্রজদের ঋণভূমে দাঁড়িয়েও জীবনানন্দ এক নতুন সময়চেতনার ইঙ্গিত দিতে পেরেছিলেন তার প্রথম কাব্যগ্রন্থেই। এই বইয়ের ছন্দে ও প্রকাশ-

---

আমাদের মনে রাখতে হয়– সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতটা বুঝে নেবার জন্য।
[জীবনানন্দ ও উত্তরকাল/*এই সময় ও জীবনানন্দ*]

**রণজিৎ দাশ**

'চক্ষুষ্মির কবিতাটির শুরুতেই তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ– চিরকাল আমার হৃদয়ে / পৃথিবীর দণ্ডীদের মতো পরিমিত ভাষা নেই।' উক্তিটি শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব কাব্যভাষার সাবঅল্টার্ন মুক্তিঘোষনা নয়, এমনকী সমস্ত প্রগতিসাহিত্যে-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রেণীচেতনার একটি মৌলিক আইডেন্টিফিকেশনও নয়। উক্তিটি তাঁর চেয়েও বেশি কিছু। উক্তিটির মধ্যে আছে চক্ষুষ্মির হওয়ার মতো একটি ইঙ্গিত, যে, কাব্যভাষা, নিজেরই অজ্ঞাতে, শাসকশ্রেণীর দণ্ডবিধানের পরিমিত ভাষার জোগাড়ে হয়ে উঠতে পারে।

[হৃদয়ের নীলিমা থেকে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালি: 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতা/*এই সময় ও জীবনানন্দ*]

০৩.

***নিকটঅগ্রজদের ঋণভূমে দাঁড়িয়েও জীবনানন্দ এক নতুন সময়চেতনার ইঙ্গিত দিতে পেরেছিলেন তার প্রথম কাব্যগ্রন্থেই। এই বইয়ের ছন্দে ও প্রকাশ-প্রকরণে কবি অনেকের দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিষয়-প্রকরণে নতুন বাঁকের ইশারাও রাখতে পেরেছিলেন। 'নাবিক',***

প্রকরণে কবি অনেকের দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিষয়-প্রকরণে নতুন বাঁকের ইশারাও রাখতে পেরেছিলেন। 'নাবিক', 'আলেয়া', 'অস্তচাঁদে', 'কবি', 'পিরামিড' ইত্যাদি কবিতায় সেই ইশারা খুবই স্পষ্ট। প্রত্যন্ত বরিশালের এক অখ্যাত কবি ব'লেই কি জীবনানন্দকে সেদিন চিনতে ভুল করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? হয় তো তা-ই। এবং বুদ্ধদেব সম্পাদিত *কবিতায়* প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে হয়তো রবীন্দ্রনাথ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি। বলতে দ্বিধা নেই, বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন সম্পাদক ছিলেন ব'লেই জীবনানন্দ দাশ সমকালেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। জীবনানন্দ যদি পঞ্চাশ বছর পর, আজকের এই বামন-সম্পাদকদের যুগে জন্মাতেন, তাহলে স্বীকৃতির জন্য তাকে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হত হয়তো বা। বুদ্ধদেব যে জীবনানন্দের কবিতার কত বড় রক্ষাকবচ ছিলেন, তা অশোক মিত্রের একটি বক্তব্যে স্পষ্ট হয়—

> 'কবিতা' পত্রিকার অভাবে বরিশালের কবি জীবনানন্দ হয়তো চুপচাপ কবিতা লিখে চুপচাপই তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন, চিরকালের জন্য তারা আমাদের অনুভবের অন্তরালে থেকে যেত। বুদ্ধদেব বসু যদি কোনোদিন আত্মজীবনী লেখেন, আরো-একটু বিশদ ক'রে আমরা জানতে পারবো কত পরিমাণ আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে, কত উপরোধের উপান্তে জীবনানন্দের কাছ থেকে নিয়মিত কবিতা সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।
> [অশোক মিত্র : ভয়ে ভয়ে কয়েকটি কথা/*কবিতা থেকে মিছিলে*]

---

*'আলেয়া', 'অস্তচাঁদে', 'কবি', 'পিরামিড' ইত্যাদি কবিতায় সেই ইশারা খুবই স্পষ্ট।*

## সম্পূরক পাঠ

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

আসল কথা, কোনও কবিই উত্তরাধিকারের দায় থেকে মুক্ত নন। তিনি কীভাবে ঐ দায়ভার থেকে নতুন দায়িত্ববোধ তৈরি করে নেবেন, সেটাই হল বিবেচ্য।
[সঞ্চারী/*জীবনানন্দ*]

**আবদুল মান্নান সৈয়দ**

ললিত-মধুর-মোহন শব্দপ্রয়োগে জীবনানন্দের অভ্যাসধারা মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের মতো হ'লেও তাঁর শব্দপ্রয়োগ কিছুতেই মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের অনুসরণ করেনি; নিজের জন্যে বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি নব্য শব্দান্বয়—নূতন ললিত-মধুর-মোহন শব্দাবলি এনে ঘর সাজিয়েছিলেন।
[*শুদ্ধতম কবি*]

০৪.

*একা বুদ্ধদেবই জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতি মনোযোগী করে তুলেছিলেন*

সেই আত্মজীবনী লেখায় হাত দিয়েছিলেন বটে বুদ্ধদেব বসু, কিন্তু জীবনানন্দের কথা বিশদে আসার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দয়মন্তী বসুর সম্পাদনায় *আমাদের কবিতাভবন* নামে সেই অসম্পূর্ণ জীবনী আজ আমাদের গোচরীভূত। তার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, জীবনানন্দের কবিতার প্রতি বুদ্ধদেবের টান কত আন্তরিক আর প্রগাঢ় ছিল। এর বিপরীতে *শনিবারের চিঠির* আক্রমণ খুব বড় ঘটনা নয়। সব কালে, সব ভাষার সাহিত্যেই এমন দু-একজন মানুষের দ্যাখা পাই, যাদের একার মতে খণ্ডন হয়ে যায় অসংখ্য অর্বাচীনের মতামত। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব ছিলেন তেমনই একজন কাব্যচিন্তাবিদ। আক্রমণকারীদের হাত থেকে জীবনানন্দকে শিশুর মতো আগলে রাখার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব যে কতখানি আন্তরিক ছিলেন, সেকথা তার 'কবি জীবনানন্দ' শীর্ষক এক গদ্যেও আছে—

> এইরকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হতো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হতো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হতো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য।
> *[বুদ্ধদেব বসু/কবি জীবনানন্দ]*

অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের কবিতার খাঁটি সমালোচকই শুধু নন, প্রতিরোধের ঢালও ছিলেন। বুদ্ধদেবের মতো একজন বড় কাব্যসমালোচককে পরম সুহৃদের

---

*সমকালীন বোদ্ধা পাঠকদের। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন-গ্রন্থে জীবনানন্দের ৪টি মাত্র কবিতা ('পাখীরা', 'শকুন', 'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জ্জন হাত') স্থান পেয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে, এমনকি প্রেমেন্দ্র মিত্রর তুলনায় এই সংখ্যা ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। দেরিতে হ'লেও সেই অপ্রাপ্তি পুষিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব তার নিজের সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতায়। বুদ্ধদেবকৃত এই কাব্য-সংকলনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। জীবনানন্দের মৃত্যুর এক বছর আগে। সেখানেই জীবনানন্দের কবিতা সংখ্যার দিক থেকে গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯-এ দাঁড়াল। এই সংকলনগ্রন্থে যা একক সর্বাধিক। এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি।*

সম্পূরক পাঠ

**বুদ্ধদেব বসু**

**আমার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বেদনার কারণ জীবনানন্দ— যাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরেও আরো অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা বেরিয়ে গেছে ততদিনে, অথচ যিনি স্থান পেয়েছিলেন অতি সংকীর্ণ; আমি বহু তর্ক ক'রেও অন্যদের বোঝাতে পারিনি যে জীবনানন্দ শুধু**

ভূমিকায় পেয়েছিলেন ব'লেই আত্মরক্ষার জন্য জীবনানন্দকে ব্যস্ত হতে হয়নি। নিবিড়-ঘন থাকতে পেরেছিলেন তিনি কবিতার খাতায়। তারপরও কবিতা নিয়ে কিছু গদ্য লিখেছেন জীবনানন্দ। এই গদ্যগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্নে নিজের কবিতার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর একটি প্রচেষ্টাও লক্ষ করি আমরা। নিজ-নিজ কবিতার বিশ্লেষণ ক'রে জীবনানন্দ যে কবিদের গদ্য লিখতে বলেছিলেন, সেখানেও আমরা তার এই মনোভাবেরই প্রকাশ দেখি। কবির মৃত্যুর পর এই সব গদ্যে তার *কবিতার কথা* বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে জীবনানন্দের বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যভাবনা, ভাবনার রূপান্তর ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। যুক্তির স্বচ্ছতা কম ব'লে *কবিতার কথা*কে প্রবন্ধ-গ্রন্থের মর্যাদা দিতে চান না অনেকেই। কেউ-কেউ সেখানে ইংরেজ কবি-সমালোচকদের লেখার গন্ধও পান (সেই গন্ধ কবির 'হায় চিল'সহ একাধিক কবিতায় আছে)। নিজের কাব্যভাবনার অনুকূলে পাঠককে টেনে আনার যে প্রচেষ্টা *কবিতার কথায়* লক্ষণীয়, তা এলিয়টের 'On Poetry and Poets'-এও আছে। এসব সত্ত্বেও জীবনানন্দের কবিতাকে বুঝতে *কবিতার কথা* অতুলনীয়। শুধু দাশকাব্যেরই নয়, কবিতার অনেক গহনকথনেরও ব্যাখ্যাতা জীবনানন্দের এই বই। বুদ্ধদেবের মতো কাব্যসমালোচক যে জীবনানন্দেরও কাঙ্ক্ষিত ছিল, তার ইশারও সেখানে আছে–

> এত সব পড়েও সকলেই বড় সমালোচক হয় না, দু'একজন হয়। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে, না পড়ে অশিক্ষিতপটুত্বও ঠিক জিনিস নয়। জ্ঞানেরই

---

'বর্ণনাধর্মী' লিপিকার নন, অতি গভীর ভাবনাঋদ্ধ এক কবি, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। আমি অগত্যা আপোস করেছিলাম যাতে বইটা বেরিয়ে যায় এবং বন্ধুতা অটুট থাকে, কিন্তু অসন্তোষ ভুলতে পারিনি। এই কারণে, এবং প্রকাশকের ইচ্ছে অনুসারেও, যখন চোদ্দ বছর পরে নতুন সংস্করণের ডাক এলো আমি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলাম। ততদিনে কবিতাভবনের পুরোনো গুচ্ছ ছিন্নভিন্ন, চেষ্টা করলেও সেবারকার মতো সহযোগ আর সম্ভব হতো না– এদিকে অনেক নতুন কবিতা উৎপন্ন হয়েছে এবং দু-একটি নতুন কবিও দৃষ্টিগোচর; বদলে গিয়েছে সারাদেশের ও বাংলা কবিতার আবহাওয়া– নানান দিক থেকেই পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণে আমি জীবনানন্দকে তাঁর যোগ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং সব ধরনের কবিতার জন্যই দুয়ার রেখেছিলাম উন্মুক্ত, অবনীন্দ্রনাথের একটি গদ্য পর্যন্ত বাদ পড়েনি; আমার রসবোধ ও বিবেক দুই-ই তৃপ্ত হয়েছিলো।

|*আমাদের কবিতাভবন*|

০৫.

*যুক্তির স্বচ্ছতা কম ব'লে 'কবিতার কথা'কে প্রবন্ধ-গ্রন্থের মর্যাদা দিতে চান না অনেকেই। কেউ-কেউ সেখানে ইংরেজ কবি-সমালোচকদের লেখার গন্ধ পান (সেই গন্ধ কবির 'হায় চিল'সহ অনেক কবিতাতেও আছে)। এসব সত্ত্বেও জীবনানন্দের*

দরকার বেশি, সেই জন্যই অধ্যয়নের দরকার। অধীত জিনিস থেকে প্রজ্ঞা লাভ করবে কি সমালোচক, না পাণ্ডিত্য? প্রথমটির (প্রজ্ঞা) ভরসাই অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য দিয়ে কবিতায় সমালোচনা বেশি চলে না।

[জীবনানন্দ দাশ : *দেশ কাল ও কবিতা/কবিতার কথা*]

এবং বুদ্ধদেবই জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতি মনোযোগী ক'রে তুলেছিলেন সমকালীন বোদ্ধা পাঠকদের। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা* সংকলন-গ্রন্থে জীবনানন্দের ৪টি মাত্র কবিতা ('পাখীরা', 'শকুন', 'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জ্জন হাত') স্থান পেয়েছিল। সুধীন, বুদ্ধদেবসহ সমকালীন কোনও-কোনও কবির তুলনায় এই সংখ্যা ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। দেরিতে হ'লেও সেই অপ্রাপ্তি পুষিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব তার নিজের সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতায়*। বুদ্ধদেবকৃত এই কাব্য-সংকলনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। জীবনানন্দের মৃত্যুর এক বছর আগে। সেখানেই জীবনানন্দের কবিতা সংখ্যার দিক থেকে গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯-এ দাঁড়াল। এই সংকলনগ্রন্থে যা একক সর্বাধিক। এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি। 'শকুন' ছাড়া হীরেন্দ্র-আইয়ুব সম্পাদিত সংকলনের বাকি তিনটি কবিতা সেখানে স্থান পেয়েছিল। পুরো তালিকাটি এমন– 'পাখিরা', 'অবসরের গান' (অংশ), 'বোধ, 'ঘাস', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'সমারূঢ়', 'বিড়াল', 'আট বছর আগের একদিন',

---

*কবিতাকে বুঝতে বইটির তুলনা হয় না। শুধু দাশকাব্যেরই নয়, কবিতার অনেক গহনকথনেরও ব্যাখ্যাতা জীবনানন্দের 'কবিতার কথা'।*

## সম্পূরক পাঠ

**সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম**

বস্তুত বাংলা কবিতার গত একশ বছরের সমালোচনার ইতিহাসে সত্যিকার মেধাবী আলোচক হিসেবে কয়েকজন কবির নামই উল্লেখ করা যায়– রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তালিকাটি আরেকটু দীর্ঘ করলে শঙ্খ ঘোষের মতো দুয়েকজন তাতে অন্তর্ভুক্ত হন। জীবনানন্দকেও এই তালিকায় রাখা যেত, তবে 'কবিতার কথা' গ্রন্থটি মন দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে বুদ্ধদেব বা সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটি মৌলিক প্রভেদ আছে : বুদ্ধদেব কবিতার নান্দনিকতা ও কাঠামোচিন্তার বাইরে গিয়েও এর ঐতিহাসিক বৌদ্ধিক পূর্বাপরতায় কবিতাকে স্থাপন করেন; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা বিষয়ক অনুধাবন অনেক মৌলিক। সেই তুলনায় জীবনানন্দ দাশ কবিতার নান্দনিক পরিমণ্ডলেই আটকে থাকেন; তার চিন্তাগুলোও বিভিন্ন জনের– ম্যাথু আর্নল্ড থেকে নিয়ে টি. এস এলিয়ট পর্যন্ত কবি-সমালোচকদের। এক অর্থে জীবনানন্দ তাঁর রোমান্টিক চিন্তা থেকে কবিতার বিষয়ে যে সব অনুধাবন ব্যক্ত করেন, সেগুলো শুদ্ধবাদী রোমান্টিক একটি

'আদিম দেবতারা' 'আকাশলীনা' 'যেই সব শেয়ালেরা', 'রাত্রি', 'সুদর্শনা', 'অদ্ভুত আঁধার এক', 'ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত' 'কার্তিকের ভোরবেলা' ও 'দুদিকে ছড়িয়ে আছে'। লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, দু-একটি ব্যত্যয় ছাড়া, বুদ্ধদেবের পছন্দের এই কবিতাগুলোই বার-বার আলোচিত হয়েছে। আরও লক্ষণীয় বানানরীতির পরিবর্তন– বুদ্ধদেবের সংকলনে এসেই 'পাখীরা' হল 'পাখিরা', 'নির্জ্জন' হল 'নির্জন'। জীবনানন্দের প্রতিষ্ঠালাভে বুদ্ধদেবের এই প্রযত্ন আমাদের সাহিত্যের বিরলতম ঘটনাগুলোর একটি। এবং সন্দেহ নেই, বুদ্ধদেবকৃত *আধুনিক বাংলা কবিতায়* জীবনানন্দের স্বীকৃতিই ছিল কবির জীবদ্দশার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

স্বতঃ, রজঃ ও তমঃ– সাংখ্য দর্শনে এই তিনের নিত্যসম্বন্ধকেই জগৎসৃষ্টির কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এরা যথাক্রমে সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক শক্তি। এদেরই কোনও একটি প্রবল হয়ে অন্য দুটির উপর প্রভাব বিস্তার করলে এক-একটি 'ক্রিয়া' সংঘটিত হয়। জীবনানন্দের কবিতারও তিন প্রধান শক্তি তেমনি– সময়, সংবেদ ও নিসর্গ। জীবদ্দশায় প্রকাশিত ৬টি (*ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাতটি তারার তিমির*) এবং মরোণত্তর ২টি (*রূপসী বাংলা* ও *বেলা অবেলা কালবেলা*)– এই ৮টি কাব্যগ্রন্থেই এই তিন জীবনানন্দীয় স্বভাব-শক্তি লক্ষণীয়। এদেরই পরিপার্শ্বে দাশকাব্যে ইতিহাস, মৃত্যুচিন্তা, প্রেম, নির্জনতা, রাত্রি, অন্ধকার, নক্ষত্র ইত্যাদি আসা-যাওয়া করে।

---

কবিগোত্রের, তিনি এর মুখপাত্র, অত্যন্ত উজ্জ্বল একজন মুখপাত্র, কিন্তু কবিতার ভাবনাটি তাঁর প্রথাগত, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রমের শিকার।
[সমালোচক জীবনানন্দ/*দ্বিতীয় চিন্তা* জীবনানন্দ জন্মশতবার্ষিক স্মারক সংখ্যা, ১৯৯৯]

০৬.

*যে বুদ্ধদেবের সহৃদয়তায় জীবনানন্দের কবিতা বিদ্যুৎ-গতিতে বোদ্ধা পাঠকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, সেই বুদ্ধদেবই আবার নিরাসক্ত ছিলেন তার 'মহাপৃথিবী'-পরবর্তী কবিতাবলিতে। বুদ্ধদেবের পর সমকালীন কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যই ছিলেন দাশকাব্যের সবচেয়ে বড় অনুরাগী। নিজের সম্পাদিত 'পূর্বাশা'য় তিনি জীবনানন্দ দাশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবিতা ছেপেছেন। বুদ্ধদেব যেখানে থামলেন, সেখানেও সঞ্জয় মুগ্ধতা নিয়ে তাকালেন।*

সম্পূরক পাঠ

**সঞ্জয় ভট্টাচার্য**

**'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে এই আকাশ-যাত্রা সমাপ্ত হয়েছে। কবির 'সুরঞ্জনা'র সহায়তায়। যেমনি দান্তের হয়েছিল বিয়াত্রিচের সহায়তায়। সে-নারী 'আকাশলীনা'**

কোনও-কোনও কাব্যগ্রন্থে কোনও একটি বিশেষ শক্তির প্রভাব থাকলেও বাকি দুটিও সেখানে নিত্যসম্বন্ধে অনুষঙ্গক হিসেবে উপস্থিত। যেমন—*ধূসর পাণ্ডুলিপি* কবিতাগুলি প্রধানত সংবেদ বা ইন্দ্রিয়প্রবণ; *বনলতা সেন*, *মহাপৃথিবী* ও *সাতটি তারার তিমির*-এ প্রাধান্য পেয়েছে সময় এবং *রূপসী বাংলায়* মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে নিসর্গ। তবে জীবনানন্দের এই তিন স্বভাব-শক্তির কেন্দ্রে আছে সময়। *সাতটি তারার তিমির* থেকে এই সময়চেতনার নতুন নিরীক্ষা শুরু করেন জীবনানন্দ। এই নীরিক্ষার সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে বিশদে যাওয়ার আগে দাশকাব্যের এই তিন স্বভাব-শক্তিজাত 'ক্রিয়া'র প্রকাশভঙ্গিটি পর্যবেক্ষণ করা যাক—

সময়প্রধান ক্রিয়া—

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির করে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স;
[বিভিন্ন কোরাস/*মহাপৃথিবী*]

ইন্দ্রিয়প্রধান ক্রিয়া—

চাঁদ জেগে রয়
তারা ভরা আকাশের তলে,

---

হয়ে সপ্তর্ষিরই নক্সায় 'সাতটি তারার তিমির' রচনা করছে। কিন্তু অতীত-ইতিহাসের 'ঘোড়া' রয়েই গেছে স্বপ্নের মতো বাস্তবে কবির 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে। জ্যোৎস্নায় এখনও কবির তা মনে পড়ে। 'মহাপৃথিবী'র সৃষ্টির উত্তেজ স্বাভাবিকভাবেই 'সাতটি তারার তিমির'-এ নেই। কেননা এখানে তিনি মানুষ— সমাজেরই একজন হিসেবে সময়ের নাটকের দিকে তাকাচ্ছেন : ('ঘোড়া' দ্রষ্টব্য)।
[*কবি জীবনানন্দ দাশ*]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জীবনানন্দ দাশকে যদি 'মহাপৃথিবী'-প্রেমিক এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এর প্রেমিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে দেখতে পাব, তার ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে। জীবনানন্দের কবি-জীবনের পর্যায়গুলো অসম্বদ্ধ নয়। যেমনি 'ঝরা পালক'-এর পর্যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র দিকে ইঙ্গিত জানিয়েছে তেমনি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁকে ক্রমে 'বনলতা সেন'-এ 'মহাপৃথিবী'তে এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এ ডেকে নিচ্ছে। হেমন্তের মাঠেই তাঁর পিপাসা চরিতার্থ হয়ে যায়নি। আকাশের দিকেও তিনি তাকিয়েছেন।
[*কবি জীবনানন্দ দাশ*]

মূল্যায়ন সে-কথাই বলে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও কবির *সাতটি তারার তিমিরে* খুঁজে পেয়েছিলেন নতুন বিশ্ববীক্ষা। তারুণ্যে অলোকরঞ্জন জীবনানন্দের কবিতাকে 'নির্বস্তুক' আখ্যা দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ কারণে জীবনানন্দ তার উপর ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। ক্ষোভ কমলে একদিন জীবনানন্দই তাকে অনুরোধ করেছিলেন– "আমার কবিতার পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একটা বই লিখবে তো?" অগ্রজের এই অনুরোধ রক্ষা করেছেন অলোকরঞ্জন। জীবনানন্দের কবিতা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন তিনি তার *জীবনানন্দ* নামের গ্রন্থটি। যদিও তা কবির মৃত্যুর অনেক বছর পর প্রকাশিত হয়।

জীবনানন্দের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ করার মতো ঘটনা হল– রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেই তার কবিতা সম্পর্কে প্রথমে বিরূপ মন্তব্য ক'রে পরবর্তীকালে মতপরিবর্তন করেছেন। তবে উল্লেখ করার মতো সবচেয়ে বড় পুনর্মূল্যায়নটি এসেছে সজনীকান্ত দাশের কাছ থেকে। জীবদ্দশায় *শনিবারের চিঠি*র এই সজনীকান্তই কবিকে সর্বাধিক বাণবিদ্ধ করেছেন তার বিবিধ গদ্যে। *কবিতা* ও *প্রগতি*র কবি-লেখকদের প্রতি আক্রমণ শানানোই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল *শনিবারের চিঠি*র। দলবাজি, গোষ্ঠীবাজি এড়িয়ে চলার পরও জীবনানন্দ দাশ হয়েছিলেন এই গোষ্ঠীগত আক্রমণের প্রধান শিকার। যেহেতু বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের কবিতার প্রশংসায় কলম ধরেছেন, সেহেতু প্রশংসিত কবির বিরুদ্ধাচরণ না করলেই নয়– এমনই লক্ষ্য ছিল *শনিবারের চিঠি*র।

---

প্রতীক।
[প্রতীকী কবিতা/*কবিতা নিয়ে গদ্য*]

০৮.
*একজন সমরনায়ক হিটলার যখন ভাঁড়ারের খোঁজে অন্য জাতির মুখের আহার কেড়ে নিয়ে নিজ জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিচ্ছেন দুনিয়াজোড়া, জীবনানন্দ তখন নিজের জাতিসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন বৃহত্তর মানবসত্তায়, মানবসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন প্রাণিরাজ্যের সামষ্টিক প্রাণসত্তায়, সামষ্টিক প্রাণসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে ফের পাড়ি জমাচ্ছেন এক নিখিল চরাচরে।*

## সম্পূরক পাঠ

**শঙ্খ ঘোষ**

আমরা বেঁচে আছি আমাদের একটা সমকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে, এও এক সময়, কিন্তু এ হল এক ব্যক্তিকাল। জীবনানন্দের শব্দ ব্যবহার করে বলা যায়, আরো একটু 'অন্তর্যানী' হয়ে ওঠে যখন আমাদের মন, তখন এই ব্যক্তিকালকে দেখি অন্য একটা সময়ের মধ্যে ভাসমান, তাকে বলা যায় মানবকাল, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর সজনীকান্ত দাশ নিজেই ফাঁস করে দিলেন সেই অসাহিত্যিক উদ্দেশ্যের কথা। অসাহিত্যিক? সন্দেহ নেই তাতে। কেবল তর্কের স্বার্থে তর্ক বা বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা কখনোই সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে না। *শনিবারের চিঠি* যে এ জাতীয় অসাহিত্যিক কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, সে-কথা আমরা জানতে পাই সজনীকান্তের নিজের জবানবন্দিতেই–

> কবি জীবনানন্দের কাব্যের প্রতি আমরা যৌবনে যথেষ্ট বিরূপতা দেখাইয়াছি। তাঁহার দুর্বোধ্যতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বহু পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করিয়া তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ি নাই। তিনি প্রধানত 'কল্লোল'-'প্রগতি'-গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে বিপক্ষ দলে ফেলিয়া লড়াইয়ের ধর্ম অনুযায়ী আক্রমণেই আমাদের আনন্দ ছিল। আজ কালধর্মে আমাদের মতি ও বুদ্ধির পরিবর্তন হইয়াছে, তিনিও সকল নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছেন। পুরাতন যাবতীয় অশোভন বিরূপতা সত্ত্বেও একথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন, তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম শ্রদ্ধার সহিত কাব্য-সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতে অস্পষ্টতা থাকিলেও সাধনায় বিন্দুমাত্র ফাঁকি ছিল না। তিনি ভঙ্গি ও ভান-সর্বস্ব কবি ছিলেন না। তাঁহার অবচেতন মনে কবিতার যে প্রবাহ অহরহ বহিয়া চলিত, লেখনীমুখে সজ্ঞান-সমতলে তাহার ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ দিতে প্রয়াস করিতেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তব্যের চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। যাঁহারা তা পাইতেন না

---

থেকে যায়', সেই হল এক ইতিহাস। কিন্তু আরো একটু 'অন্তর্যানী' হলে তবেই শুধু অনুভব করা যায়, অনুভব করতে হয়, বিশ্বজাগতিক অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে আমাদের বিম্ব-অবস্থান– ভঙ্গুর ভারাতুর ভীতিময়, আবার সেই একই সঙ্গে রঞ্জিত রহস্যাতুর রতিময়– তার ধারক সেই প্রবাহ হল এক বিশ্বকাল। আমি যদি আমার বাইরে এসে দাঁড়াতে চাই, ব্যাপ্ত কোনো না-আমির মধ্যে, তাহলে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে দেখতে হয় ব্যক্তিকাল মানবকাল আর বিশ্বকালের সম্পর্কের মধ্যে। কখনো হয়তো সেই সম্পর্ককে মনে হয় সমন্বয়ের দিকে এগিয়ে-আসা অনেকখানি, কখনো-বা তাকে দেখি এক প্রবল সংঘর্ষে। ঢেউ কখনো এগিয়ে এসে যেন পৌঁছে যায় তটে, পরের মুহূর্তে প্রবল প্রতিঘাতে সে আবার সরে যায় দূরে, এই আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিকাল মানবকাল আর বিশ্বকাল, আমাদের সমাজ ইতিহাস আর প্রকৃতি। নিজেকে নিজের বাইরে এনে, এর যে-কোনো-একটার সঙ্গেই নিবিড় সম্পর্কসূত্রে কেউ লিখতে পারেন কবিতা, আর কেউ-বা জড়িয়ে নিতে পারেন এর সবকটিকেই একসঙ্গে অবলীন এক অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে। সেই সবকটিরই ইঙ্গিত দেন জীবনানন্দ, যখন তিনি বলেন 'মহাবিশ্বের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো' কিংবা যখন 'মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায়' দেখতে চান তিনি, কিংবা বলেন

তাঁহারাই বিমুখ হইতেন। আমরা এই শেষোক্তদের দলে ছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া কবি জীবনানন্দের কাব্যসম্পদ কিছু বাতিল হইয়া যায় নাই। আমরাই বরং সহৃদয়তার সাধনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

[সজনীকান্ত দাশ : সংবাদ-সাহিত্য/*শনিবারের চিঠি* কার্তিক ১৩৬১]

সজনীকান্তের এই স্বীকারোক্তিতে দাশকাব্যই শুধু পুনর্মূল্যায়িত হল না, জীবনানন্দের 'সমারূঢ়' কবিতাটি স্থূলবুদ্ধি কাব্যসমালোচকদের বিরুদ্ধে একটি লাগসই মারণাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল–

'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা'–
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিও দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়– সে যে আরূঢ় জনতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে– কবি নয়– অজর, অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই– চোখে তার অক্ষম পিচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে– আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো– হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

[সমারূঢ়/*সাতটি তারার তিমির*]

---

'প্রকৃতি, সমাজ ও সময় অনুধ্যান'-এর কথা।

[সময়ের সমগ্রতা/*এই সময় ও জীবনানন্দ*]

**অশ্রুকুমার শিকদার**

এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথই সব চেয়ে ইতিহাসসচেতন কালজ্ঞানী কবি। কিন্তু কালের ঘূর্ণ্যমান সিঁড়ির শিখরে দণ্ডায়মান জীবনানন্দও কম কালজ্ঞানী নন : নাটোরের বনলতা সেনের মুখে তিনি শ্রাবস্তীর কারুকার্য লক্ষ করেন, শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায় দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা; কালপ্রবাহের দুর্বার স্রোতে অস্তিত্বের কণা যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় দ্রুত বহমান একথা জীবনানন্দ যে উপলব্ধি করেছিলেন তার চিহ্ন আছে তাঁর কবিতার মজ্জায়-মজ্জায়। সুধীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দকে যদি বলি কালসচেতন কবি, তাহলে সমসাময়িক অন্য কবিদের অন্তত বলতে হয় স্বকালসচেতন। অন্যান্যেরা স্বীয়কালকে দেখেছেন, এঁরা দুজন স্বীয়কালকে সর্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন এতেই বোধহয় আছে দুজনের শ্রেষ্ঠত্বের উৎস। তাৎক্ষণিকের সঙ্গে চিরন্তনের এই মুখোমুখি দেখা, তাতে এক নতুন তাৎপর্য আসে বর্তমান চিরন্তনের অঙ্গ হয়ে ওঠে, চিরন্তন বর্তমানের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পায়। কিন্তু সমকালীন বেশির ভাগ কবিতায় পাই এই স্বকালচেতনারই পরিচয়।

[ত্রিশের দশক : 'আদিম দেবতারা'/*আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*]

যেন জীবনানন্দ দাশ জানতেনই, মৃত কবিদের মাংস-কৃমি খুঁটে খাওয়া সজনীকান্ত দাশদের পক্ষে জীবিত কোনও কবির মূল্যায়ন অসম্ভব কাজ। যেন এও জানতেন জীবনানন্দ, তার মৃত্যুর পরই উল্টে যাবে বিরুদ্ধাচরণকারীদের পূর্বমত। এবং সজনীকান্তও ধরা দিলেন কবির পেতে রাখা ফাঁদেই। বাধ্য হলেন তিনি আত্মসমর্পণে। আর এভাবেই, অনেক চিন্তাশীল লেখা প্রকাশ করার গৌরবও ম্লান হয়ে গেল *শনিবারের চিঠির*। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সজনীকান্ত দাশের নাম লেখা হল একজন খলনায়ক হিসেবে। সেই সঙ্গে জীবদ্দশায় যত বিরোধিতার শিকার হয়েছিলেন জীবনানন্দ, সবই পুরস্কার হয়ে ফিরে এল তার 'ভাঁড়ারে'।

দাশকাব্যে এই 'ভাঁড়ার' ফিরে-ফিরে এসেছে। এসেছে প্রতীকের চরিত্র নিয়ে। 'ভাঁড়ার'-এর মতো 'হেমন্ত' ও 'শীত'ও এসেছে আশা ও নিরাশার প্রতীক হয়ে। তারই আশেপাশে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসা পুরানো পেঁচারা, এশিয়ার আকাশে-আকাশে চ'রে বেড়ানো শকুনেরা কিংবা জ্যোৎস্নায় ভেসে আসা বন্দুকের শব্দ জীবনের মাঠে মৃত্যুকে, স্বপ্নের উঠোনে দুঃস্বপ্নকে ডেকে এনেছে বার-বার। পৃথিবীর সব গল্প যে ঐ 'ভাঁড়ার'কে ঘিরেই, সে-কথা জানতেন জীবনানন্দ। তার কবিতায় সামষ্টিক প্রাণের প্রতীক 'ভাঁড়ার'। প্রাণের উপলক্ষও সে। উ ..... করা যাক সেই প্রতীকটিকে—

> হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
> এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে

---

**হুমায়ূন কবির**

**জীবনানন্দে যেটি লক্ষ করবার মতো ভঙ্গী সেটি হল তিনি কেমন সাবলীল অপসারিত হন বর্তমান থেকে অতীতে এবং আভাষিত করেন ভবিষ্যৎ এবং তার কবিতার মধ্যে ঝোলানো যেন একটি যাদুকরী পর্দা যাকে টেনে দিলেই আমাদের অবস্থানে কোলকাতা, বিদিশা, দ্বারকা ও আলেকজান্দ্রিয়া একাকার হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টি পৃথিবীর সময়কে এক অনন্যপ্রান্তর হয়ে যেতে দেখে। প্রায় সমস্ত উচ্চারণে বিস্তৃত সেই প্রান্তরের অনন্ত বিস্তার। প্রান্তরে যেমন কোন খণ্ডাংশের বিশেষ পরিচয় বা মর্যাদা নেই, জীবনানন্দের ইতিহাস ও বিশ্ববোধেও তাই কোলকাতা বা প্যালেস্টাইনে কোনও ব্যবধান নেই। ব্যবধান নেই সময়ের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ের মধ্যে।**

**[*হাজার বছর ধরে শুধু খেলা করে/হুমায়ূন কবির রচনাবলী*]**

**০৯.**

***অর্থাৎ সাতটি তারার তিমির-এর পর থেকে গাণিতিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতারাও সিদ্ধিলাভ না ক'রেই প্রবেশ করতে শুরু করল জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। এ পর্যন্ত কবিতাবলিতে যে কাব্যভাষা জীবনানন্দ রচনা করেছিলেন, তা ছিল মহাকাশযানের মতো সুদূরচারী। সেই সুদূরচারী ভাষাযানটিকে নিয়ে যখনই জীবনানন্দ নিকটপৃথিবীভ্রমণে বেরুলেন, তখনই সৃষ্টি হল পারিসরিক সংকট। এবং সংকটের***

সময়ের কুয়াশায়;
মাঠের ফসলগুলো বার বার ঘরে
তোলা হ'তে গিয়ে তবু সমুদ্রের পাড়ের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে।
মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিভা;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, উত্তর, খাতক;
কিছু নেই তবুও অপেক্ষাতুর;
হৃদয়স্পন্দন আছে - তাই অবেরত
বিপদের দিকে অগ্রসর;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায়;
কী যে চায়।
[নাবিকী/সাতটি তারার তিমির]

প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরাপালক*কেই এই নাবিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ তার 'নাবিক' শিরোনামের কবিতাটিতে। কিন্তু তখনও সেই নাবিকের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে অনেক বন্দরের কাহিনী বাকি ছিল, যেমন বাকি ছিল কবির নিজস্ব ভাঁড়ারেও অনেক হেমন্তের গল্প। অনেক বন্দর আর অনেক হেমন্তের গল্প সহযোগে *ঝরাপালক*-এর নাবিককেই কবি ফিরিয়ে আনেন তার *সাতটি তারার*

---

*বিস্তার 'সাতটি তারার তিমির'-এর পর থেকেই। 'বেলা অবেলা কালবেলা'কে সংকটমুক্ত ও সংকটকবলিত অধ্যায়ের বাঁক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শুধু শেষ অধ্যায়েরই নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে লেখা সংকটকবলিত কবিতাও এই বইয়ে যুক্ত হয়েছে ব'লে ধারণা করি।*

## সম্পূরক পাঠ

**অরুণ মিত্র**

প্রচলিত যে কবিতা লেখা হচ্ছিল, যাকে বলা যায় আমাদের ঐতিহ্য মেনে, আমি রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর অন্তর্ভুক্ত করছি, তা থেকে উনি সরে আসেন। সেই সরে আসাটা ওঁর নিজের চিন্তাভাবনাই ঘটিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই ধারা প্রচলিত ঐতিহ্যগত ধারা কখনোই নয়। বরঞ্চ বলতে পারি যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রকাশ। সেই ধারার কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাননি তিনি। তাঁর ওই প্রকাশভঙ্গি ওঁর সঙ্গেই চলে গেছে বলা যায়। কেউ কেউ অবশ্য নকল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিছু হয়নি। একেবারেই অক্ষম অনুকরণ। সুতরাং সেদিক দিয়ে ওঁর গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো প্রশ্ন নেই। তবে সেটাই যে কবিতার শেষ কথা বা ঐ ধরনের কিছু, এরকম আমার মনে হয় না। জীবনানন্দের কবিতাকে আরো বিশ্লেষণ যদি করা যায় তা হলে দেখা যাবে, তার মধ্যে

তিমির-এ। তখনও ইউরোপমুগ্ধতা কাটেনি রবীন্দ্রনাথের। এক কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল কোনও প্রতিবাদ বাংলা কবিতার কোথাও লক্ষণীয় নয়। নজরুল যে শোষণকে পরাধীন ভারতের চালচিত্রে শনাক্ত করলেন, জীবনানন্দ তাকেই দেখতে পেলেন বৃহত্তর বিশ্বদীক্ষায়। 'মৃত্তিকার ওই দিক'-এ পশ্চিমের শোষক রাষ্ট্রগুলোকে শনাক্ত করলেন তিনি 'যেন শাদা মেঘের প্রতিভা' ব'লে। আর তারই বিপরীতে শোষিত রাষ্ট্রগুলোর করুণ ছবিও ফুটিয়ে তুললেন নিপুণ চিত্রকল্পে—

এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক;
কিছু নেই— তবুও অপেক্ষাতুর;
হৃদয়স্পন্দন আছে— তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায়;
কী যে চায়।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর শরীরে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা লেগেছে। এবং এই বিশ্বযুদ্ধের পেছনেও ছিল হেমন্তের ভাঁড়ারের নেপথ্য-কাহিনী। এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দুর্বল দেশগুলোর ভাঁড়ার খালি ক'রে দিয়ে নিজেদের ভাঁড়ার পূর্ণ ক'রে

---

কবিতায় পুনরাবৃত্তি আছে, এবং আমি বলবো, একঘেয়েমির লক্ষ্যহীনতাও পাওয়া যায়। শেষদিকে যে তিনি যেমন 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় কিংবা এই সময়ের লেখায় যেন একটা পরাবাস্তবতার দিকে সুররিয়ালিজমের, দিকে ঝুঁকেছিলেন। কোথাও যেন গতি পরিচয়েন না, এমন মনে হয়। সুতরাং এমন দিকও ভাবার আছে তাঁর কবিতা সম্পর্কে।
[সাক্ষাৎকার/বিশিষ্ট অকবিদের সাক্ষ্য, মার্চ-চৈত্র ১৪০৭]

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

এই কারণেই, তাঁর নিজের ভাষায়, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে তৃতীয় মহাযুদ্ধের উঠতি হাওয়ায়' লেখা এই কবিতাগুলিতে তাঁর নিজের মতামতের দাগ আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে ছিল, এই মতামতের বিরোধের দরুনই 'বেলা অবেলা কালবেলা'কে টেঁকে থাকতে ভাড়পত্র দিয়ে যেতেন না, যেহেতু কবি-উপলব্ধি থেকে, সর্বত্র শিল্পরূপ অর্পিত হতে পারেনি, সেজন্যে 'সাতটি তারার তিমির' হতে পেরেছিল?
[সাক্ষাৎকার / বীরেন্দ্রকুমার]

**সেলিম খান**

আসলে তিনি জীবনানন্দের কাছে সমাজ ও ইতিহাসের প্রবাহমানতার কোনো দাম আছে বলে মনে হয় না। তিনি একেবারের শেষ-পর্যায়ের আগে সমসমাজ ও তার সমস্যা নিয়ে কিছু লিখতে চাননি। অবশেষে 'সাতটি তারার তিমির' থেকে তাঁর কবিতায়

তুলেছিল যে পাশ্চাত্যের শক্তিধর সেনাবাহিনী, তাদেরই অন্তর্কলহে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল দু-দুটি মহাসমর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকারী হিটলার ভ্রাতৃঘাতে নেমে পেছেন বাড়াতে স্বার্থান্ধ মানুষের মুখ; কিন্তু পৃথিবীর আসরে পৃথিবীর ভাগ্যের তাঁতার। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি সেনাবাহিনীর মতো পুর ভারত উপমহাদেশ গ'ড়ে তাঁতার-সৃষ্টিতের চেয়ে বিস্তীর্ণ শস্যভূমিসমৃদ্ধ প্রতিবেশী ভূমিখণ্ডকে দখল ক'রে নেওয়াটি হিটলারের কাছে সহজতর কাজ ব'লে মনে হয়েছিল। দেশ ছোট হ'লে বড় দেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে সর্বক্ষণ, এই দুশ্চিন্তাও তাকে তাড়িত করেছে। পূর্ব-উপমহাদেশ ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবিস্তারে কৃষিজ বিচিত্রতা এড়ানো যায় না ব'লেই রাজ্যবিস্তারে ও তাঁতারের খোঁজে হিটলারের পছন্দ ছিল রাশিয়া-দখল। হিটলারের এই পরিকল্পনার কথা আমরা জানতে পারি তার আত্মজৈবনিক রচনা মাইন ক্যাম্পে। একজন সমরনায়ক হিটলার যখন তাঁতারের খোঁজে অন্য জাতির মুখের আহার কেড়ে নিয়ে নিজ-জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিচ্ছেন দুনিয়াজোড়া, জীবনানন্দ তখন নিজের জাতিসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন বৃহত্তর মানবসত্তায়, মানবসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন প্রাণিরাজ্যের সামষ্টিক প্রাণসত্তায়, সামষ্টিক প্রাণসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে যের পাড়ি জমাচ্ছেন এক নিখিল চরাচরে। হিটলার তো মরেই, বৃহত্তর মানুষের কল্যাণে আসা মার্কসীয় দর্শনের পথও সেখানে ফুরোয়, সেখানেও অনেক পথ বাঁকি থেকে যায় জীবনানন্দের। এর জন্য 'যের', 'সেই', 'হয়তো', 'হয়তো বা', 'কতো',

---

বক্তব্য কিছু-কিছু এসে যাচ্ছিল। আর সেখানে সমকালীনতা নিয়ে মাঝে-মোনাও মাঝে-মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল। কবির পূর্বতন বিশিষ্টতার পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল।.....জীবনানন্দের কবিতা হয়ত এর ফলে বক্তব্যের কবলে পৌঁছল— অন্তরায় থেকে মুক্তি পেল আলোয়— কিন্তু সেই সব নিরাশার জোনাকির সেই জোনাকি? মৃণালিনী মোষালের শব ঘিরে লাল-নীল-সোনালি ঘোড়ার সেই উজ্জ্বল মৃত্যু? পাঁচ-পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের লুকোচুরি, উপলব্ধির সব বৈপরীত্যের হিসেব, প্রেম-ঘৃণা-অবহেলার চক্রাবর্তন? জীবনানন্দের কবিতা, যে-সব জায়গায় এক শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা, তা তো আর রইল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, শেষ দিকের এক লেখায় : 'আমার ঘুমুর পাখি উড়ে গেছে'— তেমনি বক্তব্য পেতে গিয়ে, ইতিহাসকথার মুক্তি পেতে গিয়ে আমরা কবিকে হারালাম।

[ভূমিকা : কবি ও কাব্য-পরিচিতি/জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র]

১০.

যে খাতায় 'রূপসী বাংলা'র পাণ্ডুলিপিটি কবি নিজেই সম্পাদন করেছিলেন, সম্ভবত তা কবিকৃত সংশোধিত পাঠ। সংশয় জাগে, সেখানে পরবর্তী পর্যায়ে লিখিত কিছু কবিতাও ঢুকেছে। ফলে বইটির মূল পাণ্ডুলিপিতেই গ্রাম-বরিশাল ও শহর-কলকাতার পারিপার্শ্বিক সংকেত লক্ষণীয়। ১২টি কবিতায় বাস-এরিয়ায় এই সংকেত দূর হয়নি। সংকেতকালীন

'কতোবার', 'কবেকার', 'দিকে-দিকে', 'নব নব', 'কত শত' 'কোনো', 'কোনো এক' 'যদি', 'তবুও' জাতীয় শব্দ ও শব্দসমবায়ে তাকে কবিতার মধ্যে এমন এক স্পেস রচনা করতে হয়েছে, যার অবসরে অতীত বর্তমান-ভবিষ্যৎ তাত পরাপরি ক'রে সাধলীল ঘুরে বেড়াতে পারে। এই স্পেস বা পরিসরের কারণেই ফা হিয়েন বা হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মতো তার কবিতাও বর্তমানের পথ হাঁটতে হাঁটতে পৃথিবীর অনেক হারানো রাজ্য আর পুরানো কিংবদন্তির কথা বলে। তাই তার কবিতায় 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'-এর পরপরই দেখতে পাই 'অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে'র মতো সুদূরচারী দৃশ্য। এবং এই স্পেস বা পরিসরের কারণেই কবেকার মৃত মানুষরাও জীবিতদের মতো ঘুরে বেড়ায় তার কবিতায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক*-এই শুরু হয় এই পরিসররচনার চেষ্টা। শেষ হয় *সাতটি তারার তিমির*-এ। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* থেকে *মহাপৃথিবী* পর্যন্ত রচনাকালে এই পরিসর ছিল মহাকালাশ্রিতারী। *সাতটি তারার তিমির*-এ এসে জীবনানন্দ সমকালকেও প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। এতদিন তিনি সমকালকে নিয়ে মহাকালে পাড়ি জমিয়ে এসেছেন। কিন্তু এবার শুরু হল সমকালের উঠোনে মহাকালকেই ডেকে আনা। ফলে দ্যাখা দিল পারিসরিক সংকট। তবে খুব বেশি নয় তা *সাতটি তারার তিমির*-এ। বরং দাশকাব্যে এক নতুন ব্যঞ্জনাই যোগ হল তাতে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যর মুগ্ধতার কারণও হয়তো সেখানেই। এ-পর্যায়ের কবিতায় বিষ্ণু দে-র মুগ্ধতারও প্রমাণ মেলে তার সম্পাদিত *একালের কবিতায়*।

---

*কয়েকটি কবিতা যেমন ঢুকে পড়েছে গ্রন্থে, তেমনি বাদ পড়েছে সংকটমুক্ত কয়েকটি কবিতাও।*

সম্পূরক পাঠ

ভূমেন্দ্র গুহ

*যে-সব কবিতা প্রেসকপিতে ছিল তাদের সম্বন্ধে এইটুকুই বলা চলে যে, তথাকথিত সনেট-আকারের সব কবিতাই সেখানে ছিল; তার মধ্যে থেকে স্পষ্টতই কিছু ঝাড়াই-বাছাই হয়েছে মূল 'রূপসী বাংলা' বইটিতে; এবং নতুন কবিতাও যুক্ত হয়েছে, যেগুলি প্রথম প্রেসকপিতে ছিল না। এমন-কী কবিতা তৈরিও হয়েছে। কোনো কবিতার একটি পুরো পংক্তি ছেঁটে দেওয়া হয়েছে, দেখা যাচ্ছে।*

[ভূমেন্দ্র গুহ : 'রূপসী বাংলা'/*বিভাব অন্তরতর্ব সংখ্যা*, ১৪০৫/১৯৯৮-৯৯]

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

*কিন্তু মৃত্যু হতে না হতে 'রূপসী বাংলা'র ৬ নম্বর খাতাখানি সপ্রচারে ছেপে ও সামগ্রিকভাবে সুনির্ণয় করে তুলে 'ঝরা পালক' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' এ ধারাবাহিত কবিকে একটা অযথা পরিচয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হল কিনা কিংবা এই দীর্ঘ একচল্লিশ বছরে সেই পরিচয়ই আজ একান্ত হয়ে উঠেছে কিনা তা নিয়ে একটা*

কিন্তু তারপর, সমকালটি যখন মুখ্য হয়ে উঠল বেলা অবেলা কালবেলা পরবর্তী কবিতাগুলিতে, তখন তিনি হল পারিপার্শ্বিক সাক্ষী; জীবনানন্দের কবিতা থেকে এল স্বভাব কবিতার প্রথম স্তরে, যার কথা কবিতার কথায় কবি নিজেই বলেছেন...

> যে কোনো সৎ কবিতাই স্বভাবকবিতা, কিন্তু সেখানে কবির অভিজ্ঞতা কম, মু. চারটের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার ভার বহন করবার শক্তি সেই চিত্রের অভিজ্ঞতাকে সেকালের চিত্রের তুলনায় অল্প-বেশি স্পষ্টতায় সেখানের স্বভাব সেই সেখানে স্বভাবকবিতা তার প্রথম স্তরে; অভিজ্ঞতা থেকে মানব সঙ্গে আরো-বেশি সিদ্ধির স্তরে পৌঁছলে সম্ভব, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে আজকের সমাজ ও সব সময়ের সমাজ, এ কাল ও সব সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক জায়গায় বসাবার ও প্রতিটি অভিজ্ঞতার সত্য মূল্য (প্রতি মুহূর্তে যা পরিবর্তিত বদলাচ্ছে যদিও) স্থির করবার ক্ষমতা না থাকলে অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণতে সংস্থায় পৌঁছে যেতে পারে, জীবনের প্রয়োজনে কাজে না, ছোট আদর্শের তলদেশে পৌঁছয় না, স্বভাবকবিতা প্রথম স্তরে থেকে যায়।
>
> [জীবনানন্দ দাশ : কবিতার আলোচনা/কবিতার কথা]

অর্থাৎ সাতটি তারার তিমির-এর পর থেকে পাণিতিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতারা সিদ্ধিলাভ না ক'রেই প্রবেশ করতে শুরু করল জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। এ পর্যন্ত কবিতাগুলিতে যে কাব্যভাষা জীবনানন্দ সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছিল মহাকাশযানের মতো সুদূরচারী। সেই সুদূরচারী ভাষাযানটিকে নিয়ে যখনই

---

সংশয় অবশ্যই পড়ে উঠেছে।

[জীবনানন্দ দাশের আদ্য রচনা/বিভাব জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ১৪০৫/১৯৯৮-৯৯]

১১.

*সভ্যতার হাতে তৈরি ঘড়ির কাঁটায় কিংবা ক্যালেন্ডারের পাতায় নয়, জলের মতো ঘুরে ঘুরে একাকী কথোপকথনে খুঁজে পাওয়া যায় জীবনানন্দের কবিতার কালমঞ্জটিকে। এবং জীবনানন্দ তার কবিতায় মঞ্জায়িত করেন এক 'সর্বপ্রাণসত্তা পাখা'ও, যার সব কুশীলবই মহাকালের বাসিন্দা। সবাই তারা এক ও অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতির সন্তান। মানব পরিচয়ে সেখানে কোনও বিশিষ্টতা নেই। জীবনানন্দের কবিতার মূল বৈশিষ্ট্যই এখানে।*

সম্পূরক পাঠ

অহর সেন মজুমদার

পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কবিদের কবিতায় মানবেতর প্রাণী ও জীবজন্তুরা অনেকটা যেন বেড়ানোর ঢঙে এসেছে এবং নিজেদের কোনোরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় স্থাপন করবার ব্যর্থতাসহই আবার চলেও গেছে। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় জীবজন্তুরা এক-একটি সবিশেষ প্রতীকচরিত্রে পরিণত হয়ে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

জীবনানন্দ সিকত পাণ্ডুলিপিগুলোর প্রেক্ষাপটে, তখনই দুটি দল পারিপার্শ্বিক সংকট। এমন সংকটের বিস্তার সাতটি তারার তিমির এর পর প্রেমিক। প্রেম আবেগ কালপ্রবাহের সংকটযুক্ত ও সংকটকবলিত অধ্যায়ের বীজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শুধু প্রেম অধ্যায়েরই নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রেম সংকটকবলিত কবিতাও এই বইয়ে যুক্ত হয়েছে ব'লে ধারণা করি। এর বিপরীতে অবস্থিত অধ্যায়ের অনেক সংকটমুক্ত কবিতার দ্যোতনা পাই আমরা। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন নয় যে একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে মানুষের চাকা ঘুরে গেল আর ভিন্ন রকম কবিতা লিখতে শুরু করলেন জীবনানন্দ। উভয় পর্যায়েরই সিকত পাণ্ডুলিপির দিকে দৃষ্টি পাতা এমন কিছু পঙ্‌ক্তি রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি, যার সঙ্গে তার মনের রসায়ন ঘটেছে না। উদাহরণ করা যাক দুটি নমুনা

> কি হ'য়ে মরেছ কল ন'য়ে যায় নিরিহ বাতাস
> সমস্তটা ম'রে গেল নদী তবে কেমনের চিনি
> প্রেমে গেল তিনি দাসে তবে কার লাভ
> এই চিত্র চরকার ক'রে গেল উদাস নাবিকী।
> [illegible] মুহূর্ত/সাতটি তারার তিমির

কিংবা

> [illegible] একটা কাজ ফুরিয়ে যাবে তবে;
> কিন্তু তাদের ফুরাবে না তো।
> [illegible]

---

জীবনানন্দের কবিতা পাঠকালে প্রথমেই মনোযোগের আকর্ষণে উপলব্ধি করার অর্থ তাঁর কবিতার একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ গঠন করে চলা।
[illegible] জীবনানন্দ [illegible]/[illegible] জীবনানন্দ [illegible], [illegible]

১৩

সাধারণ মানুষের কবিতাগুলোর মুখের ভাষা প্রেমেই জীবনানন্দ সন্ধান করেছেন বাংলার গ্রামের আত্মাকেই পাওয়ার। আর তা নিয়েই সন্তুষ্ট করেছেন তার কাব্যের ভাঁড়ার। প্রথম করেছেন এই অভ্যন্তরীণ চিত্রকল্পের সংগ্রহশালা, যেখানে নিজের পাশে তিনি নিয়েছি এবং।

সাধারণের পাশে

জীবন জিজ্ঞাসা

আর আমার, বাংলাদেশ কবিতায় অধ্যাপক উদ্দেশ্য ছিল মুখের ভাষা ও আমাদের জীবনের সম্পর্ক নিয়েছেন। প্রেমিকের ভাষায় উদ্দেশ্য অর্থাৎ নিজের প্রেমের দিকে মানুষের কবিতাকে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ ক'রে তোলেছেন প্রেমের দিকে তাঁর সমস্যাটি করেছেন। তাদের জীবনানন্দের মতো এমন আবেগ ও প্রেমে অধ্যাপক আর প্রেমেই করতে পারেননি। তাঁর

## ভাষা

(অনুষ্টুপ/অমিত্রাক্ষর)

ভাষা ছাড়া মানুষ কিছু নয় শুধু মাংস আর হাড়
ভাষা দিয়ে বানাই আমরা ঘর, ভাষা দিয়ে ভাঙি পাহাড়
ভাষা দিয়ে বুনি স্বপ্ন আর ভাষা দিয়ে করি যুদ্ধ
ভাষা দিয়ে ভালোবাসি আর ভাষা দিয়ে করি ক্রোধ
ভাষা ছাড়া মানুষ হতো বোবা পশুর মতো
ভাষা দিয়েই মানুষ হয়েছে মানুষ অবিরত।

## ভাষা

(অনুষ্টুপ/অমিত্রাক্ষর)

ভাষা হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র
ভাষা দিয়ে মানুষ করে যুদ্ধ
ভাষা দিয়ে মানুষ করে প্রেম
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ক্রোধ
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ঘৃণা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে পূজা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে বন্দনা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে নিন্দা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে সৃষ্টি
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ধ্বংস।

---

## পুরাণী

(অক্ষরবৃত্ত/অন্ত্যমিল)

পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী
পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী
পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী
পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী
পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী
পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী
পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী
পুরাণী পুরাণী পুরাণী পুরাণী

## ভাষা

(অনুষ্টুপ/অমিত্রাক্ষর)

ভাষা হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র
ভাষা দিয়ে মানুষ করে যুদ্ধ
ভাষা দিয়ে মানুষ করে প্রেম
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ক্রোধ
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ঘৃণা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে পূজা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে বন্দনা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে নিন্দা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে সৃষ্টি
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ধ্বংস।

## ভাষা

(অনুষ্টুপ/অমিত্রাক্ষর)

ভাষা হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র
ভাষা দিয়ে মানুষ করে যুদ্ধ
ভাষা দিয়ে মানুষ করে প্রেম
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ক্রোধ
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ঘৃণা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে পূজা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে বন্দনা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে নিন্দা
ভাষা দিয়ে মানুষ করে সৃষ্টি
ভাষা দিয়ে মানুষ করে ধ্বংস।

প্রকাশকাল অনুসারে পরের হলেও, *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থটি *সাতটি তারার তিমির*-এর আগের পর্বের রচনা। এই বইয়ের সিগনেট-সংস্করণে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে ১২টি কবিতা বাদ পড়েছিল। *রূপসী বাংলার* বাদ পড়া কবিতাগুলো এখন আমাদের গোচরীভূত। দেবেশ রায় সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি-সংস্করণের সঙ্গে বিভিন্ন কাব্যসমগ্রের পাঠের হেরফেরও আমাদের নজর এড়ায় না। কবির ঘনিষ্ঠজনদের সুবাদে আমরা জানি, এই বইয়ের কবিতাগুলো কবি তার বরিশাল-জীবনে টানা-ঘোরের মধ্যে লিখেছিলেন। যে খাতায় *রূপসী বাংলার* পাণ্ডুলিপিটি কবি নিজেই সম্পাদন করেছিলেন, সম্ভবত তা কবিকৃত সংশোধিত পাঠ। সংশয় জাগে, সেখানে পরবর্তী পর্যায়ে লিখিত দু-একটি কবিতাও ঢুকে পড়েছে। ফলে বইটির মূল পাণ্ডুলিপিতেই গ্রাম-বরিশাল ও শহর-কলকাতার পারিসরিক সংকট লক্ষণীয়। গ্রহণ-বর্জনের এই প্রক্রিয়ায় কালের পরিসর নয়, মনে হয়, সনেট-অসনেট বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ যা-ই হোক না কেন, এর পেছনে প্রকাশকেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল। ভূমেন্দ্র গুহ সূত্রে আমরা সে-কথাই জানি। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বইটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার এক গদ্যে। এমনও হতে পারে, এই বইয়ের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করার সময় শেষ পর্যায়ের কিছু কবিতাও কবি যুক্ত করতে চেয়ে আবার নিজেই বাদ দিয়েছেন। সংশয়মোচনের আজ আর উপায় নেই। তবে কবির নিজস্ব সিদ্ধান্তের নিকটবর্তী থাকতে চাইলে দেবেশ রায় সম্পাদিত *রূপসী বাংলাকে* প্রামাণ্য ব'লে গ্রহণ করা উচিত। *রূপসী বাংলার* মতো *বেলা অবেলা*

---

হয়ে উঠেছিল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ দ্বারা– তার মাঝে যেন এক ম্যাজিসিয়ান এসে পড়লেন, ঘাড় ধরে আমাদের নিয়ে গেলেন তার ম্যাজিক পরিবেশে। [কৃষ্ণা বসু: নিমজ্জিত উচ্চারণ/*একান্তর* ১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৯]

১৩.

*সমকালীন বিশ্বকবিতায় কোথায় কি জড়ো হচ্ছে প্রতিদিন, সে-সম্পর্কে জীবনানন্দ সচেতন ছিলেন। সেখান থেকে কাব্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ করলেও অটল থেকেছেন তিনি নিজের ভাঁড়ার সংলগ্ন নিজস্ব মাটিতে। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার নদী, বাংলার নদী-তীরবর্তী জনপদ, বাংলার জনভাষা থেকে নিজেকে জীবনানন্দ বিচ্ছিন্ন করেননি কখনও। আস্থা রেখেছেন অর্জিত অভিজ্ঞতায়। সমকালীন অন্য সব কবির মতো গা ভাসিয়ে দেননি আমদানিকৃত বিদেশী প্রকরণে।*

সম্পূরক পাঠ

**মণীন্দ্র রায়**

**কিন্তু তিনি যদি নিজের ভাবনাচিন্তাকে আরো সচেতনভাবে সংগঠিত করতে পারতেন এবং তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকত, জীবনানন্দ দাশ হয়তো**

*কালবেলা*ও জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। এই বইয়ের কবিতাগুলোর পারিসরিক সংকেট খুবই স্পষ্ট। শেষ পর্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতাগুলো তারই ধারাবাহিকতা। একটি উত্তরণ ভাষাবান আবিষ্কারই ছিল এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়, যা একই সঙ্গে নক্ষত্রপাড়া ঘুরে এসে কলকাতার এঁদো গলিতেও শরীর গলিয়ে দিতে পারে অনায়াসে। 'ইতিহাসযান' শিরোনামের একটি কবিতা আছে জীবনানন্দের *বেলা অবেলা কালবেলায়*। কিন্তু নামেই শুধু কবিতাটি ইতিহাসযান, কার্যত সে 'থ্যাতা ইঁদুরের মতো রক্ত-মাখা ঠোঁটে' মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে 'স্বভাব কবিতার প্রথম স্তরে'। ফুরিয়ে এসেছিল কি ততদিনে জীবনানন্দের হেমন্তের 'ভাঁড়ার', যার কথা শুরুতে বলেছি? নইলে 'ছোটো বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড়–', 'যে-সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে' 'মনে হয় এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়' ইত্যাদি সাংবাদিক-বাক্যে কেন পঙ্‌ক্তি রচনা করবেন জীবনানন্দ? অথচ এই জীবনানন্দের কাছেই আমরা পেয়েছি 'পাড়াগাঁয় দু'পহর ভালোবাসি– রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে', 'এইখানে সরেজিনী শুয়ে আছে– জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা', 'হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে', 'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে', 'আকাশের থেকে দূর– আরো দূর– আরো দূর– নির্জন আকাশে', 'যে জীবন কড়িঙের, দোয়েলের– মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা' 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেলো কেশে', 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস'-এর মতো কত-শত বিস্ময়কর পঙ্‌ক্তি।

•

---

রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন মহৎ কবি হতেন। তার অভাবে তিনি হয়ে আছেন শুধু ক্ষমতাবান কবি– এক মহৎ সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি।

[কবি জীবনানন্দ দাশ/*পরিচয়*, শ্রাবণ ১৩৬২]

শিবনারায়ণ রায়

জীবনানন্দ খাঁটি কবি ছিলেন; তাঁকে আমি দু'একজন মাত্র দেখেছি; কিন্তু তাঁর রচনা পড়ে আমার মনে হয়েছে যেন তিনি এক নক্ষত্র বিধৌত জলাশয়, যেখানে গভীর অন্ধকারের স্তরে স্তরে নানা অনুভব ও ভাবনার ওঠাপড়া আছে, কিন্তু কোনো গতি নেই। অপরপক্ষে বুদ্ধদেব যেন কোনো তুষারাবৃত শৈলশিখর থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি নির্ঝর, ধাপে-ধাপে বহমান, ক্রমে নদী এবং তার শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত হয়ে মহাসমুদ্রের দিকে নিয়ত বহমান। রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেবের মতো এমন বহুমুখী এবং নিয়ত গতিশীল প্রতিভা আর একটিও দেখতে পাই না।

[বাংলা গদ্য ও বুদ্ধদেব বসু / *কৈশোর বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা*, মে ১৯৯৯]

পূর্ণেন্দু পত্রী

কোনো এক লেখক বোদলেয়ারের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, দান্তে পৌঁচেছিলেন নরকে আর বোদলেয়ার আসছেন সেই নরকের ভিতর থেকে। এই কথাটার আদলে আমরাও বলতে পারি, অনেক লেখক পৌঁচেছেন বাংলার বুকের কাছে, কিন্তু জীবনানন্দ ও

*বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থের কবিতাগুলো প্রকাশিত লেখার কাটিং হিসেবে একটি ফাইল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল কবির মৃত্যুর পর। কবি-প্রস্তাবিত কয়েকটি নামও একটি কাগজে লেখা ছিল বইয়ের নামকরণের জন্য। সেখান থেকেই একটি নাম বেছে নিয়ে উদ্ধারপর্বের সুহৃদরা এই বইয়ের নাম রেখেছিলেন– *বেলা অবেলা কালবেলা*। জীবনানন্দ নিজে সম্পাদনা করলে যে এই ফাইলের সবগুলো কবিতাই গ্রন্থভুক্ত করতেন, তেমন জোরালো প্রমাণ আমাদের সামনে হাজির করতে পারেননি উদ্ধারকর্মীরা। আবার এমনও হতে পারে, একটু আগেই যা বলছিলাম, বিভিন্ন সময় বই থেকে বাদ পড়া কবিতাগুলোই জীবনানন্দ ঐ ফাইলে জমিয়ে রেখেছিলেন ভবিষ্যতে কখনও সংশোধনপূর্বক গ্রন্থিত করার ইচ্ছেয়। তাতে হয়তো পারিসরিক সংকটেরও সমাধান মিলত। যেহেতু সেই সংশোধনের কোনও ছাড়পত্র রেখে যাননি কবি, *বেলা অবেলা কালবেলার* কবিতাগুলোকে কবির অগ্রন্থিত কবিতা হিসেবে বিবেচনা করাই ছিল উত্তম। আমার ব্যক্তিগত বিবেচনা সেরকমই।

*কবিতার কথা* য় একাধিকবার কবিতার কালস্বচ্ছতার উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ। নিজের কালে বাস ক'রেও অন্য অনেক যুগ ও কালের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মধ্যেই তার সিদ্ধি। *কবিতার কথা* থেকে উদ্ধারকৃত নিচের গদ্যাংশে জীবনানন্দের কালমঞ্চ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়–

> যে সময়ে সে বাস করেছে, এবং যে সময়ে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে, এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে, এবং যেখানে সে

---

জীবনানন্দ এসেছেন বাংলার বুকের ভিতর থেকে, হাজার বছর ধরে, হেঁটে হেঁটে, দেখে দেখে, সৌন্দর্যের সিঁদুর আর ধ্বংসের কাজল দুটোকেই দুই হাতে মেখে মেখে।
[*রূপসী বাংলার দুই কবি*]

**ফরহাদ মজহার**

জীবনানন্দ দাশ কেরানি যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের মধ্য দিয়ে পুরনো মনিব বা জমিদারদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। জমিদারদের যুগেও অন্তত কবিকে আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে দেখেছি, সমাজ সংস্কার ও নানান সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি, কৃষিকাজে সরাসরি নিয়োজিত হতে দেখেছি, বিজ্ঞানে উৎসাহী দেখেছি, ইত্যাদি। কারণ সাহিত্যের পুরনো ভূস্বামীরা তাদের জমিদারি হারাবার ভয়ে আতংকিত ছিলেন। তাঁরা আর মনিব নন, নতুন মনিব ইতিহাসে এসে হাজির হয়েছে, এই বোধটুকু তাঁদের ছিল। ফলে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের মতো একটা লড়াই তাঁরা দিয়েছিলেন। কিন্তু কেরানিদের কিছু হারাবার ভয় ছিল না। জমিদারি তো দূরের কথা, তারা ততোদিনে গ্রাম ছেড়ে ঔপনিবেশিক কলকাতা শহরের দিকে পাড়ি দিয়েছে। অধিকাংশই স্কুল-কলেজের মাস্টার। জমিদারি ততোদিনে লাটে উঠেছে, অন্যদিকে শ্রমিক বা কৃষক হওয়াটা জাতিচ্যুত হওয়ার মতো ব্যাপার। ঔপনিবেশিক কলকাতা শহরকেই প্যারিস ধরে নিয়ে কেরানিদের কবিতা লেখা শুরু

নেই– এই সকলের কাছেই সে ঋণী।

[জীবনান্দ দাশ : রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা/*কবিতার কথা*]

এই কালমঞ্চেই জীবনানন্দ জড়ো করেছেন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অসংখ্য-অজস্র কুশীলবকে। রচনা করেছেন কালনিরপেক্ষ এক নতুন সমকাল। আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ স্থান-কালের সঙ্গে মহাবিশ্বের সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণ ক'রে নতুন চিন্তারাজ্যের জন্ম দিয়েছিল বিশ শতকের শুরুতেই। এর প্রাসঙ্গিকতায় আমরা কণাবাদী বলবিদ্যার কথাও জেনেছি। বিশ শতকের শেষভাগে স্টিফেন হকিং শোনালেন তারকা-সংকোচনের ফলে কৃষ্ণগহ্বরের জন্ম ও তার উবে যাওয়ার নতুন কাহিনী। একুশ শতকের শুরুতে আইনস্টাইনের তত্ত্বকে ভুল-প্রমাণেও উঠে-প'ড়ে লেগেছেন বিজ্ঞানীদের কেউ-কেউ। যদি তেমন কোনও কাণ্ড ঘটেই ব'সে, তবে অবসরের মাঠে জীবনানন্দ দাশ যে কালমঞ্চটি রচনা ক'রে গেছেন, বিজ্ঞানের ধারণাসমূহের মতো তাকেও মনে রাখার আছে। আমরা তো এও জানি, বিজ্ঞান কোনও পূর্ণ-সত্য নয়– কোপার্নিকাসের সূত্রও ভুল প্রমাণিত হয়। আবার এর বিপরীতে সাফোর কবিতাও টিকে থাকে হাজার বছর ধ'রে। অতএব জীবনানন্দ তার নিজস্ব কালমঞ্চে যে মহাকালবিস্তারী সমকালকে হাজির করেন, হকিং-এর কৃষ্ণগহ্বরের মতো সেটিও আমাদের মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে–

কতোবার বর্তমান হ'য়ে গেছে ব্যথিত অতীত–
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত

---

হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে গ্রামের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন। হাফ গ্রাম্য বরিশালের জীবনানন্দ দাশ এই ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। তিনি না ঘরকা না ঘাটকা। কেরানিদের যুগেও এই মধ্যবর্তী জায়গায় ভাগ্যদোষে আটকা পড়ে যাবার কারণে তাঁর কবিতায় আমাদের এমন কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হয় যা অন্য কেরানিদের কবিতা থেকে হয় না।

[কোথাও দেখার মতো রয়ে গেছে কিছু .../*প্রথম আলো সাময়িকী*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯]

**সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়**

জীবনানন্দ একটা উচ্চারণরীতির প্রবর্তনা করে যান, তাঁর আপন আদলেই তাঁকে শনাক্ত করে স্বস্তি পান পাঠক। কিন্তু কবিতার চালচিত্রটা যে অনেক ব্যাপক আর দূরবিস্তারী, এই সত্যটা বোধহয় সবচেয়ে আস্থা নিয়ে বুঝে নিতে পারেন পাঠক ছাড়া আর কেউ নয়। জীবনানন্দ যে মাতৃভাষা থেকে তুলে আনেন অনাস্বাদিত এক বাক্‌প্যাটার্ন, তার পরেও অগাধ অপেক্ষা থেকে যায় বাংলা কবিতার; ফুরোয় না পাঠকের উন্মুখতা, সে চায় একই সঙ্গে অন্য ঘরানার কবিকে যিনি বিপরীত স্বরপ্রেক্ষপনের সূত্রে ছুঁয়ে যাবেন কবিতার অন্য দিকচক্র। অনাটকীয় উপস্থাপনার বিপ্রতীপে পাঠকই যেন আবিষ্কার করে নিলেন সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর, তাঁর কাছেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাইলেন অ-জীবনানন্দসুলভ উচ্চারণের বাক্‌বিভঙ্গ।

[আগে কবিতা না আগে পাঠক/ *কবিতার জলহাওয়া*]

যে-নক্ষত্র ঝ'রে যায় তার!
[নির্জন স্বাক্ষর/*ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

এবং নিজস্ব কালমঞ্চের আড়ালেই জীবনানন্দ রচনা করেন এক স্বতন্ত্র ভাষা-ঘোর। সেই ঘোর জলের ঘূর্ণির মতো একা; কিন্তু নিজের ঘূর্ণির মধ্যে পাঠককেও টেনে আনতে সক্ষম–

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়– প্রেম নয়– কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।
[বোধ/*ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

সভ্যতার হাতে তৈরি ঘড়ির কাঁটায় কিংবা ক্যালেন্ডারের পাতায় নয়, জলের মতো ঘুরে ফেরা একাকী এই কথোপকথনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় জীবনানন্দের কবিতার কালমঞ্চটিকে। এবং জীবনানন্দ তার কবিতায় মঞ্চায়িত করেন এক 'সর্বপ্রাণসত্তা পালা'ও, যার সব কুশীলবই মহাকালের বাসিন্দা। সবাই তারা এক ও অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতির সন্তান। মানবপরিচয়ে সেখানে কোনও বিশিষ্টতা নেই। জীবনানন্দের কবিতার মূল বৈশিষ্ট্যই এখানে। উদ্ধার করা যাক দাশকাব্যের

---

১৪.
*'সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়'– এই পঙ্‌ক্তি জীবনানন্দের কবিতার একটি বড় শনাক্তকরণ চিহ্ন। তার পুরো কবিকৃতিতেই ছড়িয়ে রয়েছে এই জলের ঘূর্ণি, যার মধ্যে প্রবেশ করা মানে পাতালের অতল তলদেশে পৌঁছে যাওয়া। অন্তঃশীল বোধের যে মনোরাজ্য সুররিয়ালিস্ট কবি-শিল্পীরা নিরন্তর খুঁজে ফিরেছেন, এই পঙ্‌ক্তি তারই নির্দেশক। এক নিবিড় প্রচণ্ডতাকে সে ধারণ করে শব্দের শরীরে। প্রায়শই সে থাকে নিজের আড়ালে; তবে কখনও-কখনও সেই আড়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে–*

সম্পূরক পাঠ

**বুদ্ধদেব বসু**

আমাদের বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, তবে গুণী যাঁরা, কাব্যসম্ভোগের প্রকৃত অধিকারী যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পর তিনি স্বীকৃত ও সম্মানীত হবেন এ-আশা জোর ক'রেই করা যায়। ধূসর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে এ-কথাই প্রথমে মনে হয় যে এই লেখকের আছে সত্যিকারের স্টাইল। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে

কালমঞ্চ এবং তার সর্বপ্রাণস্পন্দন–

০১.

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে।
[অবসরের গান/*ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

০২.

একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার
জেগেছিলো; বাঙালি নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিলো দেহ একদিন
বাংলার পথে-পথে হেঁটেছিলো গাঙচিল শালিখের মতন স্বাধীন
বাংলার জল দিয়ে ধুয়েছিলো ঘাসের মতন স্ফুট দেহখানি তার
[৫৩/*রূপসী বাংলা*]

০৩.

না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল;
উনিশশো বিয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়

---

(যদিও সেটা খুব কম), এবং তা নিয়ে ঠাট্টা করাও খুব সোজা। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি আমাদের পক্ষে ইয়ারকির বিষয় না-হ'য়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে একথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।
[প্রকৃতির কবি/*কবিতা*, ২য় বর্ষ]

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

কিন্তু পুনরাবৃত্তির ঐ গরজ রচয়িতার দেউলেপনাকে সূচিত করে না। তার মধ্যে জীবনানন্দীয় শিল্পেরই একটি বিশেষ কৌশল আভাসিত করে। বারংবার পুনরুক্তিতে মন্থরতার মধ্যে এক-এক বাঁকে, নতুন দ্যোতনা তৈরি করা, অর্থাৎ আবর্তনের মধ্য দিয়েই উদ্‌ঘাটনের নবত্ব নিয়ে আসার এই প্রবণতা, জীবনানন্দের একান্ত নিজস্ব।
[*জীবনানন্দ*]

**দেবেশ রায়**

বাংলায় ক্রিয়াপদের দুর্বলতা ও স্বল্পতা নিয়ে যে সংকোচ ও বিরক্তি কবি লেখক সমাজে চালু ও সেই কারণে ক্রিয়াপদকে এড়ানো বাংলা রচনার যেমন প্রায় দস্তুর, জীবনানন্দ তার বিপরীতে যেন ক্রিয়াপদময়। ও বিশেষণময়। অথচ সেই বহুল বহুল ব্যবহার তাঁর

তবুও কি উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল।
[ঘেতে প্রান্তরে/সাতটি তারার তিমির]

০৪.

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে:
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন— এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডায়নামোর 'পরে।
[ঘোড়া/ সাতটি তারার তিমির]

'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়'— এই পঙ্‌ক্তি জীবনানন্দের কবিতার একটি বড় শনাক্তকরণ চিহ্ন। তার পুরো কবিকৃতিতেই ছড়িয়ে রয়েছে এই জলের ঘূর্ণি, যার মধ্যে প্রবেশ করা মানে পাতালের অতল তলদেশে পৌঁছে যাওয়া। অন্তঃশীল বোধের যে মনোরাজ্য সুররিয়ালিস্ট কবি-শিল্পীরা খুঁজে ফিরেছেন, এই পঙ্‌ক্তি তারই নির্দেশক। এক নিবিড় প্রচণ্ডতাকে সে ধারণ করে শব্দের শরীরে। প্রায়শই সে থাকে নিজের আড়ালে; তবে কখনও-কখনও সেই আড়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে—

আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে

---

কবিতাকে প্রতিহত করে না। বাংলা বাক্য জীবনানন্দে এক স্বাভাবিকতা পায়।
[পদ্যের কথাও তুলিনি / বিজয় জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৫/১৯৯৮-৯৯]

১৫.

*কাল-কালান্তরের, দেশ-দেশান্তরের বিপুল মনোসম্পদে ভাঁড়ার পূর্ণ করার পর সনাতন পেরেন্তের মতোই তিনি তার পাহারায় কাটিয়েছেন অনেক নিদ্রাহরা রাত। সমকালের কোলাহল থেকে দূরে-দূরে থাকা কবি নিজে, বারংবার কাটাকুটিতে পরিতপ্ত হয়ে উঠতে চাওয়া তার কবিতার খাতা, গোপন ট্রাংকে প'ড়ে থাকা তার অপ্রকাশিত কবিতাবলি— সবই সাক্ষ্য দেয়, কবিতা ছাড়া কবিতার অন্য কোনও অঙ্কে জীবনানন্দের উৎসাহ ছিল না। প্রচারের অন্য কোনও পথেও তিনি পা বাড়াননি।*

সম্পূরক পাঠ

**সঞ্জয় ভট্টাচার্য**

তাঁর চিঠি পেলে মনে হত, সব-সময় তিনি কবিতার কথা ভাবেন। এমন তো কেউ ভাবেন না— রবীন্দ্রনাথেরও অন্যান্য ভাবনা আছে— কিন্তু কবিতার দুর্ভাবনা ছাড়া কি এই ব্যক্তিটির ভাববার মতো আর কোনো বস্তু নেই! ভাবতাম জীবনানন্দের চিঠি পড়তে

ক্লান্ত— ক্লান্ত করে;
[আট বছর আগের একদিন/মহাপৃথিবী]

শব্দকে পৌনঃপুনিকতার ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে নতুন এক অর্থ-দীপ্তির জন্ম দেন জীবনানন্দ বাংলা কবিতায়। এই ঘূর্ণির মধ্যেই ফুটে ওঠে ক্লান্ত থেকে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ার শারীরিক অবসাদ. কখনও আবার তীব্রতম হয়ে ওঠে সেই ঘূর্ণি; বহু শতাব্দীর ব্যবহার-জীর্ণ ধর্মীয় কুসংস্কার আর ছবির ধারণাগুলো দেখতে পাই তার ভয়াল গহ্বরে—

ভুল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত— ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠলো :
ব্যবহৃত— ব্যবহৃত হ'য়ে অন্যায়ের মাংস হ'য়ে রয়?
[আদিম দেবতারা/মহাপৃথিবী]

মানব-বৈশিষ্ট্যে যদিও আমাদের বাস সভ্যতার পোশাকি পরিমণ্ডলে, তবু আমাদের সবার অন্তঃশীল বোধেই বয়ে চলেছে এক আদিম প্রাণসত্তা। জীবনানন্দের কবিতা সেই প্রাণসত্তাকেই সর্বশরীরে ধারণ করে। তার প্রকাশে যে প্রাকৃত ভাষা, তা তিনি আয়ত্ত করেছেন নদী-তীরবর্তী জনপদ থেকে। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের মুখের ভাষা থেকেই জীবনানন্দ সংগ্রহ করেছেন হাজার বছরের আয়ুষ্মতী শব্দরাজি। আর তা দিয়েই সমৃদ্ধ করেছেন তার কাব্যের ভাঁড়ার। রচনা করেছেন এক অবস্থানিত

---

পড়তে। কাব্যিময় চিঠি নয়— কবিতা যাতিনি জন্যে চিন্তা ও উদ্যমের প্রকাশ তাঁর চিঠিতে।
[মানুষ জীবনানন্দ সংখ্যা]

অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
এই কবি, হোগরলীনের মতোই, তাঁর কবিতাকে সংশোধনে-সংশোধনে অভিজিত করতে-করতেই তাঁর অভীপ্সিত পথে এগিয়েছেন। অপর কোনো বাঙালি কবির কথা আমরা জানি না, যিনি এত পাঠান্তরবহুল প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে শেষতম পাঠ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর মতে শেষের ঐ পাঠটি তৈরি না হলে তিনি কখনোই গ্রন্থভুক্ত করেননি।
[জীবনানন্দ]

১৬.
*এমন কি রবীন্দ্রনাথও, ব্যাপকতায় দিগন্তবিস্তারী হওয়া সত্ত্বেও, গহনতায় জীবনানন্দের সমকক্ষ নন। (আবার এর বিপরীত-প্রায় একটি কথাও মনে হয়— জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতা গহনতাতেই হারিয়ে যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেখান থেকে দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে আসে।) হারিয়ে যায় ব'লেই জীবনানন্দের কবিতা আমাদের মর্মমূলে গিয়ে বিদ্ধ হয়। যতই জীবন থেকে ফুরিয়ে আসবে অবসর, ততই*

চিত্রকল্পের মনোরাজ্য, যেখানে নিজের পাশে তিনি নিজেই একা :— 'বাঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে', 'বাধা পেয়ে নদীরা মজিয়া গেছে দিকে দিকে— শ্মশানের পাশে', 'কাঁচপোকা ঘুমায়েছে— আমিও ঘুমায়ে রব তাহাদের সাথে', 'ভোরের ফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে— শাদা দুধ ঝরে', 'রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পট শুধু পড়ে অবিরল' কিংবা 'হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়— ঠাঁশ আম, কমরাঙা, কুল'-এর মতো বিস্তারিতে (ডিটেলে) তার আগে আর কে গিয়েছিলেন বাংলা কবিতায়? বাংলা কবিতায় এই 'ডিটেল'-এরই অভাব বোধ ক'রেই একদিন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> আমাদের বাংলা কবিতাতে এমন কেন দেখা যায় যে, একজন কবি একটি কাননের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আর-একজনও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যখন আমরা একটি কানন দেখি তখন সেই কাননের মুখের দিকে আমরা ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি না; কাননের যে ভাব আছে তাহা আমরা বিভিন্ন চোখে দেখি না।
> [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঙালি কবি নয় কেন?/সাহিত্য]

লিখেছিলেন বটে রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বাংলা কবিতায় চোখের সেই ভিন্নতা সবচেয়ে ব্যাপকতায় যিনি নিয়ে এলেন, সেই জীবনানন্দের কবিতা স[illegible]র্কে তিনি সামান্য মন্তব্যেই কেন থেমে গেলেন, সে-ও এক প্রশ্ন হ'য়ে জেগে থাকে আমাদের মনে।

মানুষের ইতিহাসের মতো কবিতার ইতিহাসও ছিল জীবনানন্দের নখদর্পণে।

---

*তার জন্য হাহাকারে ভরে উঠেছে মানুষের মন। জীবনানন্দের কবিতা সেই হাহাকারের পথেই ঢুকে পড়ে আমাদের জীবিকাচতুর মনে। এবং মনের পোশাকি সজ্জাকে তছনছ ক'রে নেয় নিবিড় প্রতাপে।*

*সম্পূরক পাঠ*

**অমিয় চক্রবর্তী**

তাঁর কবিতায় একটি ভারি আশ্চর্য রহস্যময় সুর ছিল, মনে হত জীবনের বিচ্ছিন্ন বহু ঘটনার মূলে পৌঁছিয়ে তিনি সমস্তটাকে বলবার ভাষা তৈরি করছেন। পড়তে পড়তে সেই একটি আকাশী সর্ববিষয়জয়ী গাঢ় রঙে ভরা ভাষা আমরা তাঁর কবিতায় শুনতে পেয়েছি। অপ্রত্যক্ষবিরোধী উপমায়, সংলগ্নতায়, ধ্বনির লাবণ্যে এবং নিগূঢ় অনির্দিষ্টতায় কতভাবে তিনি তাঁর বলবার ধ্বনি রেখে গেলেন। বাঙালির মনে বহুকাল ধ'রে সেই ধ্বনির মূর্তি জাগবে।

[বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি/কবিতা, পৌষ ১৩৬১]

**সুধীন দাশগুপ্তায়**

এমন আবেগময়, এমন মায়াবী কবিতা পাঠ যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার মনে হয়েছিল সেই বয়েসে। ইংরেজি 'সেনসুয়াস' শব্দটি যেন এই রকম কবিতা সম্পর্কেই সঠিক

কবিতার ইতিহাস যে তার বাকপরিবর্তনের ইতিহাস– সে বিষয়েও তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। সমকালীন বিশ্বকবিতায় কোথায় কি ভাঙা হচ্ছে প্রতিদিন, সে-সম্পর্কে জীবনানন্দ সচেতন ছিলেন। সেখান থেকে কাব্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ করলেও অটল থেকেছেন তিনি নিজের ভাঁড়ার সংলগ্ন নিজস্ব মাটিতে। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার নদী, বাংলার নদী-তীরবর্তী জনপদ, বাংলার জনভাষা থেকে নিজেকে জীবনানন্দ বিচ্ছিন্ন করেননি কখনও। আস্থা রেখেছেন অর্জিত অভিজ্ঞতায়। সমকালীন অন্য সব কবির মতো পা ভাসিয়ে দেননি আমদানিকৃত বিদেশী প্রকরণে। কাল-কালান্তরের, দেশ-দেশান্তরের বিপুল কলোলস্পন্দে তাঁদের পূর্ণ করার পর সনাতন পেরন্তের মতোই তিনি তার পাহারায় কাটিয়েছেন অনেক নিদ্রাহরা রাত। সমকালের কোলাহল থেকে দূরে-দূরে থাকা কবি নিজে, কারবার কাটাকুটিতে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠতে চাওয়া তার কবিতার খাতা, গোপন ট্রাংকে প'ড়ে থাকা তার অপ্রকাশিত কবিতাবলি– সবই সাক্ষ্য দেয়, কবিতা ছাড়া কবিতার জন্য কোনও অঙ্কে জীবনানন্দের উৎসাহ ছিল না। প্রচারের জন্য কোনও পথেও তিনি পা বাড়াননি। যেন তার জানাই ছিল, কোথাও স্থির দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থাটি যার আছে, পৃথিবীর সব পথ তার কাছে এসে একবার থামে, থাকতে বাধ্য হয়–

পুরোনো খেতের পাড়ে এইখানে ভরেছে তাঁদের;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই,– কোনো কৃষকের মতো সমস্তর মাটি দূরে
মাঠে গিয়ে আজ!

---

ব্যবহার করা যায়। কেন এত সেমিকোলন, কেন হঠাৎ একটা লাইনে অকারণ চারটে ড্যাশ? জানার প্রয়োজন নেই। জীবনানন্দ দাশ কখনো উচ্চবিতণ্ডায় রবীন্দ্রবিরোধিতা করেননি। কল্লোলের অন্যান্য কবিরা যতই চ্যাঁচামেচি করুন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই স্বাভাবিক উত্তরসূরি, কিন্তু জীবনানন্দের অবস্থানটিই রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক দূরের। ফসলের তন থেকে ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরের জল পড়ার কাব্য লেখার সাধ ছিল না রবীন্দ্রনাথের।

[আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার/বিজয় অনুপমবর্ষ সংখ্যা, ১৩০৫/১৯৯৮-৯৯]

অঘূজ বসু

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা যেখানে মহত্তম দার্শনিকতায় উপনীত, জীবনানন্দ সেখানে মনোগহনের রহস্যে লীন হয়ে অনুভূতির সেই চেতনা-লোকই আবিষ্কার করলেন অন্য এক পথে, পৃথক এক স্বাদে ও সার্থকতায়। একজন অনায়াসে মৃত-বিহঙ্গের মতো নভোলোকচারী, অন্যজন মাটির পৃথিবীর আত্মগোপন করতে গিয়ে মাটি-পাথর পলিত লাভার উত্তাপের ভিতর দিয়ে ভূগর্ভ ভেদ করে আবার মৃত আকাশের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। দুজনের অভিজ্ঞতাই সমান বাদ্য হতে বাধা নেই।

[রবীন্দ্রানুস্মৃতি/একটি নক্ষত্র আসে]

রোধ– অবরোধ– ক্লেশ– কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,–
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে,
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের রং
দামামা থামায়ে ফেল,– পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সং।

[অবসরের গান/*ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

*ধূসর পাণ্ডুলিপির* এই 'অবসরের গান' কবিতার মধ্যেই লুকিয়ে আছেন জীবনানন্দ। তার কবিতা এই অবসরেরই উৎকৃষ্ট ফসল। তার সমকালে কবিতার জন্য এমন নিবিড় অবসর কম কবিই রচনা করতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতার ফসল সৃষ্টিশীলতায় উত্তীর্ণ ক'রে তুলতে হলে এই অবসরের কোনও বিকল্প নেই। পৃথিবী থেকে এই অবসর ক'মে গেছে ব'লেই জীবনানন্দের মতো অতল-গহন কবির সংখ্যাও গেছে ক'মে। এমন কি রবীন্দ্রনাথও, ব্যাপকতায় দিগন্তবিস্তারী হওয়া সত্ত্বেও, গহনতায় জীবনানন্দের সমকক্ষ নন (আবার এর বিপরীত-প্রায় একটি কথাও মনে হয়– জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতা গহনতাতেই হারিয়ে যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেখান থেকে দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে আসে)। হারিয়ে যায় ব'লেই জীবনানন্দের কবিতা আমাদের মর্মমূলে গিয়ে বিদ্ধ হয়। যতই জীবন থেকে ফুরিয়ে আসছে অবসর, ততই তার জন্য হাহাকারে ভরে উঠছে মানুষের মন। জীবনানন্দের কবিতা সেই হাহাকারের পথেই ঢুকে পড়ে আমাদের জীবিকাচতুর

---

১৭.

*ইয়েটস এর দু-একটি কবিতা জীবনানন্দ বাংলায় প্রতিলিখন করেছেন– এ-কথা যদি মেনেও নিই– তবু আমরা লক্ষ করব, ইয়েটসের কবিতা যদি আমাদের রক্তে সঞ্চারিত হয়, তবে জীবনানন্দের কবিতা স্নায়ুতে সঞ্চারণশীল। চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষা ধার করে বলা যায়– ইয়েটস-এলিয়ট যদি হন কবিতার কার্ডিওলজিস্ট, তবে জীবননানন্দ হচ্ছেন একজন দক্ষ নিউরোসার্জন। এই দুই আইরিশ কবির চেয়ে জীবনানন্দ দাশ বেশি নিকটাত্মীয় ছিলেন চিত্রকল্পবাদের জনক হিসেবে পরিচিত এজরা পাউন্ডের।*

সম্পূরক পাঠ

অমিয় চক্রবর্তী

*প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল বড়োই নতুন এবং নিজস্ব তাঁর লেখা : বাংলা কাব্যে কোথাও তার তুলনা পাই না। জর্মন কবি রিল্‌কের কথা মনে করিয়ে দেয় যদিও মনঃপ্রকৃতি এবং ধারণা ওঁদের স্বতন্ত্র। একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনের কোনো সময়ে রিল্‌কের কাব্য ওঁকে স্পর্শ করেছিল কিনা,– বললেন, না, রিল্‌কে ওঁর বিশেষ জানা নেই।*

[*বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি/কবিতা*, পৌষ ১৩৬১]

মনে। এবং মনের পোশাকি সজ্জাকে তছনছ ক'রে দেয় নিবিড় প্রতাপে। সার্থক কবিতামাত্রই যে অবসরেরই ফসল, 'অবসরের গান' কবিতার প্রথম স্তবকেই সে-কথা আমাদের জানিয়ে দেন জীবনানন্দ–

মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার,– চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
[অবসরের গান/*ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

এই কবিতায় এমনই এক নিবিড় অবসরের কথা বলেন জীবনানন্দ, যা আমাদের সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে পাঠ করতে হয়। ইন্দ্রিয়সমষ্টি দিয়েই পেতে হয় শিশিরের ঘ্রাণ কিংবা দেহের স্বাদ। অস্থির সময়ে গ্রহণ ও উপেক্ষার শক্তিকে বুকে ধারণ ক'রে স্থির হয়ে ব'সে থাকার কথা আমরা একই সময় রচিত এলিয়টের কবিতাতেও পেয়েছি বটে, কিন্তু সেখানে ছিল না ইন্দ্রিয়ের এত বিপুল আয়োজন–

Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air
The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and dryer than the will
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still.
[T. S. Eliot/*Ash-Wednesday*]

---

**নরেশ গুহ**

জীবনানন্দ অসামান্য প্রতিভার কবি। কবিদের মধ্যে অসামান্য তাঁরাই যাঁদের রচনায় জীবনের প্রগাঢ়তম আনন্দবেদনার রূপ উন্মোচিত হয়; ইন্দ্রিয় দিয়ে যা উপভোগ করবার, হৃদয় দিয়ে যা উপলব্ধি করবার, এবং প্রাণের গভীরে যা বোধ করবার বিষয় তাকে যাঁরা অভাবিতপূর্ব গতিময় ভাষার স্পন্দনে স্মরণীয়ভাবে তর্জমা ক'রে দেন আমাদের জন্য, যা আমরা আর ভুলতে পারি না, যে তর্জমার জগতে প্রবেশ করলে নিজেকে এবং বিশ্বপৃথিবীকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করি আমরা– অসামান্য কবি তারাই।
[শ্রদ্ধাঞ্জলি : জীবনানন্দ দাশ/*বিশ্বভারতী পত্রিকা*, আশ্বিন ১৩৬২]

**অশোকানন্দ দাশ**

ছোটবেলা থেকেই দাদার অনুভূতি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। আমার মনে আছে আমাদের মামাবাড়িতে প্রকাণ্ড বড়ো জামগাছ ছিল, অনেক সময়ে দুপুরবেলা তার নীচে মাদুর পেতে বসে আমরা ভাইবোনেরা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী পড়তাম। পরে আমরা সেকথা বিস্মৃত হতাম, কিন্তু দাদার সংবেদনশীল হৃদয়ে গল্পের রসের সূক্ষ্ম রেশ বহুদিন পর্যন্ত লেগে থাকত।
[জীবনানন্দের প্রাকৃতিক ও পারিবারিক পরিবেশ/*উত্তরসূরি*, ফাল্গুন ১৩৬১]

দাশকাব্যে কীটস ইয়েটস এলিয়টের প্রভাব নিয়ে একদা অনেক লেখালেখি হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় ইয়েটসের প্রভাব কখনও কখনও plagiarism বা সাহিত্যিক চুরির পর্যায়ে পড়ে। বুদ্ধদেব যদি 'তায় চিল' কবিতাটি লিখতেন, তবে হয়তো অনুবাদ কবিতা হিসেবেই ছাপাতেন। কিন্তু জীবনানন্দ তা করেননি। সকল আলোচিত কবিতা দুটিকে একটু বিশদে স্মরণ করা যাক

মূল:

O Curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in the west;
Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast :
There is enough evil in the crying of wind.
[W. B. Yeats/He Reproves The Curlew]

অনুকরণ:
তায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;

---

হুমায়ুন আজাদ

জীবনানন্দের কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়বিপর্যয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নতুন সম্ভাবনাময় ইন্দ্রিয় সৃষ্টি। এক-একটি অনুভূতি বা স্বাদ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে এক-একটি ইন্দ্রিয়চেতনা বেয়ে, তাদের প্রত্যেকের পথ স্বতন্ত্র। ধরা যাক একটি নীল ফুলকে। এ-ফুলটির রঙের অনুভূতি আমরা গ্রহণ করি চোখ দিয়ে, তার সৌরভ নিই নাসিকা দিয়ে। এ-ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ প্রচলিত, নির্দিষ্ট চেতনাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছেন, তিনি হয়তো ফুলের সৌরভ গ্রহণ করেন চোখ দিয়ে, রঙকে শোনেন কান দিয়ে। এ-বিপর্যয় প্রথম পর্যায়ে, সাধারণ পাঠকের অনুভূতিতে, বিভ্রান্তকর বিবেচিত হ'তে পারে, কিন্তু একটু প্রগাঢ় যে পাঠক, তার অনুভূতিমণ্ডলে সৃষ্টি করে ইন্দ্রিয়প্রগাঢ়তা, এক অপরিচিত মোহকর নতুন অনুভূতি। তিনি যখন লেখেন 'সবুজ বাতাস' তখন বাতাসকে আমরা শুধু ত্বকে অনুভব করি না, গ্রহণ করি আঁখিতারার মধ্যেও, কেননা একখণ্ড সবুজ জমির স্মৃতিও আমাদের আলিঙ্গন করে। আরো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবহার- 'শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ'। নিদ্রা এমন এক নির্বস্তু, যা রঙহীন গন্ধহীন স্বাদহীন, তার মধ্যে তিনি সাফল্যজনকভাবে ঘ্রাণ নিয়ে আসতে পেরেছেন। এ-পঙ্‌ক্তিপাঠকালে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি জাগে, যা ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু যার আক্রমণ এড়াতে পারি না। *বনলতা সেন*-এ এ রকম বিপর্যয়ী পঙ্‌ক্তি বেশি

আমার তাহারে কেন ডেকে আনো যে তার হৃদয় বুঝে
বেদনা জানাতে ভালোবাসে।

তারা ছিল, সোনালি ডানার ছিল, এই ছিলে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো দানাপিঠি নদীটির পারে।
[তারা ছিল/বনলতা সেন]

এলেন পুরোপুরি 'plagiarism' ই বলা যেত, যদি জীবনানন্দের চিঠিটি শ্রেণি পঙ্‌ক্তি কবিতাটির ভরকেন্দ্র না হয়ে উঠত। সেই চিঠি পঙ্‌ক্তিকে চিনে নেওয়া যাক

পুলিনীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আমার তাহারে কেন ডেকে আনো যে তার হৃদয় বুঝে
বেদনা জানাতে ভালোবাসে।

এবার কবিতাটির দ্বিতীয় ও শেষ পঙ্‌ক্তি দুটি লক্ষ করা যাক। দুটি পঙ্‌ক্তির বক্তব্যটি এক। কিন্তু শেষ পঙ্‌ক্তিতে বদলে গেছে আক্ষরিক অনুবাদের চালটি। 'তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে'র পরিবর্তে আমরা পেলাম 'তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো'। 'cry no more in the air' এর অনুকরণে 'কেঁদো নাকো' কথাটি আসে এসেছিল দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে। কিন্তু শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'উড়ে-উড়ে'কে পাই আসে। 'কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে'র চেয়ে 'উড়ে-উড়ে কেঁদো নাকো' অধিকতর লালিত্যময়, এ কথা বুঝিয়ে বলবার অবকাশ রাখে না। ইয়েটস-এর কবিতায় চোখ রেখে 'তারা ছিল' শুরু হ'লেও শেষ হয়েছিল জীবনানন্দীয় স্বতন্ত্রতায়, এর ধারা

---

নেই, রয়েছে ধূসর পাণ্ডুলিপিতে। এ-কাব্যে রঙ ও গন্ধের এক পাতলা সূচি কথা রয়েছে, যার তুলনা বাঙলা কাব্যে আর নেই।
[শেষের রাত্রিশেষ : বনলতা সেন/দ্বিতীয় চিন্তা জীবনানন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা, ১৯৯৯]

১৮.

*নিরন্তর নির্মাণের মাধ্যমে শিল্প-কবিতার পুরানো বর্ম ভেঙে বেরিয়ে আসার ফরাসি প্রচেষ্টা 'আভাঁগার্দ'-এরই নানা বিভার তখন নানা ইউরোপে। এবং সিম্বলিজম, ফিউচারিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ইমেজিজম, সুররিয়ালিজ, নানা ইত্যাদির সামষ্টিকতায় 'মডার্নিজম' নামের নতুন চিন্তারাজাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততদিনে। বিশ্বকবিতার সমকালীন ঘটনাবলির উপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল পাউন্ড, ইয়েটস, এলিয়টের। এই দুই কবির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে নিজেকে সমকালীন আন্তর্জাতিক-কাব্যভাবনার সমান্তরাল রেখেছিলেন জীবনানন্দ।*

সম্পূরক পাঠ

বুদ্ধদেব বসু

এটা উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত। উনবিংশ

একথাও প্রমাণিত হয়। তারপরও কবিতাটিকে মৌলিক বলা যায় না। এটি স্পষ্টতই প্রতিলিখন। দাশকাব্যের এই ক্ষতচিহ্নগুলোও আমাদের চোখ এড়ায় না।

ইয়েটস-এর দু-একটি কবিতা জীবনানন্দ বাংলায় প্রতিলিখন করেছেন– এ-কথা যদি মেনেও নিই– তবু আমরা লক্ষ করব, ইয়েটসের কবিতা যদি আমাদের রক্তে সঞ্চারিত হয়, তবে জীবনানন্দের কবিতা স্নায়ুতে সঞ্চারণশীল। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষা ধার ক'রে বলা যায়– ইয়েটস-এলিয়ট যদি হন কবিতার কার্ডিওলজিস্ট, তবে জীবনানন্দ হচ্ছেন একজন দক্ষ নিউরোসার্জন। এই দুই আইরিশ কবির চেয়ে জীবনানন্দ দাশ বেশি নিকটাত্মীয় ছিলেন চিত্রকল্পবাদের জনক হিসেবে পরিচিত এজরা পাউন্ডের। *কবিতার কথায়* পাউন্ডের প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা সরাসরিই জানান জীবনানন্দ–

> এলিয়ট-এর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর কোনো অংশকেই বাকচাল এমন কি মহনীয় চাতুর্য বললেও অন্যায় করা হবে হয়তো, কিন্তু কামিংস্ ইত্যাদি অনেকের কবিতা অবান্তর চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। অডেন, স্পেন্ডর, ম্যাকনিস প্রভৃতি কবির অনেক লেখাও এই ধরনের। এজরা পাউন্ড-এর রচনাগুলো বাস্তবিকই কবিতা– তাঁর আধুনিক কান্টোজ-মহাকাব্যের অর্থ ও ইঙ্গিত বুঝবার ক্ষমতা আমাদের তো দূরের কথা, স্বয়ং ইয়েটস্-এর কপালেও ঘটে ওঠেনি; এলিয়টও কি বুঝেছেন?
> [জীবনানন্দ দাশ : উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য/*কবিতার কথা*]

---

শতাব্দীর ইংরিজি কাব্যস্রোতে প্রচুর পান করেছেন তিনি; 'জীবন' 'প্রেম' এই দীর্ঘ কবিতাদুটিতে শেলি কীট্স্ উভয়েরই প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, শেলির চাইতে বরঞ্চ কীট্সের প্রভাব বেশি, কীট্সের চাইতে বরঞ্চ সুইনবর্ন ও প্রির‍্যাফেলাইটদের। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা যেটা, সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃজনীশক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হ'য়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। অতি ছোট ছোট জিনিস নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষনে ধরা দিতে চায় না।
[প্রকৃতির কবি/*কবিতা* ২য় বর্ষ]

**শামসুর রাহমান**

পাশ্চাত্য কবিতার কিছু প্রভাব তিরিশের প্রায় সকল কবির কবিতায় লক্ষ করা যায়। এই প্রভাব থেকে জীবনানন্দ দাশও মুক্ত নন। এই প্রভাব আপত্তিকর ব'লে মনে করি না। পাশ্চাত্যের কিছু প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যেও লক্ষণীয়। এতে বাংলা কবিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং লাভবান হয়েছে। অনেক কিছুর মধ্যে বিশেষ ক'রে শব্দপ্রয়োগ, উপমানির্মাণ, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, সর্বোপরি তাঁর স্বভাবী মেজাজ জীবনানন্দকে সকলের থেকে আলাদা করেছে। তিনি পাশ্চাত্যের কাছে শিখেছেন, অনুকরণ করেননি।
[কবির চোখে কবি (সাক্ষাৎকার)/*দ্বিতীয় চিন্তা* জীবনানন্দ জন্মশতবার্ষিক স্মারক সংখ্যা, ১৯৯৯]

দাশকাব্যে ফিরে-ফিরে ঘাসের কাহিনী এসেছে। এসেছে 'নিবিড় ঘাস-মাতা'র কথা, 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে' জন্মাবার কথা। *রূপসী বাংলার* কবিতাগুলো তো এই ঘাসেরই সবুজ থেকে উঠে আসা নিসর্গকথন। 'ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর–' কিংবা 'ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে– রাতের আকাশ'-এর মতো অসংখ্য পঙ্‌ক্তির মধ্যে মিশে আছেন কবি নিজেই। জীবনানন্দের জন্মের আগেই বিশ্বকবিতায় ঘাসের ইতিকথা রচনা করে গেছেন ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-১৮৯২) তার *Leaves of Grass* কাব্যগ্রন্থে। জীবনানন্দ যেমন বলেন 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়', হুইটম্যানও তেমনি বলেন– 'And I know I am deathless'। ইংরেজি কবিতার মনোযোগী পাঠক জীবনানন্দের অজানা ছিলেন না নিশ্চয় হুইটম্যান। কিন্তু বলেন না কেউ যার কথা কখনোই, হয়তো জীবনানন্দেরও কোনওদিন পাঠ করার সুযোগ হয়নি যার কবিতা, সেই অ্যালবেরি অ্যালস্টোন হুইটম্যানের কাব্যভাবনার সঙ্গে দাশকাব্যের মিল আরও বেশি। এই কবিও ছিলেন এক নিখিল চরাচরের বাসিন্দা; মনে করতেন– poetry is a language of universal sentiment। হার্লেম রেনেসাঁর স্বপ্নপুরুষ কালো চামড়ার এই কবির *The Rape of Florida* র ছত্রে-ছত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে জীবনানন্দের সঙ্গে তার চিন্তার ঐক্য। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো অ্যালবেরি. এ. হুইটম্যানও মানববিশিষ্টতাকে গ্রাহ্য না ক'রে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জড়ো ক'রে পেতে চেয়েছিলেন সর্বপ্রাণস্পন্দন। আগেই বলেছি, জীবনানন্দও সেই একই জগতের

---

**বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য**

ইয়েটসের আকর্ষণ যেমন তাঁর ওপরে অনস্বীকার্য তেমনি রিলকেরও। তবে কামিংসের চাতুর্য তাঁর মন টানেনি, যেমন টেনেছে এজরা পাউন্ডের মনন-দীপ্তি। আরাগঁ বা এলুয়েরের মতো পরাবাস্তববাদীদের লেখা সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কোনো উল্লেখ নেই, যদিও শিল্প ও সাহিত্যে পরাবাস্তববাদ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিতভাবে সতর্ক ছিলেন। হাক্‌সলিকে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মনে করেননি, যেমনভাবে ঔপন্যাসিক টমাস মানকে এ বিপন্ন যুগের চিন্তানায়ক হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এরা জীবনানন্দের ভাবনা-প্রতিমায় মিশে গেছেন। বুদ্ধদেব বসুতে যেমন বোদলেয়ারের উষ্ণ নিশ্বাস শোনা যায় বা এলিয়টের প্রুফ্রককে আমরা প্রায় ভাষান্তর-এ দেখি বিষ্ণু দে-র সুরেশে, জীবনানন্দ তার ব্যতিক্রম। তিনি বহু ভাবনাকে গ্রহণ বর্জন করেও নিজের স্বভাব স্বকীয়তায় নির্দিষ্ট ও উজ্জ্বল থাকেন। তাঁর কবিতায় দেশি বা বিদেশি অগ্রজের প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটে না। না ইয়েটসেরও নয়।

[হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর/*বিভাব* জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ১৪০৫/১৯৯৮-৯৯]

**সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

জীবনানন্দের কবিতার অবয়বে অচিরে দেখা গেল ইয়েটসীয় প্রতীকান্বয়, এবং কীটসীয় ইন্দ্রিয়াশ্রয় আর সৌন্দর্য সংহতি ছাড়াও আরো কিছু রয়েছে। তা হল কবিতার ভাষা।

বাসিন্দা। এবং অ্যালবেরি হুইটম্যানের মতোই বণিক-পৃথিবীর দিকে ধ্যানী মহাকালের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন জীবনানন্দ–

> বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
> অভ্যুত্থান শুরু হলো এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে;
> বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
> চারিদিকে পামগাছ– ঘোলা মদ– বেশ্যালয়– সেঁকো– কেরোসিন
> সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।
> [নিরঙ্কুশ/*সাতটি তারার তিমির*]

অ্যালবেরিও মহাকালের কণ্ঠে বলেছিলেন, কেনাবেচার মানবদের হাত থেকে যতদিন মুক্তি নেই, ততদিন আরোগ্য নেই অসুস্থ পৃথিবীরও–

> If earth were freed from those who buy and sell,
> It soon were free from most, or all its ills.
> [Albery A. Whitman/*Rape of Florida*]

অ্যালবেরি জন্মেছিলেন ক্রীতদাস পিতা-মাতার ঘরে; এবং জীবনানন্দেরও জন্ম ঔপনিবেশিক দাস-সমাজে। অভিজ্ঞতায় দু'জনে কাছাকাছি জীবনের ছিলেন ব'লেই মনের রসায়নেও হয়তো বা এই মিল। কিন্তু দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে যাননি অ্যালবেরি। তা দেখেছিলেন পাউন্ড, ইয়েটস, এলিয়ট ও জীবনানন্দ। সুতরাং মহাযুদ্ধের এই অভিজ্ঞতায় জীবনানন্দ ছিলেন পরবর্তী তিনজনের বেশি

---

এই ভাষা অক্ষরে গঠিত হয়েও এক স্বনির্ভর ভাষা হয়ে উঠল। সোজা কথায় শব্দের অর্থ দিয়ে নয়, ব্যাঞ্জনার অনুসন্ধানে নয়– জীবনানন্দের কবিতাকে মুখ্যত পাওয়া যাবে বিশেষ কবিতাটির বাণীচ্ছবিগুলির সংলগ্নতায়, এমনকি অসংলগ্নতায়ও বটে।
[জীবনানন্দীয় চিত্রকল্প : বাগীশ্বরী দ্যোতনা/*অনুষ্টুপ* জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৯]

**মঞ্জুভাষ মিত্র**

জীবনানন্দ আধুনিক কবি এবং বিংশ শতাব্দীর কবি। বিশ্বআধুনিককবিতার প্রধান কবিদের সঙ্গে তিনিও একই কাব্যআন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। পরবর্তী কবি পূর্ববর্তী কবিদের কাছে স্বভাবতই ঋণী হতে পারেন, কবিতার ঐতিহ্য তাই বলে। রোমান্টিক কবিতার থেকে দূরত্ব উৎপাদনের জন্য জীবনানন্দ সচেতনভাবে বিংশ শতকীয় ইংরেজি ও আমেরিকান কবিতার কাছ থেকে শুভদীক্ষা নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ভাবে ও ভাষায় বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ নির্মাণ করলেন।
[জীবনানন্দ দাশ এবং কয়েকজন বিদেশী কবি/*আধুনিক বাংলা কবিতা*]

**১৯.**

***কবিতার প্রকাশ-প্রকরণে পরিবর্তন আনতে ফরাসি কবি অ্যাপেলিনিয়ের ছবির আদলে কবিতা লিখেছিলেন। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ কবিতার আদলে ছবিও এঁকেছেন।***

নিকটজন। কিন্তু পাউণ্ড পক্ষ নিয়েছিলেন নাৎসিদের। অতএব নৈকট্য সত্ত্বেও পাউন্ডের সঙ্গে এই জায়গাটিতে জীবনানন্দের চিন্তার বিরোধ থাকার কথা। একইভাবে চিন্তার ঐক্য থাকার কথা এবং ছিলও সমকালীন লাতিন আমেরিকান কবিদের সঙ্গে, যারা তখন আধুনিকতার একরৈখিক বর্গটিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে পোস্টমডার্ন বহুরৈখিকতার ভূম রচনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাদের কবিতায়। এই ঐক্য যে সব সময় কবিতা-বাহিতই হবে, সেকথা ঠিক নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সময় ও পরিপার্শ্ববাহিত। একই সময় একই বঞ্চনার মধ্যে থাকা পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই কবিতে যে অভিন্ন মর্মবেদনা ধ্বনিত হতে দেখি, তার এইটিই কারণ। আজ এতদিন পরে চিলির কবি ভিসেন্তে হুইদোব্রোর সঙ্গেও জীবনানন্দের মিল খুঁজে পেয়ে তাই অবাক হই না। যদিও দু'জনের কেউই হয়তো কারও কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এবং এভাবেই ঐক্যে-বিরোধে কবিতে-কবিতে প্রভাব যেমন লক্ষণীয়, নিজস্বতাও তেমনি দ্রষ্টব্য। জীবনানন্দ তার সমকালীন বিশ্বকবিতা থেকে প্রচুর রসদ সংগ্রহ করলেও কবিতার মৌল উপকরণ জোগাড় করেছিলেন নিজের অভিজ্ঞতার মাটি থেকে। জীবনানন্দকালীন বিশ্বকবিতার পটভূমিটি যদি পর্যালোচনা করি আমরা, তবে দেখতে পাব, তখন সর্বত্রই চলছে কবিতার পুরানো বর্গটিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ার অদম্য প্রচেষ্টা। বোদলেয়ারসৃষ্ট বা মালার্মেঘোষিত প্রতীকবাদ থেকে মুক্তি খুঁজছে তখন ফরাসি কবিতা। অ্যাপেলিনেরের 'নতুন মানসিকতা'য় উচ্চারিত হচ্ছে কবিতার নতুন বাঁকের কথা।

---

*'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির' – এই পাঁচটি গ্রন্থের কবিতাগুলো কেউ নিবিড়ভাবে পাঠ করলেই লক্ষ করবেন, জীবনানন্দ কেবল কবিই নন, একজন চিত্রকরও ছিলেন। রঙ-তুলি-ক্যানভাসের পরিবর্তে কালি-কলম-কাগজে অসংখ্য-অজস্র ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনানন্দ তার কবিতায়।*

## সম্পূরক পাঠ

### সুচরিতা দাশ

দাদা রোদে ইজিচেয়ারে বসে কত কি লিখতেন; তখন তাঁর ছবি আঁকার নেশা ছিল, আল্‌তো পেন্সিলের মৃদু চঞ্চলতায় অস্ফুট আলোছায়াময় কতই না ছবি ফুটে উঠত; কখনো আকাশে দুচোখ মেলে দিয়ে কেমন স্তব্ধ চেতনায় গাঢ় বিলুপ্তিতে ডুবে যেতেন। কখনো কলম চলে দ্রুতগতিতে, কখনো লালফুলের আস্তরণে মুড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার দিকে অপলক চোখে চেয়ে ধ্যানস্থ হয়ে যান। কবিচিত্তে তখন মধুছন্দা ঝর্নার অমৃতপ্রবাহ বয়ে চলেছে।

[তাঁর তিরোধানের আঠারো বছর পরের জন্মদিনে/*বিভাব* জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ১৪০৫/১৯৯৮-৯৯]

### পূর্ণেন্দু পত্রী

জীবনানন্দ পড়া থাকলে মিরো-কে চিনে নিতে পারা হয়ে যায় যেন খানিকটা সহজে,

তারই উচ্চারণ থেকে 'সুররিয়ালিজম' কথাটি তুলে নিয়ে আঁদ্রে ব্রেতো নিয়ে এলেন 'মেনিফেস্টো দ্য সুররিয়ালিজম' (১৯২৪)। বাস্তবতা ও যুক্তির দেয়াল ভেঙে পড়তে শুরু করল কবি-শিল্পীদের চিন্তারাজ্য থেকে। ফ্রান্সে পল এলুয়ারসহ অনেক কবিরই পছন্দ ছিল সুররিয়ালিজমের নতুন মনোরাজ্য। তার আগেই ইতালির কবি ফিলিপ্পো মারিনেত্তি বিশ্বকবিতায় নিয়ে এসেছেন 'ফিউচারিজম' (১৯০৯) ধারণা। উনিশ শতকীয় রোমান্টিক কবিতার নন্দন ভেঙে এই মতবাদের কবিরা যন্ত্রের গতি ও ধ্বনির কাছে হাত পাতলেন। ইতালি থেকে রাশিয়ায় পৌঁছল এই মতবাদ অল্প সময়ের ব্যবধানেই (১৯১২)। রুশ কবি মায়াকোভস্কি ভিড়লেন ফিউচারিস্ট কবি-শিল্পীদের দলে। এইসব আন্দোলনে সৃষ্টির চেয়ে ডামাডোল ছিল বেশি। পাউন্ডের 'ইমেজিজম' ছিল সেই তুলনায় অধিকতর কবিতাঘনিষ্ঠ। আর লোরকা অগ্রাহ্য করলেন যে-কোনও ইজমকেই। ধ্বনিকে প্রাধান্য দিয়ে লিখলেন তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সঙ্স'। ধ্বনিকে গুরত্ব দিয়ে মার্কিন কবিতায় তখন 'পারফরমেন্স পোয়েট্রি' নামে এক নতুন আন্দোলন শুরু করেছেন জাজ কবিরা। ছন্দকে গুঁড়িয়ে দিতে উনিশ শতকের শেষভাগে শুরু হওয়া ফ্রি-ভার্সের জের তখনও চলছে। নিরন্তর নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প-কবিতার পুরানো বর্গ ভেঙে বেরিয়ে আসার ফরাসি প্রচেষ্টা 'আভাঁগার্দ'-এরই নানা বিস্তার তখন সারা ইউরোপে। এবং সিম্বলিজম, ফিউচারিজম, এক্সপ্রেশিনিজম, ইমেজিজম, সুররিয়ালিজ, দাদা ইত্যাদির সামষ্টিকতায় 'মর্ডানিজম' নামের নতুন চিন্তারাজ্যটিও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে ততদিনে।

---

আপাত দুর্বোধ্যতার পর্দা সরিয়ে। পৃথিবীর গহন ক্ষতিতে জীবনানন্দের মতোই যে তিনি আতুর, ধরা পড়ে যায় সেই লুকানো তথ্য। মিরোর ছবিতে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ, রূপালি আগুনে ভরা নক্ষত্র, অনন্তরৌদ্রের অন্ধকার, যাদের মাথার চুলে কেবলি রাত্রির মতো চুল, সেই রকম অদ্ভুত সব নারী ও মানুষ আর উৎসারিত অন্ধকার, জলের মতো রাত্রি আসা-যাওয়া করে বারবারই। তিনিও বিষণ্ন, নক্ষত্র এবং নারীর মাঝখানের না-ঘোচা দূরত্বে। তিনিও যেন বারংবার রাত্রির ভয়াবহ বিকৃতির দৃশ্য এঁকে আমাদের জানাতে চান– 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়– দ্বেষ'। যেন তাঁরও মনে হয়েছে– 'কোথাও সার্থককাম নয় কেউ'। জীবনানন্দ দেখেন আকাশের ওপারে আকাশ। মিরোও দেখেন সেইভাবে হয়তো। দেখেন বলেই বলতে পারেন, 'আকাশ আমাকে বিচলিত করে সবচেয়ে বেশি।'

[মিরো, ছবির জীবনানন্দ/*কালি কলম মন*]

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন– এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডায়নামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়।
[ঘোড়া]

বিশ্বকবিতার সমকালীন ঘটনাবলির উপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল পাউণ্ড, ইয়েটস, এলিয়টের। এই তিন কবির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে নিজেকে সমকালীন আন্তর্জাতিক-কাব্যভাবনার সমান্তরাল রেখেছিলেন জীবনানন্দ।

জীবনভর জীবনানন্দ বাংলার নিসর্গেরই ছবি এঁকেছেন তার কবিতায়। জীবনানন্দের কবিতা-প্রাসঙ্গিকতায় রবীন্দ্রনাথ যে 'চিত্ররূপময়' শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেছিলেন, তাকে তাই এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কবিতার প্রকাশ-প্রকরণে পরিবর্তন আনতে ফরাসি কবি অ্যাপোলিনের ছবির আদলে কবিতা লিখেছিলেন। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ কবিতার আদলে ছবিও এঁকেছেন। *ধূসর পাণ্ডুলিপি, রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী ও সাতটি তারার তিমির*– এই পাঁচটি গ্রন্থের কবিতাগুলো কেউ নিবিড়ভাবে পাঠ করলেই লক্ষ করবেন জীবনানন্দ কেবল কবিই নন, একজন চিত্রকরও ছিলেন। রঙ-তুলি-ক্যানভাসের পরিবর্তে কালি-কলম-কাগজে অসংখ্য-অজস্র ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনানন্দ তার কবিতায়। লিওনার্দোর 'মোনালিসা'র মতো তার 'বনলতা'ও তাই আমাদের ভাবনার ফ্রেমে বাঁধানো থেকে যায়। কবির বোন সুচরিতা দাশের স্মৃতিচারণমূলক গদ্য থেকে আমরা জানি, অল্প বয়েসে খাতায় নিসর্গের বিচিত্র ছবিও আঁকতেন তিনি। শৈশবের সেই শিল্পীস্বভাব তার কবি-স্বভাবে মিশে ছিল আমৃত্যু। ছবির এক বিশাল ভাঁড়ার কবির *বনলতা সেন* ও *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থ দুটি। সমকালীন বিশ্বকবিতার যেমন অক্লান্ত পর্যটক ছিলেন তিনি, সমকালীন ছবির দুনিয়া সম্পর্কেও

---

এটুকু পড়লেই জেগে ওঠে সালভাদর ডালির অতিপরিচিত ছবি 'অটোমোবাইলের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম-নেওয়া অন্ধ ঘোড়া টেলিফোন চিবিয়ে খাচ্ছে' (১৯৩৮)। ছবিটির চিত্রণকাল 'সাতটি তারা তিমিরে'র রচনাকালের আগেই নিবদ্ধ, কিন্তু ঐ কালপর্বেই বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
[*জীবনানন্দ*]

২০.
*'উপমাই কবিতা' বলতে সম্ভবত জীবনানন্দ দাশ চিত্রকল্পকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কারণ তার কবিতার উপমা ব্যাকরণসিদ্ধ উপমা নয়– উপমান ও উপমেয়র মিশ্রণে এক নতুন দ্রবণ, যা চিত্রকল্পরই বেশি কাছাকাছি। ইমেজের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে তখনও চিত্রকল্প আসেনি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ররূপময়' কথাটিই বাংলা ভাষায় চিত্রকল্পের প্রথম প্রতিশব্দ। সেই চিত্রকল্পের ব্যবহারে জীবনানন্দের চেয়ে ব্যাপকতর কবির দ্যাখা আমরা এখনও পাইনি বাংলা কবিতায়।*

সম্পূরক পাঠ

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**
এই কাব্যভাষা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনুধাবন করা হয়তো সম্ভব ছিল না। তিনি

তার ধারণা ছিল নিশ্চয়ই। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরদের সমঝদার ছিলেন বোদলেয়ার। তাদের ছবি নিয়ে সমালোচনা-গদ্য লিখেছেন। আমাদের বিষ্ণু দে-ও কলম ধরেছেন যামিনী রায়ের ছবি সম্পর্কে। লোরকার সঙ্গে সালভাদর দালির ছিল গভীর সম্পর্ক। লোরকার কবিতা নিয়ে দালি ছবিও এঁকেছেন। সেই দালির ছবির সঙ্গে জীবনানন্দের 'ঘোড়া'র মিলের কথা লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য তার *কবি জীবনানন্দ দাশ* বইয়ে। সুররিয়ালিস্ট কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দালির ঘনিষ্ঠতার কথা আমাদের অজানা নয়। কবিতার প্রশ্নে জীবনানন্দও ইমেজিস্ট ও সুররিয়ালিস্ট কবি-লেখকদের নিকটজন ছিলেন। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, কোনও নির্দিষ্ট বর্গেরই কবি ছিলেন না তিনি। *শ্রেষ্ঠ কবিতার* ভূমিকায় নিজেও তিনি জানাচ্ছেন সেকথা; বলছেন– 'কবিতা অনেক রকম'। সেই অনেকরকমেরই একটি গুণ– তার কবিতায় ছবির রাজত্ব। এই বিশেষ গুণটির জন্যই জীবনানন্দকে শুধু কবি না ব'লে একই সঙ্গে ভাষাচিত্রীও বলা উচিত। জীবনানন্দের এই শিল্পীসত্তাকে খুব ভালো বুঝেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। মিরোর ছবির সঙ্গে দাশকাব্যের মিলের কথা তিনি তার এক গদ্যে লিখেছিলেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা তার *রূপসী বাংলার দুই কবি* বইটিতে আরও বিশদে পাওয়া যায় জীবনানন্দের কবিতার এই বিশেষ গুণটির কথা। শিল্পী ও কবি দুইই ছিলেন ব'লে এমন একটি ব্যত্যয়ী বই পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন পত্রী। এবার জীবনানন্দের কবিতার কিছু ছবির দিকে তাকানো যাক–

---

জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন। বিভিন্ন লেখক-কবিকে উদারভাবে সার্টিফিকেট দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক শব্দ বানাতে হয়েছিল, এটাও সেরকম সার্টিফিকেটের ভাষা। কিছুই বোঝায় না। জীবনানন্দ নিজেও এই বিশেষণ মেনে নেননি।

[সূর্য ও সাতটি তারার তিমির/*দেশ* জীবনানন্দ ২/২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮]

**অম্বুজ বসু**

জীবনানন্দ তাঁর কোনো রচনায় 'চিত্রকল্প' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে 'ইমেজিসম্' শব্দটি উল্লেখ করে এই আন্দোলনের প্রভাব স্বীকার করেছেন। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের কাছাকাছি। তখনো চিত্রকল্প শব্দটি উদ্ভাবিত হয়েছিল কিনা বা হয়ে থাকলেও জীবনানন্দের জানা ছিল কিনা বলতে পারবো না। কিন্তু তাঁর কবিতাতে চিত্রকল্পের সজ্ঞান ও সর্বতোমুখি ব্যবহার এই আভাস দেয় যে চিত্রকল্পবাদী কবি যদি বাংলা ভাষায় কেউ থাকেন তবে তিনি জীবনানন্দই।

[চিত্রকল্প/*একটি নক্ষত্র আসে*]

২১.

*আসলে জীবনানন্দের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের এক নতুন মিশ্রণ। এই ছন্দের*

০১.

ডাইনীর মতো হাত তুলে-তুলে ভাঁট আঁশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝি নাকো– বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি হায় এমন বিজন
শাদা পথ– সোঁদা পথ বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চ'লে গেছে– শ্মশানের পারে বুঝি– সন্ধ্যা আসে সহসা কখন
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম– নিম– নিম কার্তিকের চাঁদে।
[২০/*রূপসী বাংলা*]

০২.

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে–
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে!
[কুড়ি বছর পরে/*বনলতা সেন*]

০৩.

বুনো হাঁস পাখা মেলে– সাঁই সাঁই শব্দ শুনি তার;
এক– দুই– তিন– চার– অজস্র– অপার–

---

*রীতিটি অক্ষরবৃত্তের হলেও চালটি মাত্রাবৃত্তের। নিজেও কবি 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে'র ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গদ্যে। জীবনানন্দীয় ছন্দের এই চালটিকে 'অক্ষরমাত্রিক'ও বলা যেতে পারে। প্রচল অক্ষরবৃত্তের মতো যুক্তাক্ষর গ্রহণে দাশকাব্য উদার নয়। নিজেও কবি 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে'র ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গদ্যে। দণ্ডী-কুন্তক কী বলতেন, জানি না; তাল-লয়ের কান সে-কথাই জানায়। আবার এ-ও বলা যেতে পারে– পয়ারবন্ধী চালের শৈথিল্যে জীবনানন্দ বৈষ্ণব কবিদের নতুন সংস্করণ। মধুসূদন-প্রদত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিস্তারই প্রচল অক্ষররবৃত্ত। যুক্তাক্ষরের প্রতি তার প্রবল আসক্তি। জীবনানন্দকালীন কবিদের সবাই এই যুক্তাক্ষরপ্রবণ অক্ষরবৃত্তকেই মুখ্য ছন্দ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ গেলেন মাত্রাবৃত্ত ও পয়ারের ঢিলে চালে।*

## সম্পূরক পাঠ

**বুদ্ধদেব বসু**

এটাও লক্ষ্য করবার যে জীবনানন্দের পয়ারে যুক্তাক্ষর কম। যুক্তাক্ষরের অভাবে পয়ারের শিথিল ও মেরুদণ্ডহীণ হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে; কিন্তু এই কবি একটি লাইনও লেখেননি যাতে ঋজুতা, দৃঢ়তা, কি গাম্ভীর্যের অভাব। বরঞ্চ, যুক্তাক্ষরের

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে– ছুটিতেছে তা'রা।
[বুনো হাঁস/*বনলতা সেন*]

শুধু ছবিই নয়, রূপকের অধিক রূপক এরা; চিত্রকল্পের অধিক চিত্রকল্প। সমস্ত ইন্দ্রিয় জড়ো না ক'রে এদের সবটুকু উপলব্ধি করা অসম্ভব। জলের মতো ঘুরে-ঘুরে এই সব একাকী ছবিও এঁকে গেছেন জীবনানন্দ তার কবিতায়। কবিতার প্রধান দু'টি গুণ– ধ্বনিময়তা ও চিত্রময়তা। সব ভাষার কাব্যে ধ্বনিই তার আদি গুণ। একসময় কবিতা সুর ক'রে পড়া হত। গানের তখন আলাদা কোনও পরিচয় ছিল না। কবিতা নিজেই ছিল গান। এখনও গ্রামে-গঞ্জে সুরের পুঁথি, সুরের পাঁচালি কবিতার আদি বৈশিষ্ট্যে বেঁচে আছে। তারপর কবিতায় চিত্র এসেছে। বাংলা কবিতায় মধ্যযুগের কবিরা সুরের সঙ্গে কবিতায় চিত্রকেও ধারণ করতে শুরু করলেন। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কিংবা বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কিংবা বৈষ্ণব কবিদের *পদাবলি* এই যুগের অনন্য সৃষ্টি। ভারতচন্দ্র থেকে চিত্রকল্পেরও সূচনা। বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিকও তিনিই। যদিও বাংলা গদ্যের সূচনায় ইউরোপমুগ্ধ কাব্যসমালোচকরা মোটা দাগের যুগবিভাজনে তাকে মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে ফেলে রাখলেন। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' কিংবা 'মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে' কিংবা 'হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়' কিংবা 'বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'-এর মতো প্রবল চিত্রকল্প বাংলা

---

স্বল্পতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার ক'রেছেন যাতে পয়ারে লেগেছে নতুন সুর।
[প্রকৃতির কবি/*কবিতা* ২য় বর্ষ]

**অজিত দত্ত**

জীবনানন্দের কবিতার একটা সুর, একটা বিশেষ ছন্দ, একটা বিশেষ ধ্বনি ছিল। জীবনানন্দের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য কবিতাই এই বিশেষ ধাঁচে, বিশেষ সুরে লেখা। তাঁর কবিতার বিরতি, ঝঙ্কার, শব্দচয়ন, উপমা সবই যেন ছিল একটু আলাদা ধরনের। অনেক সময় এই বিশেষ ভঙ্গিটি এত প্রকট হয়ে উঠত যে, সেটা অনেকের কাছে মুদ্রাদোষ বলেই মনে হত। কিন্তু জীবনানন্দের মনের যে বিশেষ গঠন, তারই সুসঙ্গত ভঙ্গি ও সুরটি তিনি তাঁর রচনার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই তাঁর রচনা সাধারণ পাঠকের কাছে এত অদ্ভুত ঠেকে।
[কবি জীবনানন্দ/*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৪ কার্তিক ১৩৬১]

**দীপ্তি ত্রিপাঠী**

কিন্তু জীবনানন্দের ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নতা। তাঁর কবিতায় কলা-কৌশলের অভাব নেই, ছন্দ তাঁর কোথাও টলেনি, মিল, অনুপ্রাস পুনরুক্তিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু সেগুলি কোথাও চমক দেয় না। সব মিলিয়ে কবির বক্তব্যটিকে আরো

সাহিত্যে আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতাতেই প্রথম পাই। তার *অন্নদামঙ্গল* বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আধুনিক কাব্যগ্রন্থ– শুধু চিত্রকল্পের কারণেই নয়, দৃষ্টিভঙ্গির বহুরৈখিকতার জন্যও। চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র, মাঝে মধুসূদন– আবহমান বাংলা কবিতার এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। কবিতার ধ্বনিময়তায় তিনি সার্থক ও সফল। তাই কবিতার চেয়ে তার গান আমাদের বেশি ভালো লাগে। চিত্রময়তা বা কবিতার দ্বিতীয় গুণটির ক্ষেত্রে বাংলা কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। কারণ তার কবিতা চিত্রকে ছাড়িয়ে আধুনিক চিত্রকল্পের স্তরে খুব কমই উত্তীর্ণ হয়েছে। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-অসাধ্য সেই কাজটিই করেছেন জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন চিত্রকে নিয়ে চিত্রকল্পের রাজ্যসৃষ্টির মাধ্যমে। 'উপমাই কবিতা' বলতে সম্ভবত জীবনানন্দ দাশ চিত্রকল্পকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কারণ তার কবিতার উপমা ব্যাকরণসিদ্ধ উপমা নয়– উপমান ও উপমেয়র মিশ্রণে এক নতুন দ্রবণ, যা চিত্রকল্পরই বেশি কাছাকাছি। ইমেজের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে তখনও চিত্রকল্প আসেনি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ররূপময়' কথাটিই বাংলা ভাষায় চিত্রকল্পের প্রথম প্রতিশব্দ। সেই চিত্রকল্পের ব্যবহারে জীবনানন্দের চেয়ে ব্যাপকতর কবির দ্যাখা আমরা এখনও পাইনি বাংলা কবিতায়। তার কবিতা উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের এক আশ্চর্য সমবায়। প্রচল সংজ্ঞায় তাকে খুঁজতে যাওয়া তাই অর্থহীন। 'মতো'র বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও উপমানকে বিম্বিত করার জন্য উপমেয় আসে না তার কবিতায়। দু'জনেই

---

স্ফুটমান ক'রে তোলে। আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর রচনাই সন্ধান দেয় গভীরতর মননের স্তরে যাত্রী হবার।

[জীবনানন্দ দাশ/*আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*]

**শিশিরকুমার দাশ**

জীবনানন্দ এতদিনে বুঝে নিয়েছিলেন যে তাঁর স্বাভাবিক ছন্দ অক্ষরবৃত্ত এবং বিশেষ ধরনের অক্ষরবৃত্ত। সমকালীন অন্য কবিদের অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে তাঁর অক্ষরবৃত্তের পার্থক্য একটি বিশেষ ছন্দস্পন্দে। এই ছন্দস্পন্দের উৎস তাঁর ধ্বনিসজ্জায়– তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে দেখা যাবে মুক্ত দলের প্রাধান্য। কদাচিৎ তিনি রুদ্ধ দলসজ্জায় প্রাধান্য দেন। কদাচিৎ তাঁর বাক্যে রুদ্ধ দলের ক্রমসজ্জার তরঙ্গ দেখা দেয়। মুক্ত দলের ক্রমসজ্জা তাঁর পঙ্‌ক্তিগুলিকে দেয় এক মন্থরতা ও মসৃণতা।

[আমার পায়ের শব্দ শোনো : ঝরাপালক থেকে ধূসর পাণ্ডুলিপি/*অনুষ্টুপ* জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৯]

**রণেশ দাশগুপ্ত**

অথচ সুরই হচ্ছে তাঁর কবিতার প্রাণ। লৌকিক বাংলার কবিতার সুরে বিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের পদাবলী লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি যে গদ্য কবিতা লিখেছেন, তাও একই গ্রামে বাঁধা। সাধু ক্রিয়াপদ আর গ্রামীণ কথা সুরের তটিনীতে মালা হয়ে

দু'জনকে বিবৃত করে সমান-সমান। এইভাবে উপমা ও রূপক উভয়েই পরিণতির স্তরে পৌঁছে যায় চিত্রকল্পের এক জটিল মহারাজ্যে। যেমন—

যাকে কুঁড়ি মতো
সেই জল-সরোবর কন্যা
বুক বুক চিত্র
কেবল পেয়েছে
শরীর পিছল
কাজল কুঁড়ি মতো শিশুর জল
চাঁদে বুকে ঝরে কার
উত্তর সাগর
উত্তর সাগর
পদ্মবনে পড়িনি

'আলোপথ'র আমরা একটি উপমানের বহু উপমেয় দেখি, প্রতিবিম্বপরম্পরা উপমান ও উপমেয়কে একই সমান্তরালে বিম্বিত-প্রতিবিম্বিত হতে দেখি; কিন্তু জীবনানন্দের উপমা'কে এরূপ কোনও বাঁধাই বেঁধে দেওয়া যায় না। সাধারণভাবে উপমেয়ের ধর্মকে বিম্ব এবং উপমানের ধর্মকে প্রতিবিম্ব হিসেবে দাবি করা যায়। 'চাঁদের মুখ'। 'মুখ' বস্তুটিকে চাঁদ উপমান, মুখ উপমেয়। অর্থাৎ যাকে সাদৃশ্য তুলনা করা হচ্ছে, তাকে আমরা উপমান বলছি এবং যাকে তুলনা করা হচ্ছে, তাকে বলছি উপমেয়। কিন্তু উপমেয়ের

---

[illegible] চলেছে। যেন কিছু বর্ণের শব্দ আছে, কিছু সবই পেছন হয়ে গিয়েছে পেছনে সুদূর বাংলায়। তাঁর কবিতাগুলি মনোমত প্রধান হয়ে গিয়েছে সুর সৃষ্টিতে আমাদের। বুঝছ জীবনানন্দ সাদের কবি স্বর।

তপন চৌধুরী

জীবনানন্দের ছন্দ-রহস্য সম্পর্কেও বুদ্ধদেব প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জীবনানন্দ বেশিরভাগ কবিতা অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও গদ্যছন্দে কিছু কবিতা লিখেছেন। প্রচলিত প্রকরণে কবিতার তালিকা হিসেবে প্রথম অক্ষরবৃত্তে ২৭টি, মাত্রাবৃত্তে ১৪টি, স্বরবৃত্তে ৩টি, গদ্যছন্দে ২৪টি। বুদ্ধদেব অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দ সম্পর্কেই কথা বলেছেন। জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্তের ছন্দ যে প্রচলিত পথে নয়, বরং অন্যদিকে যে তা এক নতুন সুর যোজনা করেছে, সেকথা বুদ্ধদেবই সর্বপ্রথম মধ্যে নিয়ে প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণের বিন্যাস নিয়ে কেন ব্যবহার-গত জটিলতার মধ্যে যাননি, তিনি বিষয়বস্তুর সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের যতটা সম্বন্ধ দেখিয়ে কাব্যিক সৌন্দর্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় যে আলস্য ও মন্থরতার একটি বাতাবরণ আমরা লক্ষ করি, তার মূল যে অক্ষরটাই ছন্দনির্ভর, সে কথা বুদ্ধদেব বলেছেন।

জীবনানন্দ-সমালোচনা : কয়েকটি প্রবন্ধ/জীবনের কবি জীবনানন্দ

কবিতাগুলো সাধারণ নেই, নদীর শরীর ও চুল সবই উপমান এবং সবই উপমেয়
সেখানে সমস্তরে চেতনার মাঠে একটি নদীর শরীর যেমন স্পষ্ট হয় পাঠ, তেমনি
নদীর শরীরের মাঠে একটি সমগ্র-দৃশ্যও অবলোকন তোমার জন্যে পাঠ হয় মাঠ,
ঝিনুক ও চাঁদও মুখে পাড় একই পরম্পরায় এবং ঝিনুক হয় এক উদ্ভিদ
চিত্রকল্প — বাক্য কবিতার চিত্রকল্পের এই নতুন প্রয়োগের জন্যে জীবনানন্দ দাশ

চিত্রকল্পের নতুন ভাষা রচনা করার পাশাপাশি ধ্বনিমূলের যে কবিতার মূল বুনিয়াদ
তাকেও বিস্তৃত করেন জীবনানন্দ— উদাহরণ দেবো নাকি ও পূর্বোক্ত সাড়া দিয়া আসে,
এমন এক শিল্পী পরম্পরাই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ অর্জনের ধ্বনিমূল বার্থ সমগ্র-চিত্রের
শব্দ জীবনানন্দ অবলোকন করেছেন বারবার আয়ত্তে হয় ও হয়ে, গোড়া ও পায়ের
ইত্যাদি সমগ্র-চিত্রের শব্দের নির্বাচন বারবার আয়ত্তে হয় কবিতার যে বিচার
পদ্ধতিতে করা, তেমনটি করেননি তিনি তাই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ করেন ও মনকে
তাই বুদ্ধিজীবিরা হয়ত সাড়াও শুনিয়ে নির্বাচন জীবনানন্দ 'ক্ষয়-ক্ষয়'-এর
মতো শব্দকেও গ্রহণ করেন অকাতরে সচেতনভাবেই এই কাজ করেছেন তিনি
সেই সচেতনতার সাক্ষ্য দেয় তার ছন্দ-ভাবনা—

> বাস্তবের মুক্তির উপায়ের কথা কবিতার ধর্ম নয়:- এই যুগের অবস্থা
> উদ্ভাবনের সমস্ত বাধার জন্য সর্বজনীন নিরীক্ষণের যে পরিচয় পাওয়া যায়
> রাষ্ট্র ও সমাজে— সেইটা কাব্যের ছন্দাকারে নিয়ন্ত্রণরূপে প্রতিফলিত হয়
> বাস্তবের মুক্তির জন্য যে কিনা ভেবে দেখে যেতে পারে যদি সে এক

---

**সৈয়দ আলী আহসান**

তবে একথা মানতেই হবে যে জীবনানন্দ কখনো-কখনো ট্রেডিশনের ভেতর দিয়ে হেঁটেছেন : তা অবশ্য তাঁর জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় 'রূপসী বাংলা'র কোনো-কোনো সনেটও তার ছাপ পড়ে। পঞ্চভূতে অমর মরণবিন্যাস ('পৃথিবীর পথে অবিরাম', 'একদিন পৃথিবীর পথে' ইত্যাদি সনেট), অনুসার দিয়ে শেষ হওয়া বাক্যকে দু' মাত্রা বিবেচনা (যেমন: 'চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি— শাদা শাঁখ— কাঁকড়ার ঝাল') ইত্যাদি ব্যবহারে তা স্পষ্ট হয়। তাছাড়া পরিচিত পঞ্চভূতাদির, দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করে, অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংযুক্ত সম্ভারে, বিষয় ও যাদের কৌশিক নুতি প্রয়োগে তিনিই পেট্রার্কান ধারার সকল সনেট-রচয়িতা।

[জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষ/কবিতাসমগ্র, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ২০০৩]

২২

একরৈখিক আধুনিকতার মধ্যে ছিল প্রতিমা-নির্বাচনের ঝোঁক। কবিতে কোনও নির্দিষ্ট পিরোপায় আবিষ্কারের চেষ্টাও সেই আধুনিকতারই ফসল। কিন্তু আধুনিক যুগে জন্ম ক'রেও সমকালীন লাতিন আমেরিকার কবিদের মতো বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ শুরু করেছিলেন প্রতিমাবিসর্জনের কাজটি। কেন্দ্রাভিমুখী না হয়ে তিনি ছুটেছিলেন

কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এ রকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা?
[জীবনানন্দ দাশ : কবিতার আত্মা ও শরীর/*কবিতার কথা*]

ছন্দ-প্রকরণে জীবনানন্দ দাশ-এর পছন্দ ছিল ঢিলে চালের পয়ারবন্ধী অক্ষরবৃত্ত। 'অক্ষরবৃত্ত' নামটি যার দেয়া, সেই প্রবোধচন্দ্র সেন জীবনানন্দের এই ছন্দোবন্ধকে চিহ্নিত করেছিলেন 'অতিমুক্তক' ব'লে। তাঁর 'অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধ' শীর্ষক গদ্যে স্বীকারও করেছিলেন তিনি– "এ-রকম অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি খ্যাত হয়েছেন কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)।" তবে জীবনানন্দের ছন্দ-রীতিকে প্রবোধচন্দ্র অক্ষরবৃত্তের বর্গেই রেখেছিলেন। আসলে জীবনানন্দের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের এক নতুন মিশ্রণ। এই ছন্দের রীতিটি অক্ষরবৃত্তের হলেও চালটি মাত্রাবৃত্তের। নিজেও কবি 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে'র ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গদ্যে। জীবনানন্দীয় ছন্দের এই চালটিকে 'অক্ষরমাত্রিক'ও বলা যেতে পারে। প্রচল অক্ষরবৃত্তের মতো যুক্তাক্ষর গ্রহণে দাশকাব্য উদার নয়। নিজেও কবি 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে'র ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গদ্যে। দণ্ডী-কুন্তক কী বলতেন, জানি না; তাল-লয়ের কান সে-কথাই জানায়। আবার এ-ও বলা যেতে পারে– পয়ারবন্ধী চালের শৈথিল্যে জীবনানন্দ বৈষ্ণব কবিদের নতুন সংস্করণ। মধুসূদন-প্রদত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিস্তারই প্রচল অক্ষররবৃত্ত। যুক্তাক্ষরের প্রতি তার প্রবল আসক্তি। জীবনানন্দকালীন কবিদের সবাই এই যুক্তাক্ষরপ্রবণ অক্ষরবৃত্তকেই মুখ্য ছন্দ

---

*প্রান্তিকের টানে। তার কবিতায় তাই এত বিপর্যাস, এত বিরোধাভাস। আধুনিক যুগের এই বিরোধাভাসই উত্তরআধুনিক ব্যাখ্যায় সামষ্টিকতা বা বিকেন্দ্রীকরণ বা প্রতিমাবিসর্জন বা প্রান্তিকতা বা জটিলতা বা অনির্দিষ্টতা– এক কথায় বহুরৈখিকতা। বাংলা কবিতায় জীবনান্দ দাশই এই বহুরৈকিতার প্রথম সার্থক রূপকার।*

## সম্পূরক পাঠ

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

জীবনানন্দ বাক্যরচনার ক্ষেত্রে একাধারে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, প্রবল প্রাচীনপন্থী এবং উত্তর-আধুনিক। তাঁর সাধু ভাষাত্মক ক্রিয়াপদের ক্লান্তিহীন ও ক্লান্তিকর পুনর্ব্যবহারের মুদ্রাদোষ নিঃসন্দেহে ঘোরতর প্রাচীনগন্ধি, যা আমাদের ভাষাসঙ্গে কমলকুমার মজুমদারের গদ্যের কথা মনে করায়। এরি পাশাপাশি, একেবারে অর্বাচীন বাচালের বাগ্‌বিধিও জীবনানন্দে হঠাৎ-হঠাৎ এসে হাজির হয় যা আধুনিকতম শিল্পীর সৃজনে দুর্লভ, অসম্ভাব্য। সেখানে তিনি উত্তর-আধুনিক। ভুলে গেলে চলবে না, সাহিত্যের ইতিহাসে অধুনা-স্বীকৃত 'উত্তর-আধুনিক' শব্দসংজ্ঞা আসলে স্থাপত্যের জগৎ থেকেই উঠে এসেছে। একালের স্থপতি অতীতকে বজায় রেখেও বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষের ব্যবহার্য পরিসরের কথা মনে রেখে যখন আয়তন রচনা করেন, তাঁকে এই আখ্যা দেওয়া

হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ গেলেন মাত্রাবৃত্ত ও পয়ারের ঢিলে চালে। এই যুক্তির পক্ষে একটি বড় প্রমাণ– 'ধানসিড়ি'। এই নদীর নাম ছিল আগে 'ধানসিদ্ধি'। জীবননান্দ লিখলেন 'ধানসিড়ি' (নদীর নামই বদলে গেল কবির উচ্চারণে)। 'আবার আসিবো ফিরে ধানসিড়িটির তীরে– এই বাংলায়–' না প'ড়ে 'আবার আসিবো ফিরে ধানসিদ্ধিটির তীরে– এই বাংলায়–' পড়লেও প্রচল অক্ষরবৃত্তে ছন্দ-পতন ঘটে না; কিন্তু জীবনানন্দকে খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হয়। যারা বরিশালে গেছেন– সুগন্ধা ও বিষখালি নদী এবং গাবখান খালের পাশে ধানসিড়িকে দেখেছেন– একটু লক্ষ করলেই তারা আবিষ্কার করবেন– ঐ তিন নদী-খালের প্রবাহ যদি অক্ষরবৃত্তের অনুরূপ হয়, তবে একমাত্র ধানসিড়িই ব'য়ে চলেছে পয়ারবন্ধী কিংবা অক্ষরমাত্রিকের শিথিল চালে। ছন্দের এই ঢিলে চাল থেকে শেষ পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশ স'রে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখনও সরেননি, সেই পর্যায়ের একটি কবিতায়, কবির মৃত্যুর পর, একটি অনাবশ্যক পরিবর্তন ঘটেছিল বুদ্ধদেব বসুর হাতে। *মহাপৃথিবীর* 'ইহাদেরি কানে' কবিতার একটি শব্দগুচ্ছে ঢিলে চালের 'সোনার পিতল মূর্তি' পরিবর্তিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল আঁটোসাটো অক্ষরবৃত্তের 'সোনার পিত্তলমূর্তি'তে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সিগনেট-সংস্করণ *মহাপৃথিবীতে* এবং দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত কাব্যসমগ্রে বুদ্ধদেবকৃত পাঠটিই গৃহীত হয়েছে। অনুষ্টুপ জীবনানন্দ সংখ্যায় এ-বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন অশ্রুকুমার শিকদার।

---

হয়। জীবনানন্দের শব্দার্পিত সময়চিন্তায় এরকম নানান্ আয়তন নির্মিত হয়ে আছে।
[*জীবনানন্দ* ]

**পূর্ণেন্দু পত্রী**

জীবনানন্দকে কেউ কখনো অন্ধকারের কবি বলেননি। ইচ্ছে করলে তাও বলা যেতো। কেননা এত অন্ধকার আমাদের দেশের কবিতায় আর কেউ জড়ো করেননি কখনো। তাঁর সব উল্লেখযোগ্য কবিতাতেই উটের গ্রীবার মতো মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে অন্ধকার। তাঁর সমস্ত স্মরণীয় কবিতার শরীরের সবচেয়ে ঝলমলে, সবচেয়ে প্রখর, সবচেয়ে আকর্ষক পোশাক অথবা অলঙ্কারটি হল অন্ধকার। আর অন্ধকারের এই রত্নহার পাবার জন্যেই তাঁর অধিকাংশ কবিতার পটভূমি সন্ধ্যে থেকে রাত্রি।
[রূপসী বাংলার দুই কবি]

**ক্লিন্টন বি সীলি**

১৯৪০-এর আগে জীবনানন্দর কবিতা এক শব্দে বর্ণনা করতে গেলে তাকে বলা যায় ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক বা ইন্দ্রিয়াত্মিক, যেমন 'ঘাস' নামের কবিতাটি। ..... এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দর "Synaesthethic" কল্পমূর্তি। এটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যাশিত সংযোগ ঘটায় যেমন :

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন

নিবিড়পাঠে 'সোনার পিতলমূর্তি'কেই সঠিক পাঠ ব'লে মনে হয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বিকল্প পাঠ ছাড়াও এ জাতীয় অনেক পরিবর্তিত পাঠের জটিলতা থেকে গেছে বিভিন্ন সংস্করণে।

বুদ্ধদেব বসু তাকে 'নির্জনতম কবি' শিরোপা দিয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন 'শুদ্ধতম কবি'। 'প্রকৃতির কবি', 'রূপসী বাংলার কবি', 'হেমন্তের কবি' ইত্যাদিও বলা হয়েছে জীবনানন্দকে। এই শিরোপাপ্রদানকে মৃদু কটাক্ষ ক'রে পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছিলেন-- "জীবনানন্দকে কেউ অন্ধকারের কবি বলেননি, ইচ্ছে করলে তাও বলা যেত।"-- আজ এক কথায় বলা যায়, জীবনানন্দ কোনও নির্দিষ্ট বর্গের কবি ছিলেন না ব'লেই কোনও একক শিরোপায় তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মহাকালচারী হওয়ার পরও 'এক তিল অধিক প্রবীণ এক নীলিমার পারে'র মতো ক্ষুদ্রতম এককের সময়গণনা করেছেন তিনি, নির্জনতম মনোরাজ্যের বাসিন্দা হওয়ার পরও 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল'-এর মতো রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনি পাঠককে, দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণের প্রাত্যহিকতায় মণি-মুক্তাখচিত ইতিহাসকে টেনে এনে বলেছেন-- "অন্ন নেই-- অন্ন নেই-- নেই; / ইতিহাস : বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃস্বত্ত্বার মতন"। একরৈখিক আধুনিকতার মধ্যে ছিল প্রতিমা-নির্মাণের ঝোঁক। কবিকে কোনও নির্দিষ্ট শিরোপায় আবিষ্কারের চেষ্টাও সেই আধুনিকতারই ফসল। কিন্তু আধুনিক যুগে বাস ক'রেও সমকালীন লাতিন আমেরিকান কবিদের মতো বাংলা কবিতায়

---

সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল..."
(বনলতা সেন)

চোখে পড়ার মতো 'রৌদ্রের গন্ধ' এই চিত্রকল্প খানিকটা স্ববিরোধী, তারপরে ১৯৩০-এর শেষের দিকে এবং ১৯৪০ দশকে পরিপূর্ণ বিরোধাভাসের ব্যবহার জীবনানন্দর কবিতায় বাড়তে থাকে। সেই বিরোধাভাসের পদ ক্রমশ বেখাপ্পা হতে থাকে, তার অর্থের সমন্বয় ক্রমশ দুরূহ, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
["রৌদ্রের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে"/*দেশ* জীবনানন্দ ২, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮]

**উইলিয়াম রাদিচে**

যুদ্ধ হিংসা বর্বরতা আপনার কবিতায় কোনও কিছুই বাদ পড়েনি। আপনি দেখালেন যে চূড়ান্ত নৈরাশ্যেও রয়েছে এক ধরনের সততা ও বাস্তবনিষ্ঠা। একুশ শতকে হয়তো আরও আঁধার ঘনাবে। তখন আপনার কবিতা "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ" আরও অনেক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেবে।
[উইলিয়াম রাদিচে: "আপনি আধুনিকতার শরিক"/*দেশ* জীবনানন্দ ২/ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮]

**নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

'মানুষ কেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে'-- লিখেছিলেন

জীবনানন্দ শুরু করেছিলেন প্রতিমাবিসর্জনের কাজটি। কেন্দ্রাভিমুখী না হয়ে তিনি ছুটেছিলেন প্রান্তিকের টানে। তার কবিতায় তাই এত বিপর্যাস, এত বিরোধাভাস। আধুনিক যুগের এই বিরোধাভাসই উত্তরআধুনিক ব্যাখ্যায় সামষ্টিকতা বা বিকেন্দ্রীকরণ বা প্রতিমাবিসর্জন বা প্রান্তিকতা বা জটিলতা বা অনির্দিষ্টতা— এক কথায় বহুরৈখিকতা। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশই এই বহুরৈখিকতার প্রথম সার্থক রূপকার। তাই তার কবিতায় নির্দিষ্টতার চেয়ে অনির্দিষ্টতার লক্ষণ এত বেশি।

এবং সর্বার্থেই তিনি ছিলেন ভিড়ের মধ্যে একা। কোলাহলে নিজেকে হারাননি ব'লেই, অনিশ্চয়তাময় জীবন পাড়ি দিয়েছেন ব'লেই, জীবনের অনুপুঙ্খ বেদনাকেও জীবনানন্দ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তার কবিতায়। জ্বরাগ্রস্ত এক প্রবীণ পৃথিবীকে নিয়ে তিনি পথ হেঁটেছেন 'পৃথিবীর পথে'। সেই পথে যুগে-যুগে আরও যারা হেঁটেছেন, সেই বুদ্ধ, ঈসিস, কনফুসিয়াস, কৌটিল্য, কপিল, নাগার্জুন, চার্বাক, দীপঙ্করও তার চিন্তার সহযাত্রী। তাই ব'লে বিস্মৃত হননি তিনি সমকালীন পৃথিবীকে। বিস্মৃত হননি শোষিত স্বদেশকেও। তবে সবকিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এক কাল-নিরপেক্ষ মুক্তাঞ্চল থেকে। এই মুক্তাঞ্চলকে তিনি সময়ের 'মধ্যম পথ' বলেছেন একাধিক কবিতায়। সেখানে দাঁড়িয়েই প্রত্যক্ষ করেছেন বৃহত্তর জনমানুষের নির্মম বাস্তবতা— 'সারাদিন সকলের সাথে আমি ব্যবহৃত হয়ে চলি'। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি জেনেছেন, এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক 'আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে'। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন, 'পৃথিবীর সন্তানের

---

জীবনানন্দ 'ক্যাম্পে' কবিতায়। 'নোনা মেয়েমানুষ' বলতে কী বোঝায়, কেমেলিন কি তেমন করে ভেবে দেখেছি আমরা? কোন মেয়েমানুষের কথা বলতে চান তিনি? শারীরিকভাবে ব্যবহৃত মেয়েমানুষ? নাকি যৌন-পীড়িত মেয়েমানুষ? নাকি সেই মেয়েমানুষ যার নৈকট্যে পুরুষের যৌন-বোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়? এখানে 'নোনা' শব্দের আমি যে অর্থ করব, অন্য পাঠক অন্য কোনো ভিন্ন অর্থ করতে পারেন। আর এখানেই এই বিরলপ্রতিভাসম্পন্ন কবির বিশেষত্ব। তিনি প্রায় একশ বছর পরেও তার পাঠককে চমৎকৃত করেন এবং বিভ্রান্তও করেন এইভাবে।

[এইসব আলো প্রেম ও নির্জনতা/*কবিতা নিয়ে গদ্য*]

রফিকউল্লাহ খান

প্রথম মহাসমরোত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন-কোলাহলের বন্ধুর জগতে জীবনানন্দ দাশ চেতনায় এক নতুন প্রান্ত উন্মোচন করলেন। আপাত-নিভৃত, নিসর্গ-নস্টালজিয়ার চেতন-অবচেতনকারী, উপনিবেশিত মধ্যবিত্তের বৃত্তবদ্ধ জীবনের ব্যর্থতাবোধের গভীর বলয়ের এই কবি বিশ শতকের বাংলা কবিতাকে এক বিশ্বজনীন চারিত্র্য দান করলেন। বাঙালি কবিতাপাঠকের অভিজ্ঞতায় যা ছিলো অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর। মৃত সময়ের গহ্বর খুঁড়ে-খুঁড়ে কীভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের তাৎপর্য নিরূপণ করা যায়, 'নক্ষত্রলোকের ইশারায়' থেকে উৎসারিত সমগ্রচেতনাকে কীভাবে কবিতায়

মতো পরিমিত ভাষায় চিরকালের ক্লান্ত জনসাধারণের হাজার বছরের বঞ্চনার ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি আবিষ্কার করেছেন, কতিপয় সুবিধাবাদী মানুষ বৃহত্তরের 'ঘিঞ্জি ভাঁড়ার' তুলে দিচ্ছে মুষ্টিমেয়র হাতে। ভাবনার এই সার্বভৌমত্বে তিনি জমিদার বংশোদ্ভূত রবীন্দ্রনাথ থেকে তো বটেই, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের চেয়েও অনেক বেশি দূরগামী। কারণ তিনি এও জানেন, নিরাশার মাঠে মুনি-ঋষিরা যত আশার বীজই বুনুক না কেন, ভাঁড়ারের সঙ্গে-সঙ্গে ফুরিয়ে আসছে পৃথিবীর আয়ুও। তাই আশা নয়, জীবনানন্দের কবিতা শেষ পর্যন্ত সেই নিরাশার কথাই শোনায়, যে নিরাশা বৃহত্তর মানুষের নিকটাত্মীয়। ফলে ইংরেজ-আশ্রিত রবীন্দ্রনাথ নন, পশ্চিমা চিন্তাশ্রয়ী অন্য কোনও কবিও নন, জীবনানন্দই হয়ে ওঠেন তার কালের মহত্তম কবি। এবং তার কবিতা হয়ে ওঠে আমাদের সামষ্টিক উচ্চারণ—

০১.

আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিডলম্যানদের কাছে পর নয়;
তাহারা চিনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,
আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,
আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,
আমাদের গড়পরতা সব পড়তি কৌতুক

---

ভাবলোকে বিজ্ঞানের গূঢ় অবলোকনের বিষয় করে তোলা যায়— জীবনানন্দের কবিতায় তা এখন নিত্য নতুন অনুসন্ধানের বিষয়।

[*সম্পাদকীয়/মৃতপত্রে নীলোচ্ছ্বাস : জীবনানন্দ দাশ*]

**ফয়জুল লতিফ চৌধুরী**

একটি নতুন পথের সন্ধান পেতে আগ্রহী উত্তর-আধুনিকদের পশ্চিমের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি-না তা ভেবে দেখবার বিষয়। তারা বরং জীবনানন্দের কাছে ফিরে যেতে পারে, কেননা আমরা লক্ষ করেছি যে জীবনানন্দ দাশ বহু আগেই আধুনিকতা থেকে দূরে সরে গিয়ে উত্তর-আধুনিক দিকদর্শনের অভ্রান্ত অভিজ্ঞান রেখে গেছেন। তবে বিশ শতকের শুরুতে যেভাবে বাংলাসাহিত্যে পশ্চিমোত্থিত আধুনিকতা প্রবেশ করেছিল, বা যেভাবে শতাব্দীশেষে পশ্চিমাগত উত্তর-আধুনিকতা বাংলা কবিতায় পথ খুঁজে নিতে নিতে চাইছে সেভাবে জীবনানন্দে উত্তর-আধুনিকতার উন্মেষ ঘটেনি। তাঁর চেতনায় উত্তর-আধুনিকতা প্রবেশ করেছে আধুনিকতার ভিত্তির ওপর, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। জীবনানন্দ উত্তর-আধুনিকতাবাদী ছিলেন না, তাঁর উত্তর-আধুনিক চেতনা ও করণকৌশল স্বজ্ঞাপ্রসূত, স্বোপার্জিত, ঐতিহ্যাশ্রয়ী। তাই উত্তর-আধুনিকতার সন্ধানে পশ্চিমের দ্বারস্থ না-হয়ে জীবনানন্দের কাব্যবিচারই হবে শ্রেয়তর পন্থা।

[*জীবনানন্দ, উত্তর-আধুনিকতা'র দিকে/দ্বিতীয় চিন্তা* জীবনানন্দ জন্মশতবার্ষিক স্মারক সংখ্যা, ১৯৯৯]

তাহারা বেহাত ক'রে ফেলে সব।
[সোনালি সিংহের গল্প/সাতটি তারার তিমির]

০২.

বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো– আরো ঢের বার্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধ'রে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোন্ দিকে ?
জানু ভেঙে প'ড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল
হ'য়ে চায়– কিছু খোঁজে;
এ-ছাড়া আকাশ নেই আর।
[এইসব দিনরাত্রি/শ্রেষ্ঠ কবিতা]

জলের মতো ঘুরে-ঘুরে জীবনানন্দ যে একাকী ছবি এঁকেছেন, বলেছেন যে একাকী কথা, আজ তারই প্রতিধ্বনি ওঠে আমাদের সামষ্টিক প্রাণে। একাকী এই ঘূর্ণির মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে জীবনানন্দ শুধু রবীন্দ্রনাথ থেকেই নন, চর্যার দোহা, বৈষ্ণব পদাবলিসহ বাংলা কবিতার তাবৎ অতীত থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। শুধু আলোর পৃথিবীতে তার মন ভরেনি। গলিত জীবন আর মৃত্যুর অন্ধকারও তিনি হাতড়ে বেড়িয়েছেন ভূতগ্রস্তের মতো। মঞ্জায়িত করেছেন সেই সব পূর্ণসত্তাকেও, যাদের আড়াল করে রাখাই ছিল প্রচল বাংলা সাহিত্যের রীতি। জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটিকে নিয়ে যে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল, তার অন্যতম কারণ–

---

আমিনুর রহমান সুলতান

সম্প্রতি পোস্টমডার্ন বা উত্তর-আধুনিক চিন্তাবিদরা 'অন্ত্যজ' ও 'প্রান্তিক'-এর কথা বলছেন। কোনো তত্ত্বের প্রণোদনায় নয়, জীবনানন্দের কবিতায় এই 'অন্ত্যজ' ও 'প্রান্তিক'-এর ভাবনা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিধৃত হয়েছে। এই কাব্যলক্ষণ তাঁর সমকালীন অন্য কোনও কবির কবিতায় মূর্ত নয়। জসীমউদ্‌দীন ব্যতিক্রম। তবে জসীমউদ্‌দীনের প্রান্তিকতা কেবল প্রান্তিক-পাঠকেরই উপযোগী। লোক-ঐতিহ্যের চাহিদাকে কবিতায় সর্বাধিক ধারণ ক'রে তিনি পাঠকনন্দিত বটে, কিন্তু বাংলা কবিতায় তা কোনও নতুন বাঁকের ইঙ্গিত বহন করে না। বিপরীতে, জীবনানন্দ দাশ আধুনিক মানুষের রুচি-উপযোগী কাব্যভাষায় প্রান্তের বার্তাকে কেন্দ্রে পৌঁছে দেন।
[প্রান্তিকের কথা ও জীবনানন্দ দাশ/অনিরুদ্ধ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ২০০৩]

পলাশ দত্ত

প্রথাসিদ্ধ প্রতীকী শব্দ ব্যবহার না-করবার কারণে- যা ছিলো বোদলেয়রের কবিতা থেকে শুরু-হ'তে-থাকা সিমবলিজমের স্বতঃসিদ্ধ রীতি- নতুন একটি কবিতাধারা তৈরি হ'য়ে গিয়েছিলো ফরাসী কবিতায়। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু যখন সেই ফরাসী কবিতা থেকে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসছেন বোদলেয়রকে, যিনি কিনা মধুসূদনের সমসাময়িক, তখন কী করছেন জীবনানন্দ? তিনি প্রতীকবাদিতায় থাকলেও, তাঁর কাছ থেকে কবিতায়

আমাদের ভব্য কান যা শোনেনি আগে, জীবনানন্দ সেই অকথিত বাণীও বয়ে এনেছেন তার কবিতায়। যে মাঠে কেউ হাঁটেনি আগে, বাঁক নিয়েছেন তিনি সেই নতুন মাঠের সন্ধানে। এবং নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছেন এক অপ্রচল মাঠের একাকী সম্রাটের আসনে–

কেউ যাহা জানে নাই– কোনো এক বাণী–
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছো যে-সুর–
ফুরায়েছে,– পুরানো তা– কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,– আমার মতন
আর নাই কেউ!
[কয়েকটি লাইন/ *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

রবীন্দ্রনাথে যেমন থেমে থাকেনি বাংলা কবিতা, ফুরিয়ে যায়নি তা জীবনানন্দেও। মাঠের পরও মাঠ আছে। কবিতার যিনি নিবিড় পাঠক, খুঁজে নেবেন সেই সব নতুন মাঠের দ্রষ্টাদেরও– কবিতার প্রত্যাশা সেরকমই। নইলে নতুন কোনও অবহেলা জমা হতে পারে নতুন কোনও জীবনানন্দের জন্য।

---

*'অতিবতিময়তার স্পেস'-এর যে-নতুন ধারণাটি পাওয়া গেলো সেই স্পেসটুকুতে তিনি রেখে গেলেন অপরিমেয় অদেখার খোঁজ, অনির্দিষ্টতার মোড়; এ-কারণেই যতি টানতে গিয়ে তিনি কবিতার একই পঙ্‌ক্তিতে কমা ও সেমিকোলন ব্যবহার করেন একই সাথে, এবং কখনও-কখনও এরপরও ব্যবহার করেন ড্যাশ; কৌতূহলোদ্দীপকভাবে আজকের উত্তর আধুনিকতাও ভাবছে কবিতায় কথা-বলবার সেই অনির্দিষ্টতাতেই রয়েছে কবিতার মুক্তি। আবার এমনও হ'তে পারে যে, জীবনানন্দ যে-ধীরতায়, যে-শ্লথতায় এবং যে-স্পষ্টতায় তার কবিতার ছবিকে দৃশ্যমান ক'রে তুলেতে চেয়েছেন, সেজন্যে স্পেসের ওই বিপুল-যতিময় ব্যবহারের কিংবা বিপুল-যতিময়স্পেস ব্যবহারের কোনও বিকল্প তাঁর কাছে ছিলো না।*

[*কবিতার কুশলতা/অমিতাক্ষর, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৩*]

---

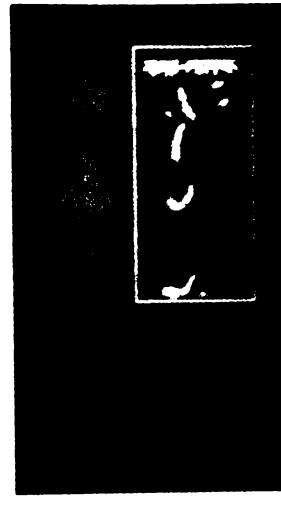

প্রথম প্রকাশ
১৩৩৪ বাংলা, ১৯২৭ ইংরেজি

আমি কবি,– সেই কবি– ৭১ নীলিমা ৭১ নব নবীনের সাথী ৭২ বিশ্বেরে প্রতি ৭৩ মরীচিকার পিছে– ৭৫ জীবন-মরণ দুয়ারে আমার ৭৬ বেদনা ৭৯ নাবিক ৮০ মনের চাতক– মনের চাতক ৮২ সাগর-কাজল ৮২ চলতি উপায় ৮৩ একদিন ঘুমোইনু যবে– ৮৬ আলেয়া ৮৭ অস্তচাঁদে ৮৯ ছায়া-নিয়া ৯১ ডাকিনী কহিলে মোরে আমার সুজন ৯৩ কবি ৯৪ সিন্ধু ৯৫ দেশবন্ধু ৯৭ বিবেকানন্দ ৯৮ হিন্দু-মুসলমান ১০০ নিখিল আমার ভাই ১০২ পতিতা ১০৩ ডাহুকী ১০৩ শ্মশান ১০৪ নিশা ১০৬ নিরাশিত ১০৭ মানসচারু ১০৯ চাঁদনীতে ১১১ দক্ষিণা ১১২ যে কামনা নিয়ে ১১৩ স্মৃতি ১১৪ সেদিন এ-ধরণীর ১১৫ ওগো দরদিয়া ১১৭ সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরি কথা হয় ১১৮

## আমি কবি,– সেই কবি–

আমি কবি,– সেই কবি,–
আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি !
আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে !
মৌন নীলের ইশারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে !
বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে !
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি !

স্বপন-সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা ক'রে !
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হ'লো না আমার সাধা,–
পায়-পায় নাচে জিঞ্জির হায়,– পথে-পথে ধায় ধাঁধা
– নিমেষে পাসরি এই বসুধার নিয়তি-মানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভ'রে !

ভুঁয়ের চাঁপাটি চুমি
শিশুর মতন,– শিরীষের বুকে নীরবে পড়ি গো নুমি !
ঝাউয়ের কাননে মিঠা মাঠে-মাঠে মটর-ক্ষেতের শেষে
তোতার মতন চকিতে কখন আমি আসিয়াছি ভেসে !
– ভাটিয়াল সুর সাঁঝের আঁধারে দরিয়ার পারে মেশে,
বালুর ফরাশে ঢালু নদীটির জলে ধোঁয়া ওঠে ধূমি !

বিজন তারার সাঁঝে
আমার প্রিয়ার গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে !
প'ড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখির নষ্ট নীড় !
হেথায় বেদনা মা-হারা শিশুর, শুধু বিধবার ভিড় !
কোন্ যেন এক সুদূর আকাশ গোধূলিলোকের তীর
কাজের বেলায় ডাকিছে আমারে, ডাকে অকাজের মাঝে !

## নীলিমা

রৌদ্র-ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্যনিশিথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দ্যাখা তুমি দাও বারে-বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।
উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লীবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,

আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা।
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার, পায় নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল;
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙেছো মায়াবী !
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী;
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা !
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধিরলিপিকা,
জ্ব'লে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা !
বসুধার অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি– ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়– স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক !

## নব নবীনের লাগি

– নব নবীনের লাগি
প্রদীপ ধরিয়া আঁধারের বুকে আমরা রয়েছি জাগি !
ব্যর্থ পঙ্গু খর্ব প্রাণের বিকল শাসন ভেঙে,
নব আকাঙ্ক্ষা আশার স্বপনে হৃদয় মোদের রেঙে,
দেবতার দ্বারে নবীন বিধান– নতুন ভিক্ষা মেগে
দাঁড়ায়েছি মোরা তরুণ প্রাণের অরুণের অনুরাগী !

ঝড়ের বাতাস চাই !
– চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলি, শ্মশানপথের ছাই,
ছড়ায়ে রয়েছে পাহাড়প্রমাণ মৃতের অস্থি খুলি,
কে সাজাবে ঘর-দেউলের 'পর কঙ্কাল তুলি-তুলি ?
সূর্যচন্দ্র নিভায়ে কে নেবে জরার চোখের ঠুলি !

– মরার ধরায় জ্যান্ত কখনো মাগিতে যাবে কি ঠাঁই !

– ঘুমায়ে কে আছে ঘরে !
মৃতশিশু-বুকে কল্যাণী পুরকামিনী কি আজ মরে !
কে আছে বসিয়া হতাশ উদাস অলস অন্যমনা ?
দোদুল আকাশে দুলিয়া উঠিছে রাঙা অশনির ফণা,
বাজে বাদলের রঙ্গমল্লী, ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা !
ফিরিছে বালক ঘর-পলাতক ঝরা পালকের ঝড়ে !

আমরা অশ্বারোহী !–
যাযাবর যুবা, বন্দিনীদের ব্যথা মোরা বুকে বহি,
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি,
মোদের প্রাণের পূজার দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি,
চুয়া-চন্দন-গন্ধ বিলায়ে আমরা ঝরিয়া পড়ি,
সুবাস ছড়াই উশীরের মতো,– ধূপের মতন দহি !

গাহি মানবের জয় !
– কোটি-কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয় !
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি বুকে কোটি দেউটি জ্বলিছে,– কোটি-কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানবদেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমার তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয় !
– জয় মানবের জয় !

## কিশোরের প্রতি

যৌবনের সুরাপাত্র গরল-মদির
ঢালোনি অধরে তব, ধরা-মোহিনীর
ঊর্ধ্বফণা মায়া-ভুজঙ্গিনী
আসেনি তোমার কাম্য উরসের পথটুকু চিনি,
চুমিয়া-চুমিয়া তব হৃদয়ের মধু
বিষবহ্নি ঢালেনিকো বাসনার বধূ
অন্তরের পানপাত্রে তব;
অম্লান আনন্দ তব, আপ্লুত উৎসব,
অশ্রুহীন হাসি,
কামনার পিছে ঘুরে সাজোনি উদাসী।
ধবল কাশের দলে, আশ্বিনের গগনের তলে
তোর তরে রে কিশোর, মৃগতৃষ্ণা কভু নাহি জ্বলে !

নয়নে ফোটে না তব মিথ্যা মরূদ্যান।
অপরূপ রূপ-পরীস্থান
দিগন্তের আগে
তোমার নির্মেঘ চক্ষে কভু নাহি জাগে !
আকাশকুসুমবীথি দিয়া
মাল্য তুমি আনো না রচিয়া,
উধাও হও না তুমি আলেয়ার পিছে
ছলাময় গগনের নিচে !
– রূপ-পিপাসায় জ্বলি মৃত্যুর পাথারে
স্পন্দহীন প্রেতপুরদ্বারে
করোনিকো করাঘাত তুমি
সুধার সন্ধানে লক্ষ বিষপাত্র চুমি
সাজোনিকো নীলকণ্ঠ ব্যাকুল বাউল !
অধরে নাহিকো তৃষ্ণা, চক্ষে নাহি ভুল,
রক্তে তব অলক্ত যে পরে নাই আজো রানী,
রুধির নিঙাড়ি তব আজো দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন !
কারাগার নাহি তব, নাহিকো বন্ধন;
দীঘল পতাকা, বর্শাতন্দ্রাহারা প্রহরীর লওনি তুলিয়া,
– সুকুমার কিশোরের হিয়া !
– জীবন-সৈকতে তব দুলে যায় লীলায়িত লঘুনৃত্য নদী,
বক্ষে তব নাচেনিকো যৌবনের দুরন্ত জলধি;
শূল-তোলা শম্ভুর মতন
আস্ফালিয়া ওঠে নাই মন
মিথ্যা বাধা-বিধানের ধ্বংসের উল্লাসে !
তোমার আকাশে
দ্বাদশ সূর্যের বহ্নি ওঠেনিকো জ্বলি
কক্ষচ্যুত উল্কাসম পড়েনিকো স্খলি,
কুজ্ঝটিকা-আবর্তের মাঝে
অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গের সাজে !
সব বিঘ্ন সকল আগল
ভাঙিয়া জাগোনি তুমি স্পন্দন-পাগল
অনাগত স্বপ্নের সন্ধানে
দুরন্ত দুরাশা তুমি জাগাওনি প্রাণে !
নিঃস্ব দুটি অঞ্জলির আকিঞ্চন মাগী
সাজোনিকো দিক্‌ভোলা দিওয়ানা বৈরাগী !
পথে-পথে ভিক্ষা মেগে কাম্য কল্পতরু
বাজাওনি শ্মশান-ডমরু !
জ্যোৎস্নাময়ী নিশি তব, জীবনের অমানিশা ঘোর
চক্ষে তব জাগেনি কিশোর !

আঁধারের নির্বিকল্প রূপ,
স্পন্দহীন বেদনার কূপ
রুদ্ধ তব বুকে;
তোমার সম্মুখে
ধরিত্রী জাগিছে ফুল্ল সুন্দরীর বেশে;
নিত্য বেলাশেষে
যেই পুষ্প ঝরে
যে-বিরহ জাগে চরাচরে
গোধূলির অবসানে শ্লোক-ম্লান সাঁঝে,
তাহার বেদনা তব বক্ষে নাহি বাজে;
আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া জ্বালো নাই চিতা,
ব্যথার সংহিতা
গাহো নাই তুমি !
দরিয়ার তীর ছাড়ি দেখ নাই দাব-মরুভূমি
জ্বলন্ত নিষ্ঠুর !
নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে যেই মৃত্যুপ্রেতপুর,
ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি
ছন্দ তার মর্মে তব ওঠে না প্রকাশি !
সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী
মলিন করেনি তব মানসের ছবি,
ফেনিল করেনি তব নভোনীল, প্রভাতের আলো,
এ উদভ্রান্ত যুবকের বক্ষে তার রশ্মি আজো ঢালো, বন্ধু, ঢালো !

মরীচিকার পিছে—

ধূম্র তপ্ত আঁধির কুয়াশা তরবারি দিয়ে চিরে
সুন্দর দূর মরীচিকাতটে ছলনামায়ার তীরে
ছুটে যায় দুটি আঁখি।
— কতো দূর হায় বাকি !
উধাও অশ্ব বল্গাবিহীন অগাধ মরুভূ ঘিরে,
পথে-পথে তার বাধা জ'মে যায়,— তবু সে আসে না ফিরে !

দূরে,— দূরে,— আরো দূরে,— আরো দূরে,
অসীম মরুর পারাবার-পারে আকাশ-সীমানা জুড়ে
ভাসিয়াছে মরুতৃষা !
— হিয়া হারায়েছে দিশা !
কে যেন ডাকিছে আকুল অলস উদাস বাঁশির সুরে
কোন্ দিগন্তে নির্জন কোন্ মৌন মায়াবী-পুরে !

কোন্ এক সুনীল দরিয়া সেথায় উথলিছে অনিবার !
– কান পেতে একা শুনেছে সে তার অপরূপ ঝঙ্কার,
ছোটে অঞ্জলী পেতে,
তৃষার নেশায় মেতে,
ঊষর ধূসর মরুর মাঝারে এমন খেয়াল কার !
খুলিয়া দিয়াছে মাতাল ঝর্ণা না জানি কে দিলদার !

কে যেন রেখেছে সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা পাতি !
যতো খুন যতো খারাবির ঘোরে পরান আছিলো মাতি,
নিমেষে গিয়েছে ভেঙে
স্বপন-আবেশে রেঙে
আঁখি-দুটি তার জৌলস্-রাঙা হ'য়ে গেছে রাতারাতি
কোন্ যেন এক জিন্-সর্দার সেজেছে তাহার সাথী !

কোন্ যেন পরী চেয়ে আছে দুটি চঞ্চল চোখ তুলে !
পাগলা হাওয়ায় অনিবার তার ওড়না যেতেছে দুলে !
গেঁথে গোলাপের মালা
তাকায়ে রয়েছে বালা,
বিলায়ে দিয়েছে রাঙা নার্গিস কালো পশমিনা চুলে।
বসেছে বালিকা খর্জুরছায়ে নীল দরিয়ার কূলে।

ছুটিছে ক্লিষ্ট ক্লান্ত অশ্ব কশাঘাত-জর্জর,
চারিদিকে তার বালুর পাথার,– মরুর হাওয়ার ঝড়;
নাহি ভ্রান্তির লেশ,
সুদূর নিরুদ্দেশ–
অসীম কুহক পাতিয়া রেখেছে তাহার বুকের 'পর !
পথের তালাসে পাগল সোয়ার হারায়ে ফেলেছে ঘর !

আঁখির পলকে পাহাড়ের পারে কোথা সে ছুটিয়া যায় !
চকিত আকাশ পায় না তাহার নাগাল খুঁজিয়া হায় !
ঝড়ের বাতাস মিছে
ছুটিছে তাহার পিছে !
মরুভূর প্রেত চমকিয়া তার চক্ষের পানে চায়,–
সুরার তালাসে চুমুক দিলো কে গরলের পেয়ালায় !

## জীবন-মরণ দুয়ারে আমার

সরাইখানার গোলমাল আসে কানে,
ঘরের শার্সি বাজে তাহাদের গানে,

পর্দা যে উড়ে যায়
তাদের হাসির ঝড়ের আঘাতে হায় !
– মদের পাত্র গিয়েছে কবে যে ভেঙে !
আজো মন ওঠে রেঙে
দিলদারদের দরাজ গলার রবে,
সরায়ের উৎসবে !
কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হায়
পেয়ালা তাদের থেকে-থেকে বেজে যায়
বেহুঁশ হাওয়ার বুকে !
সারা জনমের শুষে-নেওয়া খুন নেচে ওঠে মোর মুখে !
পাণ্ডুর দুটি ঠোঁটে
ডালিম ফুলের রক্তিম আভা চকিতে আবার ফোটে !
মনের ফলকে জ্বলিছে তাদের হাসিভরা লাল গাল,
ভুলে গেছে তারা এই জীবনের যতো কিছু জঞ্জাল !
আখেরের ভয় ভুলে
দিলওয়ার প্রাণ খুলে
জীবন-রবাবে টানিছে ক্ষিপ্ত ছড়ি !
অদূরে আকাশে মধুমালতীর পাপড়ি পড়িছে ঝরি,–
নিভিছে দিনের আলো;
– জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিবো ভালো
একা-একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন !
পূর্ণ হয়নি পিপাসী প্রাণের একটি আকিঞ্চন,
খুলিনি একটি দল,–
যৌবন শতদলে মোর হায় ফোট নাই পরিমল !
উৎসব-লোভী অলি
আসেনি হেথায়,–
কীটের আঘাতে শুকায়ে গিয়েছে কবে কামনার কলি !
– সারাটি জীবন বাতায়নখানি খুলে
তাকায়ে দেখেছি নগরী-মরুতে ক্যারাভেন যায় দুলে
আশা-নিরাশার বালু-পারাবার বেয়ে,
সুদূর মরূদ্যানের পানেতে চেয়ে !
সুখ-দুঃখের দোদুল ঢেউয়ের তালে
নেচেছে তাহারা,– মায়াবীর জাদুজালে
মাতিয়া গিয়েছে খেয়ালী মেজাজ খুলি,
মৃগতৃষ্ণার মদের নেশায় ভুলি !
মস্তানা সেজে ভেঙে গেছে দরদোর,
লোহার শিকের আড়ালে জীবন লুটায়ে কেঁদেছে মোর !
কারার ধুলায় লুণ্ঠিত হ'য়ে বান্দার মতো হায়
কেঁদেছে বুকের বেদুইন মোর দুরাশার পিপাসায় !

জীবনপথের তাতার দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলি উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি
মোর গবাক্ষে কবে !
কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্তব্ধ নভে !
আতুর নিদ্রা চকিতে গিয়েছে ভেঙে,
সারাটি নিশীথ খুন-রোশনাই প্রদীপে মনটি রেঙে
একাকী রয়েছি বসি,
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাইনি যে তাহা টের !
– দূর দিগন্তে চ'লে গেছে কোথা খুশরোজী মুসাফের !
কোন্ সুদূরের তুরাণী-প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে !
দীর্ঘ দিবস ব'য়ে গেছে যারা হাসি-অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের 'রোজা';
আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয়নি যে হায় দ্যাখা,
পরানে কখনো জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা !
কি যে মিঠা এই সুখের-দুঃখের ফেনিল জীবনখানা !
এই যে-নিষেধ, এই যে-বিধান,– আইন-কানুন, এই যে শাসন মানা,
ঘরদোর-ভাঙা তুমুল প্রলয়ধ্বনি
নিত্য গগনে এই যে উঠিছে রণি
যুবানবীনের নটনর্তন তালে,
ভাঙনের গান এই যে বাজিছে দেশে-দেশে কালে-কালে,
এই-যে তৃষ্ণা-দৈন্য-দুরাশা-জয়-সংগ্রাম-ভুল
সফেন সুরার ঝাঁঝের মতন ক'রে দেয় মজ্‌গুল
দিওয়ানা প্রাণের নেশা !
ভগবান,– ভগবান,– তুমি যুগ-যুগ থেকে ধরেছো শুঁড়ির পেশা !
– লাখো জীবনের শূন্য পেয়ালা ভরি দিয়া বার-বার
জীবন-পান্থশালার দেয়ালে তুলিতেছে ঝঙ্কার,–
মাতালের চিৎকার !
অনাদি কালের থেকে;
মরণশিয়রে মাথা পেতে তার দস্তুর যাই দেখে !
হেরিলাম দূরে বালুকার পরে রুপার তাবিজ-প্রায়
জীবনের নদী কলরোলে ব'য়ে যায় !
কোটি শুঁড় দিয়ে দুঃখের মরুভূ নিতেছে তাহারে শুষে,
ছলা-মরীচিকা জ্বলিতেছে তার প্রাণের খেয়াল-খুশে !
মরণ-সাহারা আসি
নিতে চায় তারে গ্রাসি !–
তবু সে হয় না হারা
ব্যথার রুধিরধারা

জীবন-মদের পাত্র জুড়িয়া তার
যুগ-যুগ ধরি অপরূপ সুরা গড়িছে মশলাদার !

## বেদিয়া

চুলিচালা সব ফেলেছে সে ভেঙে, পিঞ্জরহারা পাখি !
পিছু-ডাকে কভু আসে না ফিরিয়া কে তারে আনিবে ডাকি ?
উদাস উধাও হাওয়ার মতন চকিতে যায় সে উড়ে,
গলাটি তাহার সেধেছে অবাধ নদী-ঝর্ণার সুরে;
নয় সে বান্দা রংমহলের, মোতিমহলের বাঁদী,
ঝোড়ো হাওয়া সে যে, গৃহ-প্রাঙ্গণে কে তারে রাখিবে বাঁধি !
কোন্ সুদূরের বেনামী পথের নিশানা নেছে সে চিনে,
ব্যর্থ ব্যথিত প্রান্তর তার মরণ-চিহ্ন বিনে !
যুগযুগান্ত কতো কান্তার তার পানে আছে চেয়ে,
কবে সে আসিবে উসর ধূসর বালুকা-পথটি বেয়ে
তারি প্রতীক্ষা মেগে ব'সে আছে ব্যাকুল বিজন মরু !
দিকে-দিকে কতো নদী-নির্ঝর কত গিরি-চূড়া-তরু
ঐ বাঞ্ছিত বন্ধুর তরে আসন রেখেছে পেতে
কালো-মৃত্তিকা ঝরা-কুসুমের বন্দনা-মালা গেঁথে
ছড়ায়ে পড়িছে দিকদিগন্তে ক্ষ্যাপা পথিকের লাগি !
বাবলা বনের মৃদুল গন্ধে বন্ধুর দ্যাখা মাগি
লুটায়ে রয়েছে কোথা সীমান্তে শরৎ উষার শ্বাস !
ঘুঘু-হরিয়াল-ডাহুক-শালিক-গাঙচিল-বুনোহাঁস
নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিরে-ফিরে
বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে !
তারি লাগি ভায় ইন্দ্রধনুক নিবিড় মেঘের কূলে,
তারি লাগি আসে জোনাকি নামিয়া গিরিকন্দরমূলে।
ঝিনুক-নুড়ির অঞ্জলি ল'য়ে কলরব করে ছুটে
নাচিয়া আসিছে অগাধ সিন্ধু তারি দুটি করপুটে।
তারি লাগি কোথা বালুপথে দ্যাখা দেয় হীরকের কোণা,
তাহারি লাগিয়া উজানী নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে সোনা !
চকিতে পরশপাথর কুড়ায়ে বালকের মতো হেসে
ছুঁড়ে ফেলে দেয় উদাসী বেদিয়া কোন্ সে নিরুদ্দেশে !
যত্ন করিয়া পালক কুড়ায়, কানে গোঁজে বনফুল,
চাহে না রতন-মণিমঞ্জুষা হীরে-মানিকের দুল্,
– তার চেয়ে ভালো অমল উষার কনক-রোদের সিঁথি,
তার চেয়ে ভালো আলো-ঝলমল শীতল শিশির-বীথি,
তার চেয়ে ভালো সুদূর গিরির গোধূলি-রঙিন জটা,

তার চেয়ে ভালো বেদিয়া বালার ক্ষিপ্র হাসির ছটা !
কি ভাষা বলে সে, কি বাণী জানায়, কিসের বারতা বহে !
মনে হয় যেন তারি তরে তবু দুটি কান পেতে রহে
আকাশ-বাতাস-আলোক-আঁধার মৌন স্বপ্নভরে,
মনে হয় যেন নিখিল বিশ্ব কোল পেতে তার তরে !

## নাবিক

কবে তব হৃদয় নদী
বরি নিলো অসম্বৃত সুনীল জলধি !
সাগর-শকুন্ত-সম উল্লাসের রবে
দূর সিন্ধু-ঝটিকার নভে
বাজিয়া উঠিল তব দুরন্ত যৌবন !
– পৃথ্বীর বেলায় বসি কেঁদে মরে আমাদের শৃঙ্খলিত মন !
কারাগার-মর্মরের তলে
নিরাশ্রয় বন্দীদের খেদ-কোলাহলে
ভ'রে যায় বসুধার আহত আকাশ !
অবনত শিরে মোরা ফিরিতেছি ঘৃণ্য বিধিবিধানের দাস !
– সহস্রের অঙ্গুলিতর্জন
নিত্য সহিতেছি মোরা,– বারিধির বিপ্লব-গর্জন
বরিয়া লয়েছো তুমি,– তারে তুমি বাসিয়াছো ভালো;
তোমার পঞ্জরতলে টগ্‌বগ্‌ করে খুন– দুরন্ত, ঝাঁঝালো !–
তাই তুমি পদাঘাতে ভেঙে গেলে অচেতন বসুধার দ্বার,
অবগুণ্ঠিতার
হিমকৃষ্ণ অঙ্গুলির কঙ্কাল-পরশ
পরিহরি গেলে তুমি,– মৃত্তিকার মদ্যহীন রস
তুহিন নির্বিষ নিঃস্ব পানপাত্রখানা
চকিতে চূর্ণিয়া গেলে,– সীমাহারা আকাশের নীল শামিয়ানা
বাড়ব-আরক্ত স্ফীত বারিধির তট,
তরঙ্গের তুঙ্গ গিরি, দুর্গম সঙ্কট
তোমারে ডাকিয়া নিলো মায়াবীর রাঙা মুখ তুলি !
নিমেষে ফেলিয়া গেলে ধরণীর শূন্য ভিক্ষাঝুলি !
প্রিয়ার পাণ্ডুর আঁখি অশ্রু-কুহেলিকা-মাখা গেলে তুমি ভুলি !
ভুলে গেলে ভীরু হৃদয়ের ভিক্ষা, আতুরের লজ্জা অবসাদ,–
অগাধের সাধ
তোমারে সাজায়ে দেছে ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা সিন্দবাদ !
মণিময় তোরণের তীরে
মৃত্তিকার প্রমোদ-মন্দিরে

নৃত্য-গীত-হাসি-অশ্রু-উৎসবের ফাঁদে !
হে দুরন্ত দুর্নিবার,– প্রাণ তব কাঁদে !
ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের !
টাইফুন্-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছো অতীত-আখের
হে জলধি-পাখি !
পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী-বৈশাখী !
ললাটে জ্বলিছে তব উদয়াস্ত আকাশের রত্নচূড় ময়ূখের টিপ,
কোন্ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে !
বিচিত্র বিহঙ্গ কোন্ মণিময় তোরণের দ্বারে
সহর্ষ নয়ন মেলি হেরিয়াছো কবে !
কোথা দূর মায়াবনে পরীদল মেতেছে উৎসবে,–
স্তম্ভিত নয়নে
নীল বাতায়নে
তাকায়েছো তুমি !
অতিদূর আকাশের সন্ধ্যারাগ-প্রতিবিম্বে প্রস্ফুটিত সমুদ্রের
আচম্বিত ইন্দ্রজাল চুমি
সাজিয়াছো বিচিত্র মায়াবী !
সৃজনের জাদুঘর-রহস্যের চাবি
আনিয়াছো কবে উন্মোচিয়া
হে জল-বেদিয়া !
অলক্ষ্য বন্দর পানে ছুটিতেছো তুমি নিশিদিন
সিন্ধু বেদুইন !
নাহি গৃহ,– নাহি পান্থশালা–
লক্ষ-লক্ষ ঊর্মি-নাগবালা
তোমারে নিতেছে ডেকে রহস্য-পাতালে–
বারুণী যেথায় তার মণিদীপ জ্বালে !
প্রবাল-পালঙ্ক-পাশে মীননারী ঢুলায় চামর !
সেই দুরাশার মোহে ভুলে গেছো পিছু-ডাকা স্বর
ভুলেছো নোঙর !
কোন্ দূর কুহকের কূল
লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়-মাস্তুল
কে বা তাহা জানে !
অচিন আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে-কানে !

## বনের চাতক– মনের চাতক

বনের চাতক বাঁধলো বাসা মেঘের কিনারায়,–
মনের চাতক হারিয়ে গেলো দূরের দুরাশায় !
ফুঁপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার ক্ষোভে,–
সে কোন্ বোঁটের ফুলের ঠোঁটের মিঠা মদের লোভে
বনের চাতক– মনের চাতক কাঁদছে অবেলায় !

পুবের হাওয়ায় হাপর জ্বলে, আগুনদানা ফাটে !
কোন্ ডাকিনীর বুকের চিতায় পচিম আকাশ টাটে !
বাদর-বৌয়ের চুমার মৌয়ের সোয়াদ চেয়ে-চেয়ে
বনের চাতক– মনের চাতক চলছে আকাশ বেয়ে,
ঘাটের ভরা কলসি ও-কার কাঁদছে মাঠে-মাঠে !

ওরে চাতক,– বনের চাতক, আয় রে নেমে ধীরে
নিঝুম ছায়া-বৌরা যেথা ঘুমায় দীঘি ঘিরে,
'দে জল !' বলে ফোঁপাস কেন ? মাটির কোলে জল
খবর-খোঁজা সোজা চোখের সোহাগে ছল্‌ছল্ !
মজিস নে রে আকাশ-মরুর মরীচিকার তীরে !

বনের চাতক,– হতাশ উদাস পাখায় দিয়ে পাড়ি
কোথায় গেলি ঘরের কোণের কানাকানি ছাড়ি ?
ননীর কলস আছে রে তার কাঁচা বুকের কাছে,
আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে !
আয় রে ফিরে দানোয়-পাওয়া,– আয় রে তাড়াতাড়ি।

বনের চাতক,– মনের চাতক আসে না আর ফিরে,
কপোত-ব্যথা বাজায় মেঘের শকুনপাখা ঘিরে !
সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে !
চিনিমাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠোঁটের মাঝে
লুকিয়ে আছে সে-কোন্ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে !

## সাগর-বলাকা

ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁশ হাওয়া ঠেলে
পাতলা পাখা দিলি রে তোর দূর-দূরাশায় মেলে !
ফেনার বৌয়ের নোন্‌তা মৌয়ের– মদের গেলাস লুটে,
ভোর-সাগরের শরাবখানায়– মুসল্লাতে জুটে

হিমের ঘুণে বেড়াস খুনের আগুনদানা জ্বেলে !

ওরে কিশোর, অস্তরাগের মেঘের চুমায় রেঙে
নীল নহরের স্বপন দেখে চৈতি চাঁদে জেগে,
ছুটছো তুমি চ্ছলচ্ছল জলের কোলাহলের সাথে কই !
উছলে ওঠে বুকে তোমার আলতো ফেনা-সই !
ঢেউয়ের ছিটার মিঠা আঙুল যাচ্ছে ঠোঁটে লেগে !

রে মুসাফের,– পাতাল-প্রেতপুরের মরীচিকা
সাগর-জলের তলে বুঝি জ্বালিয়ে দেছে শিখা !
তাই কি গেলে ভেঙে হেথার বালিয়াড়ির বাড়ি !
দিচ্ছো যাযাবরের মতো সাগর-মরু পাড়ি,–
ডাইনে তোমার ডাইনীমায়া,– পিছের আকাশ ফিকা !

বাসা তোমার সাত সাগরের ঘূর্ণি হাওয়ার বুকে !
ফুটছে ভাষা কেউটে-ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে !
প্রয়াণ তোমার প্রবালদ্বীপে, পলার মালা গলে
বরুণ-রানী ফিরছে যেথা,– মুক্তা-প্রদীপ জ্বলে !
যেথায় মৌন মীনকুমারীর শঙ্খ ওঠে ফুঁকে।

যেইখানে মূক মায়াবিনীর কাঁকন শুধু বাজে
সাঁজসকালে,– ঢেউয়ের তালে, মাঝসাগরের মাঝে !
যায় না জাহাজ যেথায়,– নাবিক পায় না নাগাল যার,
লঘু উদাস পাখায় ভেসে আঁখির তলে তার
ঘুরছে অবুঝ, সে কোন্ সবুজ স্বপন-খোঁজার কাজে !

ওরে কিশোর,– দূর-সোহাগী ঘর-বিরাগী সুখ !
– টুকটুকে কোন্ মেঘের পারে ফুট্‌ফুটে কার মুখ
ডাকছে তোদের ডাগর কাঁচা চোখের কাছে তার !
– শাদা শকুন-পাখায় যে তাই তুলছে হাহাকার
ফাঁপা ঢেউয়ের চাপা কাঁদন,– ফাঁপর-ফাটা বুক !

## চলছি উধাও

চলছি উধাও, বল্গাহারা,– ঝড়ের বেগে ছুটি !
শিকল কে সে বাঁধছে পায়ে !
কোন্ সে ডাকাত ধরছে চেপে টুঁটি !
– আঁধার আলোর সাগরশেষে
প্রেতের মতো আসছে ভেসে !

আমার দেহের ছায়ার মতো, জড়িয়ে আছে মনের সনে,
যেদিন আমি জেগেছিলাম,– সেও জেগেছে আমার মনে !
আমার মনের অন্ধকারে
ত্রিশূলমূলে,– দেউলদ্বারে
কাটিয়েছে সে দুরন্ত কাল ব্যর্থ-পূজার পুষ্প ঢেলে !
স্বপন তাহার সফল হবে আমায় পেলে,– আমায় পেলে !
রাত্রি-দিবার জোয়ারস্রোতে
নোঙর-ছেঁড়া হৃদয় হ'তে
জেগেছে সে হালের নাবিক,–
চোখের ধাঁধায়,– ঝড়ের ঝাঁঝে,–
মনের মাঝে,– মনের মাঝে !
আমার চুমোর অন্বেষণে
প্রিয়ার মতো আমার মনে
অন্ধহারা কাল ঘুরেছে কাতর দুটি নয়ন তুলে
চোখের পাতা ভিজিয়ে তাহার আমার অশ্রুপাথার-কূলে !
ভিজে মাঠের অন্ধকারে কেঁদেছে মোর সাথে
হাতটি রেখে হাতে !
দেখিনি তার মুখখানি তো,–
পাইনি তারে টের,
জানিনি হায় আমার বুকে আশেক,– অসীমের
জেগে আছে জনম-ভোরের সূতিকাগার থেকে !
কতো নতুন শরাবশালায় নাবনু একে-একে !
সরাইখানার দিলপিয়ালায় মাতি
কাটিয়ে দিলাম কতো খুশির রাতি !
জীবন-বীণার তারে-তারে আগুন-ছড়ি টানি
গুলজরিয়া এলো গেলো কতো গানের রানী,–
নাসপাতি-গাল গালে রাখি কানে-কানে করলে কানাকানি
শরাব-নেশায় রাঙিয়ে দিলো আঁখি !
– ফুলের ফাগে বেহুঁশ হোলি নাকি !
হঠাৎ কখন স্বপন-ফানুস কোথায় গেলো উড়ে !
– জীবন-মরু-মরীচিকার পিছে ঘুরে-ঘুরে
ঘায়েল হ'য়ে ফিরলো আমার বুকের ক্যারাভেন,–
আকাশ-চরা শ্যেন !
মরুঝড়ের হাহাকারে মৃগতৃষার লাগি
প্রাণ যে তাহার রইলো তবু জাগি
ইবলিশেরি সঙ্গে তাহার লড়াই হলো সুরু !
দরাজ বুকে দিল্ যে উড়ু-উড়ু !
– ধূসর ধু-ধু দিগন্তরে হারিয়ে-যাওয়া নার্গিসেরই শোভা
থরে-থরে উঠলো ফুটে রঙিন– মনোলোভা !

অলীক আশার,– দূর-দুরাশার দুয়ার ভাঙার তরে
যৌবন মোর উঠলো নেচে রক্তমুঠি,– ঝড়ের ঝুঁটির পরে !
পিছে ফেলে টিকে থাকার ফাটক-কারাগার,
ভেঙে শিকল,– ধ্বসিয়ে ফাঁড়ির দ্বার
চললো সে যে ছুটে !
শৃঙ্খল কে বাঁধলো তাহার পায়ে,–
চুলের ঝুঁটি ধরলো কে তার মুঠে !
বর্শা আমার উঠলো ক্ষেপে খুনে,
হুম্‌কি আমার উঠলো বুকে রুখে !
দুশমন কে পথের সুমুখে !
– কোথায় কে বা !
এ কোন্ মায়া !
মোহ এমন কার !
বুকে আমার বাঘের মতো গর্জালো হুঙ্কার !
মানের মাঝের পিছুডাকা উঠলো বুঝি হেঁকে,–
সে কোন্ সুদূর তারার আলোর থেকে
মাথার পরের খাঁ-খাঁ মেঘের পাথারপুরী ছেড়ে
নেমে এলো রাত্রিদিবার যাত্রাপথে কে রে !
কি তৃষা তার !...
কি নিবেদন !...
মাগছে কিসের ভিখ !...
উদ্যত পথিক
হঠাৎ কেন যাচ্ছে থেমে,–
আজকে হঠাৎ থামতে কেন হয় !
– এই বিজয়ী কার কাছে আজ মাগছে পরাজয় !
পথ-আলেয়ার খেয়ায় ধোঁয়ায় ধ্রুবতারার মতন কাহার আঁখি
আজকে নিলো ডাকি
হালভাঙা এই ভূতের জাহাজটারে !
মড়ার খুলি,– পাহাড়-প্রমাণ হাড়ে
বুকে তাহার জ'মে গেছে কত শ্মশান-বোঝা !
আক্রোশে হা ছুটছিলো সে একরোখা,– একসোজা
চুম্বকেরি ধ্বংস-গিরির পানে,
নোঙর-হারা মাস্তুলেরি টানে !
প্রেতের দলে ঘুরেছিলো প্রেমের আসন পাতি,–
জানে কি সে বুকের মাঝে আছে তাহার সাথী !
জানে কি সে ভোরের আকাশ,– লক্ষ তারার আলো
তাহার মনের দুয়ার-পথেই নিরিখ হারালো !
জানেনি সে তাহার ঠোঁটের একটি চুমোর তরে
কোন্ দিওয়ানার সারেং কাঁদে

নয়নে নীর ঝরে !
কপোত-ব্যথা ফাটে রে কার অপার গগন ভেদী !
তাহার বুকের সীমার মাঝেই কাঁদছে কয়েদী
কোন্ সে অসীম আসি !
লক্ষ সাকীর প্রিয় তাহার বুকের পাশাপাশি
প্রেমের খবর পুছে
কবের থেকে কাঁদতে আছে–
'পেয়ালা দে রে মুঝে !'

## একদিন খুঁজেছিনু যারে–

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
মালতীলতার বনে,– কদমের তলে,
নিঝুম ঘুমের ঘাটে,– কেয়াফুল,– শেফালির দলে !
– যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে-মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিম ঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝরো-ঝরো
কামিনীর ব্যথার শিয়রে,
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দয় মসুদ্ চীনা তাতারের দলে !
আর্ত কোলাহলে
তুলিয়াছি দিকে-দিকে বাধা বিঘ্ন ভয়,–
আজ মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনোদিন জ্বলে নাই শিখা !
– শুধু শেষ-নিশীথের ছায়া-কুহেলিকা,
শুধু মেরু-আকাশের নীহারিকা, তারা
দিয়ে যায় যেন সেই পলাতকা চকিতার সাড়া !
মাঠে ঘাটে কিশোরীর কাঁকনের রাগিণীতে তার সুর
শোনে নাই কেউ,
গাগরীর কোলে তার উথলিয়া ওঠে নাই আমাদের
গাঙিনীর ঢেউ !
নামে নাই সাবধানী পাড়াগাঁর বাঁকা পথে চুপে-চুপে
ঘোমটার ঘুমটুকু চুমি !
মনে হয় শুধু আমি,– আর শুধু তুমি
আর ওই আকাশের পউষ-নীরবতা
রাত্রির নির্জনযাত্রী তারকার কানে-কানে কতো কাল
কহিয়াছি আধো-আধো কথা।
– আজ বুঝি ভুলে গেছো প্রিয়া !
পাতাঝরা আঁধারের মুসাফের-হিয়া

একদিন ছিলো তব গোধূলির সহচর,– ভুলে গেছো তুমি !
এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনিবার চুমি
আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ,– শুধু অবসাদ !
মহুয়ার,– ধুতুরার স্বাদ
জীবনের পেয়ালায় ফোঁটা-ফোঁটা ধরি
দুরন্ত শোণিতে মোর বার-বার নিয়েছে যে ভরি !
মসজেদ-সরাই-শরাব
ফুরায় না তৃষা মোর,– জুড়ায় না কলেজার তাপ !
দিকে-দিকে ভাদরের ভিজা মাঠ,– আলেয়ার শিখা !
পদে-পদে নাচে ফণা,–
পথে-পথে কালো যবনিকা !
কাতর ক্রন্দন,–
কামনার কবর-বন্ধন !
কাফনের অভিযান,– অঙ্গার-সমাধি !
মৃত্যুর সুমেরু অন্ধকারে বার-বার উঠিতেছে কাঁদি !
মর্‌মর্‌ কেঁদে ওঠে ঝরাপাতাভরা ভোররাতের পবন,–
আধো আঁধারের দেশে
বার-বার আসে ভেসে
কার সুর!–
কোন্‌ সুদূরের তরে হৃদয়ের প্রেতপুরে ডাকিনীর মতো মোর
কেঁদে মরে মন!

## আলেয়া

প্রান্তরের পারে তব তিমিরের খেয়া
নীরবে যেতেছে দুলে নিদালি আলেয়া !
– হেথা, গৃহ-বাতায়নে নিভে গেছে প্রদীপের শিখা,
ঘোমটায় আঁখি ঘেরি রাত্রি-কুমারিকা
চুপে-চুপে চলিতেছে বনপথ ধরি !
আকাশের বুকে-বুকে কাহাদের মেঘের গাগরী
ডুবে যায় ধীরে-ধীরে আঁধার-সাগরে !
ঢুলু-ঢুলু তারকার নয়নের 'পরে
নিশি নেমে আসে গাঢ়,– স্বপন-সঙ্কুল !
শেহালায় ঢাকা শ্যাম বালুকার কূল
বনমরালীর সাথে ঘুমায়েছে কবে !
বেণুবনশাখে কোন্‌ পেচকের রবে
চমকিছে নিরালা যামিনী !
পাতাল-নিলয় ছাড়ি কে নাগ-কামিনী

আঁকাবাঁকা গিরিপথে চলিয়াছে চিত্রা অভিসারিকার প্রায় !
শ্মশান-শয্যায়
নেভ-নেভ কোন্ চিতা-স্ফুলিঙ্গেরে ঘিরে
ক্ষুধিত আঁধার আসি জমিতেছে ধীরে !
নিদ্রার দেউলমূলে চোখ দুটি মুদে
স্বপ্নের বুদ্‌বুদে
বিলসিছে যবে ক্লান্ত ঘুমন্তের দল–
হে অনল,– উন্মুখ, চঞ্চল
উন্নমিত আঁখিদুটি মেলি
সন্তরি চলিছো তুমি রাত্রির কুহেলি
কোন্ দূর কামনার পানে !
ঝলমল দিবা-অবসানে
বধির আঁধারে
কান্তারের দ্বারে
এ কি তব মৌন নিবেদন !
– দিকভ্রান্ত,– দরদী,– উন্মন !
পল্লীপসারিনী যবে পুণ্যরত্ন হেঁকে গেছে চ'লে
তোমার পিঙ্গল আঁখি ওঠেনি তো জ্ব'লে
আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম উল্লাসে !
– জনতায়,– নগরীর তোরণের পাশে,
অন্তঃপুরিকার বুকে,– মণিসৌধ-সোপানের তীরে,
মরকত-ইন্দ্রনীল-অয়স্কান্ত-খনির তিমিরে
যাওনি তো কভু তুমি পাথেয়-সন্ধানে !
ভাঙা-হাটে– ভিজা মাঠে– মরণের পানে
শীত প্রেতপুরে
একা-একা মরিতেছো ঘুরে
না জানি কি পিপাসার ক্ষোভে !
আমাদের ব্যর্থতায়,– আমাদের সকাতর কামনায় লোভে
মাগিতে আসোনি তুমি নিমেষের ঠাঁই !
– অন্ধকার জলাভূমি,– কঙ্কালের ছাই,
পল্লীকান্তারের ছায়া,– তেপান্তর পথের বিস্ময়
নিশীথের দীর্ঘশ্বাসময়
করিয়াছে বিমনা তোমারে !
রাত্রি-পারাবারে
ফিরিতেছো বারম্বার একাকী বিচরি !
হেমন্তের হিম পথ ধরি,
পউষ-আকাশতলে দহি-দহি-দহি
– ছুটিতেছো বিহ্বল বিরহী
কতো শত যুগজন্ম বহি !

কারে কবে বেসেছিলে ভালো
হে ফকির,– আলেয়ার আলো !
কোন্ দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া
চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া !
সে কোন্ রাত্রির হিমে হ'য়ে গেছে হারা !
নিয়েছে ভুলায়ে তারে মায়াবী ও নিশিমরু,–
আঁধার-সাহারা !
আজো তব লোহিত-কপোলে
চুম্বন-শোণিমা তার উঠিতছে জ্ব'লে
অনল-ব্যথায় !
– চ'লে যায়– মিলনের লগ্ন চ'লে যায় !
দিকে-দিকে ধূমবাহু যায় তব ছুটি
অন্ধকারে লুটি-লুটি-লুটি !
ছলাময় প্রেতবধূদের পিছে
ছুটিয়া চলিছে তব প্রেম-পিপাসার
অগ্নি-অভিসার !
বহ্নি-ফেনা নিঙারিয়া পাত্র ভরি-ভরি,
অনন্ত অঙ্গার দিয়া হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি গড়ি,
উষার বাতাস ভুলি,– পলাতকা রাত্রির পিছনে
যুগ-যুগ ছুটিতেছো কার অন্বেষণে !

## অস্তচাঁদে

ভালোবাসিয়াছিলাম আমি অস্তচাঁদ,– ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী !
– অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে যবে কালো নদী,– ঢেউয়ের কলসি,
নিঝঝুম বিছানার 'পরে
মেঘ-বৌ'র খোঁপাখসা জ্যোৎস্নাফুল চুপে-চুপে ঝরে,–
চেয়ে থাকি চোখ তুলে– যেন মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত-চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া !
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে-জন্মে ফিরে-ফিরে-ফিরে
মাঠে-ঘাটে একা-একা,– বুনোহাঁস– জোনাকির ভিড়ে !
দুশ্চর দেউলে কোন্– কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর– ব্যাবিলোন– মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিডতলে,– ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মতো নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে,
কোন্ মন-ভুলানিয়া পথচাওয়া দুলালীর সনে

আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না,– চোর-চোখে– অলস নয়নে !

আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
প্রাসাদ-অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে,–
হাতে তার হাত, পায়ে হাতিয়ার রাখি
কুমারীর পানে আমি তুলিয়াছি আনন্দের আরক্তিম আঁখি !
ভোরগেলাসের সুরা,– তহুরা, করেছি মোরা চুপে-চুপে পান,
চন্দ্রেরজুড়ির মতো কুহুরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান !
পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা !
নটীরা ঘুমায়েছিলো পুরে-পুরে, ঘুমে রাজবধূ,–
চুরি ক'রে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু !
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
কৃষ্ণাতিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
লভেছিনু উল্লাস,– উতরোল !– আজ পড়ে মনে
সাধ-বিষাদের খেদ কতো জন্মজন্মান্তের,– রাতের নির্জনে !

আমি ছিনু 'ক্রবেদুর' কোন্ দূর 'প্রভেনস্'-প্রান্তরে !
– দেউলিয়া পায়দল্,– অগোচর মনচোর-মানিনীর তরে
সারেঙের সুর মোর এমনি উদাস রাত্রে উঠিত ঝঙ্কারি !
আঙুরলতায় ঘেরা ঘুমঘোর ঘরখানা ছাড়ি
ঘুঘুর পাখনা মেলি মোর পানে আসিলো পিয়ারা;
মেঘের ময়ূরপাখে জেগেছিলো এলোমেলো তারা !
– 'অলিভ্' পাতার ফাঁকে চুনচোখে চেয়েছিলো চাঁদ,
ফিননিশার শেষে– বৃশ্চিক,– গোক্ষুরাফণা,– বিষের বিস্বাদ !

স্পেইনের 'সিয়েরা'য় ছিনু আমি দস্যু– অশ্বারোহী,–
নির্মম-কৃতান্ত-কাল,– তবু কি যে কাতর,– বিরহী !
কোন্ রাজনন্দিনীর ঠোঁটে আমি এঁকেছিনু বর্বর চুম্বন !
অন্দরে পশিয়াছিনু অবেলার ঝড়ের মতন !
তখন রতনশেজে গিয়েছিলো নিভে মধুরাতি,
নীল জানালার পাশে– ভাঙা হাটে– চাঁদের বেসাতি !
চুপে-চুপে মুখে কার পড়িছিনু ঝুঁকে !
ব্যাধের মতন আমি টেনেছিনু বুকে
কোন্ তীরু কপোতীর উড়ু-উড়ু ডানা !
– কালো মেঘে কেঁদেছিলো অস্তচাঁদ– আলোর মোহানা !

বাংলার মাঠে-ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা,
পদ্মার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিলো দ্যাখা !

'ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনি রুপালি রাতে
কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে।
অপরাজিতার ঝাড়ে– নদীপারে কিশোরী লুকায়ে বুঝি !–
মদনমোহন নয়ন আমার পেয়েছিলো তারে খুঁজি !
তারি লাগি বেঁধেছিনু বাঁকা চুলে ময়ূরপাখার চূড়া,
তাহারি লাগিয়া শুঁড়ি সেজেছিনু,– ঢেলে দিয়েছিনু সুরা !
তাহারি নধর অধর নিঙাড়ি উথলিলো বুকে মধু,
জোনাকির সাথে ভেসে শেষরাতে দাঁড়াতাম দোরে বঁধু !
মনে পড়ে কি তা !– চাঁদ জানে যাহা,– জানে যা কৃষ্ণাতিথির শশী,
বুকের আগুনে খুন চড়ে– মুখ চুন হ'য়ে যায় একেলা বসি !

## ছায়া-প্রিয়া

দুপুররাতে ও কার আওয়াজ !
গান কে গাহে,– গান না !
কপোত-বধূ ঘুমিয়ে আছে
নিঝুম ঝিঁঝির বুকের কাছে;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
এ কার তবে কান্না !
গান কে গাহে,– গান না !

শার্সি ঘরের উঠছে বেজে,
উঠছে কেঁপে পর্দা !
বাতাস আজি ঘুমিয়ে আছে
জল-ডাহুকের বুকের কাছে;
এ কোন্ বাঁশি শার্সি বাজায়
এ কোন্ হাওয়া ফর্দা !
দেয় কাঁপিয়ে পর্দা !

নূপুর কাহার বাজলো রে ওই !
কাঁকন কাহার কাঁদলো !
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে;
ঘরে আমার ছায়া-প্রিয়া
মায়ার মিলন ফাঁদলো !
কাঁকন যে তার কাঁদলো !

খসখসালো শাড়ি কাহার !

উসখুসালো চুল গো !
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে;
হুলাপ কাহার উঠলো দুলে !
দুললো কাহার দুল গো !
উসখুসালো চুল গো !

আজকে রাতে কে ওই এলো
কালের সাগর সাঁতরি !
জীবনভোরের সঙ্গিনী সেই,—
মাঠে-ঘাটে আজকে সে নেই !
কোন্ তিয়াষায় এলো রে হায়
মরণপারের যাত্রী !
— কালের সাগর সাঁতরি !

কাঁদছে পাখি পউষনিশির
তেপান্তরের বক্ষে!
ওর বিধবা বুকের মাঝে
যেন গো কার কাঁদন বাজে !
ঘুম নাহি আজ চাঁদের চোখে,
নিদ্ নাহি মোর চক্ষে !
তেপান্তরের বক্ষে !

এলো আমার ছায়া-প্রিয়া,
কিশোরবেলার সই গো !
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে;
মনের মরু,— মনোরমা,—
কই গো সে মোর— কই গো !
কিশোরবেলার সই গো !

ও কার আওয়াজ হাওয়ায় বাজে !
গান কে গাহে, গান না !
কপোতবধূ ঘুমিয়ে আছে
বনের ছায়ায়,— মাঠের কাছে;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
এ কার তবে কান্না !
গান কে গাহে,— গান না !

## ডাকিয়া কহিলো মোরে রাজার দুলাল

ডাকিয়া কহিলো মোরে রাজার দুলাল,
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপি রঙিন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে কতো দিন !
মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে
তখন শকুনবধূ যেতেছিলো শ্মশানের পাশে উড়ে উড়ে !

মেঘের বুরুজ ভেঙে অস্তচাঁদ দিয়েছিলো উঁকি,
সে কোন্ বালিকা একা অন্তঃপুরে এলো অধোমুখী !
পাথারের পারে মোর প্রাসাদের আঙিনার 'পরে
দাঁড়ালো সে,— বাসররাত্রির বধূ,— মোর তরে, সেন মোর তরে !
তখন নিভিয়া গেছে মণিদীপ,— চাঁদ শুধু খেলে লুকোচুরি,
ঘুমের শিয়রে শুধু ফুটিতেছে-ঝরিতেছে ফুলঝুরি,— স্বপনের কুঁড়ি !

অলস আদুল হাওয়া জানালায় থেকে-থেকে ঝুপায় উদাসী !
কাতর নয়ন কার হাহাকারে চাঁদিনীতে জাগে গো উপাসী !
কিংখাবে-গালিচা-খাটে রাজবধূ-ঝিয়ারীর বেশে
কভু সে দেয়নি দ্যাখা— মোর তোরণের তলে দাঁড়ালো সে এসে !
দাঁড়ালো সে হেঁটমুখে— চোখ তার ভ'রে গেছে নীল অশ্রুজলে !
মীনকুমারীর মতো কোন্ দূর সিন্ধুর অতলে

ঘুরেছে সে মোর লাগি !— উড়েছে সে অসীমের সীমা !
অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল,— নরম লালিমা
জ্ব'লে গেছে,— নগ্ন হাত,— নাই শাঁখা,— হারায়েছে রুলি,
এলোমেলো কালো চুলে খ'সে গেছে খোঁপা তার,— বেণী গেছে খুলি !
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,— হিম স্তন,— হিম রোমকূপ !

আমি দেখিয়াছি তারে, ক্ষুধিত প্রেতের মতো চুমিয়াছি আমি
তারি পেয়ালায় হায়!— পৃথিবীর উষা ছেড়ে আসিয়াছি নামি
কান্তারে;— ঘুমের ভিড়ে বাঁধিয়াছি দেউলিয়া বাউলের ঘর,
আমি দেখিয়াছি ছায়া,— শুনিয়াছি একাকিনী কুহকীর স্বর !
বুকে মোর, কোলে মোর— কঙ্কালের কাঁকালের চুমা !
— গঙ্গার তরঙ্গ কানে গায়,— 'ঘুমা— ঘুমা !'
ডাকিয়া কহিলো মোরে রাজার দুলাল,—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার,— রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপি রঙিন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে,— স্বপ্নে— কতো দিন !

## কবি

ভ্রমরীর মতো চুপে সৃজনের ছায়াধূপে ঘুরে মরে মন
আমি নিদালির আঁখি, নেশাখোর চোখের স্বপন !
নিরালায় সুর বাঁধি,– বাঁধি মোর মানসীর বেণী,
মানুষ দেখেনি মোরে কোনোদিন,– আমারে চেনেনি !

কোনো ভিড় কোনোদিন দাঁড়ায়নি মোর চারিপাশে –
শুধায়নি কেহ কভু– 'আসে কি রে,– সে কি আসে– আসে– !'
আসেনি সে ভরাহাটে,– খেয়াঘাটে– পৃথিবীর পসরার মাঝে,
পাটনী দেখেনি তারে কোনোদিন– মাঝি তারে ডাকেনিকো সাঁঝে।
পারাপার করেনি সে মণিরত্ন-বেসাতির সিন্ধুর সীমানা,–
চেনা-চেনা মুখ সবি,– সে যে শুধু সুদূর– অজানা !

করবীকুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে আছে চুপে,
রূপ-সাগরের মাঝে কোন্ দূর গোধূলির সে যে আছে ডুবে !
সে যেন ঘাসের বুকে, ঝিলমিল শিশিরের জলে;
খুঁজে তারে পাওয়া যাবে এলোমেলো বেদিয়ার দলে,
বাবলার ফুলে-ফুলে ওড়ে তার প্রজাপতি-পাখা,
ননির আঙুলে তার কেঁপে ওঠে কচি নোনা-শাখা !

হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মতো কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে !
হয়তো শুনেছো তারে,– তার সুর,– দুপুর আকাশে
ঝরাপাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে,– জল-ডাহুকীর বুকে পউষনিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পুবালি হাওয়ায় !

হয়তো দেখেছো তারে ভূতুড়ে দীপের চোখে মাঝরাতে দেয়ালের 'পরে
নিভে-যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে !
শুক্লা একাদশী রাতে বিধবার বিছানায় যেই জ্যোৎস্না ভাসে
তারি বুকে চপে-চুপে কবি আসে,– সুর তার আসে !
উসখুস এলো চুলে ভ'রে আছে কিশোরীর নগ্ন মুখখানি,–
তারি পাশে সুর ভাসে,– অলখিতে উড়ে যায় কবির উড়ানি !

বালুঘড়িটির বুকে ঝিরিঝিরি-ঝিরিঝিরি গান যবে বাজে
রাতবিরেতের মাঠে হাঁটে সে যে আলসে,– অকাজে !
ঘুম-কুমারীর মুখে চুমো খায় যখন আকাশ,
যখন ঘুমায়ে থাকে টুনটুনি,– মধুমাছি,– ঘাস,

হাওয়ার কাতর শ্বাস থেমে যায় আমলকী ঝাড়ে,
বাঁকা চাঁদ ডুবে যায় বাদলের মেঘের আঁধারে,
তেঁতুলের শাখে-শাখে বাদুড়ের কালো ডানা ভাসে,
মনের হরিণী তার ঘুরে মরে হাহাকারে বনের বাতাসে !

জোনাকির মতো সে যে দূরে-দূরে যায় উড়ে-উড়ে–
আপনার মুখ দেখে ফেরে সে যে নদীর মুকুরে !
জ্ব'লে ওঠে আলেয়ার মতো তার লাল আঁখিখানি ;
আঁধারে ভাসায় খেয়া সে কোন্ পাষাণী !

জানে না তো কি যে চায়,– কবে হায় কি গেছে হারায়ে !
চোখ বুজে খোঁজে একা,– হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে
কারে আহা।– কাঁদে হাহা পুবের বাতাস,
শ্মশানশবের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস !
তারি লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা,– হিম-চিতা জ্বেলে দেয় শিখা,
তার মাঝে যায় দহি বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা !

## সিন্ধু

বুকে তব সুর-পরী বিরহ-বিধুর
গেয়ে যায়, হে জলধি, মায়ার মুকুর !
কোন্ দূর আকাশের ময়ূর-নিলীমা
তোমারে উতলা করে ! বালুচরসীমা
উল্লঙ্ঘি তুলিছো তাই শিরোপা তোমার,–
উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি,– তরঙ্গের বাঁকা তলোয়ার !
গলে মৃগতৃষ্ণাবিষ, মারীর আগল
তোমার সুরার স্পর্শে আশেক-পাগল !
উদ্যত ঊর্মির বুকে অরূপের ছবি
নিত্যকাল বহিছো হে মরমিয়া কবি
হে দুন্দুভি দুর্জয়ের, দুরন্ত, অগাধ !
পেয়েছি শক্তির তৃপ্তি, বিজয়ের স্বাদ
তোমার উলঙ্গনীল তরঙ্গের গানে !
কালে-কালে দেশে-দেশে মানুষ-সন্তানে
তুমি শিখায়েছো বন্ধু দুর্মদ-দুরাশা !
আমাদের বুকে তুমি জাগালে পিপাসা
দুশ্চর তটের লাগি– সুদূরের তরে।
রহস্যের মায়াসৌধ বক্ষের উপরে
ধরেছো দুস্তরকাল;– তুচ্ছ অভিলাষ,

দুদিনের আশা, অশান্তি, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস,
পলকের দৈন্য-জ্বালা-জয়-পরাজয়,
ত্রাস-ব্যথা-হাসি-অশ্রু-তপস্যা-সঞ্চয়,–
পিনাকশিখায় তব হলো ছারখার।
ইচ্ছার বাড়বকুণ্ডে, উগ্র পিপাসার
ধু-ধু-ধু-ধু বেদীতটে আপনারে দিতেছো আহুতি।
মোর ক্ষুধা-দেবতারে তুমি করো স্তুতি !
নিত্য নব বাসনার হলাহলে রাঙি
'পারীয়া'র প্রাণ ল'য়ে আছি মোরা জাগি
বসুধার বাঞ্ছাকূপে, উষ্ণের অঙ্গনে !
নিমেষের খেদ-হর্ষ-বিষাদের সনে
বীভৎস খঞ্জের মতো করি মাতামাতি !
চুরমার হয়ে যায় বেলোয়ারি বাতি !
ক্ষুরধার আকাঙ্ক্ষা অগ্নি দিয়া চিতা
গড়ি তবু বার-বার– বার-বার ধুতুরার তিতা
নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়া।
মোর বক্ষ-কপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে,– প'ড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়,– ঝরা পাতা,– পুবালির হাহা !
কাঁদে বুকে মরা নদী,– শীতের কুয়াশা !
ওহে সিন্ধু, আসিয়াছি আমি সর্বনাশা
ভুখারী ভিখারি একা, আসন্ন-বিবশ !
– চাহি না পলার মালা, শুক্তির কলস,
মুক্তাতোরণের তট মীনকুমারীর,
চাহি না নিতল নীড় বারুণীরানীর।
মোর ক্ষুধা উগ্র আরো, অলঙ্ঘ্য অপার !
একদিন কুকুরের মতো হাহাকার
তুলেছিনু ফোঁটা-ফোঁটা রুধিরের লাগি !
একদিন মুখখানা উঠেছিলো রাঙি
ক্লেদবসাপিণ্ড চুমি রিক্ত-বাসনার !
মোরে ঘিরে কেঁদেছিলো কুহেলি আঁধার,–
শ্মশানফেরুর পাল,– শিশিরের নিশা,
আলেয়ার ভিজা মাঠে ভুলেছিনু দিশা !
আমার হৃদয়পীঠে মোর ভগবান
বেদনার পিরামিড পাহাড়প্রমাণ
গেঁথে গেছে গরলের পাত্র চুমুকিয়া;
রুদ্র তরবার তব উঠুক নাচিয়া
উচ্ছিষ্টের কলেজায়, অশিব-স্বপনে,
হে জলধি, শব্দভেদী উগ্র আস্ফালনে !

– পূজাথালা হাতে লয়ে আসিয়াছে কতো পান্থ, কতো পথবালা
সহর্ষে সমুদ্রতীরে; বুকে যার বিষমাখা শায়কের জ্বালা
সে শুধু এসেছে বন্ধু চুপে-চুপে একা।
অন্ধকারে একবার দুজনার দ্যাখা !
বৈশাখের বেলাতটে, সমুদ্রের স্বর,–
অনন্ত, অভঙ্গ, উষ্ণ, আনন্দসুন্দর !
তারপর, দূর পথে অভিযান বাহি
চ'লে যাবো জীবনের জয়গান গাহি।

## দেশবন্ধু

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছো নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো,– বিপ্লবিনী পদ্মা ছিলো তব নদী-মাতা।
কালবৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইতো রক্তপুঞ্জ তব
উত্তাল উর্মির তালে,– বক্ষে তব লক্ষ কোটি পন্নগ-উৎসব
উদ্যত ফণার নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি,
ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিলো সদা শত্রু-অক্ষৌহিণী।
স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিতো সঞ্চারি,
এসেছিলে বিষ্ণুচক্র মর্মন্তুদ,– ক্লৈব্যের সংহারী।
ভেঙেছিলে বাঙালির সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধুলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃঙ্খলের ডোর,
ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভাণ্ড তীব্র দর্পে,– বৈরাগের রাগে,
দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে– পৃথ্বী-পুরোভাগে।
নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কাম্য পরিহরি
ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাবগঙ্গোত্তরী
আর্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি;
বাদলের মন্দ্র-সম মন্ত্র তব দিকে-দিকে তুলিলে বৈরাগী।
এনেছিলে সঙ্গে করি অবিশ্রাম প্লাবনের দুন্দুভিনিনাদ,
শান্তিপ্রিয় মুমূর্ষুর শ্মশানেতে এনেছিলে আহব-সংবাদ,
গাণ্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে,– 'আছি, আমি আছি !
কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।'
ছিলে তুমি দধীচির অস্থিময় বাসবের দম্ভোলির সম,
অলজ্ঘ্য, অজেয়, ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।
ছিলে তুমি রুদ্রের ডম্বরুরূপে, বৈষ্ণবের গুপীযন্ত্র মাঝে,
অহিংসার তপোবনে তুমি ছিলে চক্রবর্তী ক্ষত্রিয়ের সাজে–
অক্ষয় কবচধারী শালপ্রাংশু রক্ষকের বেশে।
ফেরুকুল-সঙ্কুলিত উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের দেশে
ছিলে তুমি সিংহশিশু, যোজনান্ত বিহরি একাকী

স্তব্ধ শিলাসন্ধিতলে ঘন-ঘন গর্জনের প্রতিধ্বনি মাখি।
ছিলে তুমি নীরবতা-নিষ্পেষিত নির্জীবের নিদ্রিত শিয়রে
উন্মত্ত ঝটিকাসম, বহ্নিমান বিপ্লবের ঘোরে;
শক্তিশেল অপঘাতে দেশবক্ষে রোমাঞ্চিত বেদনার ধ্বনি
ঘুচাতে আসিয়াছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্যলকরণী।
ছিলে তুমি ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে
শব-সাধকের বেশে,– সঞ্জীবনী অমৃত সন্ধানে।
রণনে রঞ্জনে তব হে বাউল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারত, ভারতী;
কলাবিৎ সম হায় তুমি শুধু দগ্ধ হ'লে দেশ-অধিপতি।
বিধিবশে ভূবাগত বন্ধু আজ, ভেঙে গেছে বসুধা-নির্মোক,
অন্ধকার দিবাভাগে বাজে তাই কাজরীর শ্লোক।
মল্লারে কাঁদিছে আজ বিমানের বৃন্তহারা মেঘছত্রীদল,
গিরিতটে, ভূমিগর্ভ ছায়াচ্ছন্ন,– উচ্ছ্বাসউচ্ছল।
যৌবনের জলরঙ্গ এসেছিলো ঘনস্বনে দরিয়ার দেশে,
তৃষ্ণাপাংশু অধরেতে এসেছিলো ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।
অর্চনার হোমকুণ্ডে হবি-সম প্রাণবিন্দু বারংবার ঢালি,
বামদেবতার পদে অকাতর দিয়ে গেলো মেধ্য হিয়া ডালি।
গৌরকান্তি শঙ্করের অম্বিকার বেদীতলে একা
চুপে-চুপে রেখে এলো পুঞ্জীভূত রক্তস্রোত-রেখা।

## বিবেকানন্দ

জয়,– তরুণের জয় !
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক,– জয়,– জয় চিন্ময় !
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিলো,– উষা উঠেছিলো জেগে
পূর্ব তোরণে, বাংলা-আকাশে,– অরুণ-রঙিন মেঘে;
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া,– জগৎ গেছিলো রেঙে।

হে যুবক মুসাফের,
স্থবিরের বুকে ধ্বনিলে শঙ্খ জাগরণপর্বের !
জিঞ্জির-বাঁধা ভীত চকিতেরে অভয় দানিলে আসি,
সুপ্তের বুকে বাজালে তোমার বিষাণ হে সন্ন্যাসী,
রুক্ষের বুকে বাজালে তোমার কালীয়-দমন বাঁশি !

আসিলে সব্যসাচী,
কোদণ্ডে তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিলো প্রাচী !
টঙ্কারে তব দিকে-দিকে শুধু রণিয়া উঠিলো জয়,
ডঙ্কা তোমার উঠিলো বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময়;

শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক,– নাহিকো তোমার ক্ষয়;

তৃতীয় নয়ন তব
ম্লান বাসনার মনসিজ নাশি জ্বালাইতো উৎসব !
কলুষ-পাতকে, ধূর্জটি, তব পিনাক উঠিতো রুখে,
হানিতে আঘাত দিবানিশি তুমি ক্লেদ-কামনার বুকে,
অসুর-আলয়ে শিব-সন্ন্যাসী বেড়াতে শঙ্খ ফুঁকে !

কৃষ্ণচক্র-সম
ক্লৈব্যের হৃদে এসেছিলে তুমি ওগো পুরুষোত্তম,
এসেছিলে তুমি ভিখারির দেশে ভিখারির ধন মাগি
নেমেছিলে তুমি বাউলের দলে,– হে তরুণ বৈরাগী !
মর্মে তোমার বাজিতো বেদনা আর্ত জীবের লাগি।

হে প্রেমিক মহাজন,
তোমার পানেতে তাকাইলো কোটি দরিদ্র-নারায়ণ;
অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণতলে
বার-বার যবে কেঁদে-কেঁদে গেলো কাতর আঁখির জলে,
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুমদলে।

কোথা পাপী ? তাপী কোথা ?
– ওগো ধ্যানী তুমি পতিতপাবন-যজ্ঞে সাজিলে হোতা !
শিব-সুন্দর-সত্যের লাগি শুরু ক'রে দিলে হোম,
কোটি পঞ্চমা আতুরের তরে কাঁপায়ে তুলিলে ব্যোম,
মন্ত্রে তোমার বাজিলো বিপুল শান্তি স্বস্তি ওঁ !

সোনার মুকুট ভেঙে
ললাট তোমার কাঁটার মুকুটে রাখিলে সাধক রেঙে !
স্বার্থ-লালসা পাসরি ধরিলে আত্মাহুতির ডালি,
যজ্ঞের যূপে বুকের রুধির অনিবার দিলে ঢালি,
বিভাতি তোমার তাই তো অটুট রহিলো অংশুমালী !

দরিয়ার দেশে নদী !
– বোধিসত্ত্বের আলয়ে তুমি গো নবীন শ্যামল বোধি !
হিংসার রণে আসিলে পথিক প্রেম-খঞ্জর হাতে,
আসিলে করুণা-প্রদীপ হস্তে হিংসার অমারাতে,
ব্যাধি-মন্বন্তরে এলে তুমি সুধা-জলধির সংঘাতে !

মহামারী-ক্রন্দন

ঘুচাইলে তুমি শীতল পরশে,– ওগো সুকোমল-চন্দন !
বজ্র-কঠোর, কুসুম-মৃদুল,– আসিলে লোকোত্তর;
হানিলে কুলিশ কখনো,– ঢালিলে নির্মল নির্ঝর,
নাশিলে পাতক,– পাতকীরে তুমি অর্পিলে নির্ভর।

চক্র-গদার সাথে
এনেছিলে তুমি শঙ্খ-পদ্ম,– হে ঋষি, তোমার হাতে;
এনেছিলে তুমি ঝড়-বিদ্যুৎ,– পেয়েছিলে তুমি সাম,
এনেছিলে তুমি রণ-বিপ্লব,– শান্তি-কুসুমদাম;
মাভৈঃ-শঙ্খে জাগিছে তোমার নরনারায়ণ-নাম !

জয়,– তরুণের জয় !
আত্মাহুতির রক্ত কখনো আঁধারে হয় না লয় !
তাপসের হাড় বজ্রের মতো বেজে ওঠে বার-বার !
নাহি রে মরণে বিনাশ,– শ্মশানে নাহি তার সংহার,
দেশে-দেশে তার বীণা বাজে– বাজে কালে-কালে ঝঙ্কার !

## হিন্দু-মুসলমান

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে– পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে-সুরে !
আহ্নিক হেথা শুরু হ'য়ে যায় আজান-বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনের উদাস ধ্বনিটি গগনে-গগনে বাজে;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-উষায় বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা,– মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির !

কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে একাকী ভারত জাঁকি ?
– মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন-রাখী;
আরব মিশর তাতার তুর্কী ইরানের চেয়ে মোরা
ওগো ভারতের মোসলেমদল,– তোমাদের বুক-জোড়া !
ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা,– আর্যাবর্ত ভাঙি
গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি !
– নবীন প্রাণের সাড়া
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্তবেণীর ধারা !

রুমের চেয়েও ভারত তোমার আপন,– তোমার প্রাণ !

– হেথায় তোমার ধর্ম-অর্থ,– হেথায় তোমার ত্রাণ;
হেথায় তোমার আসান ভাই গো, হেথায় তোমার আশা;
যুগ-যুগ ধরি এই ধূলিতলে বাঁধিয়াছো তুমি বাসা,
গড়িয়াছো ভাষা কল্পে-কল্পে দরিয়ার তীরে বসি,
চক্ষে তোমার ভারতের আলো,– ভারতের রবি, শশী,
হে ভাই মুসলমান
তোমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান !

এ ভারতভূমি নহেকো তোমার, নহেকো আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ, মুসলমানের রেখা;
হিন্দু-মনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে,
ইন্দ্রদ্যুম্নে-উজ্জয়িনীতে মথুরা-বৃন্দাবনে !
পাটলীপুত্র-শ্রাবস্তী-কাশী- কোশল-তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রটিছে কীর্তিলীলা !
– ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নব প্রতিভার বীণা !

এই ভারতের তখ্‌তে চড়িয়া শাহানশাহার দল
স্বপ্নের মণি-প্রদীপে গিয়েছে উজলি আকাশতল !
– গিয়েছে তাহারা কল্পলোকের মুক্তার মালা গাঁথি,
পরশে তাদের জেগেছে আরব-উপন্যাসের রাতি !
জেগেছে নবীন মোগল-দিল্লী,– লাহোর,– ফতেহ্‌পুর,
যমুনাজলের পুরানো বাঁশিতে বেজেছে নবীন সুর !
নতুন প্রেমের রাগে
তাজমহলের তরুণিমা আজো উষার অরুণে জাগে !

জেগেছে হেথায় আকবরী আইন,– কালের নিকষ কোলে
বার-বার যার উজল সোনার পরশ উঠিছে জ্ব'লে।
সেলিম,– শাজাহাঁ,– চোখের জলেতে একশা করিয়া তারা
গড়েছে মিনার মহলা স্তম্ভ কবর ও শাহদারা !
– ছড়ায়ে রয়েছে মোগল ভারত,– কোটি-সমাধির স্তূপ
তাকায়ে রয়েছে তন্দ্রাবিহীন,– অপলক, অপরূপ !
– যেন মায়াবীর তুড়ি
স্বপনের ঘোরে স্তব্ধ করিয়া রেখেছে কনকপুরী !

মোতিমহলের অযুত রাত্রি,– লক্ষ দীপের ভাতি
আজিও বুকের মেহেরাবে যেন জ্বালায়ে যেতেছে বাতি !
আজিও অযুত বেগম-বাঁদীর শম্পশয্যা ঘিরে
– অতীত রাতের চঞ্চল চোখ চকিতে যেতেছে ফিরে !

দিকে-দিকে আজো বেজে ওঠে কোন্ গজল-ইলাহী গান !
পথ-হারা কোন্ ফকিরের তানে কেঁদে ওঠে সারা প্রাণ !
– নিখিল ভারতময়
মুসলমানের স্বপন-প্রেমের গরিমা জাগিয়া রয় !

এসেছিলো যারা ঊষর ধূসর মরুগিরিপথ বেয়ে,
একদা যাদের শিবিরে-সৈন্যে ভারত গেছিলো ছেয়ে,
আজিকে তাহারা পড়শি মোদের, মোদের বহিন-ভাই;
– আমাদের বুকে বক্ষ তাদের, আমাদের কোলে ঠাঁই।
'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে, ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোস্‌লেম্ বিনা ভারত বিফল,–বিফল হিন্দু বিনা;
– মহামৈত্রীর গান
বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান !

## নিখিল আমার ভাই

নিখিল আমার ভাই
– কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই;
যে প্রাণ গুমরি কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি,
কোন্ ফণী যেন আকাশ-বাতাসে তোলে বিষ-গরজনি !
কি যেন যাতনা মাটির বুকেতে অনিবার ওঠে রণি,
আমার শস্য-স্বর্ণপসরা নিমেষে হয় যে ছাই !
– সবার বুকের বেদনা আমার, নিখিল আমার ভাই।

আকাশ হতেছে কালো
কাহাদের যেন ছায়াপাতে হায়, নিভে যায় রাঙা আলো !
বাতায়নে মোর ভেসে আসে যেন কাদের তপ্ত-শ্বাস,
অন্তরে মোর জড়ায়ে কাদের বেদনার নাগপাশ,
বক্ষে আমার জাগিছে কাদের নিরাশা, গ্লানিমা, ত্রাস,
– মনে-মনে আমি কাহাদের হায় বেসেছিনু এতো ভালো।
তাদের ব্যথার কুহেলি-পাথারে আকাশ হতেছে কালো।

লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন-ভাই !
আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনা-পীড়ার দান,
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,
আমার হৃদয়-যূপেতে তাহারা করিছে রক্তস্নান,
আমার মনের চিতানলে জ্ব'লে লুটায়ে যেতেছে ছাই !
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে লভিয়াছে তারা ঠাঁই।

## পতিতা

আগার তাহার বিভীষিকাভরা– জীবন মরণময় !
সমাজের বুকে অভিশাপ সে যে,– সে যে ব্যাধি,– সে যে ক্ষয়;
প্রেমের পসরা ভেঙে ফেলে দিয়ে ছলনার কারাগার
রচিয়াছে সে যে,– দিনের আলোয় রুদ্ধ করেছে দ্বার !
সূর্যকিরণ চকিতে নিভায়ে সাজিয়াছে নিশাচর,
কালনাগিনীর ফণার মতন নাচে সে বুকের 'পর !
চক্ষে তাহার কালকূট ঝরে,– বিষপঙ্কিল শ্বাস,
সারাটি জীবন মরীচিকা তার,– প্রহসন-পরিহাস !
ছোঁয়াচে তাহার ম্লান হ'য়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা !
সে যে মন্বন্তর,– মৃত্যুর দূত,– অপঘাত,– মহামারী,–
মানুষ তবু সে,– তার চেয়ে বড়ো,– সে যে নারী, সে যে নারী !

## ডাহুকী

মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী,–
নিদাঘের রৌদ্রতাপে একা সে ডাহুকী
বিজন-তরুর শাখে ডাকে ধীরে-ধীরে
বনচ্ছায়া-অন্তরালে তরল তিমিরে !
– আকাশে মন্থর মেঘ, নিরালা দুপুর !
– নিস্তব্দ পল্লীর পথে কুহকের সুর
বাজিয়া উঠিছে আজ ক্ষণে-ক্ষণে !
সে কোন্ পিপাসা কোন্ ব্যথা তার মনে !
হারায়েছে প্রিয়ারে কি ?– অসীম আকাশে
ঘুরেছে অনন্ত কাল মরীচিকা-আশে ?
বাঞ্ছিত দেয়নি দ্যাখা নিমেষের তরে !–
কবে কোন্ রুক্ষ কালবৈশাখীর ঝড়ে
ভেঙে গেছে নীড়, গেছে নিরুদ্দেশে ভাসি !
– নিঝুম বনের তটে বিমনা উদাসী
গেয়ে যায়; সুপ্ত পল্লীতটিনীর তীরে
ডাহুকীর প্রতিধ্বনি-ব্যথা যায় ফিরে !
– পল্লবে নিস্তব্ধ পিক,– নীরব পাপিয়া,
গাহে একা নিদ্রাহারা বিরহিণী হিয়া !
আকাশে গোধূলি এলো,– দিক হলো ম্লান,
ফুরায় না তবু হায় হুতাশীর গান !
– স্তিমিত পল্লীর তটে কাঁদে বার-বার,

কোন যেন সুনিভৃত রহস্যের দ্বার
উন্মুক্ত হ'লো না আর কোন্ সে গোপন
নিলো না হৃদয়ে তুলি তার নিবেদন !

## শ্মশান

কুহেলির হিমশয্যা অপসারি ধীরে
রূপসী তন্বী মাধবীরে
ধরণী বরিয়া লয় বারে-বারে-বারে !
— আমাদের অশ্রুর পাথারে
ফুটে ওঠে সচকিতে উৎসবের হাসি,—
অপরূপ বিলাসের রাশি !
ভগ্ন-প্রতিমারে মোরা জীবনের বেদীতটে আরবার গড়ি,
ফেনায়িত সুরাপাত্র ধরি
ভুলে যাই বিষের আঘাত !
মোহময় যৌবনের সাধ
আতপ্ত করিয়া তোলে ভুবিরের তুহিন-অধর !
চির-মৃত্যুচর
হে মৌন শ্মশান,
ধূম-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আবরি বয়ান
হেরিতেছো বিশ্বের স্বপন !
ক্ষণে-ক্ষণে রক্তবহ্নি করি নির্বাপন
ভস্ম করি রাখিতেছো বিরহীর ক্রন্দনের ধ্বনি !
তব মুখপানে চেয়ে কবে বৈতরণী
হ'য়ে গেছে কলহীন !
বক্ষে তব স্থির হ'য়ে আছে কতো উল্লসিত চিতা
হে অনাদি পিতা !
তব গর্ভে,— মরণের অতুল নিলয়ে
অনন্তর নিতেছে প্রলয়,—
কবে কতুকর
মৃত্যুপার মলিনার শেষ পারাবারে
তুলে দেবে হস্তে তব,— কবে লবে টানি
অনাদি-অনন্তে তুলি শ্যামা ধরণীরে
শ্মশান-তিমিরে,
প্রেমমুখ নয়ন মেলি হেরিবে তাহার
বিশ্বময় শোভা
নিত্য মনোলোভা !
[illegible]-[illegible] চিতা-কণা নিয়া

[illegible]
[illegible] মেরে সৌন্দর্যের [illegible]-বধূ ।
এ বসুধা-বধূ
[illegible] মেরে উঠলে [illegible]
[illegible]-[illegible]- [illegible]
[illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]
[illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible] ।
- [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ।
- [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ...
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ।
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

অতীত অভিশাপের নিশা এলিয়ে এলোকেশ
নিভিয়ে দেছে দেউটি তোমার দেউল-কিনারে !

কলসি কোলে নীলনদেতে যেতেছে ওই নারী,
ওই পথেতে চলতে আছে নিগ্রো সারি-সারি;
ইয়াঙ্কি ওই,– ওই য়ুরোপী,– চীনে-তাতার-মুর
তোমার বুকের পাঁজর দলে টলতেছে হুড়মুড়,–
ফেনিয়ে তুলে খুনখারাবী,– খেলাপ,– খবরদারি !

দিনের আলো ঝিমিয়ে গেলো,– আকাশে ওই চাঁদ !
– চপল হাওয়ায় কাঁকন কাঁদায় নীলনদেরই বাঁধ !
মিশর-ছুঁড়ি গাইছে মিঠা শুঁড়িখানার সুরে
বালুর খাতে, প্রিয়ের সাথে– খেজুরবনে দূরে !
আফ্রিকা এই, এই যে মিশর– জাদুর এ যে ফাঁদ !

'ওয়েসিসে'র ঠাণ্ডা ছায়ায় চৈতিচাঁদের তলে
মিশরবালার বাঁশির গলা কিসের কথা বলে !
চলছে বালুর চড়াই ভেঙে উটের পরে উট–
এই যে মিশর– আফ্রিকার এই কুহকপাখাপুট !
– কি এক মোহ এই হাওয়াতে– এই দরিয়ার জলে !

শীতল পিরামিডের মাথা,– 'গীজে'র মুরতি
অঙ্কবিহীন যুগসমাধির মূক মমতা মথি
আবার যেন তাকায় অদূর উদয়গিরির পানে !
'মেম্ননে'র ওই কণ্ঠ ভরে চারণ-বীণার গানে !
আবার জাগে ঝাণ্ডাঝালর,– জ্যান্ত আলোর জ্যোতি !

## পিরামিড

বেলা ব'য়ে যায়,
গোধূলির মেঘ-সীমানায়
ধূম্রমৌন সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘণ্টা বাজে,
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে;
পান্থ ম্লান চিতার কবলে
একে-একে ডুবে যায় দেশ জাতি সংসার সমাজ;
কার লাগি, হে সমাধি, তুমি একা ব'সে আছো আজ–
কি এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন !

অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে– পাও নাই টের:
কোন্ দিবাঅবসানে গৌরবের লক্ষ মুসাফের
দেউটি নিভায়ে গেছে– চ'লে গেছে দেউল ত্যজিয়া,
চ'লে গেছে প্রিয়তম– চ'লে গেছে প্রিয়া
যুগান্তের মণিময় গেহবাস ছাড়ি
চকিতে চলিয়া গেছে বাসনা-পসারী
কবে কোন্ বেলাশেষে হায়
দূর অস্তশেখরের গায়।
তোমারে যায়নি তারা শেষ অভিনন্দনের অর্ঘ্য সমর্পিয়া;
সাঁঝের নীহারনীল সমুদ্র মথিয়া
মরমে পশেনি তব তাহাদের বিদায়ের বাণী,
তোরণে আসেনি তব লক্ষ-লক্ষ মরণ-সন্ধানী
অশ্রু-ছলছল চোখে পাণ্ডুর বদনে:
কৃষ্ণ যবনিকা কবে ফেলে তারা গেলো দূর দ্বারে বাতায়নে
জানো নাই তুমি;
জানে না তো মিশরের মূক মরুভূমি
তাদের সন্ধান।
হে নির্বাক পিরামিড,– অতীতের স্তব্ধ প্রেতপ্রাণ
অবিচল স্মৃতির মন্দির,
আকাশের পানে চেয়ে আজো তুমি ব'সে আছো স্থির;
নিস্পল যুগ্মভুরু তুলে
চেয়ে আছো অনাগত উদধির কূলে
মেঘ-রক্ত মযুখের পানে,
জ্বলিয়া যেতেছে নিত্য নিশি-অবসানে
নূতন ভাস্কর;
বেজে ওঠে অনাহত মেম্নুনের স্বর
নবোদিত অরুণের সনে–
কোন্ আশা-দুরাশার ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলি-তাড়নে!
পিরামিড-পাষাণের মর্ম ঘেরি নেচে যায় দু-দণ্ডের রুধিরফোয়ারা–
কি এক প্রগলভ উষ্ণ উল্লাসের সাড়া!
থেমে যায় পান্থবীণা মুহূর্তে কখন;
শতাব্দীর বিরহীর মন
নিটল নিথর
সন্তরি ফিরিয়া মরে গগনের রক্ত-পীত সাগরের 'পর;
বালুকার স্ফীত পারাবারে
লোল মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারে
মিশরের অপহৃত অন্তরের লাগি
মৌন ভিক্ষা মাগি।

খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার
মুখরিত প্রাণের সঞ্চার
ধ্বনিত হইবে কবে কলহীন নীলার বেলায়–
বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজো তাই ব'সে আছে পিরামিড হায়।
কতো আগন্তুক-কাল অতিথি-সভ্যতা
তোমার দুয়ারে এসে ক'য়ে যায় অসম্বৃত অন্তরের কথা,
তুলে যায় উচ্ছৃঙ্খল রুদ্র কোলাহল,
তুমি রহো নিরুত্তর– নির্বেদী– নিশ্চল
মৌন, অন্যমনা;
প্রিয়ার বক্ষের 'পরে বসি একা নীরবে করিছো তুমি শবের সাধনা–
হে প্রেমিক– স্বতন্ত্র স্বরাট।
কবে সুপ্ত উৎসবের স্তব্ধ ভাঙা হাট
উঠিবে জাগিয়া,
সস্মিত নয়ন তুলি কবে তব প্রিয়া
আঁকিবে চুম্বন তব স্বেদকৃষ্ণ পাণ্ডু চূর্ণ ব্যথিত কপোলে,
মিশরঅলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্ব'লে,
ব'সে আছো অশ্রুহীন স্পন্দহীন তাই;
ওলটি-পালটি যুগ-যুগান্তের শ্মশানের ছাই
জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি– প্রেমের প্রহরা।
মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি–
অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু; নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে;
অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে।

## মরুবালু

হাড়ের মালা গলায় গেঁথে– অট্টহাসি হেসে
উল্লাসেতে টলছে তারা,– জ্বলছে তারা খালি !
ঘুরছে তারা লাল মশানে কপাল-কবর চষে,
বুকের বোমাবারুদ দিয়ে আকাশটারে জ্বালি
পাঁয়জোরে কাল মহাকালের পাঁজর ফেঁড়ে-ফেঁড়ে
মড়ার বুকে চাবুক মেরে ফিরছে মরুর বালি !

সর্বনাশের সঙ্গে তোরা দম্ভে খেলিস পাশা !

যেখানে কোন এক সৃষ্টিপ্রাতের সূত্রপাতের ভূমি,
– শিশুআমার পড়েছিলো ওই সাহারার বাসা:
– সে-সব গেছে কবে ঘুমের চুমার ধোঁয়ায় ধুমি !
অটল আকাশ বাজে জাঁয়ের কিতার মতো কেঁড়ে,
জবাব তোদের জ্বলছে যমের চিতার গোলাস চুমি !

তোদের সনে 'ডাইনোসুরে'র লড়াই হলো কতো–
আলুথালু লুটিয়ে বালুর ডাইনী ছায়ার তলে
আজকে তারা ঘুমিয়ে আছে,– চুল্লি শত-শত
উনুনে জ্বলে তাদের হাড়ে,– তাদের মাড়ের বলে:
কাঁদছে ধী-ধী কাঞ্চন-চাকা বালুর চাকার নিচে
মুণ্ড তাদের,– মড়ার কপাল ভৈরবেরি গলে !

তোদের বুকে জাগছে মৃগতৃষ্ণা,– জাগে ঝড় !
নিস উড়িয়ে শিকার-সোয়ার ধোঁয়ার পিছে-পিছে,–
মেঘে-মেঘে চড়াও,– বাজের বুক চিরে চক্কর !
নাচতে আছিস আকাশখানার গোখরাফণার নিচে,
আরব-মিশর চীন-ভারতের হাওয়ায় ঘুরে-ঘুরে
সত্য-ত্রেতা দ্বাপর-কলি হাপর খিচে-খিচে !

তোদের ভাষা আঙ্গলিছে শেখ-সেনানীর বুকে !
– লাল সাহারার শেয়ের সোয়ার– বালুর ঘারে ঘেরো,
ধমক মেরে আঁধির বুকে ছুটছে রুখে-রুখে !
– তোদের মতন নেইকো তাদের সোদর-সাথী কেহ,
নেইকো তোদের মতন পিছুডাকের মায়া,
নেইকো তাদের মোদের মতন আর্ত মোহ-স্নেহ।

দামোর-পাওয়া আগুনদানা,– দারুণ পথের মুখে !
বারেন করি মেঘের বুরুজ বজ্রমেরি ঘর,
উড়িয়ে হাজার 'ক্যারাভেন' ও তাবুশিবির-বুকে,
উড়িয়ে মরীচিকার শিখা– কালফণা-জর্জর
– টলতে আছিস,– দলতে আছিস,– জ্বলতে আছিস ধু-ধু
সঙ্গে স্যান্ডাড– মসুদ ডাকাত,– তাতার যাযাবর !

পাড়তে যাবে যারা তোদের বুকের মাঝে বাসা
হাড়িত তাদের কোঁপরা হ'য়ে ঝুরবে বালুর মাঝে,
এইখানেতে নেইকো দরদ,– নেইকো ভালোবাসা,
বর্শা লাকদর,– উটের গলার ঘুন্টি শুধু বাজে !
ঘুমিয়ে গেছে আশা যাদের,– জুড়িয়ে গেছে জ্বালা,
আয় রে বালুর 'কারবালা'তে, অন্ধকারের মাঝে !

## চাঁদনীতে

বেবিলোন কোথা হারায়ে গিয়েছে,– মিশর-'অসুর' কুয়াশাকালো;
চাঁদ জেগে আছে আজো অপলক,– মেঘের পালকে ঢালিছে আলো !
সে যে জানে কতো পাখারের কথা,– কতো ভাঙা হাট মাঠের স্মৃতি !
কতো যুগ কতো যুগান্তরের সে ছিলো জ্যোৎস্না, শুক্লাতিথি !
হয়তো সেদিনো আমাদেরি মতো পিলুবারোঁয়ার বাঁশিটি নিয়া
ঘাসের ফরাশে বসিতো এমনি দূর পরদেশী প্রিয় ও প্রিয়া !
হয়তো তাহারা আমাদেরি মতো মধু-উৎসবে উঠিতো মেতে
চাঁদের আলোয় চাঁদমারী জুড়ে,– সবুজ চরায়,– সবজি-ক্ষেতে !
হয়তো তাহারা দুপুর-যামিনী বালুর জাজিমে সাগরতীরে
চাঁদের আলোয় দিগদিগন্তে চকোরের মতো চরিতো ফিরে !
হয়তো তাহারা মদঘূর্ণনে নাচিতো কাঞ্চীবাঁধন খুলে
এমনি কোন্-এক চাঁদের আলোয়– মরু-'ওয়েসিসে' তরুর মূলে !
বীর যুবাদল শত্রুর সনে বহুদিনব্যাপী রণের শেষে
এমনি কোন্-এক চাঁদিনীবেলায় দাঁড়াতো নগরীতোরণে এসে !
কুমারীর ভিড় আসিতো ছুটিয়া, প্রণয়ীর গ্রীবা জড়ায়ে নিয়া
হেঁটে যেতো তারা জোড়ায়-জোড়ায় ছায়াবীথিকার পথটি দিয়া !
তাদের পায়ের আঙুলের ঘায়ে খড়-খড় পাতা উঠিতো বাজি,
তাদের শিয়রে দুলিতো জ্যোৎস্না-চাঁচর-চিকণ পত্ররাজি !
দখিনা উঠিতো মর্মরি মধুবনানীর লতা-পল্লব ঘিরে
চপল মেয়েরা উঠিতো হাসিয়া– 'এলো বল্লভ,– এলো রে ফিরে !'
– তুমি ঢুলে যেতে, দশমীর চাঁদ তাহাদের শিরে সারাটি নিশি,
নয়নে তাদের দুলে যেতে তুমি,– চাঁদিনী-শরাব,– সুরার শিশি !
সেদিনো এমনি মেঘের আসরে জ্বলেছে পরীর বাসরবাতি,
হয়তো সেদিনো ফুটেছে মোতিয়া,– ঝরেছে চন্দ্রমল্লীপাতি !
হয়তো সেদিনো নেশাখোর মাছি গুমরিয়া গেছে আঙুরবনে,
হয়তো সেদিনো আপেলের ফুল কেঁপেছে আদুল হাওয়ার সনে !
হয়তো সেদিনো এলাচির বন আতরের শিশি দিয়েছে ঢেলে
হয়তো আলেয়া গেছে ভিজে মাঠে এমনি ভুতুড়ে প্রদীপ জ্বেলে !
হয়তো সেদিনো ডেকেছে পাপিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া 'সরো'র শাখে,
হয়তো সেদিনো পাড়ার নাগরী ফিরেছে এমনি গাগরি-কাঁখে !
হয়তো সেদিনো পানসী দুলায়ে গেছে মাঝি বাঁকা ঢেউটি বেয়ে
হয়তো সেদিনো মেঘের শকুনডানায় গেছিলো আকাশ ছেয়ে !
হয়তো সেদিনো মানিকজোড়ের মরা পাখিটির ঠিকানা মেগে
অসীম আকাশে ঘুরেছে পাখিনী ছটফট দুটি পাখায় বেগে !
হয়তো সেদিনো খুর্-খুর্ করে খরগোশছানা গিয়েছে ঘুরে
বন মেহগনি-টার্পিন-তলে– বালির জর্দা-খিছানা ফুঁড়ে !
হয়তো সেদিনো জানালায় নীল জাফরির পাশে একলা বসি

মনের হারণা হেরেছে তোমারে– বনের পারের ডাগর শশী !
শুক্লা একাদশীর নিশীথে মণিহর্ম্যের তোরণে গিয়া
পারাবত-দূত পাঠায়ে দিয়েছে প্রিয়ের তরেতে হয়তো প্রিয়া !
অলিভকুঞ্জে হা-হা ক'রে হাওয়া কেঁদেছে কাতর যামিনী ভরি !
ঘাসের শাটিনে আলোর ঝালরে 'মার্টিল' পাতা পড়েছে 'ঝরি' !
'উইলো'র বন উঠেছে ফুপায়ে,– 'ইউ'-তরুশাখা গিয়েছে ভেঙে,
তরুণীর দুধ-ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে !
কোন্ গ্রীস,– কোন্ কার্থেজ, রোম, 'ক্রবেদুর'-যুগ কোন্,–
চাঁদের আলোয় স্মৃতির কবর-সফরে বেড়ায় মন !
জানি না তো কিছু,– মনে হয় শুধু এমনি তুহিন চাঁদের নিচে
কতো দিকে-দিকে– কতো কালে-কালে হ'য়ে গেছে কতো কি যে !
কতো-যে শ্মশান,– মশান কতো-যে,– কতো-যে কামনা-পিপাসা-আশা
অস্তচাঁদের আকাশে বেঁধেছে আরব-উপন্যাসের বাসা !

## দক্ষিণা

প্রিয়ার গালেতে চুমা খেয়ে যায় চকিতে পিয়াল রেণু !–
এলো দক্ষিণা,– কাননের বীণা,– বনানীপথের বেণু !
তাই মৃগী আজ মৃগের চোখেতে বুলায়ে নিতেছে আঁখি,
বনের কিনারে কপোত আজিকে নেয় কপোতীরে ডাকি !
ঘুঘুর পাখায় ঘুঙুর বাজায় আজিকে আকাশখানা,–
আজ দখিনার ফর্দা হাওয়ায় পর্দা মানে না মানা !
শিশিরশীর্ণা বালার কপোলে কুহেলির কালো জাল
উষ্ণ চুমোর আঘাতে হয়েছে ডালিমের মতো লাল !
দাড়িমের বীজ ফাটিয়া পড়িছে অধরের চারিপাশে
আজ মাধবীর প্রথম উষায়,– দখিনা হাওয়ার শ্বাসে !
মদের পেয়ালা শুকায়ে গেছিলো, উড়ে গিয়েছিলো মাছি,
দখিনা-পরশে ভরা পেয়ালায় বুদবুদ ওঠে নাচি !
বেয়ালার সুরে বাজিয়া উঠিছে শিরা-উপশিরাগুলি !
শ্মশানের পথে করোটি হাসিছে,– হেসে খুন হলো খুলি !
এস্রাজ বাজে আজ মলয়ের,– চিতার রৌদ্রাতপ
সুরের সুঠামে নিভে যায় যেন,– হেসে ওঠে যেন শব !
নিভে যায় রাঙা অঙ্গারমালা,– বৈতরণীর জলে,
সুর-জাহ্নবী ফুটে ওঠে আজ মলয়ের কোলাহলে !
আকাশ-নিথানে মধু-পরিণয়,– মিলন-বাসর পাতি
হিমানীশীর্ণ বিধবা তারারা জ্ব'লে ওঠে রাতারাতি !
ফাগুয়ার রাগে চাঁদের কপোল চকিতে হয়েছে রাঙা !
– হিমের ঘোমটা চিরে দেয় কে গো মরমস্নায়ুতে দাঙা !
লালসে কাহার আজ নীলিমার আনন রুধির-লাল–

নিখিলের গালে গাল পেতে কার কুঙ্কুম-ভাঙা গাল !
নারাঙ্গি-ফাটা অধর কাহার আকাশ-বাতাসে ঝরে !
কাহার বাঁশিটি খুন উথলায়– পরান উদাস করে !
কাহার পানেতে ছুটেছে উধাও শিশু পিয়ালের শাখা !
ঠোঁটে ঠোঁট ডলে– পরাগ চোঁয়ায় অশোক ফুলের ঝাঁকা !
কাহার পরশে পলাশ-বধূর আঁখির কেশরগুলি
মুদে-মুদে আসে,– আর বার করে কুঁদে-কুঁদে কেলাকুলি !
পাতার বাজারে বাজে হুল্লোড়,– পায়েলার রুণ্-রুণ্,
কিশলয়দের ডাশা পেষে কে গো– চোখ করে ঘুমঘুম !
এসেছে দখিনা– ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন এক-হীরের ছুরি :–
তার লাগি তবু ক্ষ্যাপা শাল-নিম, তমাল-বকুলে হুড়াহুড়ি !
আমের কুঁড়িতে বাউল বোলতা খুনসুড়ি দিয়ে খ'সে যায়,
অঘ্রাণে যার ঘ্রাণ পেয়েছিলো,– পেয়েছিলো যারে 'পোষলায়,
সাতাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ,–
নিছক হাওয়ায় ঝরিয়া পড়িছে আজ মউলের কবগুলি !
ঠেলে ফেলে দিয়ে নীলমাছি আর প্রজাপতিদের ভিড়
দখিনার মুখে রসের বাগান বিকায়ে দিতেছে ক্ষীর !
এসেছে নাগর,– যামিনীর আজ জাগর রঙিন আঁখি,–
কুয়াশার দিনে কাঁচুলি বাঁধিয়া কুচ রেখেছিলো ঢাকি,–
আজিকে কাঞ্চী যেতেছে খুলিয়া, মদঘূর্ণনে হায় !
নিশীথের স্বেদ-সীধুধারা আজ ক্ষরিছে দক্ষিণায় !
রূপসী ধরণী বাসকসজ্জা,– রুপালি চাঁদের তলে
বালুর ফরাশে রাঙা উল্লাসে ঢেউয়ের আগুন জ্বলে !
রোল উতরোল শোণিতে শিরায়,– হোরীর হা রা রা চীৎকার,–
মুখে-মুখে মধু,– সুধাসীধু শুধু,– তিত্ কোথা আজ– তিত্ কার !
শীতের বাস্তুভিত ভেঙে আজ এলো দক্ষিণা,– মিষ্টি-মধু,
মদনের হুলে ঢুলে-ঢুলে-ঢুলে হুঁশ-হারা হলো সৃষ্টি-বধূ !

## যে কামনা নিয়ে

যে কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর সেই তৃষা !
খুঁজে মরি রূপ, ছায়াধূপ জুড়ি,
রঙের মাঝারে হেরি রঙডুরি !
পরাগের ঠোঁটে পরিমলগুঁড়ি,–
হারায়ে ফেলি গো দিশা !

আমি প্রজাপতি– মিঠা মাঠে-মাঠে সোঁদালে সর্ষেক্ষেতে;
– বেদের সফরে খুঁজি নাকো ঘর,

– আবার আমায় ডাকলে কেন স্বপনঘোরের থেকে !
ওই লোকালোক-শৈলচূড়ায় চরণখানা রেখে
রয়েছিলাম মেঘের রাঙা মুখের পানে চেয়ে,
কোথার থেকে এলে তুমি হিম সরণি বেয়ে !
ঝিম্‌ঝিমে চোখ,-- জটা তোমার ভাসছে হাওয়ার ঝড়ে,
শ্মশানশিঙা বাজলো তোমার প্রেতের গলার স্বরে !
আমার চোখের তারার সনে– তোমার আঁখির তারা
মিলে গেলো,– তোমার মাঝে আবার হলেম হারা !
– হারিয়ে গেলাম ত্রিশূলমূলে,– শিবের দেউলদ্বারে;
কাঁদছে স্মৃতি– কে দেবে গো– মুক্তি দেবে তারে !

## সেদিন এ-ধরণীর

সেদিন এ-ধরণীর
সবুজ দ্বীপের ছায়া– উতরোল তরঙ্গের ভিড়
মোর চোখে জেগে-জেগে ধীরে-ধীরে হ'লো স্বপ্নহত
কুয়াশায় ঝ'রে পড়া আতসের মতো।
দিকে-দিকে ডুবে গেলো কোলাহল,
সহসা উজানজলে ভাঁটা গেলো ভাসি,
অতিদূর আকাশের মুখখানা আসি
বুকে মোর তুলে গেলো যেন হাহাকার।
সেইদিন মোর অভিসার
মৃত্তিকার শূন্য পেয়ালার ব্যথা একাকারে ভেঙে
বকের পাখার মতো শাদা লঘু মেঘে
ভেসেছিলো আতুর উদাসী;
বনের ছায়ার নিচে ভাসে কার ভিজে চোখ
কাঁদে কার বাঁরোয়ার বাঁশি
সেদিন শুনিনি তাহা;
ক্ষুধাতুর দুটি আঁখি তুলে
অতিদূর তারকার কামনায় আঁখি মোর দিয়েছিনু খুলে।

আমার এ শিরা-উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেলো ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন–
মোর তরে পিছুডাক মাটি-মা,– তোমার;
ডেকেছিলো ভিজে ঘাস– হেমন্তের হিম ঘাস– জোনাকির ঝাড়,
আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ– শ্মশানের খেয়াঘাট আসি,
কঙ্কালের রাশি,
দাউদাউ চিতা,
কতো পূর্বজাতকের পিতামহ-পিতা,

সর্বনাশ ব্যসন বাসনা,
কতো মৃত গোক্ষুরার ফণা,
কতো তিথি– কতো যে অতিথি–
কতো শত যোনিচক্রস্মৃতি
করেছিলো উতলা আমারে।
আধো আলো– আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এলো তারা ছুটে,
মাটির বাঁটের চুমো শিহরি উঠিলো মোর ঠোঁটে, রোমপুটে;
ধু-ধু মাঠ– ধানখেত– কাশফুল– বুনো হাঁস– বালুকার চর
বুকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিলো নাচিয়া;
মাঝপথে থেমে গেলো তারা সব;
শকুনের মতো শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে– দূরে– আরো দূরে– আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা– অনন্তের শুভ্র অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে
স্ফীত সমুদ্রের মতো আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে–
দূর ছায়াপথে।
পৃথিবীর প্রেতচোখ বুঝি
সহসা উঠিলো ভাসি তারকা-দর্পণে মোর অপহৃত আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি;
ভ্রূণভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এলো বুককাটা মিনতির ভরে;
সঙ্গে নিয়ে বোবা শিশু– বৃদ্ধ মৃত পিতা,
সূতিকা-আলয় আর শ্মশানের চিতা,
মোর পাশে দাঁড়ালো সে গর্ভিণীর ক্ষোভে,
মোর দুটি শিশু আঁখি-তারকার লোভে
কাঁদিয়া উঠিলো তার পীনস্তন– জননীর প্রাণ;
জরায়ুর ডিমে তার জন্মিয়াছে যে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত সন্তান
তার তরে কালে-কালে পেতেছে সে শৈবালবিছানা শালতমালের ছায়া,
এনেছে সে নব-নব ঋতুরাগ– পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া;
তার তরে বৈতরণীতীরে সে যে ঢালিয়াছে গঙ্গার গাগরী,
মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন তার ভিজে রসে উঠিয়াছে ভরি,
উঠিয়াছে দূর্বাধানে শোভি,
মানবের তরে সে যে এনেছে মানবী;
মশালদরাজ এই মাটিটার কাঁধ যে রে–
কেন তবে দু-দণ্ডের অন্ধ অমানিশা
দূর আকাশের তরে বুকে তোর তুলে যায় নেশাখের মক্ষিকার তৃষা!
নয়ন মুদিনু ধীরে– শেষ আলো নিভে গেলো পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য-প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।

## ওগো দরদিয়া

– ওগো দরদিয়া,
তোমারে ভুলিবে সবে,– যারে সবে তোমারে ত্যজিয়া;
ধরণীর পসরায় তোমারে পাবে না কেহ দিনান্তেও খুঁজে
কে জানে রহিবে কোথা নিশিভোরে নেশাখোর আঁখি তব বুজে !
– হয়তো সিন্ধুর পারে শ্বেতশঙ্খ ঝিনুকের পাশে
তোমার কঙ্কালখানা শুয়ে রবে নিদ্রাহারা ঊর্মির নিশ্বাসে !
চেয়ে রবে নিষ্পলক অতি দূর লহরীর পানে,
গীতিহারা প্রাণ তব হয়তো বা তৃপ্তি পাবে তরঙ্গের গানে !
হয়তো বা বনচ্ছায়া লতাগুল্ম পল্লবের তলে
ঘুমায়ে রহিবে তুমি নীল শষ্পে শিশিরের দলে;
হয়তো বা প্রান্তরের পারে তুমি রবে শুয়ে প্রতিধ্বনিহারা,–
তোমারে হেরিবে শুধু হিমানীর শীর্ণাকাশ,– নীহারিকা,– তারা,
তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত-জ্যোৎস্না,– বধির জোনকি !
তোমারে চিনিবে শুধু আঁধারের আলেয়ার আঁখি !
তোমারে চিনিবে শুধু আকাশের কালো মেঘ– মৌন,– আলোহারা,
তোমারে চিনিয়া নেবে তমিস্রার তরঙ্গের ধারা !
কিংবা কেহ চিনিবে না,– হয়তো বা জানিবে না কেহ
কোথায় লুটায়ে আছে হেমন্তের দিবাশেষে ঘুমন্তের দেহ !
– হয়েছিলো পরিচয় ধরণীর পান্থশালে যাহাদের সনে,
তোমার বিষাদ-হর্ষ গেঁথেছিলে একদিন যাহাদের মনে,
যাহাদের বাতায়নে একদিন গিয়েছিলে পথিক-অতিথি,
তোমারে ভুলিবে তারা,– ভুলে যাবে সব কথা,– সবটুকু স্মৃতি !
নাম তব মুছে যাবে মুসাফের,– অঙ্গারের পাণ্ডুলিপিখানি
নোনা-ধরা দেয়ালের বুক থেকে খ'সে যাবে কখন না জানি !
তোমার পানের পাত্রে নিঃশেষে শুকায়ে যাবে শেষের তলানি,
দগ্ধ দুই মাছিগুলো ক'রে যাবে মিছে কানাকানি !
তারপর উড়ে যাবে দূরে-দূরে জীবনের সুরার তল্লাসে,
মৃত এক অলি শুধু প'ড়ে রবে মাতালের বিছানার পাশে !
পেয়ালা উপুড় ক'রে হয়তো বা রেখে যাবে কোনো একজন,
কোথা গেছে ইয়োসোফ্ জানে না সে,– জানে না সে গিয়েছে কখন।
জানে না যে,– অজানা সে,– আরবার দাবি নিয়ে আসিবে না ফিরে,–
জানে না যে চাপা প'ড়ে গেছে সে যে কবেকার কোথাকার ভিড়ে !
– জানিতে চাহে না কিছু,– ঘাড় নিচু ক'রে কে বা রাখে আঁখি বুজে
অতীথ স্মৃতির ধ্যানে, অন্ধকার গৃহকোণে একখানা শূন্য পাত্র খুঁজে !
– যৌবনের কোন্ এক নিশীথে সে কবে
তুমি যে আসিয়াছিলে বনরানী। জীবনের বাসন্তী-উৎসবে
তুমি যে ঢালিয়াছিলে ফাগরাগ,– আপনার হাতে মোর সুরাপাত্রখানি

তুমি যে ভরিয়াছিলে– জুড়ায়েছে আজ তার ঝাঁঝ,– গেছে ফুরায়ে তলানি !
তবু তুমি আসিলে না,– বারেকের তরে দ্যাখা দিলে নাকো হায় !
চুপে-চুপে কবে আমি বসুধার বুক থেকে নিয়েছি বিদায়–
তুমি তাহা জানিলে না,– চলে গেছে মুসাফের,
কবে ফের দ্যাখা হবে আহা
কে-বা জানে ! কবরের 'পরে তার পাতা ঝরে,– হাওয়া কাঁদে হা-হা !

## সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরি কথা হয়

চোখ দুটো ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে !
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিলো গোপন,– স্বপন ক-দিন রয় !
এসেছে গোধূলি গোলাপিবরণ,– এ তবু গোধূলি নয় !
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরি কথা হয়,
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের 'পরে !

কেটেছে যে নিশি ঢের,–
এতোদিন তবু অন্ধকারের পাইনি তো কোনো টের !
দিনের বেলায় যাদের দেখিনি,– এসেছে তাহারা সাঁঝে;
যাদের পাইনি পথের ধুলায়– ধোঁয়ায়– ভিড়ের মাঝে,–
শুনেছি স্বপনে তাদের কলসি ছলকে,– কাঁকন বাজে।
আকাশের নিচে– তারার আলোয় পেয়েছি যে তাহাদের !

চোখদুটো ছিলো জেগে
কতোদিন যেন সন্ধ্যা-ভোরের নট্‌কান্‌-রাঙা মেঘে।
কতোদিন আমি ফিরেছি একেলা মেঘলা গাঁয়ের খেতে !
ছায়াধূপে চুপে ফিরিয়াছি প্রজাপতিটির মতো মেতে
কতোদিন হায় !– কবে অবেলায় এলোমেলো পথে যেতে
ঘোর ভেঙে গেলো,– খেয়ালের খেলাঘরটি গেলো যে ভেঙে !

দুটো চোখ ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে !
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিলো গোপন,– স্বপন ক'দিন রয় !
এসেছে গোধূলি গোলাপিবরণ,– এ তবু গোধূলি নয় !
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরি কথা হয়,–
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের 'পরে !

প্রথম প্রকাশ
১৩৪৩ বাংলা, ১৯৩৬ ইংরেজি

নির্জন স্বাক্ষর ১২১ মাঠের গল্প ১২৩ সহজ ১২৬ কয়েকটি লাইন ১২৮ অনেক আকাশ ১৩৩ পরস্পর ১৩৮ বোধ ১৪৩ অবসরের গান ১৪৬ ক্যাম্পে ১৫১ জীবন ১৫৩ ১৩৩৩ ১৬৪ প্রেম ১৬৮ পিপাসার গান ১৭২ পাখিরা ১৭৫ শকুন ১৭৭ মৃত্যুর আগে ১৭৭ স্বপ্নের হাতে ১৭৯

## নির্জন স্বাক্ষর

তুমি তা জানো না কিছু– না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে;
যখন ঝরিয়া যাবো হেমন্তের ঝরে–
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষ'য়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই;
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে;
আমি ঝ'রে যাবো– তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,
– আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে।

রয়েছি সবুজ মাঠে– ঘাসে–
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ'য়ে আকাশে-আকাশে;
জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়
এইসব ছুঁয়ে ছেনে;– সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা– আকাশেও নাই তার স্থল–
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল;
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

একবার কথা ক'য়ে দেশ আর দিকের দেবতা
বোবা হ'য়ে প'ড়ে থাকে– ভুলে যায় কথা;
যে-আগুন উঠেছিলো তাদের চোখের তলে জ্ব'লে
নিভে যায়– ডুবে যায়– তারা যায় স্খ'লে।
নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে– চ'লে আসে নতুন সময়–
পুরনো সে-নক্ষত্রের দিন শেষ হয়
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে;

আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে খ'সে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হ'য়ে তার বুকের উপরে।
আমি সেই পুরোহিত– সেই পুরোহিত।
যে-নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে–
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে–
যে-আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
জেগে আছো;
জানিয়াছো তুমি এক নিশ্চয়তা– হয়েছো নিশ্চয়।
হ'য়ে যায় আকাশের তলে কতো আলো– কতো আগুনের ক্ষয়;
কতোবার বর্তমান হ'য়ে গেছে ব্যথিত অতীত–
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে-নক্ষত্র ঝ'রে যায় তার।
যে-পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস– আকাশ তোমার।
জীবনের স্বাদ ল'য়ে জেগে আছো– তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পারো তুমি;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হ'য়ে আছো– তবু–
বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে–
ক্লান্ত হ'য়ে– শিশিরের মতো শব্দ ক'রে।
জানো নাকো তুমি তার স্বাদ–
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ।

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ? অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার।
তোমার আকাশ– আলো– জীবনের ধার
ক্ষ'য়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই, শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে।
আমি চ'লে যাবো– তবু জীবন অগাধ

তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে;
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে।

## মাঠের গল্প

### মেঠো চাঁদ

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি– খড়– নাড়া– মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল !
মেঠো চাঁদ– কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা–
চেয়ে আছে; এমনি সে তাকায়েছে কতো রাত– নাই লেখা-জোখা
মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
খেতে-খেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে– ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে– চ'লে গেছে কবে !
শস্য ফলিয়া গেছে– তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা ! ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া– পোড়ো জমি– মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল !'...
আমি তারে বলি :
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কতো–
বুড়ো হ'য়ে গেছো তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো !
খেতে-খেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতোবার– কতোবার ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে– চ'লে গেছে কবে !
শস্য ফলিয়া গেছে– তুমি কেন তবে
রয়েছো দাঁড়ায়ে
একা-একা ! ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি– খড়-নাড়া– মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল !'

## পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে–
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
হিম হ'য়ে আসে
বাঁশপাতা– মরা ঘাস– আকাশের তারা;
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা;
ধানখেতে– মাঠে
জমিছে কুয়াটে
ধারালো কুয়াশা;
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী–
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ।
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রাণের রাতে
সেই পাখি;

আজ মনে পড়ে
সেদিনো এমনি গেছে ঘরে
প্রথম ফসল;
মাঠে-মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর,
কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুর;
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে,
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিলো অঘ্রাণের রাতে
এই পাখি।
নদীটির শ্বাসে
সে-রাতেও হিম হ'য়ে আসে

বাঁশপাতা– মরা ঘাস– আকাশের তারা,
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা;
ধানখেতে– মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা;
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ-ঘুমের
কোনো সাধ।

## পঁচিশ বছর পরে

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে–
বলিলাম– 'একদিন এমন সময়
আবার আসিও তুমি– আসিবার ইচ্ছা যদি হয়–
পঁচিশ বছর পরে।'
এই ব'লে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে;
তারপর, কতোবার চাঁদ আর তারা
মাঠে-মাঠে ম'রে গেলো, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানখেত খুঁজে
এলো গেলো; চোখ বুজে
কতোবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িলো ঘুমায়ে
কতো-কেউ; রহিলাম জেগে
আমি একা; নক্ষত্র যে-বেগে
ছুটিছে আকাশে
তার চেয়ে আগে চ'লে আসে
যদিও সময়,
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয় !

তারপর– একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে– পথের উপর

পাখির ডিমের খোলা, ঠোঁট– কড়কড়;
শসাফুল– দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,–
মাকড়ের ছেঁড়া জাল– শুকনো মাকড়সা
লতায়– পাতায়;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়– ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, ঝুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

## কার্তিক মাঠের চাঁদ

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ–
পাহাড়ের মতো ওই মেঘ
সঙ্গে ল'য়ে আসে
মাঝরাতে কিংবা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে,
– মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিলো যারে;
ছেঁড়া-ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মতো– আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়–
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে– চাঁদ;
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা– তারপর হাতছাড়া হ'য়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে– আজো তুমি তার স্বাদ ল'য়ে
আর-একবার তবু দাঁড়ায়েছো এসে !
নিড়ানো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারদিকে,
শস্যের ক্ষেত চ'ষে-চ'ষে
গেছে চাষা চ'লে;
তাদের মাটির গন্ধ– তাদের মাঠের গন্ধ সব শেষ হ'লে
অনেক তবুও থাকে বাকি–
তুমি জানো– এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি !

## সহজ

আমার এ-গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে–

আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,
তবুও হৃদয়ে গান আসে
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি–
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে;
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান;
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা, জানি আমি–
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে–
তবুও হৃদয়ে গান আসে।

তুমি জল, তুমি ঢেউ– সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ– তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে;
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিলো লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে; কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে; রাত্রির সিন্ধুর জল
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক; তোমারে কে ভালোবাসে; তোমারে কি কেউ
বুকে ক'রে রাখে।
জলের আবেগে তুমি চ'লে যাও–
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু-ধু জল তোমারে যে ডাকে

তুমি শুধু একদিন, এক রজনীর;
মানুষের– মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে– কতো দূরে–
কোন্ সমুদ্রের পারে, বনে– মাঠে– কিংবা যে-আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে–
কিংবা যে-আকাশে
কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে– ডুবে যায়– তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে;
যেখানে গাছের শাখা নড়ে

শীত রাতে– মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন–
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে ল'য়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান–
তুমি সেইখানে।
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে,
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যতো।

## কয়েকটি লাইন

কেউ যাহা জনে নাই– কোনো এক বাণী–
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছো যে-সুর–
ফুরায়েছে,– পুরানো তা– কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,– আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার;– শেষ মুহূর্তের
আমি এক;– সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো,–
নতুন এ– আর সব হারানো– পুরোনো।

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো দুর্দশার গান,
যে-কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভ'রে,–
সেই কবি– সেও যাবে স'রে;
যে-কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ
যে বুঝেছে,– প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে,– সেও যাবে স'রে;

একে-একে সবি
ডুবে যাবে;– উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবে না কেউ আরো ?
যেই দিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী পাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে ?
কিংবা যদি গায়,– পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা ছিলো সত্য তার ?
আনন্দের আবর্তনে আজিকে আবার
সেদিনের পুরানো আঘাত
ভুলিবে সে ? ব্যথা যারা স'য়ে গেছে রাত্রি-দিন
তাহাদের আর্ত ডান হাত
ঘুম ভেঙে জানাবে নিষেধ;
সব ক্লেশ আনন্দের ভেদ
ভুল মনে হবে;
সৃষ্টির বুকের 'পরে ব্যথা লেগে রবে,
শয়তানের সুন্দর কপালে
পাপের ছাপের মতো সেইদিনো !–
মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে,
রোগা পায়ে করে পাইচারি,
দেয়ালে যাদের ছায়া পড়ে সারি-সারি
সৃষ্টির দেয়ালে,–
আহ্লাদ কি পায় নাই তারা কোনো কালে ?
যেই উড়ো উৎসাহের উৎসবের রব
ভেসে আসে– তাই শুনে জাগেনি উৎসব ?
তবে কেন বিহ্বলের গান
গায় তারা !– বলে কেন, আমাদের প্রাণ
পথের আহত
মাছিদের মতো !

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো ব্যর্থতার গান;
শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান,–
তাই আসি,
নানা কাজ তার
আমরা মিটায়ে যাই,–
জাগিবার কাল আছে– দরকার আছে ঘুমাবার;–
এই সফলতা
আমাদের;– আকাশ কহিছে কোন্ কথা

নক্ষত্রের কানে ?–
আনন্দের ? দুর্দশার ?– পড়ি নাকো।– সৃষ্টির আহ্বানে
আসিয়াছি।
সময়সিন্ধুর মতো
তুমিও আমার মতো সমুদ্রের পানে, জানি, রয়েছো তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে,–
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার– আমার !
জানি না তো কোন্ কথা কও তুমি ফেনার কাপড়ে বুক ঢেকে,
ওপারের থেকে;
সমুদ্রের কানে
কোন্ কথা কই আমি এই পারে– সে কি কিছু জানে ?
আমিও তোমার মতো রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার আমার।

কোথাও রয়েছো, জানি, তোমারে তবুও আমি ফেলেছি হারায়ে;
পথ চলি– ঢেউ ভেজে পায়ে;
রাতের বাতাস ভেসে আসে,
আকাশে-আকাশে
নক্ষত্রের পারে
এই হাওয়া যেন হা-হা করে !
হু-হু ক'রে ওঠে অন্ধকার !
কোন্ রাত্রি– আঁধারের 'পার
আজ সে খুঁজিছে !
কতো রাত ঝ'রে গেছে,– নিচে– তারো নিচে
কোন্ রাত– কোন্ অন্ধকার
একবার এসেছিলো,– আসিবে না আর।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু– ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর !
অন্ধকার– নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা,

যেতেছো জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে– ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছো জলের মতন,–
রাতের বাতাস তুমি,– বাতাসের সিন্ধু– ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর !

গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে
যেখানে সমস্ত রাত ভ'রে,
নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে
যেইখানে,
পৃথিবীর কানে
শস্য গায় গান,
সোনার মতন ধান
ফলে ওঠে যেইখানে,–
একদিন– হয়তো– কে জানে
তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মতো চুপে থামি
সেইখানে রবো প'ড়ে !–
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
গান গায় সিন্ধু তার জলের উল্লাসে।

ঘুমাতে চাও কি তুমি ?
অন্ধকারে ঘুমাতে কি চাই ?–
ঢেউয়ের গানের শব্দ
সেখানে ফেনার গন্ধ নাই ?
কেহ নাই,– আঙুলের হাতের পরশ
সেইখানে নাই আর,–
রূপ যেই স্বপ্ন আনে,– স্বপ্নে বুকে জাগায় যে-রস
সেইখানে নাই তাহা কিছু;
ঢেউয়ের গানের শব্দ
যেখানে ফেনার গন্ধ নাই–
ঘুমাতে চাও কি তুমি ?
সেই অন্ধকারে আমি ঘুমাতে কি চাই !
তোমারে পাবো কি আমি কোনোদিন ?– নক্ষত্রের তলে
অনেক চলার পথ,– সমুদ্রের জলে
গানের অনেক সুর– গানের অনেক সুর বাজে,–

ফুরাবে এ-সব, তবু– তুমি যেই কাজে
ব্যস্ত আজ– ফুরাবে না, জানি;
একদিন তবু তুমি তোমার আঁচলখানি
টেনে লবে; যেটুকু করার ছিলো সেইদিন হ'য়ে গেছে শেষ,
আমার এ সমুদ্রের দেশ
হয়তো হয়েছে স্তব্ধ সেইদিন,– আমার এ নক্ষত্রের রাত
হয়তো সরিয়া গেছে– তবু তুমি আসিবে হঠাৎ;
গানের অনেক সুর– গানের অনেক সুর সমুদ্রের জলে,
অনেক চলার পথ নক্ষত্রের তলে !

আমার নিকট থেকে,
তোমারে নিয়েছে কেটে কখন সময় !
চাঁদ জেগে রয়
তারা-ভরা আকাশের তলে,
জীবন সবুজ হ'য়ে ফলে,
শিশিরের শব্দে গান গায়
অন্ধকার,– আবেগ জানায়
রাতের বাতাস !
মাটি ধুলো কাজ করে,– মাঠে-মাঠে ঘাস
নিবিড়– গভীর হ'য়ে ফলে !
তারা-ভরা আকাশের তলে
চাঁদ তার আকাঙ্ক্ষার স্থল খুঁজে লয়,–
আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।

একদিন দিয়েছিলে যেই ভালোবাসা,
ভুলে গেছে: আজ তার ভাষা !
জানি আমি,– তাই
আমিও ভুলিয়া যেতে চাই
একদিন পেয়েছি যে ভালোবাসা
তার স্মৃতি– আর তার ভাষা;
পৃথিবীতে যতো ক্লান্তি আছে,
একবার কাছে এসে আসিতে চায় না আর কাছে
যে-মুহূর্ত;–
একবার হ'য়ে গেছে, তাই যাহা গিয়েছে ফুরায়ে
একবার হেঁটেছে যে,– তাই যার পায়ে
চলিবার শক্তি আর নাই;
সবচেয়ে শীত,– তৃপ্ত তাই।

কেন আমি গান গাই ?

[illegible] এই ভাষা
বলি আমি !– এমন পিপাসা
বার-বার কেন জাগে !
প'ড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়।

## অনেক আকাশ

গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে– সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়,– সেখানে সে কারে ভালোবাসে !–
পাখির মতন কেঁপে– ডানা মেলে– হিম চোখ বুজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে-উড়ে ঘর ছেড়ে কতো দিকে গিয়েছে সে ভেসে,–
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে, তবু– ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে,
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিলো হেসে !

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
ক'মে যায়; তাই নীল আকাশের স্বাদ– সচ্ছলতা–
পূর্ণ ক'রে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর;
মানুষের অন্তরের অবসাদ– মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায়; – নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে–
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন যে এক অধীরতা,
তাই ল'য়ে সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মতো রবো নক্ষত্রের সাথে !

আমারে দিয়েছো তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি,– তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা !
আমারে করেছো তুমি অসহিষ্ণু– ব্যর্থ– চমৎকার !
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার-বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে-কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায় !
একাকী মেঘের মতো ভেসেছে সে– বৈকালের আলোয়– সন্ধ্যায় !

সে এসে পাখির মতো স্থির হ'য়ে বাঁধে নাই নীড়,–
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর– অস্থিরতা !
অধীর অন্তর তারে করিয়াছে অস্থির-অধীর !
তাহারি হৃদয় তারে দিয়েছে ব্যাধের মতো ব্যথা !
একবার তাই নীল আকাশের আলোর গাঢ়তা
তাহারে করেছে মুগ্ধ– অন্ধকার নক্ষত্র আবার
তাহারে নিয়েছে ডেকে,– জেনেছে সে এই চঞ্চলতা
জীবনের; উড়ে-উড়ে দেখেছে সে মরণের পার
এই উদ্বেলতা ল'য়ে নিশীথের সমুদ্রের মতো চমৎকার !

গোধূলির আলো ল'য়ে দুপুরে সে করিয়াছে খেলা,
স্বপ্ন দিয়ে দুই চোখ একা-একা রেখেছে সে ঢাকি;
আকাশে আঁধার কেটে গিয়েছে যখন ভোরবেলা
সবাই এসেছে পথে, আসে নাই তবু সেই পাখি !–
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,
ছায়ার উপরে তার নিজের পাখার ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপনের 'পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি !
সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে !

কেউ তারে দ্যাখে নাই;– মানুষের পথ ছেড়ে দূরে
হাড়ের মতন শাখা ছায়ার মতন পাতা ল'য়ে
যেইখানে পৃথিবীর মানুষের মতো ক্ষুব্ধ হ'য়ে
কথা কয়,– আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে ব'য়ে
হেমন্তের নদী, ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে
হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিঃশ্বাস,–
তাহাদের মতো হ'য়ে তাহাদের সাথে গেছি র'য়ে;
দূরে প'ড়ে পৃথিবীর ধূলা-মাটি-নদী-মাঠ-ঘাস–
পৃথিবীর সিন্ধু দূরে,– আরো দূরে পৃথিবীর মেঘের আকাশ !

এখানে দেখেছি আমি জাগিয়াছো হে তুমি ক্ষমতা,
সুন্দর মুখের চেয়ে তুমি আরো ভীষণ– সুন্দর !
ঝড়ের হাওয়ার চেয়ে আরো শক্তি– আরো ভীষণতা
আমারে দিয়েছে ভয় ! এইখানে পাহাড়ের 'পর
তুমি এসে বসিয়াছো,– এইখানে অশান্ত সাগর
তোমারে এনেছে ডেকে– হে ক্ষমতা, তোমার বেদনা
পাহাড়ের বনে-বনে তুলিতেছে উত্তরের ঝড়
আকাশের চোখে-মুখে তুলিতেছে বিদ্যুতের ফণা
তোমার স্ফুলিঙ্গ আমি, ওগো শক্তি,– উল্লাসের মতন যন্ত্রণা !

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন
প্রেমিকের হৃদয়ের গানের মতন কেঁপে উঠে
তোমারে প্রাণের কাছে একদিন পেয়েছে কখন !
সন্ধ্যার আলোর মতো পশ্চিম মেঘের বুকে ফুটে,
আঁধার রাতের মতো তারার আলোর দিকে ছুটে,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ঝড়ের হাওয়ার কোলে জেগে
সব আকাঙ্ক্ষার বাঁধ একবার গেছে তার টুটে !
বিদ্যুতের পিছে-পিছে ছুটে গেছি বিদ্যুতের বেগে !
নক্ষত্রের মতো আমি আকাশের নক্ষত্রের বুকে গেছি লেগে !

যে-মুহূর্ত চ'লে গেছে,– জীবনের যেই দিনগুলি
ফুরায়ে গিয়েছে সব, একবার আসে তারা ফিরে;
তোমার পায়ের চাপে তাদের করেছো তুমি ধূলি !
তোমার আঘাত দিয়ে তাদের গিয়েছো তুমি ছিঁড়ে !
হে ক্ষমতা, মনের ব্যথার মতো তাদের শরীরে
নিমেষে-নিমেষে তুমি কতোবার উঠেছিলে জেগে !
তারা সব চ'লে গেছে;– ভূতুড়ে পাতার মতো ভিড়ে
উত্তর-হাওয়ার মতো তুমি আজো রহিয়াছো লেগে !
যে-সময় চ'লে গেছে তাও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে– আবেগে !

তুমি কাজ ক'রে যাও, ওগো শক্তি, তোমার মতন !
আমারে তোমার হাতে একাকী দিয়েছি আমি ছেড়ে;
বেদনা-উল্লাসে তাই সমুদ্রের মতো ভরে মন !–
তাই কৌতূহল– তাই ক্ষুধা এসে হৃদয়েরে ঘেরে,
জোনাকির পথ ধ'রে তাই আকাশের নক্ষত্রেরে
দেখিতে চেয়েছি আমি,– নিরাশার কোলে ব'সে একা
চেয়েছি আশারে আমি,– বাঁধনের হাতে হেরে-হেরে
চাহিয়াছি আকাশের মতো এক অগাধের দেখা !–
ভোরের মেঘের ঢেউয়ে মুছে দিয়ে রাতের মেঘের কালো রেখা !

আমি প্রণয়িনী,– তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী !
আমার সকল প্রেম উঠেছে চোখের জলে ভেসে !–
প্রতিধ্বনির মতো হে ধ্বনি, তোমার কথা কহি
কেঁপে উঠে– হৃদয়ের সে যে কতো আবেগে আবেশে !
সব ছেড়ে দিয়ে আমি তোমারে একাকী ভালোবেসে
তোমার ছায়ার মতো ফিরিয়াছি তোমার পিছনে !
তবু হারায়ে গেছো,– হঠাৎ কখন কাছে এসে
প্রেমিকের মতো তুমি মিশেছো আমার মনে-মনে
বিদ্যুৎ জ্বালায়ে গেছো,– আগুন নিভায়ে গেছো হঠাৎ গোপনে !

কেন তুমি আসো যাও ?– হে অস্থির, হবে নাকি ধীর !
কোনোদিন ?– রৌদ্রের মতন তুমি সাগরের 'পরে
একবার– দুইবার জ্ব'লে উঠে হতেছো অস্থির !–
তারপর, চ'লে যাও কোন্ দূরে পশ্চিমে– উত্তরে,–
সেখানে মেঘের মুখে চুমো খাও ঘুমের ভিতরে,
ইন্দ্রধনুকের মতো তুমি সেইখানে উঠিতেছো জ্ব'লে,
চাঁদের আলোর মতো একবার রাত্রির সাগরে
খেলা করো,– জ্যোৎস্না চ'লে যায়,– তবু তুমি যাও চ'লে
তার আগে; যা বলেছো একবার, যাবে নাকি আবার তা ব'লে !

যা পেয়েছি একবার, পাবো নাকি আবার তা খুঁজে !
যেইরাত্রি যেইদিন একবার ক'য়ে গেলো কথা
আমি চোখ বুজিবার আগে তারা গেলো চোখ বুজে,
ক্ষীণ হ'য়ে নিভে গেলো সলিতার আলোর স্পষ্টতা !
ব্যথার বুকের 'পরে আর এক ব্যথা-বিহ্বলতা
নেমে এলো;– উল্লাস ফুরায়ে গেলো নতুন উৎসবে;
আলো-অন্ধকার দিয়ে বুনিতেছি শুধু এই ব্যথা,
দুলিতেছি এই ব্যথা-উল্লাসের সিন্ধুর বিপ্লবে !
সব শেষ হবে;– তবু আলোড়ন,– তা কি শেষ হবে !

সকল যেতেছে চ'লে,– সব যায় নিভে– মুছে– ভেসে–
যে সুর থেমেছে তার স্মৃতি তবু বুকে জেগে রয় !
যে নদী হারায়ে যায় অন্ধকারে– রাতে– নিরুদ্দেশে,
তাহার চঞ্চল জল স্তব্ধ হ'য়ে কাঁপায় হৃদয় !
যে মুখ মিলায়ে যায় আবার ফিরিতে তারে হয়
গোপনে চোখের 'পরে,– ব্যথিতের স্বপ্নের মতন !
ঘুমন্তের এই অশ্রু– কোন্ পীড়া– সে কোন্ বিস্ময়
জানায়ে দিতেছে এসে !– রাত্রি-দিন আমাদের মন
বর্তমান অতীতের গুহা ধ'রে একা-একা ফিরিছে এমন !

আমরা মেঘের মতো হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে– একবার পৃথিবীর পানে
চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মতো চুপে-চুপে ভেসে
চ'লে যাই এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোন্ দিকে পথ বেয়ে !– আমাদের কেউ কি তা জানে।
ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চ'লে যাই; কোন্ এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে ?
পাখির মায়ের মতো আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে,– অন্ধকারে,– অন্য-কারো আকাশের থেকে !

একদিন বুজিবে কি চারিদিকে রাত্রির গহ্বর !–
নিবন্ত বাতির বুকে চুপে-চুপে যেমন আঁধার
চ'লে আসে, ভালোবেসে– নুয়ে তার চোখের উপর
চুমো খায়, তারপর তারে কোলে টেনে লয় তার;–
মাথার সকল স্বপ্ন,– হৃদয়ের সকল সঞ্চার
একদিন সেই শূন্য সেই শীত-নদীর উপরে
ফুরাবে কি ?– দুলে-দুলে অন্ধকারে তবুও আবার
আমার রক্তের ক্ষুধা নদীর ঢেউয়ের মতো স্বরে
গান গাবে,– আকাশ উঠিবে কেঁপে আবার সে সংগীতের ঝড়ে !

পৃথিবীর– আকাশের পুরানো কে আত্মার মতন
জেগে আছি;– বাতাসের সাথে-সাথে আমি চলি ভেসে,
পাহাড়ে হাওয়ার মতো ফিরিতেছে একা-একা মন,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো দুপুরের সমুদ্রের শেষে
চলিতেছে;– কোন্ এক দূর দেশ– কোন্ নিরুদ্দেশে
জন্ম তার হয়েছিলো,– সেইখানে উঠেছে সে বেড়ে;
দেহের ছায়ার মতো আমার মনের সাথে মেশে
কোন্ স্বপ্ন !– এ-আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে
খুঁজে ফিরি !– গুহার হাওয়ার মতো বন্দী হ'য়ে মন তব ফেরে !

গাছের শাখার জালে এলোমেলো আঁধারের মতো
হৃদয় খুঁজিছে পথ, ভেসে-ভেসে,– সে যে কারে চায় !
হিমের হাওয়ার হাত তার হাড় করিছে আহত,–
সেও কি শাখার মতো– পাতার মতন ঝ'রে যায় !
বনের বুকের গান তার মতো শব্দ ক'রে গায় !
হৃদয়ের সুর তার সে যে কবে ফেলেছে হারায়ে !
অন্তরের আকাঙ্ক্ষারে– স্বপনেরে বিদায় জানায়
জীবন-মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে একাকী দাঁড়ায়ে;
ঢেউয়ের ফেনার মতো ক্লান্ত হ'য়ে মিশিবে কি সে-ঢেউয়ের গায়ে !

হয়তো সে মিশে গেছে– তারে খুঁজে পাবে নাকো কেউ !
কেন যে সে এসেছিলো পৃথিবীর কেহ কি তা জানে !
শীতের নদীর বুকে অস্থির হয়েছে যেই ঢেউ
শুনেছে সে উষ্ণ গান সমুদ্রের জলের আহ্বানে !
বিদ্যুতের মতো অল্প আয়ু তবু ছিলো তার প্রাণে,
যে ঝড় ফুরায়ে যায় তাহার মতন বেগ ল'য়ে
যে প্রেম হয়েছে ক্ষুব্ধ সেই ব্যর্থ প্রেমিকের গানে
মিলায়েছে গান তার,– তারপর চ'লে গেছে ব'য়ে।
সন্ধ্যার মেঘের রঙ কখন গিয়েছে তার অন্ধকার হ'য়ে !

তবুও নক্ষত্র এক জেগে আছে, সে যে তারে ডাকে !
পৃথিবী চায়নি যারে, মানুষ করেছে যারে ভয়
অনেক গভীর রাতে তারায়-তারায় মুখ ঢাকে
তবুও সে !– কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়
তাহার মানুষ-চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয় !
মানুষীর মতো ? কিংবা আকাশের তারাটির মতো–
সেই দূর-প্রণয়িনী আমাদের পৃথিবীর নয় !
তার দৃষ্টি-তাড়নায় আমারে করেছে যে ব্যাহত–
ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মতো বিষম সে ক্ষত !

আলো আর অন্ধকারে তার ব্যথা-বিহ্বলতা লেগে,
তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল !–
মেঘের চিলের মতো– দুরন্ত চিতার মতো বেগে
ছুটে যাই;– পিছে ছুটে আসিতেছে বৈকাল-সকাল
পৃথিবীর;– যেন কোন্ মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল
কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে ! কেঁপে-কেঁপে পড়িতেছে ঝ'রে !
আরো কাছে আসিয়াছি তবু আজ– আরো কাছে কাল
আসিব তবুও আমি,– দিন-রাত্রি রয় পিছে প'ড়ে,–
তারপর একদিন কুয়াশার মতো সব বাধা যাবে স'রে !

সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বার-বার !
কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা,– বুঝেছে তা মন–
চারিদিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার !
একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে !– অধীর ঢেউয়ের মতো ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে ওই দূর নক্ষত্রের পার !
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে !

## পরস্পর

মনে প'ড়ে গেলো এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম,– শোনো তবে,–
শুনিতে লাগিলো সবে,
শুনিলো কুমার;
কহিলাম,– দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমোনো সে এক মেয়ে– নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে;

সেইখানে আর নাই কেহ,–
এক ঘরে পালঙ্কের 'পরে শুধু একখানা দেহ
প'ড়ে আছে;– পৃথিবীর পথে-পথে রূপ খুঁজে-খুঁজে
তারপর,– তারে আমি দেখেছি গো,– সেও চোখ বুজে
প'ড়ে ছিলো;– মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাত-দুটি
বুকের উপরে তার রয়েছিলো উঠি !
আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দু-পায়ে,
পাথরের মতো শাদা গায়ে
এর যেন কোনোদিন ছিলো না হৃদয়–
কিংবা ছিলো– আমার জন্য তা নয় !
আমি গিয়ে তাই তারে পারিনি জাগাতে,
পাষাণের মতো হাত পাষাণের হাতে
রয়েছে আড়ষ্ট হ'য়ে লেগে;
তবুও,– হয়তো তবু উঠিবে সে জেগে
তুমি যদি হাত দুটি ধরো গিয়ে তার !–
ফুরালাম রূপকথা, শুনিলো কুমার।
তারপর, কহিলো কুমার,
আমিও দেখেছি তারে,– বসন্তসেনার
মতো সেইজন নয়,– কিংবা হবে তাই–
ঘুমন্ত দেশের সেও বসন্তসেনাই !
মনে পড়ে,– শোনো,– মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে,–
(পদ্মা– ভাগীরথী– মেঘ্না– কোন্ নদী যে সে–
সে সব জানি কি আমি !– হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই,–
আমি তবু তার পাড়ে আজো তো দাঁড়াই !)
সেদিন তারার আলো– আর নিবু-নিবু জ্যোৎস্নায়
পথ দেখে, যেইখানে নদী ভেসে যায়
কান দিয়ে তার শব্দ শুনে,
দাঁড়ায়েছিলাম গিয়ে মাঘরাতে,– কিংবা ফাল্গুনে।
দেশ ছেড়ে শীত যায় চ'লে
সে সময়,– প্রথম দখিনে এসে পড়িতেছে ব'লে
রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায়,
আমারো চোখের ঘুম খসেছিলো হায়,–
বসন্তের দেশে
জীবনের যৌবনের !– আমি জেগে,– ঘুমন্ত শুয়ে সে !
জমানো ফেনার মতো দ্যাখা গেলো তারে
নদীর কিনারে !
হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন

শুয়ে আছে,- শুয়ে আছে- শাদা হাতে ধবধবে স্তন
রেখেছে সে ঢেকে !
বাকিটুকু,- থাক- আহা, একজনে দ্যাখে শুধু - দ্যাখে না অনেকে
এই ছবি !
দিনের আলোয় তার মুছে যায় সবি !
আজো তবু খুঁজি
কোথায় ঘুমন্ত তুমি চোখ আছো বুজি !

কুমারের শেষ হ'লে পরে,--
আর-এক দেশের এক রূপকথা বলিলো আর-একজন,
কহিলো সে,-- উত্তর-সাগরে
আর নাই কেউ !--
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনিচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে; কখন জেগেছে তারা-- তারপর ঘুমালো কখন !
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা-- শাদা,--
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে-জড়ায়ে যায় সাগরের জলে !
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে !
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,-- শাদা,-- বরফের কুঁচির মতন !
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,--
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল !
কাচের গুঁড়ার মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর-সাগরে !
পায়ে-চলা পথ ছেড়ে ভাসে তারা সাগরের গায়ে,--
কাঁকরের রক্ত কই তাহাদের পায়ে !
রুপার মতন চুল তাহাদের ঝিক্‌মিক্ করে
উত্তর-সাগরে !
বরফের কুঁচির মতন
সেই জল-মেয়েদের স্তন !
মুখ-বুক ভিজে,
ফেনার শেমিজে
শরীর পিছল !
কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে

উত্তর-সাগরে !
উত্তর-সাগরে !

সবাই থামিলে পরে মনে হ'লো একদিন আমি যাবো চ'লে
কল্পনার গল্প সব ব'লে;
তারপর; শীত-হেমন্তের শেষে বসন্তের দিন
আবার তো এসে যাবে;
এক কবি,– তন্ময়,– শৌখিন,–
আবার তো জন্ম নেবে আমাদের দেশে !
আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা,– পরীর মতন এক ঘুমোনো মেয়ে সে
হীরের ছুরির মতো গায়ে
আরো ধার লবে সে শানায়ে !
সেইদিনো তার কাছে হয়তো রবে না আর কেউ,–
মেঘের মতন চুল,– তার সে চুলের ঢেউ
এমনি পড়িয়া রবে পালঙ্কের 'পর,–
ধূপের ধোঁয়ার মতো ধলা সেই পুরীর ভিতর।
চারপাশে তার
রাজা– যুবরাজ– জেতা– যোদ্ধাদের হাড়
গড়েছে পাহাড় !
এ রূপকথার এই রূপসীর ছবি
তুমিও দেখিবে এসে,–
তুমিও দেখিবে এসে কবি !
পাথরের হাতে তার রাখিবে তো হাত,–
শরীরে ননীর ছিরি,– ছুঁয়ে দেখো– চোখা ছুরি– ধারালো হাতির দাঁত !
হাড়েরি কাঠামো শুধু,– তার মাঝে কোনোদিন হৃদয়-মমতা
ছিলো কই !– তবু, সে কি জেগে যাবে ? কবে সে কি কথা
তোমার রক্তের তাপ পেয়ে ?–
আমার কথার এই মেয়ে,–এই মেয়ে !
কে যেন উঠিলো ব'লে,– তোমরা তো বলো রূপকথা–
তেপান্তরে গল্প সব,– ওর কিছু আছে নিশ্চয়তা !
হয়তো অমনি হবে,– দেখিনিকো তাহা;
কিন্তু, শোনো– স্বপ্ন নয়– আমাদেরি দেশে কবে, আহা !–
যেখানে মায়াবী নাই,– জাদু নাই কোনো,–
এ দেশের– গাল নয়,– গল্প নয়, দু-একটা শাদা কথা শোনো !
সেও এক রোদে লাল দিন,
রোদে লাল,– সবুজীর গানে-গানে সহজ স্বাধীন
একদিন,– সেই একদিন !
ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো চোখে,
ছেঁড়া করবীর মতো মেঘের আলোকে

চেয়ে দেখি রূপসী কে প'ড়ে আছে খাটের উপরে !
মায়াবীর ঘরে
ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে-চেয়ে
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর,– মানুষের দেশের মতন;
রূপ ঝ'রে যায়,– তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন,–
যে যৌবন ছিঁড়ে-ফেঁড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে !–
শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে,
ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে,– অসুখে !–
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা– ভিতরে অসুখ !
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে !–
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর,– ফোঁপরার মতো ক'রে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে !...
সবাই উঠিলো ব'লে,– ঠিক– ঠিক– ঠিক !
আবার বলিলো সেই সৌন্দর্যতান্ত্রিক,–
আমায় বলেছে সে কি শোনো,–
আর একজন এই,–
পরী নয়,– মানুষও সে হয়নি এখনো,–
বলেছে সে– কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে ?– আসিবে তো ?– তুমি আসিবে তো !
দেখা যদি পেতো !
নিকটে বসায়ে
কালো খোঁপা ফেলিতো খসায়ে–
কী কথা বলিতে গিয়ে থেমে যেতো শেষে
ফিক্ করে হেসে !
তবু, আরো কথা
বলিতে আসিতো,– তবু, সব প্রগল্‌ভতা
থেমে যেতো !
খোঁপা বেঁধে,– ফের খোঁপা ফেলিতো খসায়ে,–
স'রে যেতো, দেয়ালের গায়ে
রহিতো দাঁড়ায়ে !
রাত ঢের,– বাড়িবে আরো কি
এই রাত !– বেড়ে যায়,– তবু চোখাচোখি

হয় নাই দেখা
আমাদের দুজনার !– দুইজন,– একা !–
বার-বার চোখ তবু কেন ওর ভ'রে আসে জলে !
কেন বা এমন ক'রে বলে,
কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দ্যাখা হবে ?– আসিবে তো ?– তুমি আসিবে তো !–
আমি না কাঁদিতে কাঁদে... দ্যাখা যদি পেতো !...
দ্যাখা দিয়ে বলিলাম, 'কে গো তুমি ?'– বলিল সে, 'তোমার বকুল,
মনে আছে ?'– 'এগুলো কী, বাসি চাঁপাফুল ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে';– 'ভালোবাসো' ?– হাসি পেলো,– হাসি !
'ফুলগুলো বাসি নয়, আমি শুধু বাসি !'
আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে
নিবানো মাটির বাতি জ্বেলে
চ'লে এলো কাছে,–
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে–
আজো এতো চুল !
চেয়ে দেখি,– দুটো হাত, ক-খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি;
চোখদুটো চুন-চুন,– মুখ খড়ি-খড়ি !
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,–
সব বাসি, সব বাসি,– একেবারে মেকি !

## বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই– মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,– কোন্ এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়– শান্তি নয়– ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়– পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা– প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে

সহজ লোকের মতো; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর; কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর ? শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর ? প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার।
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই; ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে ?
স্বপ্ন নয়,– শান্তি নয়,– কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।
পথে চ'লে পারে– পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে;
আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।

আমি থামি,–
সেও থেমে যায়;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে–
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে– জন্ম দেবে ব'লে;

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি ?
– তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী।

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল ?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল ?
কাস্তে-হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে ?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী-ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা– আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
– এইসব স্বাদ;
– এ-সব পেয়েছি আমি; বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন;
এইসব সাধ
জানিয়াছি একদিন,– অবাধ– অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে– যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন– এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি; যে-নক্ষত্র– নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা– ধুলো আর কাদা।

মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয়– প্রেম নয়– কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !
অবসাদ নাই তার ? নাই তার শান্তির সময় ?
কোনোদিন ঘুমাবে না ? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি ? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন !
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন !
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন !

এই বোধ– শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ– অগাধ !
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে ? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ– গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শস্য– পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
– সেই সব।

## অবসরের গান

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;–
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়।
চারিদিকে এখন সকাল,–
রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল;
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ–

পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান।

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁট-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে !
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া– রোদ– খুদ– কুঁড়ো– কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই– নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই– রূপ ঝ'রে পড়ে তার–
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে;
আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ– ভাঁড়ারের রস।

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলার রৌদ্রে; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ ল'য়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিলো ছড়া !
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;
ভুলে গিয়ে রাজ্য– জয়– সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেবো তার শীতলতা;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব;
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে–
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;
ফলন্ত ধানের গন্ধে– রঙে তার– স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ;
রাগ কেহ করিবে না– আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়– ভালোবাসা আহাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়;
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ– অবসাদ–
আমাদের ডেকে লয়, তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা, অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে খেতে– রোদ গেছে প'ড়ে,
এসেছে বিকেলবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধ'রে;
তখন গিয়েছে থেমে ওই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়;
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার 'পর;
মদের ফোঁটার শেষ হ'য়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর;
তখন সবুজ ঘাস হ'য়ে গেছে শাদা সব, হ'য়ে গেছে আকাশের ধবল,
চ'লে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল !

২

পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হ'য়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের 'পরে;
সবুজ ধানের নিচে– মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চ'লে গেছে; আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা;
শস্যের খেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা।

ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমার গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন;
ফসল– ধানের ফলে যাহাদের মন
ভ'রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা ক'রে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন–
আমাদের পাড়াগাঁর সেইসব ভাঁড়–
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নিচে পৃথিবীর তলে;
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায়নি তাদের সময়;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয়;
প্রণয়ীর মতো তারা ছেঁড়েনি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে;
চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হ'য়ে কপালের ঘামে
কাটায়নি– কাটায়নি কাল;
অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে;
যোদ্ধা– জয়ী– বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে– পাশাপাশি–

জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি !

অনেক রাতের আগে এসে তারা চ'লে গেছে– তাদের দিনের আলো
হয়েছে আঁধার,
সেইসব গেঁয়ো কবি– পাড়াগাঁর ভাঁড়–
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর ?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে ল'য়ে জন্মিয়াছে আজ এই খেতের ফসল;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ওই ইঁদুরেরা জানে তাহা– জানে তাহা
নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল !
সে-সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধ'রে যায় ডেকে-ডেকে ;
মাটির নিচের থেকে তারা
মৃতের মাথার স্বপ্নে ন'ড়ে উঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা !

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে–
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে ;
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর– বন্দর– বস্তি– কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই খেতে;
শরীরের অবসাদ– হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।
শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধ'রে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই ম'রে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি– পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন ;

জমি উপড়ায়ে ফেলে চ'লে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার প'ড়ে আছে– পুরানো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা ওই আমাদের তরে !
হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে–
দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চ'লে যায় চাঁদ;
অবসর আছে তার– অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে।

৩

পুরোনো খেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, কোনো কৃষকের মতো দরকার নেই দূরে
মাঠে গিয়ে আর;
রোধ– অবরোধ– ক্লেশ– কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে–
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং;
দামামা থামায়ে ফেলো– পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ।

এখানে নাহিকো কাজ– উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়।
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন–
জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

এখানে চকিত হ'তে হবে নাকো,– ত্রস্ত হ'য়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই,– এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়;
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে;
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না,–
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতরে।

অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

## ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,–
কাহারে সে ডাকে !

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন;
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে– যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষহরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;
তাহার পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়–
পিপাসার সান্ত্বনায়– আঘ্রাণে– আস্বাদে;
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন;
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারো বুকে জেগেছে বিস্ময়;
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নকটার্ন।

একে-একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের– নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে ওই
সুন্দরী গাছের নিচে– জ্যোৎস্নায়;
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
– তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে-শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা-একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জ'মে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে-শুনে
হরিণীর ডাক শুনে-শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে– আলোয় তাকে দেখা যাবে–
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তাকে এইসব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাবো,
...মাংস-খাওয়া হ'লো তবু শেষ ?
...কেন শেষ হবে ?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি ?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমাকেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়– দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো ?

আমার হৃদয়– এক পুরুষহরিণ–
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়– চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম ওই মৃত মৃগদের মতো

যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে !
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের– বিয়োগের– মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ওই মৃত মৃগদের মতো।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি ?
দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা-একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে-চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে:
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা ম'রে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে– কথা ভেবে-ভেবে।
এই ব্যথা– এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে–
কোথাও ফড়িঙে-কীটে– মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

## জীবন

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর,–
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান !
ফসল উঠিতেছে ফ'লে,– রসে-রসে ভরিছে শিকড়;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ !
সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে !
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ–

সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে !
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে,– তার সাথে সেও আছে জেগে !

২

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিষ্কার আকাশের 'পর
কখন এসেছে রাত্রি !– পশ্চিমের সাগরের জলে
তার শব্দ;– উত্তর সমুদ্র তার,– দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে– তাহার পায়ের কোলাহলে
ভ'রে ওঠে;– এসেছে সে আকাশের নক্ষত্রের তলে
প্রথম যে এসেছিলো, তারি মতো;– তাহার মতন
চোখ তার,– তাহার মতন চুল,– বুকের আঁচলে
প্রথম মেয়ের মতো;– পৃথিবীর নদী মাঠ বন
আবার পেয়েছে তারে,– সমুদ্রের পারে রাত্রি এসেছে এখন !

৩

সে এসেছে,– আকাশের শেষ আলো পশ্চিমের মেঘে
সন্ধ্যার গহ্বর খুঁজে পালায়েছে !– রক্তে-রক্তে লাল
হ'য়ে গেছে বুক তার,– আহত চিতার মতো বেগে
পালায়ে গিয়েছে রোদ,– স'রে গেছে আলোর বৈকাল !
চ'লে গেছে জীবনের 'আজ' এক,– আর এক 'কাল'
আসিতো না যদি আর আলো ল'য়ে– রৌদ্র সঙ্গে ল'য়ে !–
এই রাত্রি– নক্ষত্র সমুদ্র ল'য়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িতো না যদি আর ক্ষ'য়ে–
র'য়ে যেতো,– যে-গান শুনিনি আর তাহার স্মৃতির মতো হ'য়ে !

৪

যে-পাতা সবুজ ছিলো– তবুও হলুদ হ'তে হয়,–
শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে;–
যে মুখ যুবার ছিলো,– তবু যার হ'য়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝ'রে যায়,– প'ড়ে যায় নুয়ে;–
পৃথিবীর এই ব্যথা বিহ্বলতা অন্ধকারে ধুয়ে
পূর্ব সাগরের ঢেউয়ে,– জলে-জলে, পশ্চিম সাগরে
তোমার বিনুনি খুলে,– হেঁট হ'য়ে,– পা তোমার থুয়ে,–
তোমার নক্ষত্র জ্বেলে,– তোমার জলের স্বরে-স্বরে
র'য়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নিচে,– নীল পৃথিবীর 'পরে !

৫

ভোরের সূর্যের আলো পৃথিবীর গুহায় যেমন
মেঘের মতন চুল– অন্ধকার চোখের আস্বাদ
একবার পেতে চায়;– যে-জন রয় না– যেইজন
চ'লে যায়, তারে পেতে আমাদের বুকে যেই সাধ;–
যে ভালোবেসেছে শুধু, হ'য়ে গেছে হৃদয় অবশ
বাতাসের মতো যার,– তাহার বুকের ধন শুনে
মনে যেই ইচ্ছা জাগে;– কোনোদিন দেখে নাই চাঁদ
যেই রাত্রি,– নেমে আসে লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্রের খুনে
যেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখ, চুলে তার চুল নেব বুনে !

৬

তুমি র'য়ে যাবে,– তবু,– অপেক্ষার রয় না সময়
কোনোদিন;– কোনোদিন রবে না সে পথ থেকে স'রে !
সকলেই পথ চলে,– সকলেই ক্লান্ত তবু হয়,–
তবুও দু-জন কই ব'সে থাকে হাতে হাত ধ'রে !
তবুও দু-জন কই কে কাহারে রাখে কোলে ক'রে !
মুখে রক্ত ওঠে– তবু কমে কই বুকের সাহস !
যেতে হবে,– কে এসে চুলের বুঁটি টেনে লয় জোরে !
শরীরের আগে কবে ঝ'রে যায় হৃদয়ের রস !–
তবু,– চলে,– মৃত্যুর ঠোঁটের মতো দেহ যার হয়নি অবশ !

৭

হলদে পাতার মতো আমাদের পথে ওড়াউড়ি !–
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত ল'য়ে খেলা !–
আমরাও ছায়া হ'য়ে,– ভূত হ'য়ে করি ঘোরাঘুরি !
– মনের নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা
সন্ধ্যার অনেক আগে !– দুপুরেই হয়েছি একেলা !
আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন !
বিকালবেলার আগে ভেঙে গেছে বিকলের মেলা–
শরীর রয়েছে, তবু ম'রে গেছে আমাদের মন !
হেমন্ত আসেনি মাঠে,– হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন !

৮

শীত-রাত চের দূরে,– অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে !
শাদা হাতদুটো শাদা হাড় হ'য়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে,– চোখ বুজে তবু কি ভুলিতে

পারি এই দিনগুলো !– আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মতো শীত,– আগুনের মতো তবু জ্বর !
যেই গতি,– সেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে;
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর,–
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে !
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে !

৯

যতোদিন র'য়ে যাই এই শক্তি র'য়ে যায় সাথে,–
বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন !
যে-ফসল নষ্ট হবে তারি খেত উড়াতে-ফুরাতে
আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন !
নতুন বীজের গন্ধে ভ'রে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি,– একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল !–
এরি জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভ'রে অলক্ষিত আকাশের তল !
দুরন্ত চিতার মতো গতি তার– বিদ্যুতের মতো সে চঞ্চল !

১০

অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে অন্তরের তলে,–
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মতো ব'য়ে আসে,
এই শক্তি আগুনের মতো তার জিব তুলে জ্বলে !
ভস্মের মতন তাই হ'য়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে !
জীবন ধোঁয়ার মতো,– জীবন ছায়ার মতো ভাসে;
যে অঙ্গার জ্ব'লে-জ্ব'লে নিভে যাবে,– হ'য়ে যাবে ছাই,–
সাপের মতন বিষ ল'য়ে সেই আগুনের ফাঁসে
জীবন পুড়িয়া যায়;– আমরাও ঝ'রে পুড়ে যাই !
আকাশে নক্ষত্র হ'য়ে জ্বলিবার মতো শক্তি– তবু শক্তি চাই !

১১

জানো তুমি ?– শিখেছো কি আমাদের ব্যর্থতার কথা ?–
হে ক্ষমতা, বুকে তুমি কাজ করো তোমার মতন !–
তুমি আছো,– মরে তুমি,– এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছো কি ?– ওগো মন, মানুষের মন,–
হে ক্ষমতা– বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর– ভীষণ !
মেঘের ঘোড়ার 'পরে আকাশের শিকারির মতো;–
সিন্ধুর সাপের মতো লক্ষ ঢেউয়ে তোলো আলোড়ন !

চমৎকৃত করো,– শরীরেরে তুমি করেছো আহত ;–
যতোই জেগেছো– সেই আমাদের ছিঁড়ে ফেলে চেয়েছে যে ভয়ে ।

১২

তবু তুমি শীত-রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো ভয়ে
হৃদয়ের অন্ধকারে প'ড়ে থাকো,– কুণ্ডলী পাকায়ে ;–
অপেক্ষায় ব'সে থাকি,– স্ফুলিঙ্গের মতো যাবে ছুঁয়ে
কে তোমারে !– ব্যাধের পায়ের পাতা দিয়ে যাবে পায়ে
কে তোমারে !– কোন্ ভাষা, কোন শীষ হতাশায় যাবে
কখন জাগিয়া ওঠো;– স্থির হ'য়ে ব'সে আছি তাই ।
শীত-রাত বাড়ে আরো;– নক্ষত্রেরা যেতেছে হারায়ে,–
ছাইয়ে যে আগুন ছিলো সেইসবো হ'য়ে যায় ছাই ।
তবুও আরেকবার সব ভেঙে অন্তরের আগুন ধরাই ।

১৩

অশান্ত হাওয়ার বুকে তবু আমি মনের মতন
জীবনেরে ছেড়ে দিই !– পাতা আর পল্লবের মতো
জীবন উঠেছে মেতে শূন্যে– ভয়ে; যতোবার মন
ছিঁড়ে গেছে,– হয়েছে সেদের মতো হৃদয় আহত
ততোবার;– উড়ে গেছে শাখা, পাতা প'ড়ে গেছে যতো;–
পৃথিবীর মন হ'য়ে– ঝড়ের পতির মতো হ'য়ে,
বিদ্যুতের মতো হ'য়ে আকাশের মেঘে ইতস্তত;–
একবার মৃত্যু ল'য়ে– একবার জীবনেরে ল'য়ে
ঘূর্ণির মতন ব'য়ে যে বাতাস ছেঁড়ে– তার মতো পেছি ব'য়ে ।

১৪

কোথায় রয়েছে আলো-আঁধারের বীণার আভাস !
ছিন্ন ভগ্ন ঘুমের চোখে এক সুস্থ স্বপ্ন হ'য়ে
জীবন নিয়েছে দাঁড়া;– আকাশের মতন আকাশ
পরিব্যাপ্ত পৃথিবীতে, শিশুর হাতের মতো ব'য়ে
জীবন নিয়েছে দাঁড়া;– চোখে উঠে যেই উষা ল'য়ে
আড়ষ্ট তারার মতো চমকায়ে পেছি শীত-শেষে !
ঘুমায়ে যা দেখি নাই, জেগে উঠে তার স্বপ্ন ল'য়ে
নির্জন হতেছে যেই হৃদয়ের মতো অবশেষে !
– যে-আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মতো প্রাণ আছে জেগে ।

১৫

নক্ষত্র জেনেছে কবে ওই অর্থ শৃঙ্খলার ভাষা !
বীণার তারের মতো উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে
তাদের গতির ছন্দ,– অবিরত শক্তির পিপাসা
তাহাদের,– তবু সব তৃপ্ত হ'য়ে পূর্ণ হ'য়ে আসে !
আমাদের কাজ চলে ইশারায়– আভাসে-আভাসে !
আরম্ভ হয় না কিছু,– সমস্তের তবু শেষ হয়–
কীট যে-ব্যর্থতা জানে পৃথিবীর ধুলো মাটি ঘাসে
তারো বড়ো ব্যর্থতার সাথে রোজ হয় পরিচয় !
যা হয়েছে শেষ হয়,– শেষ হয় কোনোদিন যা হবার নয় !

১৬

সমস্ত পৃথিবী ভ'রে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেলো কবে !– বাসি পাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে !– কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস–
যক্ষ্মার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন !–
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ !
মরণ,– সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে !
বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিচড়ায়– করে প্রাণপণ,–
এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে,–
রাত্রিরে দেখিয়া যায় একবার সমুদ্রের পায়ের আভাসে !–

১৭

মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো বেশিরে বেসে ভালো !
সব সাধ জেনেছে যে সেও চায় এই নিশ্চয়তা !
সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে,– সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জেনেছে,– আর এক ক্ষুধা তবু– এক বিহ্বলতা
তাহারো জানিতে হয় ! এইমতো অন্ধকারে এসে !–
জেগে-জেগে যা জেনেছে– জেনেছে তা– জেগে জেনেছে তা,–
নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে !
সব ভালোবাসা যার বোকা হলো,– দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে !

১৮

কিংবা এই জীবনেরে একবার ভালোবেসে দেখি !–
পৃথিবীর পথে নয়,– এইখানে– এইখানে ব'সে
মানুষ চেয়েছে কিবা ? পেয়েছে কি ?– কিছু পেয়েছে কি !–

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যে ম'রে যেতেছে তার হৃদয়ের সব শেষ শ্বাস
সকল আকাশ আর পৃথিবীর থেকে পড়ে ঝ'রে।
জীবনে চলেছি আমি সে পৃথিবী আকাশের পথ ধ'রে ধ'রে।

২২

রাত্রির ফুলের মতো - ঘুমন্তের হৃদয়ের মতো
অন্তর ঘুমায়ে গেছে, ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন!
সারাদিন বুকে ক্ষুধা ল'য়ে চিতা হয়েছে আহত,—
তারপর,— অন্ধকার গুহা এই— ছায়াতলা বন
পেয়েছে সে! অশান্ত হাওয়ার মতো মানুষের মন
বুঝে গেছে— রাত্রি আর নক্ষত্রের মাঝখানে এসে।—
মৃত্যুর শান্তির ঘ্রাণ এইখানে দিতেছে জীবন,—
জীবনেরে এইখানে একবার দেখি ভালোবেসে!
শুনে দেখি,— কোন্ কথা কয় রাত্রি, কোন্ কথা নক্ষত্র বলে সে!

২৩

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে পেয়ে ভ'রে-
শস্য ফ'লে গেছে মাঠে,— কেটে নিয়ে চ'লে গেছে চাষা,
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা-
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা—
আবার জানায়ে যায়।— কবরের ঘুমের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা-হতাশা,—
বাতাসে ভাসিতেছিলো ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন।—
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেলো মন!

২৪

হলুদ পাতার মতো,— আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে
আলোর বাহির মতো— স্বপ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিলো এই পৃথিবীর সমুদ্র-পাহাড়ে,—
ঢেউ ভেঙে ঝ'রে যায়,— ম'রে যায়,— কে ফেরাতে পারে!
তবুও ইশারা ক'রে ফাল্গুন-রাতের পথে ঝ'রে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে;— হয় নাই— দিতেছে যা হ'য়ে,
মৃত্যুরেও ডাকে তুমি সেই ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা ল'য়ে!

৬৫

দুপুরের নদীর মতো তোমারই তো [illegible] হিমালয় মতন
[illegible] নিবিড় মতো তার [illegible] দুপুরেরই দুপুর,
তোমারই দুঃখের মতো পৃথিবীর পথের জীবন,
অনন্ত তোমার [illegible] পথে [illegible] মতন অনন্ত
তারই [illegible] হিমালয়— [illegible] দুপুর
[illegible] মতন [illegible] তোমার পাশে [illegible]
যে-দুপুর [illegible] তার [illegible] আঁধারে [illegible]
যে-দৌড়ে [illegible] তার [illegible] দুপুরে দুপুরে [illegible]
দুপুরের পথের মতো [illegible] হ'য়ে তার [illegible] [illegible] [illegible]

৬৬

দুপুরের তোমারই [illegible] হিমালয় [illegible] [illegible] হ'য়ে
যে-[illegible] তোমারই [illegible] [illegible] [illegible]
দুপুরের [illegible] মতো দুপুর হ'য়ে [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] যে দুপুর [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৬৭

[illegible], [illegible] [illegible] দুপুর [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৬৮

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

যখন ঝড়ের মতো জীবনের এসেছে আহ্বান !
অধীর ঢেউয়ের মতো– অশান্ত হাওয়ার মতো গান
কোনদিকে ভেসে যায় !– উড়ে যায়,– কয় কোন্ কথা !–
ভোরের আলোয় আজ শিশিরের বুকে যেই ঘ্রাণ,
রহিবে না কাল তার কোনো স্বাদ,– কোনো নিশ্চয়তা !
পাণ্ডুর পাতার রঙ গালে,– তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা !

২৯

যেখানে আসেনি চাষা কোনোদিন কাস্তে হাতে ল'য়ে,
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে,
নিরাশার মতো ফেঁপে চোখ বুজে পলাতক হ'য়ে
প্রেমেরে মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে !
তোমার চোখের 'পরে তাহার মুখেরে ভালোবেসে
এখানে এসেছি আমি,– আর একবার কেঁপে উঠে
অনেক ইচ্ছার বেগে,– শান্তির মতন অবশেষে
সব ঢেউ ভেঙে নিয়ে ফেনার ফুলের মতো ফুটে,
ঘুমাবো বালির 'পরে;– জীবনের দিকে আর যাবো নাকো ছুটে !

৩০

নির্জন রাত্রির মতো শিশিরের গুহার ভিতরে–
পৃথিবীর ভিতরের গহ্বরের মতন নিঃসাড়
রবো আমি;– অনেক গতির পর– আকাঙ্ক্ষার পরে
যেমন থামিতে হয়, বুজে যেতে হয় একবার :–
পৃথিবীর পারে থেকে কবরের মৃত্যুর ওপার
যেমন নিস্তব্ধ শান্ত নিমীলিত শূন্য মনে হয়;–
তেমন আস্বাদ এক কিংবা সেই স্বাদহীনতার
সাথে একবার হবে মুখোমুখি সব পরিচয় !
শীতের নদীর বুকে মৃত জোনকির মুখ তবু সব নয় !

৩১

আবার পিপাসা সব ভূত হ'য়ে পৃথিবীর মাঠে,–
অথবা গ্রহের 'পরে– ছায়া হ'য়ে, ভূত হ'য়ে ভাসে !–
যেমন শীতের রাতে দ্যাখা যায় জ্যোৎস্না ধোঁয়াটে,
ফ্যাকাশে পাতার 'পরে দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাসে;–
যেমন হঠাৎ দুটো কালো পাখা চাঁদের আকাশে

অনেক গভীর রাতে চমকের মতো মনে হয়:
কার পাখা ?– কোন্ পাখি ? পাখি সে কি ! অথচ সে আসে !–
তখন অনেক রাতে কবরের মুখ কথা কয় !–
ঘুমন্ত তখন ঘুমে, জাগিতে হতেছে যার সে জাগিয়া রয় !

৩২

বনের পাতার মতো কুয়াশায় হলুদ না হ'তে,
হেমন্ত আসার আগে হিম হ'য়ে প'ড়ে গেছি ঝ'রে !–
তোমার বুকের 'পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে;
তোমার দুইটি চোখ প্রিয়ার চোখের মতো ক'রে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু,– পথ থেকে ঢের দূরে স'রে
প্রেমের মতন হ'য়ে !– তুমি হবে শান্তির মতন !–
তারপর স'রে যাবো,– তারপর তুমি যাবে ম'রে,–
অধীর বাতাস ল'য়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন !–
মৃত্যুর মতন তবু বুজে যাক,– ঘুমাক মৃত্যুর মতো মন !

৩৩

নির্জন পাতার মতো, আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া মেঘে আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো– রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিলো ওই পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে–
ঢেউ ভেঙে ঝ'রে যায়– ম'রে যায়– কে ফেরাতে পারে !
তবুও ইশারা ক'রে ফাল্গুনরাতের গন্ধে ব'য়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে– হয় নাই– গিয়েছে যা হ'য়ে–
মৃত্যুরেও ডাকো তুমি সেই স্মৃতি-আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা ল'য়ে !

৩৪

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভ'রে–
শস্য ফ'লে গেছে মাঠে– কেটে নিয়ে চ'লে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা–
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা–
আবার জানায়ে যায়– কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা-হতাশা–
বাতাসে ভাসিতেছিলো ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন !–
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেলো মন !

১৩৩৩

তোমার শরীর,–
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;– তারপর,– মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে জানিনি তা,– হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;– ছিঁড়ে গেছি, ফেঁড়ে গেছি,– পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কতো দিন-রাত্রি গেছে কেটে !
কতো দেহ এলো,– গেলো,– হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব;– সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,– সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া !
তোমার শরীর,–
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;– তারপর,– মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে,– ফ'লে গেছে কতোবার, ঝ'রে গেছে তৃণ !

•

আমারে চাও না তুমি আজ আর,– জানি;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ !– তোমার রক্তের ভালোবাসা
দিয়েছো কাহারে !
কে বা সেই !– আমি এই সমুদ্রের পারে
ব'সে আছি একা আজ,– ওই দূর নক্ষত্রের কাছে
আজ আর প্রশ্ন নাই,– মাঝরাতে ঘুম লেগে আছে
চক্ষে তার,– এলোমেলো রয়েছে আকাশ !
উচ্ছৃঙ্খল-বিশৃঙ্খলা !– তারি তলে পৃথিবীর ঘাস
ফ'লে ওঠে,– পৃথিবীর তৃণ
ঝ'রে পড়ে,– পৃথিবীর রাত্রি আর দিন
কেটে যায় !
উচ্ছৃঙ্খল-বিশৃঙ্খলা,– তারি তলে হায় !

•

জানি আমি– আমি যাবো চ'লে
তোমার অনেক আগে;

তারপর,– সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন,–
আকাশে-আকাশে যাবে জ্ব'লে
নক্ষত্র অনেক রাত আরো,
নক্ষত্র অনেক রাত আরো !–
(যদিও তোমারো
রাত্রি আর দিন শেষ হবে
একদিন কবে !)
আমি চ'লে যাবো,– তবু, সমুদ্রের ভাষা
র'য়ে যাবে,– তোমার পিপাসা
ফুরাবে না,– পৃথিবীর ধুলো– মাটি– তৃণ
রহিবে তোমার তরে,– রাত্রি আর দিন
র'য়ে যাবে;– র'য়ে যাবে তোমার শরীর,
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়।

•

আমারে খুঁজিয়াছিলে তুমি একদিন,–
কখন হারায়ে যাই– এই ভয়ে নয়ন মলিন
করেছিলে তুমি !–
জানি আমি;– তবু, এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ– দেহ ঝরে– ঝ'রে যায় মন
তার আগে !
এই বর্তমান,– তার দু-পায়ের দাগে
মুছে যায় পৃথিবীর 'পর
একদিন হয়েছে যা– তার রেখা,– ধুলার অক্ষর !
আমারে হারায়ে আজ চোখ ম্লান করিবে না তুমি,–
জানি আমি;– পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ;–
দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝ'রে যায় মন !

•

আমার পায়ের তলে ঝ'রে যায় তৃণ,–
তার আগে এই রাত্রি-দিন
পড়িতেছে ঝ'রে
এইরাত্রি,– এই দিন রেখেছিলে ভ'রে
তোমার পায়ের শব্দে,– শুনেছি তা আমি !

কখন গিয়েছে তবু থামি
সেইশব্দ !– গেছো তুমি চ'লে
সেইদিন– সেইরাত্রি ফুরায়েছে ব'লে !
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ,–
তবু সেইরাত্রি আর দিন
প'ড়ে গেলো ঝ'রে !–
সেইরাত্রি,– সেইদিন– তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভ'রে !

•

জানি আমি, খুঁজিবে না আজিকে আমারে
তুমি আর;– নক্ষত্রের পারে
যদি আমি চ'লে যাই,
পৃথিবীর ধুলো-মাটি-কাঁকরে হারাই
যদি আমি,–
আমারে খুঁজিতে তবু আসিবে না আজ;
তোমার পায়ের শব্দ গেলো কবে থামি
আমার এ নক্ষত্রের তলে !–
জানি তবু,– নদীর জলের মতো পা তোমার চলে–
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মতো কোনো এক ঢেউয়ের উপরে !
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চ'লে যাই
নক্ষত্রের পারে,–
জানি আমি, তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে !

•

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে !
নক্ষত্র সরিয়া যায়, তবু যদি তোমার দু-পায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথ-চলার পিপাসা !–
একবার ভালোবেসে– যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি সেই ভালোবাসা।
আমার এখানে এসে যেতে যদি থামি !–
কিন্তু তুমি চ'লে গেছো, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে !
নক্ষত্র সরিয়া যায়– তবু কেন আমার এ-পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ– চলার পিপাসা !
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা !

•

চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
আমার এ-পথে– কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।
জানি আমি, আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
তারপর,– কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি !– তাই আসো নাই
আমার এখানে তুমি আর !
একদিন কতো কথা বলেছিলে,– তবু বলিবার
সেইদিনো ছিলো না তো কিছু;– তবু সেইদিন
আমার এ পথে তুমি এসেছিলে,– বলেছিলে কতো কথা,–
কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন;
আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই;
তারপর,– কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি,– তাই আসো নাই !

•

তোমার দু-চোখ দিয়ে একদিন কতোবার চেয়েছো আমারে।
আলো-অন্ধকারে
তোমার পায়ের শব্দ কতোবার শুনিয়াছি আমি !
নিকটে-নিকটে আমি ছিলাম তোমার তবু সেইদিন,–
আজ রাত্রে আসিয়াছি নামি এই দূর সমুদ্রের জলে !
যে-নক্ষত্র দ্যাখো নাই কোনোদিন, দাঁড়ায়েছি আজ তার তলে !
সারাদিন হাঁটিয়াছি আমি পায়ে-পায়ে
বালকের মতো এক,– তারপর, গিয়েছি হারায়ে
সমুদ্রের জলে,
নক্ষত্রের তলে !
রাত্রে,– অন্ধকারে !
– তোমার পায়ের শব্দ শুনিবো না তবু আজ,– জানি আমি,–
আজ তবু আসিবে না খুঁজিতে আমারে !

•

তোমার শরীর,–
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;– তারপর,– মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে জানিনি তা,– হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;– ছিঁড়ে গেছি,– ফেঁড়ে গেছি,– পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কতো দিন-রাত্রি গেছে কেটে !
কতো দেহ এলো,– গেলো,– হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে

দিয়েছি ফিরায়ে সব;– সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,– সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া !

## প্রেম

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো,–
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত
একা-হরিণের মতো আমাদের হৃদয় যখন,
জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হ'লে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মতো শিশিরে-শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি !– ছুটি ল'য়ে চ'লে যায় মন !–
পায়ের পথের মতো ঘুমন্তেরা প'ড়ে আছে কতো,–
তাদের চোখের ঘুম ভেঙে যাবে আবার কখন !–
জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হ'য়ে রয়েছে হৃদয়,–
অনেক জাগার পর এই মতো ঘুমাইতে হয়।

অনেক জেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না জানিতে;
অনেক মেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না মানিতে;
দিন-রাত্রি-গ্রহ-তারা-পৃথিবী-আকাশ ধ'রে-ধ'রে
অনেক উড়েছে যারা অধীর পাখির মতো ক'রে,–
পৃথিবীর বুক থেকে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখির মতো,– প্রবল হাওয়ার মতো জোরে
মৃত্যুও উড়িয়া যায় !– অসাড় হতেছে পাতা শীতে,
হৃদয়ে কুয়াশা আসে– জীবন যেতেছে তাই ক'রে !–
পাখির মতন উড়ে পায়নি যা পৃথিবীর কোলে–
মৃত্যুর চোখের 'পরে চুমো দেয় তাই পাবে ব'লে !

কারণ, সাম্রাজ্য– রাজ্য– সিংহাসন– জয়–
মৃত্যুর মতন নয়,– মৃত্যুর শান্তির মতো নয় !
কারণ, অনেক অশ্রু– রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি জীবনের এই আলো জ্বেলে !
তবুও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মতো জেগে রয় !–
তাহার মতন আলো হৃদয়ের অন্ধকারে পেলে
মানুষের মতো নয়,– নক্ষত্রের মতো হ'তে হয় !

মানুষের মতো হ'য়ে মানুষের মতো চোখ মেলে
মানুষের মতো পায়ে চলিতেছি যতোদিন,– তাই,–
ক্লান্তির পরে ঘুম,– মৃত্যুর মতন শান্তি চাই !

কারণ, যোদ্ধার মতো– অথবা সেনাপতির মতন
জীবন যদিও চলে,– কোলাহল ক'রে চলে মন
যদিও সিন্ধুর মতো দল বেঁধে জীবনের সাথে,
সবুজ বনের মতো উত্তরের বাতাসের হাতে
যদিও বীণার মতো বেজে ওঠে হৃদয়ের বল
একবার– দুইবার– জীবনের অধীর আঘাতে,–
তবু– প্রেম– তবু তারে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে গিয়েছে কখন !
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু !– অঘ্রাণের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চ'লে গেছে ছিঁড়ে !
পাতার মতন ক'রে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে !

তবু পাতা– তবুও পাখির মতো ব্যথা বুকে ল'য়ে,
বনের শাখার মতো– শাখার পাখির মতো হ'য়ে
হিমের হাওয়ার হাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে– অসুস্থ ডানার কোলাহলে,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মতো ব'য়ে,
আগুন জ্বালিয়া গেলে অঙ্গারের মতো তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন !– জীবনের বিহ্বলতা স'য়ে
আমাদের দিন চলে,– আমাদের রাত্রি তবু চলে;
তার ছিঁড়ে গেছে,– তবু তাহারে বীণার মতো ক'রে
বাজাই,– যে-প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধ'রে !

কারণ, সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি;– তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুক !
সুস্থ ক'রে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ !–
পাখির শিশুর মতো যখন প্রেমেরে ডেকে-ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছি মুখ,–
ভোরের আলোর মতো চোখের তারায় তারে দেখে !–
প্রেম কি আসেনি তবু ?– তবে তার ইশারা আসুক !
প্রেম কি চলিয়া যায় প্রাণেরে জলের ঢেউয়ে ছিঁড়ে !
ঢেউয়ের মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে ফিরে !

যতোদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মতো আলো নিয়ে–

তুমি চ'লে আসো প্রেম,– তুমি চ'লে আসো কাছে প্রিয়ে !
নক্ষত্রের বেশি তুমি,– নক্ষত্রের আকাশের মতো !
আমরা ফুরায়ে যাই,– প্রেম, তুমি হও না আহত !
বিদ্যুতের মতো মোরা মেঘের গুহার পথ দিয়ে
চ'লে আসি,– চ'লে যাই,– আকাশের পারে ইতস্তত !–
ভেঙে যাই,– নিভে যাই,– আমরা চলিতে গিয়ে-গিয়ে !
আকাশের মতো তুমি;– আকাশে নক্ষত্র আছে যতো–
তাদের সকল আলো একদিন নিভে গেলে পরে,–
তুমিও কি ডুবে যাবে, ওগো প্রেম, পশ্চিম সাগরে !

জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিনো রবে জেগে,– জানি !
জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি,–
ঘুমন্ত ফুলের মতো নিবন্ত বাতির মতো ঢেলে
মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায়,– তুমি তারে জ্বেলে
চোখের তারার 'পরে তুলে লবে সেই আলোখানি !
সময় ভাসিয়া যাবে,– দেবতা মরিবে অবহেলে,–
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুমো খাবে !– মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি ল'য়ে
পূর্বের সমুদ্র ওই পশ্চিম সাগরে যাবে ব'য়ে !

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায় ভরে মন !
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি,– তোমার আসন
সকল স্থলের 'পরে,– সকল জলের 'পরে আছে !
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম, তোমার !– যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিয়াছো !– অঙ্কুরের মতো তুমি,– যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে !– তুমি ঢেউ,– হাওয়ার মতন !
আগুনের মতো তুমি আসিয়াছো অন্তরের কাছে !
আশার ঠোঁটের মতো নিরাশার ভিজে চোখ চুমি
আমার বুকের 'পরে মুখ রেখে ঘুমায়েছো তুমি !

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছো ব'লে প্রেম,– গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছো ব'লে !
হৃদয় গন্ধের মতো– হৃদয় ধূপের মতো জ্ব'লে
ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে যে করিছে ব্যজন !
ওগো প্রেম,– বাতাসের মতো যেইদিকে যাও চ'লে
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন !

আমি শেষ হবো শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হ'লে !
তুমি যদি বেঁচে থাকো,– জেগে রবো আমি এই পৃথিবীর 'পর,–
যদিও বুকের 'পরে রবে মৃত্যু,– মৃত্যুর কবর !

তবুও,– সিন্ধুর জল– সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ব'য়ে
তুমি চ'লে যাও প্রেম;– একবার বর্তমান হ'য়ে,–
তারপর, আমাদের ফেলে যাও পিছনে– অতীতে,–
স্মৃতির হাড়ের মাঠে,– কার্তিকের শীতে !
অগ্রসর হ'য়ে তুমি চলিতেছো ভবিষ্যৎ ল'য়ে–
আজো যারে দ্যাখো নাই তাহারে তোমার চুমো দিতে
চ'লে যাও !– দেহের ছায়ার মতো তুমি যাও র'য়ে,–
আমরা ধরেছি ছায়া,– প্রেমেরে তো পারিনি ধরিতে !
ধ্বনি চ'লে গেছে দূরে,– প্রতিধ্বনি পিছে প'ড়ে আছে;–
আমরা এসেছি সব,– আমরা এসেছি তার কাছে !

একদিন– একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা !
একরাত– একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা
একদিন– একরাত;– তারপর প্রেম গেছে চ'লে,–
সবাই চলিয়া যায়,– সকলের যেতে হয় ব'লে
তাহারো ফুরালো রাত !– তাড়াতাড়ি প'ড়ে গেলো বেলা
প্রেমেরো যে !– একরাত আর একদিন সাঙ্গ হ'লে
পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হয়েছে সোনেলা !
আকাশে পুবের মেঘে রামধনু গিয়েছিলো জ্ব'লে
একদিন;– রয় না কিছুই তবু,– সব শেষ হয়,–
সময়ের আগে তাই কেটে গেলো প্রেমের সময়;

একদিন– একরাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে !–
আকাশ চলেছে,– তার আগে-আগে প্রেম চলিয়াছে !
সকলের ঘুম আছে– ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে
সকলের;– নক্ষত্রও ঝ'রে যায় মনের অসুখে;–
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে !
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম তোমারে !– মৃতেরা আবার জাগিয়াছে !–
যে-ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা– বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,–
ওগো প্রেম,– সেইসব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে !

## পিপাসার গান

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইবো চ'লে– আরবার আসিবো কি নামি
অনেক পিপাসা ল'য়ে এ-মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে !
কে আমারে ব্যথা দেছে,– কে বা ভালোবাসে,–
সব ভুলে,– শুধু মোর দেহের তালাশে
শুধু মোর স্নায়ু শিরা রক্তের তরে
এ-মাটির 'পরে
আসিবো কি নেমে !
পথে-পথে,– থেমে– থেমে– থেমে
খুঁজিবো কি তারে,–
এখানের আলোয়-আঁধারে
যেইজন বেঁধেছিলো বাসা !–
মাটির শরীরে তার ছিলো যে-পিপাসা,
আর যেই ব্যথা ছিলো,– যেই ঠোঁট, চুল,
যেই চোখ,– যেই হাত,– আর যে-আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা–
যে-দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিলো,– আর তার ধানীসুরা করেছিলো পান,
একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান,
দেখেছে যে ওই নীল আকাশের ছবি
মানুষ-নারীর মুখ,– পুরুষ– স্ত্রীর দেহ সবি
যার হাত ছুঁয়ে আজো উষ্ণ হ'য়ে আছে,–
ফিরিয়া আসিবে সে কি তাহাদের কাছে !
প্রণয়ীর মতো ভালোবেসে
খুঁজিবে কি এসে
একখানা দেহ শুধু !–
হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে-কাঁকরে
এ-মাটির 'পরে !

অন্ধকারে সাগরের জল
ছেনেছে আমার দেহ,– হয়েছে শীতল
চোখ– ঠোঁট– নাসিকা– আঙুল
তাহার ছোঁয়াচে; ভিজে গেছে চুল
শাদা-শাদা ফেনাফুলে;
কতোবার দূর উপকূলে
তারাভরা আকাশের তলে

বালকের মতো এক– সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
জেনেছি দেহের স্বাদ;– গেছে বুক– মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ,– নারীর মতন
এ-দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের খেতে !
প্রথম প্রণয়ী সে যে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে-যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে !
চোখ দুটো ফের ঘুমে ভরে
যেন তার চুমো খেয়ে !
এ-দেহ,– অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ !–
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত-বৈকালে
উড়ো পাখপাখালির পালে
উঠানের;– পেতে থাকে কান,–
শোনে ঝরা-শিশিরের গান
অঘ্রাণের মাঝরাতে;
হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এ-দেহেরে এসে ধরে,–
ব্যথা দেয় ! নারীর অধরে–
চুলে– চোখে– জুঁয়ের নিশ্বাসে
ঝুম্‌কো-লতার মতো তার দেহ-ফাঁসে
ভরা ফসলের মতো পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ,– ব্যথা পায় ফিরে !...
তবু এই শস্যখেতে পিপাসার ভাষা
ফুরাবে না;– কে বা সেই চাষা,–
কাস্তে হাতে,– কঠিন,– কামুক,–
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা !–
কে বা সেই !– জানি না তো,– হয় নাই দেখা
আজো তার সনে;
আজ শুধু দেহ– আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর;– চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া,– শুধু পীড়া !– মুকুলে-মুকুলে
শুধু কীট,– আঘাত,– দংশন,–
চায় আজ মন !

নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে

পথ ভুলে বার-বার পৃথিবীর খেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল !–
অন্ধকারে শিশিরের জল
কানে-কানে গাহিয়াছে গান–
ঢালিয়াছে শীতল আঘ্রাণ;
মোর দেহ ছেনে গেছে অলস– আদুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে;– কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
ঢালিয়াছে আলো–
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মতো !
রেখে গেছে ক্ষত
সব্‌জির সবুজ রুধিরে !
শস্যের মতো মোর এ-শরীর ছিঁড়ে
বার-বার হয়েছে আহত
আগুনের মতো
দুপুরের রাঙা রোদ !
আমি তবু ব্যথা দেই,–
ব্যথা পাই ফিরে !–
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ-ব্যথার সুখ !
লাল আলো,– রৌদ্রের চুমুক;
অন্ধকার,– কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়,– যেন গুঁড়ি-গুঁড়ি
ধুলো মোরে ধীরে লয় শুষে !–
মাঠে– মাঠে– আড়ষ্ট পউষে
ফসলের গন্ধ বুকে ক'রে
বার-বার পড়ি যেন ঝ'রে !
আবার পাবো কি আমি ফিরে
এই দেহ !– এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিবো কি নামি !
হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলে নিঙাড়ি
এক খেত ছাড়ি
অন্য খেতে
চলিবো কি ভেসে

এ-সবুজ দেশে
আর একবার !
শুনিবো কি গান
ঢেউদের !– জলের আঘ্রাণ
লবো বুকে তুলে
আমি পথ ভুলে
আসিবো কি এ-পথে আবার !
ধুলো-বিছানার
কীটেদের মতো
হবো কি আহত
ঘাসের আঘাতে !
বেদনার সাথে
সুখ পাবো !
লতার মতন মোর চুল,
আমার আঙুল
পাপড়ির মতো,–
হবে কি বিক্ষত
তোমার আঙুলে– চুলে !
লাগিবে কি ফুলে
ফুলের আঘাত !
আরবার
আমার এ পিপাসার ধার
তোমাদের জাগাবে পিপাসা !
ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে ক'রে-ক'রে
ফলিবো কি !– পড়িবো কি ঝ'রে
পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে
আর একবার আমি–
নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে।

## পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে–
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;
– এখন সে কতো রাত !
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,

আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে ?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে ওই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয়;
সবাই ঘুমায়ে আছে সবদিকে—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময় ?

সাগরের ওই পারে— আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এইসব পাখি ছিলো;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিলো তারা তারপর,
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
বাদামি— সোনালি— শাদা— ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিলো—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে।

কোথাও জীবন আছে,— জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে— সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে;
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন্‌ এক খেতে;
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয় ?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,

এই স্বাদ– গভীর– গভীর।
আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

## শকুন

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে– সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি; নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন– সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিকহস্তিগণ
প'ড়ে গেছে– প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার শ্বেত মাঠ প্রান্তরের পর

এইসব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু; আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে– পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই; একবার স্নিগ্ধ মলাবারে
উড়ে যায়– কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে:

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে... চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হুন

## মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ– কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার :
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা; অশত্থের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ– মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ– বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দ্যাখে নদীর ভিতরে;
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল;
পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর

আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দ্যাখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির ·
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর.

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো– সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কী বুঝিতে চাই আর ? ... রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

## স্বপ্নের হাতে

পৃথিবীর বাধা– এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই।
যেইসব ছায়া এসে পড়ে
দিনের রাতের ঢেউয়ে– তাহাদের তরে
জেগে আছে আমার জীবন;
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিতো যদি এই স্বপনের হাতে
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেতো না তবে কেউ আর–
থাকিতো না হৃদয়ের জরা–
সবাই স্বপ্নের হাতে দিতো যদি ধরা।

আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে,
সারাদিন– সারারাত্রি অপেক্ষায় থেকে,
পৃথিবীর যতো ব্যথা– বিরোধ– বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব;
চাহিয়াছে অন্তর যে-ভাষা,
যেই ইচ্ছা– যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে-পারে গিয়া–
স্বপ্নে তাহা সত্য হ'য়ে উঠেছে ফলিয়া।
মরমের যত তৃষ্ণা আছে–
তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া এসো–

তোমরা চলিয়া এসো সব !
ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা– ব্যাঘাত– বাস্তব !
সকল সময়
স্বপ্ন– শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে,
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে-পাশে–
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম– মৃত্যু– সব–
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা;
সন্ধ্যার নদীর জল– পাথরে জলের ধারা
আয়নার মতো
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত
তাহাদের তরে।
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময় ...

পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
আঁকাবাঁকা অসংখ্য অক্ষরে
একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা–
সে-সব ব্যর্থতা
আলো আর অন্ধকারে গিয়াছে মুছিয়া;
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়– ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,
তবে ওই পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
লিখিতে যেও না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা;
আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে-সব ব্যর্থতা।
পৃথিবীর ওই অধীরতা
থেমে যায়– আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে– ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয়;
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়।

পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয় !

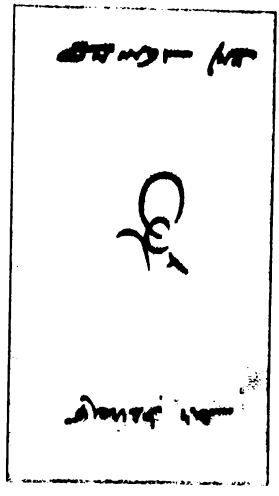

কবিতাভবন সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ
১৩৪৯ বাংলা, ১৯৪২ ইংরেজি

সিগনেট সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ
১৩৫৯ বাংলা, ১৯৫২ ইংরেজি

বনলতা সেন ১৮৫ কুড়ি বছর পরে ১৮৫ হাওয়ার রাত ১৮৬ আমি যদি হতাম ১৮৭ ঘাস ১৮৮ হায় চিল ১৮৯ বুনো হাঁস ১৮৯ শঙ্খমালা ১৮৯ নগ্ন নির্জন হাত ১৯০ শিকার ১৯১ হরিণেরা ১৯২ বিড়াল ১৯৩ সুদর্শনা ১৯৩ অন্ধকার ১৯৪ কমলালেবু ১৯৫ শ্যামলী ১৯৬ দুজন ১৯৬ অবশেষে ১৯৭ স্বপ্নের ধ্বনিরা ১৯৮ আমাকে তুমি ১৯৮ তুমি ১৯৯ ধান কাটা হ'য়ে গেছে ২০০ শিরীষের ডালপালা ২০০ হাজার বছর শুধু খেলা করে ২০১ সুরঞ্জনা ২০১ মিতভাষণ ২০২ সবিতা ২০২ সুচেতনা ২০৩ অঘ্রাণ প্রান্তরে ২০৪ পথ হাঁটা ২০৫

## বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল-সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

## কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দ্যাখা হয় যদি !
আবার বছর কুড়ি পরে–
হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাসে–
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে– তখন হলুদ নদী
নরম-নরম হয় শর কাশ হোগলায়– মাঠের ভিতরে !

অথবা নাইকো ধান খেতে আর;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে; মুনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার–
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার :

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের– আমের:
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে !

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার–
তখন আবার যদি দ্যাখা হয় তোমার আমার !

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে–
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে !
চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে–

সোনালি-সোনালি চিল– শিশির শিকার ক'রে নিয়ে গেছে তারে–
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে !

## হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল– অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিলো আমার– আধো-ঘুমের ভিতর হয়তো–
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে !
কাল এমন চমৎকার রাত ছিলো।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো– আকাশে এক তিল
ফাঁক ছিলো না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ !
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।

যে-নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে;
যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন–
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য
আড়ষ্ট– অভিভূত হ'য়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল;
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে সাঁই-সাঁই ক'রে,
সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট
সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়।

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেলো,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেলো উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায়-তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

## আমি যদি হতাম

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হ'তে যদি তুমি,
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানখেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর

এক নিরালা নীড়ে;

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাত
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রুপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খইখেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ায় গান !

হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো-টুকরো মৃত্যু আর থাকতো না;
থাকতো না আজকের জীবনের এই টুকরো-টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম;
বনহংসী হ'তে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানখেতের কাছে।

## ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস— তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

## হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে !
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

## বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে–
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে– সাঁই-সাঁই শব্দ শুনি তার;
এক– দুই– তিন– চার– অজস্র– অপার–

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে– ছুটিতেছে তা'রা।
তারপর প'ড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ– দু-একটা কল্পনার হাঁস;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক-উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

## শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিলো আমারে,
বলিলো, তোমারে চাই : বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি– কুয়াশার পাখনায়–
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে-আলোক
জোনাকির দেহ হ'তে– খুঁজেছি তোমারে সেইখানে–
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে

ধানশিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা :
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে-আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো— দুধে আর্দ্র— কবেকার শঙ্খিনীমালার;
এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

## নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।
ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিলো একদিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিলো;

মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী–
এইসব ছিলো সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক;
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস–
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।
পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ !
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

## শিকার

ভোর;
আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারিদিকের পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো:
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে-মুক্তা আমার নীল মদের

গেলাসে রেখেছিলো
হাজার-হাজার বছর আগে এক রাতে– তেমনি–
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে
আগুন জ্বেলেছে–
মোরগফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;
সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের
সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে-ঘুরে
সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিলো।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামলো–
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য;
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো একটা বিস্তীর্ণ
উল্লাস পাবার জন্য;
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাঁপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার– উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এলো।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক– হিম– নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

## হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি– ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা; রুপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা– মুক্তা ঝ'রে যায়

পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে– বনে-বনে– হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,–

বিলুপ্ত ধূসর কোন্ পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে–
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

## বিড়াল

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলি আমার দ্যাখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামি পাতার ভিড়ে;
কোথায় কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে-পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদ থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

## সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে

শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সবচেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো;
তবুও সময় স্থির নয়;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর; তুমি দান করোনি তো;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার ব'লে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

## অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল-চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম— পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগবো না জেনে
কোনোদিন জাগবো না আমি— কোনোদিন জাগবো না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃতুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে-আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন— অনেক-অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে

মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়– বেদনায়– আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব !
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত-শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এইসব ভয়াবহ আরতি !

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত:
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠবো না আর;
তাকিয়ে দেখবো না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো– ধীরে– পউষের রাতে–
কোনোদিন জাগবো না জেনে–

কোনোদিন জাগবো না আমি– কোনোদিন আর।

## কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হ'য়ে যাবো
আবার কি ফিরে আসবো না আমি পৃথিবীতে ?
আবার যেন ফিরে আসি

কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

## শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন;
যখন জাহাজে চ'ড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে ব'লে,
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেতো কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেলো;
মানুষকে স্থির— স্থিরতর হ'তে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে ব'লে এতো রক্ত-নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ;— শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে;
কাল কিছু হয়েছিলো;— হবে কি শাশ্বতকাল পরে।

## দুজন

'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন— কতোদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো;— এক নক্ষত্রের নিচে তবু— একি আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হ'য়ে যায় ক্ষয়;
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরো একদিন ম'রে যেতে হয়;
হয় নাকি ?'— ব'লে সে তাকালো তার সঙ্গিনীর দিকে;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ-কার্তিকে
প্রাণ তার ভ'রে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এলো– মনে হয়– যেন কিছু চেয়ে– কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশথের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ঘাসের উপর ঝ'রে পড়ে;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হ'লে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে;
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে;– চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝ'রে গেছে– শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে– বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে

নারী তার সঙ্গীকে : 'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হ'য়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি;– তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কি নিয়ে থাকিবে বলো;– একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা
তারপর ঝ'রে গেছে; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিতো না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের– প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরতো না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে–'

এই ব'লে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিলো হাঁটুভর।
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে-ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির;–

প্রেমিকের মনে হলো : 'এই নারী– অপরূপ– খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে;
যেখানে রবো না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর– জনিত বাসনা নিজে– বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।'

## অবশেষে

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু-উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার 'পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর সকালবেলাকে।

আলার বিকেল হ'লে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত থাকে
এইসব পাহাড়গুলো; যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের শ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় এসে।
চেয়ে দ্যাখো ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস
ন'ড়ে ওঠে অন্তত্তায়; আরো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তরুণে
অন্তর্হিত হ'য়ে যেতে পারে তারা বটে।
একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে।
তবুও বাঘিনী হ'য়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

## স্বপ্নের ধ্বনিরা

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে ধ'রে যায়। স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো;
নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জ্বেলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থবিরের চোখে যেন জ'মে ওঠে অন্য কোন বিকেলের আলো।
সেই আলো চিরদিন হ'য়ে থাকে স্থির;
সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থবির
হ'য়ে যাবো। সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রবো বিছানায় শুয়ে;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রবো
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।

স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো।

## আমাকে তুমি

আমাকে
তুমি দেখিয়েছিলে একদিন;
মস্ত বড়ো ময়দান— দেবদারু পামের নিবিড় মাথা— মাইলের পর মাইল;
দুপুরবেলার জলবিয়ল গভীর বাতাস
দূর শূন্যে চিলের পাটিকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হ'য়ে হারিয়ে যায়।
জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার;
জানালায়-জানালায় অনেকক্ষণ ধ'রে কথা বলে।
পৃথিবীকে মায়াবীর পায়ের দেশ ব'লে মনে হয়।
তারপর

দূরে
অনেক দূরে
খরবোদে পা ছড়িয়ে নদীয়সী রূপসীর মতো শাল জালে  পাল পায়  পাল পায়
এই দুপুরের বাতাস।

এক একটা দুপুরে এক একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হ'য়ে যায় যেন।

বিকেলে নরম মুহূর্ত।
নদীর জলের ভিতর পথর, নীলপাটি, হরিণের ছায়ার আসা যাওয়া,
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া
আতার ধূসর ফীকে-পড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধ'রে
স্থির।

মাঝে-মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনে - ঘিয়ের ঘ্রাণ।
বিকেলে
অসম্ভব নিমগ্নতা।
খাড় হরীতকী শাল, নিস্তব্ধ সূর্যে
পিয়াশাল পিয়াল আমলকী সেগুনের—
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা।

শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়  ছায়ায়,
রাত্রি।
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিস্তব্ধতা।

মরণের পরপারে যতো অন্ধকার
এইসব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

## তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারদিকে উজ্জ্বল আকাশ,
বাতাসে নীলাভ হ'য়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস,
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে— গজাফড়িং সে-ও ঘুমে,
আম নিম হিজলের ঘ্রাণিতে প'ড়ে আছো তুমি।

'মাটির অনেক নিচে চ'লে গেছো ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ ? কোন্ কথা ভাবছো আঁধারে ?
ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে :
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি– তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে– আশ্বিনের এতো বড় অকূল আকাশে
আর কাকে পাবো এই সহজ গভীর অনায়াসে–'
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেলো উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে– প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

## ধান কাটা হ'য়ে গেছে

ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন– খেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম– সাপের খোলস নীড় শীত।
এইসব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ– কেমন নিবিড়।

ওইখানে একজন শুয়ে আছে– দিনরাত দ্যাখা হ'তো কতো কতো দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কতো অপরাধ;
শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

## শিরীষের ডালপালা

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে ঝাউবন।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : 'শান্ত হ'তে হবে–'
অকূল গুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হ'য়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চ'লে এসে; চারিদিকে রাত্রি-নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হ'য়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

## হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো;
চারিদিকে পিরামিড– কাফনের ঘ্রাণ :
বালির উপরে জ্যোৎস্না– খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়– দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের– ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে ?' সুধালো সে– সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'

## সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন;
কালো চোখ মেলে ওই নীলিমা দেখেছো;
গ্রীক-হিন্দু-ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছো ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কি চেয়েছো ? কি পেয়েছো ?– গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো;
তবুও সমুদ্র নীল; ঝিনুকের গায়ে আলপনা;
একটি পাখির গান কি রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়– তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে;–
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

## মিতভাষণ

তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে— ধর্মে— নির্বাণে:
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষ'য়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হ'লে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছো শ্রেয়তর বেলাভূমি :
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী-সৌরভে।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো-বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

## সবিতা

সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে :
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেইসব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী,
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী।

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শ্বাপদ রাত্রির দিকে তবে
সহস্র বিকেলবেলা শেষ হ'য়ে গেলে
[illegible] কেমন নীরবে।

চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির ক'রে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রীস্টান।

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা–
সিন্ধুর রাত্রির জল জানে–
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে;
কেমন অনন্যোপায় হাওয়ার আহ্বানে
আমরা অকূল হ'য়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে :
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন !
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কতো পৌত্তলিক খ্রীস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন;
কতো কাছে– তবু কতো দূর।

## সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত

ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে:
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন:
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরি কাছে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়:
সেই শস্য অগণন মানুষের শব:
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক ক'রে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে– এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততো দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে;
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়–
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

## অঘ্রাণ প্রান্তরে

'জানি আমি তোমার দু-চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর, পৃথিবীর 'পরে–'
ব'লে চুপে থামলাম, কেবলি অশথপাতা প'ড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া;– অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে :
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে– সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে;– কিছুক্ষণ অঘ্রাণের অস্পষ্ট জগতে
হাঁটলাম, চিল উড়ে চ'লে গেছে– কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু-একটা সজারুর আসা-যাওয়া; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন লেগে আছে বহতা পাখায়

ওইসব পাখিদের; ওইসব দূর-দূর ধানখেতে, ছাতকুড়োমাখা ক্লান্ত জামের শাখায়;
নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা
ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকে আজ... হেঁটে চলি... আজ কোনো কথা
নেই আর আমাদের; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল
প'ড়ে আছে; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,
সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেঁধে গিয়ে নড়ে-চড়ে;
পতঙ্গ পালক জল– চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ;
আলেয়ার মতো ওই ধানগুলো ন'ড়ে শূন্যে কী রকম অবাধ আকাশ
হ'য়ে যায়; সময়ও অপর– তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধ'রে আছে ব'লে সে-ও সনাতন;– কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে স'রে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে– তাই-ই ঠিক– ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়– নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

## পথ হাঁটা

কী এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হ'য়ে চ'লে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে :

সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো ক'রে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো– ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হ'য়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব;
তখন অনেক রাত– তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে; মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর-কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা ?
চোখ নিচে নেমে যায়– চুরুট নীরবে জ্বলে– বাতাসে অনেক ধুলো খড়;
চোখ বুজে একপাশে স'রে যাই– গাছ থেকে অনেক বাদামি জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা-একা এমনি হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানি নাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

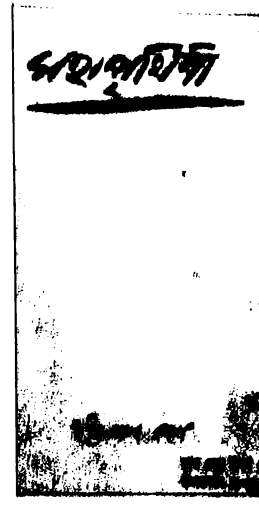


প্রথম প্রকাশ
১৩৫১ বাংলা, ১৯৪৪ ইংরেজি

নিরালোক ২০৯ সিন্ধুসারস ২১০ ফিরে এসো ২১১ শ্রাবণরাত ২১২ মুহূর্ত ২১৩ শহর ২১৩ শব ২১৩ স্বপ্ন ২১৪ বলিলো অশ্বত্থ সেই ২১৪ আট বছর আগের একদিন ২১৫ শীতরাত ২১৮ আদিম দেবতারা ২১৮ স্থবির-যৌবন ২২০ আজকের এক মুহূর্ত ২২১ ফুটপাথে ২২২ প্রার্থনা ২২৩ ইহাদেরি কাছে ২২৩ সূর্যসাগরতীরে ২২৩ মনোবীজ ২২৪ পরিচায়ক ২২৭ বিভিন্ন কোরাস ২২৯ প্রেম অপ্রেমের কবিতা ২৩২

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের খেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে... জ্বেলে... জ্বেলে... নিভে গেলে- নিভে গেলে ?'
ব'লে তারে জাগায় আবার;
জাগায় আবার।
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে- বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

অনেক নক্ষত্রে ভ'রে গেছে সন্ধ্যার আকাশ- এই রাতের আকাশ;
এইখানে ফাল্গুনের ছায়া-মাখা ঘাসে শুয়ে আছি;
এখন মরণ ভালো,- শরীরে লাগিয়া রবে এইসব ঘাস;
অনেক নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি।

কে যেন উঠিলো হেঁচে,- হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি !
সারাদিন গাড়ি টানা হলো ঢের,- ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস;
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে,- আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি ?
'কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি ?'- চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।

ঝাউফলে ঘাস ভরে- এখানে ঝাউয়ের নিচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে;
কাশ আর চোরকাঁটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে কোন্ ঘরে যাবো !
কোথায় উন্মাদ নাই, কোথায় আবেগ নাই,- চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাবো ?
রাতের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে যাবো ?
'তোমারি নিজের ঘরে চ'লে যাও'- বলিলো নক্ষত্র চুপে হেসে-
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ তার ভালোবেসে;
অথবা তাকায়ে দ্যাখো গোরুর গাড়িটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে;
পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খলখল অন্ধকার- শান্তি তার জেগেছে সম্মুখে;
চ'লে যায় চুপে-চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে;-
যদিও মরেছে ঢের গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ,- তবু তার মৃত্যু নাই মুখে।'

## সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস,
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছো টারান্‌টেলা— রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা-দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতশ্বাস; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে ? মরে গেছে অনেক নৃপতি ?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি ? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে— হারায়েছি আনন্দের গতি;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান— এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের— বেদনার আমরা সন্তান ?

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব; নেই নিম্নভূমি— নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো— পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দ্যাখা
রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার— ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে; যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
মাছি আর; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিকের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে— সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে;
সেখানে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে;

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনো নাকো; অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর দালর ভিতরে
জানো নাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে;
গভীর নিলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

এইসব জানো নাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে;
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা, শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে।
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি– জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে,
বিষণ্ন পৃথিবী ছেড়ে দলে-দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে– দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে।
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর– পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই– আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

## ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো; একদিন নীল ডিম করেছো বুনন;
আজো তারা শিশিরে নীরব;
পাখির ঝর্ণা হ'য়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব।

## শ্রাবণরাত

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে-ধীরে ঘুম ভেঙে যায়
কোথায় দূরে মহোপসাগরের শব্দ শুনে ?

দর্শন অনেকক্ষণ হয় খেয়ে গেছে
যতো দূর চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে ক'রে চুপ ক'রে শুয়েছে যেন,
নিস্তব্ধ হ'য়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড়ো-বড়ো কপাট খুলছে,
বন্ধ ক'রে ফেলছে আবার;
কোন্ দূর– নীরব– আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে কারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে;
কাল ভোরে জাগবার জন্য।

যে-সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কাদায় অন্ধকারে বিশেষিতেছে
ধীরে-ধীরে ভেসে ওঠে তারা;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খসিয়ে আমাকে ঘুরে যায় ওরে।

সমস্ত বঙ্গসাগরের উচ্ছ্বাস খেয়ে যায় যেন;
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হ'য়ে থাকে।

কে যেন বলে :
আমি যদি সেইসব কপাট স্পর্শ করতে পারতাম
তা হ'লে এই সকল গভীর নিস্তব্ধ মাটি স্পর্শ করতাম গিয়ে।–
আমার কাঁধের উপর কাপড় হাত রেখে ধীরে-ধীরে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে।

চোখ তুলে আমি
দুই ভয় অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম :
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

## [illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

রাঙা মেঘ– হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না; চেয়ে দ্যাখো যদি;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো;
লাল নীল মাছ মেঘ– ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে: এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রুপালি নীরব।

## স্বপ্ন

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে;
শিশির পড়িতেছিলো ধীরে-ধীরে খ'সে;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি

উড়ে গেলো কুয়াশায়,– কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেলো বুঝি ?
অন্ধকার হাতড়ায়ে ধীরে-ধীরে দেশলাই খুঁজি;
যখন জ্বালিবো আলো কার মুখ দ্যাখা যাবে বলিতে কি পারো ?

কার মুখ ?– আমলকী শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিলো তাহা;
এ-ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিলো, আহা,
সে-মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীল সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।

## বলিলো অশ্বত্থ সেই

বলিলো অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন্ দিকে যাবে বলো–
তোমরা কোথায় যেতে চাও ?
এতোদিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কতো কাছে :
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো– আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এইসব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছো চ'লে পাই নাকো টের !
বোঁচকা বেঁধেছো ঢের,– ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটা ঘটিটাও;

আবার কোথায় যেতে চাও ?
'পঞ্চাশ বছরো হায় হয়নিকো– এই-তো সেদিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
– আজো, আহা, তাহাদের কথা মনে হয় !–
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এইসব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিলো ঋণ;
দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,– মনে হয় যেন সেইদিন !

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না ? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে ?
সেই পথে আরো শান্তি– আরো বুঝি সাধ ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর !...
যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দ্যাখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর !'
– বলিলো অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে-ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

## আট বছর আগের একদিন

শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে– ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে– শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো– জ্যোৎস্নায়– তবু সে দেখিলো
কোন্ ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল– লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি !
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জানিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম– অবিরাম ভার

সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে— অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে;
পলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়— অসুখের উষ্ণ অনুরাগে।

ঠেস পাই বৃথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির জমাহীন বিরক্ততা;
মশা তার অন্ধকার সন্ধ্যায়ায়ে জেগে থেকে জীবনের ক্লেদ অনেকখানে।

রক্ত ক্লেদ কসা থেকে রৌদ্রে কের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত ফীটের খেলা মতো দেখিয়াছি।

অমিত আকাশ যেন— যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে উদ্যানের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে কড়িঙের মন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অন্ধকের মতো
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা;
যে-জীবন কড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

অন্ধকের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্থির ঠোঁটে
করেনি কি মাখামাখি ?
ঘুরঘুরে জন্ম পেঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুঝি চাঁদ পেয়ে বুঝি বেলোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি পেঁচা এসে এ ফুলুল পাড় সমাচার ?

জীবনের এই ঘাস— সুপক্ক যবের ঘ্রাণ মেয়েদের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো;
মর্গে কি ছাদ ছুঁয়েছিলো
মর্গে— ডমোটে
ধাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে !

[illegible]

তবু এ মৃত্যুর পর, [illegible]
[illegible] কার্য হয় নাই,
[illegible] জীবনের মধ্য
[illegible] [illegible]
[illegible] উঠে এসে বসু
বসু— আর [illegible] বসু
[illegible]
[illegible] [illegible]
এ-জীবন [illegible] [illegible] নাই,
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]— তবু [illegible]
[illegible] [illegible]— [illegible]— [illegible]— [illegible] [illegible]
[illegible] নয়, [illegible] নয়, [illegible] নয়,
[illegible]-এক [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]— [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

তবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ?
[illegible] !
[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

## শীতরাত

এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা পেঁচার গান; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

শহর ও গ্রামের দূর মোহানায় সিংহের হুংকার শোনা যাচ্ছে
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।

এদিকে কোকিল ডাকছে– পউষের মধ্য রাতে;
কোনো একদিন বসন্ত আসবে ব'লে– ?
কোনো একদিন বসন্ত ছিলো, তারি পিপাসিত প্রচার ?
তুমি স্থবির কোকিল নও ? কতো কোকিলকে স্থবির হ'য়ে যেতে দেখেছি,
তারা কিশোর নয়,
কিশোরী নয় আর;
কোকিলের গান ব্যবহৃত হ'য়ে গেছে।

সিংহ হুংকার ক'রে উঠছে;
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক– আফিমের সিংহ– অন্ধ– অন্ধকার।

চারদিককার আবছায়া-সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে যায় সব ;
সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।
কোকিলের গান
বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'সে-খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বিপাশামদিন নাগপাশ,– তুমি
পাশ ফিরে শোও,
কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।

## আদিম দেবতারা

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ–

কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিলো ভয়া,
তোমার সংস্পর্শে মানুষদের হতে দিলো মাটির মতো কামনা।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বাঁচার পরিবারে
আমাকে দিলো নির্দিষ্ট রচনা করবার আদেশ :
যেন আমিও আগুন বাতাস জল :
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করতে।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নির্জীব দেবতার দ্বীপ;
যেনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ;

ভুল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ায় ভিতর।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বাঁচার পরিবারে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ যেন নির্জন দেবতার-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া হেসে না-
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
ভুল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে- ব্যবহৃত- ব্যবহৃত- ব্যবহৃত- ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত- ব্যবহৃত-
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো :
'ব্যবহৃত- ব্যবহৃত হ'য়ে অভ্যেসের মানে হ'য়ে যায় ?'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম আমি !-
চমৎকারের অট্টহাসির ভিতর একটি বিরাট ভিখিরি মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হ'য়ে উঠলো যেন :
পৃথিবীর সমস্ত রূপ আমার ভিখিরি মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই যাই আমি সেইসব সমুদ্রের উচ্ছ্বাস-উচ্ছ্বাস
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক !

## স্থবির-যৌবন

তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে
কহিবে : তোমারে চাই– তোমারেই, নারী:
এইসব সোনা রুপা মসলিন যুবাদের ছাড়ি
চ'লে যেতে হবে দূর আবিষ্কারে ভেসে।

বলিলাম:– শুনিলো সে : 'তুমি তবু মৃত্যুর দূত নও– তুমি–'
'নগর-বন্দর ঢের খুঁজিয়াছি আমি:
তারপর তোমার এ জানালায় থামি
ধোঁয়া সব:– তুমি যেন মরীচিকা– আমি মরুভূমি–'

শীতের বাতাস নাকে চ'লে গেলো জানালার দিকে,
পড়িলো আধেক শাল বুক থেকে খ'সে:
সুন্দর জন্তুর মতো তার দেহকোষে
রক্ত শুধু ? দেহ শুধু ? শুধু হরিণীকে
বাঘের বিক্ষোভ নিয়ে নদীর কিনারে– নিম্নে– রাতে ?
তবে তুমি ফিরে যাও ধোঁয়ায় আবার:
উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত বিবর্ণ এবার–
বরং নারীকে ছেড়ে কঙ্কালের হাতে

তোমারে তুলিয়া লবে কুয়াশা-ঘোড়ায়।
তুমি এই পৃথিবীর অনাদি স্থবির:–
সোনালি মাছের মতো তবু করে ভিড়
নীল শৈবালের নিচে জলের মায়ায়

প্রেম– স্বপ্ন– পৃথিবীর স্বপ্ন, প্রেম তোমার হৃদয়ে।
হে স্থবির, কী চাও বলো তো–
শাদা ডানা কোনো-এক সারসের মতো ?
হয়তো সে মাংস নয়– এই নারী; তবু মৃত্যু পড়ে নাই আজো তার মোহে।

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো-এক বিকেলের জাফরান দেশে।
কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হ'য়ে গেছে কতো ভেসে।
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে ?

## আজকের এক মুহূর্ত

হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে ছেড়ে চলছো ব'লে আমি খুব গভীর খুশি ?
কিন্তু আরো খানিকটা চেয়েছিলাম:
চারিদিকে তুমি হাড়ের পাহাড় বানিয়ে রেখেছো:–
যে-ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি
অতীত ঋষীদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
এইখানে মৃতবৎসা, মাতাল, ভিখারি ও কুকুরদের ভিড়ে
কোথায় তাকে রেখে দিলে তুমি ?

এতোদিন ব'সে পুরোনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ করতে-না-করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়ে গেলো;
কোন্-এক গভীর নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে:–
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে ব'লে ?
সে-ই শেষ সত্য ব'লে ?
জীবন : ভারতের, চীনের, আফ্রিকার নদীপাহাড়ে বিচরণের মূঢ় আনন্দ নয় আর
বরং নির্ভীক বীরদের রচিত পৃথিবীর ছিদ্রে-ছিদ্রে
ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আমোদ :
তারপর চুম্বক পাহাড়ে গিয়ে নিস্তব্ধ হবার মতো আস্বাদ ?

জীবন : নির্ভীক নারীদের সৌন্দর্যের আঘাতে
নিগ্রো সঙ্গীতের বেদনার ধুলোরাশি ?
কিন্তু এ বেদনা আত্মিক, তাই ঝাপসা:– একাকী : তাই কিছু নয়:–
কিন্তু তিলে-তিলে আটকে থাকবার বেদনা :
পৃথিবীর সমস্ত কুকুর ফুটপাথে বোধ করছে আজ।

যেন এতোদিনের বীজগণিত কিছু নয়,
যেন নতুন বীজগণিত নিয়ে এসেছে আকাশ !

বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কতোবার দেখলাম
কতো বালিকাকে নিয়ে গেলো বাঘ– জঙ্গলের অন্ধকারে:
কতোবার হটেনটট-জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম:

কিন্তু সেইসব মূঢ়তার দিন নেই আর সিংহদের:
নীলিমার থেকে সমুদ্রের থেকে উঠে এসে
পরিস্ফুট রোদের ভিতর

উজ্জ্বল দেহ অদৃশ্য রাখে তারা;
শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের
আর কোনো শেষ বক্তব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

যে-ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
সেইসব শাদা-শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন্ জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হ'য়ে অপেক্ষা করছে কোথাও;
আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাই আমি।

## ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে– অনেক গভীর রাত হয়েছে;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে– ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে–
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে– কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,–
তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন,– মাথার ওপরে অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেলো ব'লে কোনো ঘুঘু তার
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি ব'লে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার !
পেঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার সুর নক্ষত্রকে ঘুঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম করে তুলবে না !
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে রয়েছে দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো মনে হবে না;
পেঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,

শিশিরে সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার।

## প্রার্থনা

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে ?
পিরামিড যারা গড়েছিলো একদিন– আর যারা ভাঙে-গড়ে;–
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন– যতো অগণন মগজের কাঁচা মালে;
যে-সব ভ্রমণ শুরু হলো শুধু মার্কোপোলোর কালে;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে-সব জ্যোতি
দেশলাইকাঠি নয় শুধু আর– কালপুরুষের গতি;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হ'লে কী ক'রে চলে,–
আমাদের প্রভু বিরতি দিয়ো না; লাখো-লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড গড়ে– পিরামিড ভাঙে গড়ে।

## ইহাদেরি কানে

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে– একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেলো যুবকের দল:
পৃথিবীর পথে-পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিলো আধেক কথা;– এইসব বধির নিশ্চল
সোনর পিতল মূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেলো যুবকের দল;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে– একবার বেদনার পানে।

## সূর্যসাগরতীরে

সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার :
সেই কথা বোঝা ভার।
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে ওদের প্রাণ
গড়িয়া উঠিলো কাফ্রির মতো সূর্যসাগরতীরে
কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাসবুনুনিটি ঘিরে।

চারিদিকে স্থির-ধূম্র-নিবিড় পিরামিড যদি থাকে–
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ

সূর্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান,–
তবুও আমরা জননী বলিবো কাকে ?
গড়িয়া উঠিলো মানবের দল সূর্যসাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনুনি ঘিরে।

## মনোবীজ

জামিরের ঘন বন ওইখানে রচেছিলো কারা ?
এইখানে লাগে নাই মানুষের হাত।
দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত
ইস্পাতের আশা গড়ে– সেইসব সমুজ্জ্বল বিবরণ ছাড়া
যেন আর নেই কিছু পৃথিবীতে : এই কথা ভেবে
যাহারা রয়েছে ঘুমে তুলোর বালিশে মাথা গুঁজে;–
তাহারা মৃত্যুর পর জামিরের বনে জ্যোৎস্না পাবে নাকো খুঁজে;
বধির ইস্পাত-খড়্গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে।

সেইমুখ এখনো দিনের আলো নিয়ে করিতেছে খেলা :
যেন কোনো অসংগতি নেই– সব হালভাঙা জাহাজের মতো সমন্বয়
সাগরে অনেক রৌদ্র আছে ব'লে;– পরিব্যস্ত বন্দরের মতো মনে হয়
যেন এই পৃথিবীকে;– যেখানে অঙ্কুশ নেই তাকে অবহেলা
করিবে সে আজো জানি;– দিনশেষে বাদুড়ের-মতন-সঞ্চারে
তারে আমি পাব নাকো;– এই রাতে পেয়ারার ছায়ার ভিতরে
তারে নয়– স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী পেঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।
মৃত্যু এক শান্ত খেত– সেইখানে পাবো নাকো তারে।

পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে আমি কতোদিন চলিলাম।
ঘুমালাম অন্ধকারে যখন বালিশে :
নোনা ধরে নাকো যেই দেয়ালের
ধূসর পালিশে
চন্দ্রমল্লিকার বন দেখিলাম
রহিয়াছে জ্যোৎস্নায় মিশে।
যেইসব বালিহাঁস ম'রে গেছে পৃথিবীতে
শিকারির গুলির আঘাতে :
বিবর্ণ গম্বুজে এসে জড়ো হয়
আকাশের চেয়ে বড়ো রাতে;
প্রেমের খাবার নিয়ে ডাকিলাম তারে আমি

তবুও সে নামিলো না হাতে।

পৃথিবীর বেদনার মতো ম্লান দাঁড়ালাম :
হাতে মৃত সূর্যের শিখা;
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম;
অঘ্রাণের মাঠের মৃত্তিকা
হ'য়ে গেলো;
নাই জ্যোৎস্না– নাইকো মল্লিকা।

সেইসব পাখি আর ফুল :
পৃথিবীর সেইসব মধ্যস্থতা
আমার ও সৌন্দর্যের শরীরের সাথে
মমির মতনো আজ কোনোদিকে নেই আর;
সেইসব শীর্ণ দীর্ঘ মোমাবাতি ফুরায়েছে
আছে শুধু চিন্তার আভার ব্যবহার।
সন্ধ্যা না-আসিতে তাই
হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে
অনেক ধূসর বই নিয়ে।

চেয়ে দেখি কোনো এক আননের গভীর উদয়;
সে-আনন পৃথিবীর নয়।
দু-চোখ নিমীল তার কিসের সন্ধানে ?
'সোনা– নারী– তিসি– আর ধানে'–
বলিলো সে : 'কেবল মাটির জন্ম হয়।'
বলিলাম : 'তুমিও তো পৃথিবীর নারী,
কেমন কুৎসিত যেন,– প্যাগোডার অন্ধকার ছাড়ি
শাদা মেঘ-খরশান বাহিরে নদীর পারে দাঁড়াবে কি ?'

'শানিত নির্জন নদী'– বলিলো সে– 'তোমারি হৃদয়,
যদিও তা পৃথিবীর নারী– নদী নয় :
তোমারি চোখের স্বাদে ফুল আর পাতা
জাগে না কি ? তোমারি পায়ের নিচে মাথা
রাখে না কি ? বিশুষ্ক– ধূসর–
ক্রমে-ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদের স্তর
যেন তারা;– অপ্সরা– উর্বশী
তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিলো না কি বসি ?
ডাইনির মাংসের মতন
আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন;

সমুদ্রের পাখার মতন
একদিন ছ'য়ে যাবে;
সে সব মাছিরা কালো মাংস খায় তারে ছিঁড়ে খাবে।'

কাঙালের পাশে যেন সৌন্দর্যের ভূতের মতন
তাহারে চকিত আমি করিলাম; রোমাঞ্চিত হ'য়ে তার মন
ব'লে গেলো : 'চকিত সৌন্দর্য সব পৃথিবীর
উপনীত কাঙালের মাদুরের সুদীর্ঘ শরীর
নিয়ে আসে একদিন, হে হৃদয়, একদিন
দাঁড়াবিও ছিন্ন হয় প্রণয়ের সন্ন্যাসীরা হবে না মলিন ?'
কল্পনার অবিনাশ রঙনীয় উপনীরণ থেকে
আসিলো সে হৃদয়ের। হাতে হাত রেখে
বসিলো সে। মনে হ'লো পাণ্ডুলিপি মোমের পিছনে
রয়েছে সে। একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
উপনিষদেরো পাতা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে;
ল্যাম্পের আলো হাতে সেদিন দাঁড়াবে
অনেক মেধাবী মুখ স্বপনের বন্দরের তীরে,
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে।

...

প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে ?
হয়তো জ্বালায়ে গিয়েছে অনেক- অনেক বিগত কাল।
বাদুর মোড়ার খুরে যে-পরায় অগ্নির মতো নাল
জানে না সে কিছু- তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে।
চীনের প্রাচীর ছেড়ে যেতে-যেতে-
চীনের প্রাচীর বলে :
অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে;
যা-কিছু নিভৃত- ধূসর- মেধাবী- তাহারে রক্ষা করে;
পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে পড়ে।

অথবা চীনের প্রাচীরের ভুল- চেনেনি নিজের হাল;
কিংবা জ্বালায়ে গিয়েছে হয়তো অনেক বিগত কাল;
অগ্নিমোড়ার খুরে যে-পরায় জলের মতন নাল
জানে না সে কিছু... তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে;-
খবিসে জড়ানো শিশিরের মসি কালো বিড়ালকে বলে।

## পরিচয়পত্র

মাঝে-মাঝে মনে হয় এ জীবন হংসীর মতন—
হয়তো বা কোনো-এক বৃদ্ধাদের মতো;
প্রজাপতি সোনার ছিল মেলে যার অন্তের ভিতরে;
পরিণত বিস্ময়ের অনুভবে ছবি-ছবি দূর হয় পৃথিবীর মন
তাই সে হংসীর স্বর দূর মাঠে দুপুরে নদীর বালু জলে
নিজেকে বিলিয়ে করে;— ছবি দূরে— দূরে
হয়তো বা মিশে যাবে অশিষ্ট কুকুর :
ধূসর বইয়ের দেশে চিরকাল— ধূসর কবরীর জড়ুয়ায়

তবুও হংসীই আজ;— হয়তো বা পৃথিবীর জলে
সোনার-মিটাল-করা ছিল তার বিবর্ণ প্রসব।
দুপুরে সূর্যের পানে কঙ্কালের মতন কলরব
কণ্ঠে তুলে ভেসে যায় অসের জলের অভিমানে :
কেয়াফুলগন্ধি হাওয়া স্থির তুলাদণ্ড প্রদক্ষিণ
ক'রে যায়;— লোকসমাগমহীন, ছিল কান্তারের পর
করে নাকো ভীতি আর মরণের অর্থ প্রত্যাহার :
তবুও হংসীর পাখা তুষারের কোলাহলে অন্ধকারে উড্ডীন

...

তবুও হংসীর প্রিয় অলোকসামান্য সুর, শূন্যতার থেকে আমি ফেঁসে
এইখানে প্রান্তরের অন্ধকারে দাঁড়িয়েছি এসে;
মধ্যনিশীথের এই আসন্ন তারকাদের সঙ্গ ভালোবেসে।

মরখুটে ঘোড়া ওই ঘাস খায়,— ঘাড়ে তার ঘামের উপরে
ঝিনঝিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মতো শব্দ করে।
এই স্থান, হ্রদ, আর বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে
ছিলো তবু একদিন ? রবে তবু একদিন ? হে কালপুরুষ, ধ্রুব, মাতা, শতভিষা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার ?— ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিৎ।

ভূপৃষ্ঠের ওই দিকে— জানি আমি— আবার নতুন বেকিন
উঠেছে অনেক দূর— শোনা যায় কার্নিশে সিংহের গর্জন।
হয়তো বা ধুলোস্মাৎ হ'য়ে গেছে এতো রাতে মহাবাহন।

এইদিকে বিকলাঙ্গ নদীটির থেকে পাঁচ-সাত ধনু দূরে
মানুষ এখনো নীল, আদিম সাপুড়ে :

রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায় নাকো তারা খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে।

এইসব শেষ হ'য়ে যাবে তবু একদিন;– হয়তো বা ক্রান্ত ইতিহাস
শাণিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।
ক্রমে এক নিস্তব্ধতা : নীলাভ ঘাসের ফুলে সৃষ্টির বিন্যাস

আমাদের হৃদয়কে ক্রমেই নীরব হ'তে বলে।
যে-টেবিল শেষরাতে দোভাষীর– মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে
সেইসব বহুভাষা শিখে তবু তারকার সন্তপ্ত অনলে

হাতের আয়ুর রেখা আমাদের জ্বলে আজো ভৌতিক মুখের মতন;
মাথার সকল চুল হ'য়ে যায় ধূসর– ধূসরতম শণ;
লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ

বিদূষক বামনের মতো হেসে একবার চায় শুধু হৃদয় জুড়াতে।
ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচিছাঁটা জামার মতন মুক্ত হাতে
তাহার নগ্নতা ঘিরে জ্ব'লে যায়– সে কোথাও পারে না দাঁড়াতে।

নীলিমাকে যতদূর শান্ত নির্মল মনে হয়
হয়তো বা সে-রকম নেই তার মহানুভবতা।
মানুষ বিশেষ কিছু চায় এই পৃথিবীতে এসে
অতীব গরিমাভ'রে ব'লে যায় কথা;

যেন কোনো ইন্দ্রধনু পেয়ে গেলে খুশি হতো মন।
পৃথিবীর ছোটো-বড়ো দিনের ভিতর দিয়ে অবিরাম চ'লে
অনেক মুহূর্ত আমি এ-রকম মনোভাব করেছি পোষণ।

দেখেছি সে-সব দিনে নরকের আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত;
সে-আগুন নিভে গেলে সে-রকম মহৎ আঁধার,
সে-আঁধারে দুহিতারা গেয়ে যায় নীলিমার গান;
উঠে আসে প্রভাতের গোধূলির রক্তচ্ছটা-রঞ্জিত ভাঁড়।

সে-আলোকে অরণ্যের সিংহকে ফিকে মরুভূমি মনে হয়;
মধ্যসমুদ্রের রোল– মনে হয়– দয়াপরবশ;
এরাও মহৎ– তবু মানুষের মহাপ্রতিভার মতো নয়।

আজ এই শতাব্দীতে পুনরায় সেইসব ভাস্বর আগুন

কাজ ক'রে যায় যদি মানুষ ও মনীষী ও বৈহাসিক নিয়ে
সময়ের ইশারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা
আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িয়ে,

দেয়ালের 'পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছায়ার জীবন
জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায় আগুনের রং আরো বিভাসিত হ'লে–
গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে-কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতিবিশোধন।

## বিভিন্ন কোরাস

### এক

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনো যেতেছে চ'লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস;
সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন– আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস;

দেখেছি সন্তানদের ময়দানে আলোর ভিতরে
স্বতই ছড়ায়ে আছে– যেমন শুনেছি টায়-টায়;
অদ্ভুত ভিড়ের দিকে চেয়ে থেকে দেখে গেছি জনতার মাথা
গ্রহদেবতাকে দেখে শৃঙ্গ শিলায়।

নগরীর পিতামহদের ছবি দেয়ালে টাঙায়ে–
টাঙায়েছি নগরীর পিতাদের ছবি :
পরিক্রমণে গিয়ে সর্বদাই আমাদের বড়ো নগরীতে
যাহাতে অমৃত হয় সে-রকম অর্থ, বাচক্লবী,

প্রকাশে প্রয়াস পেয়ে গেছি মনে হয়;
আমাদের নেয় যাহা নিয়ে গেছি তুলে;
নটে গাছ মুড়ে গেছে ব'লে মনে হয়
আমাদের বক্তব্য ফুরুলে।

আবার সবুজ হ'য়ে জুয়ায়ে গিয়েছে
আমাদের সন্তানের– সন্তানের-সন্তানের প্রয়োজনমতো।
এ-রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হ'তে পারে;

অন্য কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে
স্থির হ'য়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব ?

যদি তারা টেঁসে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন-অবশেষে
শেয়াল পেঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়,–
তখন স্বপ্নই সত্য; গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁসে

জীবনের বাস্তবতা সে-সময়।
মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে
জীবনের বাস্তবতা ?– এমন অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে
মাঝে-মাঝে গিয়েছি নাগাড় কথা ভেবে।

## দুই

সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।
আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হ'য়ে যাবে;
স্বতসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে;
এ-রকম ভাবনার কিছু অবলেশ

তাদরে হৃদয়ে আছে হয়তো বা;– মাঠে ময়দানে
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ;
অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

সমুদ্রের রৌদ্র থেকে আমাদের দেশে
নীলাভ ঢেউয়ের মতো দীপ্তি নেমে আসে মনে হয়;
আমাদের পিতামহ পিতারাও প্রবাদের মতো জেনে গেছে;
আমাদেরো ততোদূর ভাববিনিময়

একদিন ছিলো,– তবু শোচনীয় কালের বিপাকে
হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।
কারু সাথে অন্ধকার মাটিতে ঘুমায়ে,
কারু সাথে ভোরবেলা জেগে– বারো মাস

তাকেও স্মরণ ক'রে চিনে নিতে হয়
সে কি কাল ? সে জীবন ? জ্ঞাতিভ্রাতা ? গণিকা ? গৃহিণী ?
মানুষের বংশ এসে সময়ের কিনারে থেমেছে,

একদিন চেনা ছিলো ব'লে আজ ইহাদের চিনি

অন্ধকার সংস্কার হাতড়ায়ে, মৃদুভাবে হেসে;
তীর্থে-তীর্থে বার-বার পরীক্ষিত হ'য়ে পরিচয়
বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাঁইয়ে প'ড়ে আছে;
আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স;
সে-সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে
পশ্চিমে অস্তের সূর্য ধূলিকণা, জীবাণুর উতরোল মহিমা রটায়ে
পৃথিবীকে রেখে যায় মানবের কাছে জনমানবের ঋণে।

তিন

সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে ?
তাদের ছায়ার মতো শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে-কাটে।

মাঝে-মাঝে দু-চারটে প্লেন চ'লে যায়।
একভিড় হরিয়াল পাখি
উড়ে গেলে মনে হয়, দুই পায়ে হেঁটে
কতো দূর যেতে পারে মানুষ একাকী।

এসব ধারণা তবু মনের লঘুতা।
আকাশে রক্তিম হ'য়ে গেছে;
কামানের থেকে নয়, আজো এইখানে
প্রকৃতি রয়েছে।

রাত্রি তার অন্ধকার ঘুমাবার পথে
আবার কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে, ছেলে;
মানুষ ও মনীষীর রৌদ্রের দিন
হৃদয়বিহীনভাবে শূন্য হ'য়ে গেলে।

সেই রাত্রি এসে গেছে: সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে
জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে।
পারাবত-পক্ষধ্বনি সায়াহ্নের, সকালের নয়,
মাঝে এই বেহুলা ও কালারত্রি বিনে।

চার

এখন অনেক দূরে ইতিহাস-স্বভাবের গতি চ'লে গেছে।
পশ্চিম সূর্যের দিকে শত্রু ও সুহৃদ তাকায়েছে।
কে তার পাগড়ি খুলে পুব দিকে ফসলের, সূর্যের তরে
অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রির ভিতরে
ডুবে যেতে চেয়েছিলো ব'লে চ'লে গেছে।

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই– তবু র'য়ে গেছি স্বভাববশত।
এই ক্রান্তি জীবন বা মরণের ব'লে মনে হয়।

আকাশের ফিকে রং ভোরের, কি সন্ধ্যার আঁধার ?
এই দূরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার ?
আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী;
বংশ লুপ্ত ক'রে দিয়ে শেষ অবিশিষ্ট ডোডো পাখি
হ'তে গিয়ে পারাবত-পক্ষধ্বনি শুনি,
না কি ডোডোমির অতল ক্রেংকার।

## প্রেম অপ্রেমের কবিতা

নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে;
অগ্নিপরীক্ষার মতো কেবলি সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সে-সব।
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের একতিল বেশি অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন করেছে প্রত্যক্ষ অনুভব !
পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হ'য়ে আছে;
অপরিচিতের মতো সমাজ সংসার শত্রু সবি
পরিচিত বুনোনির মতো তবু হৃদয়ের কাছে
ক্রমশই মনে হয় নিজ সজীবতা নিয়ে চমৎকার;
আবর্তিত হ'য়ে যায় দানবের মায়াবলে তবুও সে-সব।

তোমার মৃত্যুর পরে মনিবের একতিল বেশি অধিকার
দীর্ঘ কালকেতু তুলে বাধা দিতে চেয়েছে রাসভ।

তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চ'লে গেলে কবে।
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে
মাঝে-মাঝে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জেগে উঠেছে হৃদয়।
না-হ'লে নিরুৎসাহিত হ'তে হয়।
জীবনের, মরণের, হেমন্তের এ-রকম আশ্চর্য নিয়ম;
ছায়া হ'য়ে গেছো ব'লে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম।

শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়– যদি কেউ চায়;
সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চ'লে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।
তারপর অনুভব ক'রে গেছে রমণীর ছায়া বা শরীর
অথবা হৃদয়,–
বিড়ালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে;
প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মতো নয়।

তোমার সংকল্প থেকে খ'সে গিয়ে ঢের দূরে চ'লে গেলে তুমি;
হলেও বা হ'য়ে যেতো এ-জীবন; দিনরাত্রির মতো মরুভূমি;
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা;
জীবনেও নেইকো অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর র'য়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন;
সকলের কাছ থেকে সুস্থির মনের ভাবে নিয়ে আসে ঋণ,
কাউকে দেয় না কিছু, এমনি কঠিন;
সরল সে নয়, তবু ভয়াবহভাবে শাদা, সাধারণ কথা
জনমানুষীর কাছে ব'লে যায়– এমনি নিয়ত সফলতা।

প্রথম প্রকাশ
১৩৫৫ বাংলা, ১৯৪৮ ইংরেজি

আকাশলীনা ২৩৭ ঘোড়া ২৩৭ সমারূঢ় ২৩৮ নিরঙ্কুশ ২৩৮ রিস্টওয়াচ ২৩৯ গোধূলিসন্ধির নৃত্য ২৩৯ যেইসব শেয়ালেরা ২৪০ সপ্তক ২৪০ একটি কবিতা ২৪১ অভিভাবিকা ২৪২ কবিতা ২৪৩ মনোসরণি ২৪৩ নাবিক ২৪৪ রাত্রি ২৪৫ লঘু মুহূর্ত ২৪৬ হাঁস ২৪৭ উন্মেষ ২৪৮ চক্ষুস্থির ২৪৯ খেতে-প্রান্তরে ২৫০ বিভিন্ন কোরাস ২৫২ স্বভাব ২৫৪ প্রতীতি ২৫৫ ভাষিত ২৫৬ সৃষ্টির তীরে ২৫৮ জুহু ২৫৯ সোনালি সিংহের গল্প ২৬০ অনুসূর্যের গান ২৬১ তিমিরহননের গান ২৬২ বিস্ময় ২৬৩ সৌরকরোজ্জ্বল ২৬৪ সূর্যতামসী ২৬৫ রাত্রির কোরাস ২৬৬ নাবিকী ২৬৭ সময়ের কাছে ২৬৮ লোকসামান্য ২৭০ জনান্তিকে ২৭০ মকরসংক্রান্তির রাত্রে ২৭২ উত্তরপ্রবেশ ২৭৩ দীপ্তি ২৭৫ সূর্যপতিম ২৭৬

## আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেও নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে– আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেও নাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস–
আকাশের ওপারে আকাশ।

## ঘোড়া

আমরা যাইনি ম'রে আজো– তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন– এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো– ঘুমে– ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেলো ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেলো গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

## সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা '
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয় সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষা, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে কবি নয় অজর, অক্ষর
অধ্যাপক; দাঁত নেই চোখে তার অক্ষম পিচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংসে কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

## নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্র পারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের :
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি- তারপর এখানে বাদামি মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

শাদা-শাদা ছোটো ঘর নারকেলখেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরো গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়; মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হ'লো এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ- ঘোলা মদ- বেশ্যালয়- সেঁকো- কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়- উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা-শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে;
লাল কাঁকরের পথ- রক্তিম গির্জার মুণ্ড দ্যাখা যায় সমুদ্রের ফাঁকে :
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

## রিস্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হ'য়ে
আজ রাতে ঢের মেঘ জিম হ'য়ে আছে দিকে দিকে।
পাহাড়ের নিচে তাহাদের কাক কাক মাথাবন্ধে দাঁড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে ধীরে ঘুরাতেছে:
চাঁদের আলোর নিচে এইসব অদ্ভুত লহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে;
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্ক্ষার মতো ন'ড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাইপল্লবের তলে ধারা বিন্দু বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো জনহীন বাতাসের ধ্বনি
দু-এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

## গোধূলিসন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়- পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে- শব্দহীন ভাঙা
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল রাঙা

চুপে-চুপে ডুবে যায়- জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দ্যাখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
মৃমুত্তের আবছায়া- নিস্তব্ধতা-
বাদামি পাতার ঘ্রাণ- মধুরূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো :
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হস্তকণ্ঠের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তা'রা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে– বরুণে

ক্রুর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে– জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক– কর্কট– তুলা– মীন।

## যেইসব শেয়ালেরা

যেইসব শেয়ালেরা– জন্ম-জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে– বার হয়– চেয়ে দ্যাখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে;– উঠিতে পারিতো যদি সহসা প্রকাশি
সেইসব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায় :
তাহলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো;– সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারো নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

## সপ্তক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,– জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হ'য়েছে শোয়া;– তারপর একদিন চ'লে গেছে কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে :
সরোজিনী চ'লে গেলো অতোদূর ? সিঁড়ি ছাড়া– পাখিদের মতো পাখা বিনা ?
হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ ? জ্যামিতির ভূত বলে : আমি তো জানি না।

জাফরান-আলোকের বিশুদ্ধতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :
লুপ্ত বিড়ালের মতো; শূন্য চাতুরির মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

## একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরো হ'য়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও-প্রাসাদে কারা থাকে ? কেউ নেই– সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে– জ্বলিতেছে– মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়– দহে নাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায় দহে নাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়–
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস ওই– একা;
এখানে পেলো না কিছু; করুণ পাখায়
তাই তা'রা চ'লে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দ্যাখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যতোদূর ভেসে যায়– আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে;
সব কেরোসিন-অগ্নি ম'রে গেছে; জলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার পর;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের 'পরে ছুটে সারাদিন
হ'য়ে গেছে এখন পাথর;
যে-সব যুবারা সিংহীগর্ভে জ'ন্মে পেয়েছিলো কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে– আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চ'লে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে–
সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে;

গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিতো তবু
একটি মানুষ কাছে পেলে;
যে-মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটেরা সৈনিকেরা যে-সব লবণ, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে ?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন ব'লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

## অভিভাবিকা

তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর-একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়,–
মনে হবে
অনেক প্রতীক্ষা মোরা ক'রে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ ক'রে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষিগোলকের সাথে
আঁখি-তারকার সব সমাহার এক দেখে;
তবু লঘু হাস্যে– সন্তানের জন্ম দিয়ে–
তারা আমাদের মতো হবে– সেই কথা জেনে– ভুলে গিয়ে–
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গ মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব ক'রে গেছি– ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিত হ'য়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথ-পথান্তরে;
তবু ওই নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবকের মতো মনে হয়;
হাতে তার তুলাদণ্ড;
শান্ত– স্থির;
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্য-সমুদ্রের 'পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া– ক্রীড়া,
বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।
স্থির– শুভ্র– নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর।

## কবিতা

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে;
তা না হ'লে সকলি হারায়ে যেতো ক্ষমাহীন রক্তে– নিরুদ্দেশে।
হে আকাশ, একদিন ছিলে তুমি প্রভাতের তটিনীর;
তারপর হ'য়ে গেছো দূর মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।
ভোরবেলা পাখিদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের প্রাণে।
বানরী ছাগল নিয়ে যে-ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে–
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে–
খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।
চামচিকা বার হয় নিরালোকে ওপারের বায়ুসন্তরণে;
প্রান্তরের অমরতা জেগে ওঠে একরাশ প্রাদেশিক ঘাসের উন্মেষে;
জীর্ণতম সমাধির ভাঙা ইঁট অসম্ভব পরগাছা ঘেঁষে
সবুজ সোনালিচোখ ঝিঁঝি-দম্পতির ক্ষুধা করে আবিষ্কার।
একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতোদূর চক্রবাল আছে লভিবার।
হে আকাশ, হে আকাশ,
একদিন ছিলে তুমি মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের মতো;
তারপর হ'য়ে গেছো প্রভাতের নদীটির মতো প্রতিভার।

## মনোসরণি

মনে হয় সমাবৃত হ'য়ে আছি কোন্ এক অন্ধকার ঘরে–
দেয়ালের কার্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে :
এইসব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে;
পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোসে।

হয়তো চেঙ্গিজ আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে।
বহু উপদেশ দিয়ে চ'লে গেলে কনফুশিয়াস–
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব ক'রে ফেলে ফাঁস।

বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে– ন'ড়ে চলে ধীরে।
সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কতো কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ'লো রক্তে– উপেক্ষায়;
বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজো আসে।
সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,

মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাশার প্রগলভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে
তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে-সারসদম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে– হয়তো বা
ফেলেছিলো সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে
যে-বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,
যে-বনানী সুর পায়–

আর যারা মানবিক ভিত্তি গ'ড়ে– ভেঙে গেলো বার-বার–
হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে ভুল ক'রে– বধ ক'রে– প্রেমে;–
সূর্যের স্ফটিক আলো স্তিমিত হবার আগে সৃষ্টির পারে
সেইসব বীজ আজো জন্ম পায় মৃত্তিকা অঙ্গারে।
পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেইসব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

## নাবিক

কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশ-রেখায়– তবে– এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হ'তে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরো– ওইদিকে– সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল– পাম সারি– তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে;
গোধূম-খেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয়;
তবু তার পরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়–

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়– চেয়ে দ্যাখে– কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু ?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও– দুপুরবেলায়;
বৈশালির থেকে বায়ু– গেথসিমানি– আলেকজান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সংকেতের মতো;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রয়োজন র'য়ে গেছে– যতোদিন স্ফটিক-পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে; এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যতোদিন; ভুলের বিনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয়;
উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি– নাবিক– অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

## রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেলো কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শা ছুটে মিশে গেলো শেষ প্যাসল্যান্সে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে– হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে– দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেস্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে– টেরিটিবাজারে;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমা খায় গালে।
কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান–
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম।

থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব— অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

## লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরির
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'লো মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল— রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিলো মুখ আচমন।
কেননা এখন তা'রা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে;
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দ্যাখে পরস্পরের পিঠে চ'ড়ে জাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরি মিলে গিয়ে
গোল হ'য়ে ব'সে গেলো তিন মগ চায়ে;
একটি উজির, রাজা, বাকিটি কোটাল,
পরস্পরকে তা'রা নিলো বাৎলায়ে।
তবু এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলে মিশে গেলো তা'রা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তা'রা
ব্যবহার ক'রে নিতে গেলো সোঁদা ফুটপাথে ব'সে;
মাথা নেড়ে দুঃখ ক'রে ব'লে গেলো : 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কি হ'তো জাঁহাবাজ ?
ভিখিরিকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভদ্র-বৌ সকলে নারাজ।'

ব'লে তা'রা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে

নামায়েছে তা'রা এক শাকচুন্নিকে।
এ-মেয়েটি হাঁস ছিলো একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তা'রা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিলো তাকে আরেক গেলাস :
'আমাদের সোনা-রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?'

এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
লাফায়ে-লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়;
নদীল জলের পারে ব'সে যেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে
তাহারা গণনা ক'রে গেলো এই পৃথিবীর ন্যায়-অন্যায়;
চুলের এঁটিলি মেরে শুনে গেলো অন্যায়-ন্যায়;
কোথায় ব্যয়িত হয়– কারা করে ব্যয়;
কি-কি দেয়া-থোয়া হয়– কারা কাকে দেয়;

কি ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়– বিনি দামে– তবে কার লাভ
এই নিয়ে চারজনে ক'রে গেলো ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তা'রা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে:
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দ্যাখে– যতোদিন মুখ দ্যাখা চলে।

## হাঁস

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দ্যাখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে:
তিনবার তিন গুনে নয় হয় পৃথিবীর পথে:
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মতো জাদুবলে।

সে নদীর জল খুব গভীর– গভীর:
সেইখানে শাদা মেঘ– লঘু মেঘ এসে
দিনমানে আরো নিচে ডুবে গিয়ে তবু
যেতে পারে নাকো কোনো সময়ের শেষে।

চারিদিকে উঁচু-উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা;
অনেক সময় ধ'রে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হ'য়ে গেছে যে সময়ে নীলাকাশ ব'লে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল

মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে;
অথবা কাঁপির থেকে অমের খইয়ের রং ঝরে;
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হ'য়ে যায় সব;
নদীটি অমল হংস নদীতে রয়েছে মনে প'ড়ে

## উনেষ

কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে–
দাঁড়িয়ে রয়েছে আজো সাবেককালের এক স্তিমিত প্রাসাদ;
দেয়ালে একটি ছবি : বিচারসাপেক্ষভাবে নৃসিংহ উঠেছে;
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হ'য়ে যাবে অচিরাৎ।

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ– অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ ক'রে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দ্যাখে
আবহমানের জড় এসেছে পাখার পিঠে চ'ড়ে।

বাক্করের অক্করের অমের স্তূপের নিচে ব'সে থেকে যুগ
কোথাও সংগতি তবু পায় নাকো তার;
অরে কাটে– তথাপিও ধারে কাটে ব'লে
সমস্ত সমস্যা কেটে দেয় তরবার।

চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে;
যে দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া;
অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতন
চলীটির দিকে ভেসে যাই;
হলদুস সাগরের জল,
ম্যানিলা– হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চ'লে যায়–
দূরতর দেশে।
কী এক অশেষ কাজ করেছিলো তিমি;
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে

মৃদু মর্মরিত জলে মিশে গিয়ে তাকে
বোর্নিওর সাগরের শেষে–
যেখানে বোর্নিও নেই– ঘন অন্ধকারে
ডাকে
যতোদূর যেতে হয়
ততোদূর অবাচীর অন্ধকারে গিয়ে
তিমির-শিকারি এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারিয়ে;
তিমির-পিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি;
কোথায় রয়েছি–
জীব হ'য়ে কবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
এই তো জীবন :
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে;
নিপট আঁধার;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।
সবি আজো প্রতিশ্রুতি, তাই
দোষ হ'য়ে সব
হ'য়ে গেছে গুণ।
বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির বেবুন।

## চক্ষুস্থির

ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ– চিরকাল;– আমার হৃদয়ে
পৃথিবীর দণ্ডীদের মতো পরিমিত ভাষা নেই।
রাত্রিবেলা বহুক্ষণ মোমের আলোর দিকে চেয়ে,
তারপর ভোরবেলা যদি আমি হাত পেতে দিই
সূর্যের আলোর দিকে,– তবুও আমার সেই একটি ভাবনা
অতীব সহজ ভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে
হৃদয়ঙ্গম করে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতারা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস;
উত্তেজিত না হ'য়েই অনায়াসে ব'লে যায় তারা :
হেমন্তের খেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিলো,
অথবা কোথায় কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া।

রক্তাতিপাতের দেশে ব'সেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়
দেখে যাই সোনালি ফসল, হ্রদ, সিঙাড়ার ছবি;
আমার প্রেমিক সেই জলের কিনারে ঘাসে– দক্ষ প্রজাপতি;
মানুষ-ও-ছাগমুণ্ড কেটে তাকে শুদ্ধ ক'রে দিয়ে যাবে অনাগত সবি,
একদিন হয়তো বা:– আজ সব উত্তমর্ণ দেবতাকে আমার হৃদয়
যে-সব পবিত্র মদ দিয়েছিলো– যে-সব মদির
আলোর রঙের মতো ম্লান মদ দিয়ে গিয়েছিলো,–
যখনি চুমুক দিই হ'য়ে থাকি চর্মচক্ষুস্থির !

## খেতে-প্রান্তরে

১

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু-তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ণ এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লন্ডনের জন্ম, মৃত্যু হ'লে–
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন ব'লে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এলো তার কামিনীর কাছে;
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে প'ড়ে আছে।

২

আবার বিকেল বেলা নিতে যায় নদীর খাড়িতে;
একটি কৃষক শুধু খেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ ক'রে গেছে;
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হ'য়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে;
এ-দিকের দিনমান– এ-যুগের মতো শেষ হ'য়ে গেছে,
না-জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দ্যাখে থেমে আছে তবুও বিকাল;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

৩

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিলো খেতে;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে-ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে নিরুৎকীর্ণ মাঠে
প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ।

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'য়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর-কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল খড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই-তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয়;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর-কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চ'লে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে–
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে ?
চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ
চিনে-চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হ'যে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

## বিভিন্ন কোরাস

১

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;
এ-রকম একদিন মনে হয়েছিলো;
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ;
আমাদের উঁচু-নিচু দেয়ালের ভিতরে খোঁড়লে
ততোধিক গুণাগার আপনার কাজ
ক'রে যায়; ঘরের ভিতর থেকে খ'সে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক ক'রে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে
ফিরে আসে; তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন; গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি একদিন; অন্য সব জিনিস হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন
হারায়েছে– উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি;– কাজ ক'রে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে, পাপকথা উচ্চারণ ক'রে,
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাইনি; তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতোদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম– হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে;
কারু মুখে তবুও বিরক্তি নেই– পথ নেই ব'লে,

যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে
র'য়ে যায়; শতাব্দীর শেষ হ'লে এ-রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে; বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে :
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে :
যতোদূর চোখ যায়– অনুভব করি;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে ক'রে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তা'রা,
ভীত মুখশ্রীর সাথে এ-রকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে; তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত;
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা–
নিজের ক্ষমতা তার এতো বেশি ব'লে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা;
তবুও বক্তৃতা শেষ হ'য়ে যায় বেশি করতালি শুরু হ'লে।
এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত খেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হ'য়ে উঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে– রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হ'য়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যিমামার

পাখিকের জিহ্বাকে উদ্বোধিত করে।

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস।
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত
হ'য়ে উঠে নদী
দ্যাখা দেয় বিকেল অবাধ,
অসংখ্য সূর্যের চোখে ঝরনের আনন্দে পড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা।
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন পরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঁধারের খাত বেয়ে।
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে।
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎপ্রোত পুরুষের হাল।
কামানের উর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে
মেঘের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ, পড়ানে।
সুক্ষ্মভাস কেটে তা'রা পালকের পাখি তনু।
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পাঞ্চলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের 'পরে,
নীলিমার তলে।
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে ?
হিংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে তাদের ঘরে চুরি দিনে জ্বাল ও প্রণয় ?
মহাসাগরের জল কখনো কি সংধিজাতার মতো হয়েছিলো স্থির-
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিলো তন্দ্রামাত্র নীলিমার নিচে ?
না-হ'লে উজ্জ্বল সিন্ধু মিছে ?
তবুও মিথ্যা নয়। সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হ'য়ে, পরে আলোকিত হ'য়ে গেলে।

## স্বভাব

যদিও আমার চোখে ঢের সদী ছিলো একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
তবুও একটি সদী দ্যাখা মেতো শুধু ভায়পদ।
কেবলএকটি সারী ফুয়াশা ফুরোলে

নদীর রেখার পার লক্ষ্য ক'রে চলে।
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্যাদার মতো
তার সেই মূর্তি এসে পড়ে।
সূর্যের সম্পূর্ণ বড়ো নিজের পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস।
এতোদিন পরে সেসব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি কার সুপারিশ
তাহলে সে-স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে।
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় পড়াবে'
এ-রকম দু-চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হ'য়ে গেছে একদিন সাধারণভাবে।

## প্রতীতি

বাতাবিলেবুর পাতা উড়ে যায় হাওয়ায়—প্রান্তরে,
শালিতে ধীরে-ধীরে জলতরঙ্গের শব্দ বাজে।
এলমুরো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আক্ষেপটি রয়েছে;
না-হ'লে কিছুই নেই লবেজান লড়ায়ে জাহাজে।

বাইরে রৌদ্রের ঘাড় পাথরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে।
হোক না তা। প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে অতীব প্রবীণ,
হিসেবে বিভিন্ন সত্য র'য়ে গেছে তার।
এবং নির্মল ভিটামিন।

সময় উচ্ছিন্ন হ'য়ে কেটে গেলে আমাদের পুরানো প্রত্যেক
জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি ক'রে ফেলে,
জেনে নিয়ে যে যাহার স্বজনের কাজ করে না কি
পদার্থের কথা ভেবে ভালো লেগে গেলে।

মানুষেরা ভয়াবহ স্বাভাবিকতার দূর পৃথিবী ঘুরায়।
মাটির তরঙ্গ তার দু-পায়ের নিচে
অধোমুখে ধ'সে যায়—চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে।
এ-রকম দিগ্‌বিদিগ্‌ক ক'রে বেঁচে থাকা দিয়ে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বলে-যায় আমাকে ডেকে;
আমার হৃদয় তবু অনড়-অবিচল

পরিচয় নেই তার,– পরিচিত হয় যে কখনো;
রবিকরোজ্জ্বল গেরুয়া মৃত্তিকা ভিতরে
মনে হয় মুহূর্তেই, তোমারো হৃদয়
ফুল এসে সত্যকে অনুভব করে

সময়ের সিংহদ্বার দিগন্তের মতো–
অথবা নিকটে যেন আমার নিজের শতাব্দীতে তোমাকে জড়ায়ে
তবু পথ ঘুরে দিয়ে বাঁকে মনে হয়,
যখন প্রত্যুষে চাঁদ পেছি বাঁয়ে।

এ-রকম কেন হ'য়ে গেলো তবে সব
বৃক্ষের মৃত্যুর পরে বন্দি এসে পাঁজরের আগে
একবার নির্ভরের ফুল হ'য়ে গেলো
আবার নিজস্ব হ'তে কতোদিন লাগে ?

সমস্ত সকালবেলা এই কথা ভেবে পথ চ'লে
যখন পথের শেষ সরণীতে– দুপুরের পেরে
আমাকে উত্তরে দিয়ে দৈনন্দিনের সব সাধ্যের মতো
দিয়ে গেলো পরস্পরের কথাগুলো,

তখনোই ছি-ছি গেলোনের অবকাশ গেল দাবা গেলো;
কাজ তবু সর্বদাই তীব্র হ'য়ে আছে এক দিন;–
এ-রকম মনে হ'লো বিদ্যুতের মতন সময়;
সাগর– সাগর সে কি– অথবা কাঁপন ?

এ-রকম অনুভব আমাকে ধারণ ক'রে চুপে
স্থির ক'রে রেখে গেলো পাখির কিনারে;
আকাশ নিজের হাতে নেই মনে হ'লো;
আকাশকুসুম তবু ফুটিয়ে পাপড়ি অনুসারে।

তবুও পৃথিবী দিয়ে অভিভূত ব'লে
উত্তরের নেই কোনো রাগ :
সারাটা মাংস হ'তে গেছে তবু সুষিমা হতেছে;
সারাটা সুষিমা হ'তে গিয়ে তবু প্রত্যুষাকাশ।

বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু;
আবেগ কি ক্রমেই আরেক তিল বিশোধিত হয় ?
নিঞ্জন ভীষণ লিপি লিখে দিলো সূর্যদেবীকে;
সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।

## সৃষ্টির তীরে

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়– তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে :
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারির হৃদয়কে ছিঁড়ে;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে :
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর;
বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে;
প্রেমিকারা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে;
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময় !
যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম– হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেলো লাল :
মানুষেরি হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে র'য়ে গেছি সবে–
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিলো যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিলো স্বাভাবিক ভাবে পথ দিয়ে,
কী ক'রে তা হ'লে তারা এ-রকম কিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন-পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে ?
অথবা যে-সব লোক নিজের সুনাম ভালোবেসে
দুয়ার ও পরচুলা না এঁটে জানে না কোনো লীলা,
অথবা যে-সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিলো : আপিলা চাপিলা
– রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড্‌বাস্কেট খেলো শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শত্রুর খোঁজে
সাত-পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে;
অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিলো ব'লে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হ'য়ে ওঠে কি যে উচাটন !–

কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন :
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নগ্ন ঘায়ে
ঘরের ভিতরে কেউ খোয়ারি ভাঙছে ব'লে কপাটের ভয়
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসায়ে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমেই অধিক ফিকে হ'য়ে আসে; নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে;
অথবা তা ছায়া নয়– জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি;
গঁপ্যার ছবির মতো– তবু গঁপ্যার চেয়ে শুক্র হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে কুচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে;
নিভে যায়– জ্ব'লে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে
স্বাতীতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে-মানুষ নরক বা মর্তে বাহাল
হ'তে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।

## জুহু

সান্টা ক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্ণে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিলো সূর্যের নিকটে থেমে সেদুমন পলিত;
বাংলার থেকে এতো দূরে এসে– সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিলো বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল বাতাস খাবে সারাদিন; যেইখানে দিন গিয়ে বছরে গড়ায়–
বছর আয়ুর দিকে– নিকেল-ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায়– সেখানে শরীর তার নটকান-রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াশ খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের 'টাইমস্'টাকে
বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অরুণিমা ঢেলে,
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদবুদের ! পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দ্যাখা দিলো; ঢেউ নয়, বালি নয়, উনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু–
সেই রলরোলে তিন-চার ধনু দূরে-দূরে ;এয়োরোড্রামের কলরব
লক্ষ্য পেলো অচিরেই– কৌতূহলে হৃষ্ট সব সুর
দাঁড়ালো তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর;

সকলেরি স্থির চোখে- কাঁধের উপরে মাথা-পিছু
কোথাও দ্বিরুক্তি নেই মাথার ব্যথার কথা ভেবে।
নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়্গের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে ক'রে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই, সকলকে সম্বোধন ক'রে।
কখন সে বজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো;
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পাখী, মেমে, খোজা, বেদুইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি– সান্টা ক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর ? যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে
ব'সে আছে; মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেলো, মহিলারা মর্মরের মতো স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

## সোনালি সিংহের গল্প

আমাদের পরিজন নিজেদের চিনেছিলো না কি ?
এই সেই সংকল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ ক'রে ফেলে চায়ের ভিতরে;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।
আমাদের উত্তমর্ণদের কাছে প্রতিজ্ঞার শর্ত চেয়ে তবু
তাহাদের খুঁজে পাই ছিমছাম,– কনুয়ের ভরে
ব'সে আছে প্রদেশের দূর বিসারিত সব ক্ষমতার লোভে।
কোথায় প্রেমিক তুমি : দীপ্তির ভিতরে।
কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আধারে।
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হ'য়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে-কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে;
যে-কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে;
পৃথিবীর বারগৃহ ধ'রে তারা উঠে যেতে চায়।
নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমাদের খেতে-ভুঁয়ে অবিরাম হৃতমান সোনা
ফ'লে আছে ব'লে মনে হয়;
আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে-সব ধানের আন্তরিক পরিচয়
নেই; তবু এইসব ফসলের দেশে

সূর্য নিরন্তর হিরন্ময়;
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌লম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চিনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,
আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,
আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,
আমাদের গড়পড়তার সব পড়তি কৌতুক
তাহারা বেহাত ক'রে ফেলে সব।
রাজপথে থেকে-থেকে মূঢ় নিঃশব্দতা
বেড়ে ওঠে;– অকারণে এর-ওর মৃত্যু হ'য়ে গেলে–
অনুভব করে তবু বলবার মতো কোনো কথা
নেই। বিকেলে গা ঘেঁষে সব নিরুত্তেজ সরজমিনে ব'সে
বেহেড আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির লোকসানে।
তবুও ভোরের বেলা বার-বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হ'য়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হ'য়ে–
যদি না সূর্যাস্তে ফের হ'য়ে যায় সোমালি হেঁয়ালি।

## অনুসূর্যের গান

কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
আমাদের ডাকে।
পিছে-পিছে ঢের লোক আসে।
আমরা সবের সাথে ভিড়ে চাপা প'ড়ে– তবু–
বেঁচে নিতে গিয়ে
জেনে বা না-জেনে ঢের জনতাকে পিষে– ভিড় ক'রে,
করুণার ছোটো-বড়ো উপকণ্ঠে– সাহসিক নগরে-বন্দরে
সর্বদাই কোনো-এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চলেছি।
সে সমুদ্র–
জীবন বা মরণের;
হয়তো বা আশার দহনে উদ্বেল।
যারা বড়ো, মহীয়ান– কোনো-এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হ'য়ে চ'লে গেছে;
একদিন নচিকেতা ব'লে মনে হ'তো তাহাদের;
একদিন আত্তিলার মতো তবু;

আজ তারা জনতার মতো।
জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির ক'রে দিতে গিয়ে তবু
সময়ের অনিবার উদ্ভাবনা এসে
যে-সব শিশুকে যুবা · প্রবীণ করেছে তারপর,
তাদের চোখের আলো
অনাদির উত্তরাধিকার থেকে, নিরবিচ্ছিন্ন কাজ ক'রে
তাদের প্রায়ান্ধ চোখ আজ রাতে লেন্‌স্‌,
চেয়ে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চক্ষে ফস্‌ফোরেসেন্‌স্‌।
তাদের সম্মুখে আলো
দীনাত্মা তারার
জ্যোৎস্নার মতন।
জীবনের শুভ অর্থ ভালো ক'রে জীবনধারণ
অনুভব ক'রে তবু তাহাদের কেউ-কেউ আজ রাতে যদি
ওই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে মনে ভেবে—
স্মরণীয় অঙ্কে কথা বলে,
তা হ'লে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ ?
আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ।

## তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো-এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেইসব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।

হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই- তবু-
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্রসাধারণ
চেয়ে দ্যাখে কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে–
ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে;
ওরা সব ওই পথে– তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন– অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই– তবু এই জের টেনে খেলি;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে– অন্ধকারে–
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

## বিস্ময়

কোথাও নতুন দিন র'য়ে গেছে না কি।
উঠে ব'সে সকলের সাথে কথা ব'লে
সমিতির কোলাহলে মিশে
তবুও হিসেব দিতে হয় কোনো-এক স্থানে;
– সেখানে উটের পিঠে সার্থবাহ দিগন্তরে মিলিয়ে গিয়েছে;
সাইরেনের কথা স্থির;
আর শেষ সাগরে জাহাজডুবি জীবনে মিটেছে;
বন্দরের অধিকারীদের হাল, কৃচ্ছ্র, আলোড়ন,
মানুষের মরণের ভয়ের ক্ষয়ের জন্যে মানুষের সর্বস্বসাধন

হ'তে চায়,- হয়তো বা হ'য়ে গেছে সার্বজনীন কল্যাণ।

জানি এ-রকম দিন আজো আসেনিকো।
এ-রকম যুগ ঢের– হয়তো বা আরো ঢের দূরের জিনিস।
আজ, এই ভূমিকায় মুহূর্তের বিস্মৃতির, স্মৃতির ভিতরে
সারাদিন সকলের সাথে ব্যবহৃত হ'য়ে চলি,
জিতে হেরে লুকায়ে সন্ধান ভুলে; নিরুদ্দিষ্ট ভয়
খামিরের মতো এসে আমাদের সবের হৃদয়
অধিকার ক'রে রাখে।

চারিদিকে সরবরাহের সুর সারাদিনমান
কি চাহিদা কাদের মেটায়।
মানুষের জন্যে মানুষের সব সম্ভ্রমের ভাষা, ভাঙাগড়া, ভালোবাসা
এতোদিন পরে এই অন্ধ পরিণতির মতন
হ'য়ে গিয়ে তবুও কঠিন ক্রান্তি না কি ?
কোলাহলে ভিড়ে গেছে জনসাধারণ;
জীবনের রক্তের বিনিময়ে ফাঁকি
প্রাণ ভ'রে তুলে নিয়ে পরস্পরের দাবি হিংসা প্রেম উর্ণকঙ্কালে মিলে গিয়ে
তবুও যে যার নিজ অন্ধ কাঠামোর কাছে ঠেকে– অহরহ–
সময়ের অনাবিষ্কৃত অন্তরীপ।

মনে হয়, কোনো-এক সমুদ্রের মাইলের– মাইলের দূর দিগন্তর
উজ্জ্বল, নিরপরাধভাবে
জীবনের মতো নীল হ'য়ে, তবু– মৃত্যুর মতন প্রভাবে।
অন্ধকার ঝড় থেকে অঙ্কে অগণন মেরুপাহাড়ের পাখি
সে তার নিজের বুকে টেনে নিয়ে–
ওই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়েছিলো না কি ?
সনাতন সত্যে অন্ধ হ'য়ে তবু– মিথ্যায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে
পাখিদের ডেকে নিয়ে উড়ায়ে দিতেছে;
মৃত্তিকার মর্মে ম্লান অম্লান উপকূলে হয়তো বা– আর-একবার তবু ওড়াবার মতো;
মরণ বা প্রলোভ উপচায়ে– জীবনের নির্দেশবশত।

## সৌরকরোজ্জ্বল

পরের খেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ;
যে-কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
তাদের সমাজ।

তবুও তাদের ধারা– ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব–
কিংবা এ-সব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে– ফসল ফলায়ে– তবু যুগে-যুগে উড়ায়ে গিয়েছে পঙ্গপাল।
কাল তবু– হয়তো আগামীকাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে; তৃতীয় চতুর্থ– আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

## সূর্যতামসী

কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর;
কোথাও ভোরের বেলা র'য়ে গেছে– তবে।
অগনন মানুষের মৃত্যু হ'লে– অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে;
এ কোন্ সিন্ধুর সুর :
মরণের– জীবনের ?
এ কি ভোর ?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা স'য়ে–
সময় কি অবশেষে এ-রকম ভোরবেলা হ'য়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে ক'রে জেগে ওঠে।
কোথাও ডানার শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর–
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।
সৃজনের ভয়াবহ মানে;
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধুপাখিদের শব্দ শুনি;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রিকরোজ্জ্বল
হিয়েনা, টোকিয়ো, রোম, মিউনিখ– তুমি ?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, ওই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি !
বিলীন হয় না মায়ামৃগ– নিত্য দিকদর্শিন্;
অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে– যা শেখেনি–

সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্ব'লে
জাগে না কি হে জীবন– হে সাগর–
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে।

## রাত্রির কোরাস

এখন সে কতো রাত;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুঞ্জরণ হ'তে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।
পরস্পরের পাশে নগরীর প্রাণের মতন
নগরী ছড়ায়ে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরি ঘুম
জেগে থাকা।
নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেয়সীর মতো হ'তে গিয়ে
নটীরো মতন তবু নয়;–
প্রেম নেই– প্রেমব্যসনেরো দিন শেষ হ'য়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস র'য়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
র'য়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কন্‌ভয়,–
মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।
সূর্য অনেক দিন জ্ব'লে গেছে মিশরের মতো নীলিমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুরুবর্ষের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হ'তে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্যামী যাত্রীদের মতো
জীবনের মানে বার ক'রে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হ'য়ে আরো চেতনার ব্যথায় চলেছে।
মাঝে-মাঝে থেমে চেয়ে দ্যাখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হ'লো তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে-নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।

হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর– পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলি ভেঙে যায়
স্প্লিন্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবস্থাতা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইয়াঙ্কির লেন-দেন ডলারে প্রত্যয়;–
এইসব মৃত হাত তবে
নব-নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি ?–
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই– নেই;–
অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই– কোথাও দিৎসা নেই– জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

## নাবিকী

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়;
মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হ'তে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেছে।
মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিজ্ঞ;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক;
কিছু নেই– তবুও অপেক্ষাতুর;
হৃদয়স্পন্দন আছে– তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায়;
কী যে চায়।
যেন কেউ দেখেছিলো খণ্ডাকাশ যতোবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে,
যতোবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,
আর তাহাদের মতো নরনারী যতোবার
তেমন জীবন চেয়েছিলো,
যতো নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,
নদীর ও নগরীর

আর নব–
নব-নব মানবের তরে
কেবলি অপেক্ষাতুর হ'য়ে পথ চিনে নেওয়া–
চিনে নিতে চাওয়া;
আর সে-চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা;
(কেন এই ক্ষুধা–
কেনই সমাপ্তিহীন !)
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল;
আমি এইসব।

সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ
কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা
জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে– ভাবে।
ভেবে নিক– যৌবনের জীবন্ত প্রতীক : তার জয় !
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হ'য়ে কোন্ আলোকের পাখিকে দেখেছে ?
জয়, তার জয়, যুগে-যুগে তার জয় !
ডোডো পাখি নয়।

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা– নবীনতা– শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতোই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই;
কোথাও আঘাত ছাড়া– তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।

হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে– সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন ?
নব-নব মৃত্যুশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন

হবে না কি মানবকে চিনে— তবু প্রতিটি ব্যক্তির ঘাট বসন্তের তরে !
সেইসব সুনিবিড় উদ্বোধনে– 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়:
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

## লোকসামান্য

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিলো তারা
জীবনের সাগরে-সাগরে :
বঙ্গোপসাগরে,
চীনের সমুদ্রে– দ্বীপপুঞ্জের সাগরে।
নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের 'পরে সূর্য এঁকে
চোখ মেরেছিলো তারা নীলিমার সূর্যের দিকে।
তারা সব আজ রাতে বিলোড়িত জাহাজের খোল
সাগরকীটের মৃত শরীরের আলেয়ার মতো
সময়ের দোলা খেয়ে নড়ে:
'এশিয়া কি এশিয়াবাসীর
কোপ্রস্‌পেরিটির
সূর্যদেবীর নিজ প্রতীতির তরে ?'
ব'লে সে-পুরোনো যুগ শেষ হ'য়ে যায়।
কোথাও নতুন দিন আসে;
কে জানে সেখানে সৎ নবীনতা র'য়ে গেছে কিনা;
সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে
বহুকাল কেটে গেছে বহুতর স্লোগানের পাপে।
এ-রকম ইতিহাসে উৎস রক্ত হ'য়ে
এই নব উত্তরাধিকারে
স্বর্গতি না হোক– তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি ?
ভাবনা ব্যাহত হ'য়ে বেড়ে যায়– স্থির হয় না কি ?
হে সাগর সময়ের,
হে মানুষ, —সময়ের সাগরের নিরঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী
হ'লেও সে হ'তো, তবু পৃথিবীর বড়ো রৌদ্রে– আরো প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।

## জনান্তিকে

তোমাকে দ্যাখার মতো চোখ নেই– তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই– তুমি

আজো এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছো।
কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখির মতন কোনো হৃদয়ের তরে।
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না-জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল ব'লে
আজ তার মানবকে কি ক'রে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনো বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দ্যাখা যায় লোক
কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হ'য়ে স্তব্ধ হয়;
এ-ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।
যে-মানুষ– যেই দেশ টিকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়– রাজ্য গড়ে– সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলি ভেঙে গিয়ে
তারি পিপাসায়
গ'ড়ে ওঠে।
এ-ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হ'লে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চ'লে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।
পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে;
ঝ'রে পড়ে।
এইসব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হ'তে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

চোখ না-এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরো-এক আভা :
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়– তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
হ'য়ে তুমি র'য়ে গেছো।

তোমার মাথার চুলে কেবলি রাত্রির মতো চুল
তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল

রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে
ধ'রে আছে।
তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক
রাত্রি নেই। আমাদের প্রাণে এক তিল
বেশি রাত্রির মতো আমাদের মানবজীবন
প্রচারিত হ'য়ে গেছে ব'লে–
নারী,
সেই এক তিল কম
আর্ত রাত্রি তুমি।

শুধু অন্তহীন ঢল, মানব-খচিত সাঁকো, শুধু অমানব নদীদের
অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে;
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
র'য়ে গেছে।

নিজের নুড়ির 'পরে সারাদিন নদী
সূর্যের– সুরের বীথি, তবু
নিমেষে উপল নেই– জলো কোন্ অতীতে মরেছে;
তবুও নবীন নুড়ি– নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী;
জানি আমি জানি আদিনারীশরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি;
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বকুলের বনে-মনে রপার রক্তের ঢলে গ্লেশিয়ারে জলে
অসতী না হ'য়ে তবু স্মরণীর অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন ক'রে কোথায় নভের দিকে চলে।

## মকরসংক্রান্তির রাতে

(আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন)

কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড়ো বিষয়ের হাতে
সে-সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কি এক গভীর সুসময়!

মকর'ক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
– তবুও তা পৃথিবীর নয়;
এখন গভীর রাত, হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

শতাব্দীর যে-কোনো নটীর ঘরে
নীলিমার থেকে কিছু নিচে
বিশুদ্ধ মুহূর্ত তার মানুষীর ঘুমের মতন;
ঘুম ভালো,– মানুষ সে নিজে
ঘুমাবার মতন হৃদয়
হারিয়ে ফেলেছে তবু।
অবরুদ্ধ নগরী কি ? বিচূর্ণ কি ? বিজয়ী কি ? এখন সময়
অনেক বিচিত্র রাত মানুষের ইতিহাসে শেষ ক'রে তবু
রাতের স্বাদের মতো সপ্রতিভ ব'লে মনে হয়।
মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম, বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্ররা ছিলো মনে পড়ে।

মকর'ক্রান্তির রাতে গভীর বাতাস।
আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ মুখ চেনাবার
মতন একান্ত ব্যাপ্ত আকাশকে পেয়ে গেছে আজ।
তেমনি জীবনপথে চ'লে যেতে হ'লে তবে আর
দ্বিধা নেই;– পৃথিবী ভঙ্গুর হ'য়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়;
পৃথিবী প্রতিভা হ'য়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে
নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লন্ডন
দিল্লি কলকাতার নক্‌টার্নে
অভিভূত হ'য়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হ'য়ে যাবে না কি !–
সূর্যে, আরো নব সূর্যে দীপ্ত হ'য়ে প্রাণ দাও– প্রাণ দাও পাখি।

## উত্তরপ্রবেশ

পুরোনো সময় ঢের কেটে গেলো।
যদি বলা যেতো :
সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,
সোনার বলের মতো সূর্য ছিলো পুবের আকাশে–
সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেনশীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।

পুরোনো বছর দেশ ঢের কেটে গেলো
রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে;
পুকুরের জল থেকে কিশোরের মতো তৃপ্ত হাতে
ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে;
চোখের পলকে তবু যুবকের মতো
মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে
কোনো এক সূর্যের জগতে
চোখের নিমেষে পড়েছিলো।

সেইখানে সূর্য তবু অস্ত যায়।
পুনরুদয়ের ভোরে আসে
মানুষের হৃদয়ের অগোচর
গম্বুজের উপরে আকাশে।
এ-ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই;
বসন্তের অন্য সাড়া নেই।
প্লেন আছে :
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়োরোড্রোম
র'য়ে গেছে।
চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড়–
হলেও বা হ'য়ে যেতো পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর;

সেইখানে ক্লান্তি তবু–
ক্লান্তি– ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময়;
সেইখানে মৃত্যু তবু;
এই শুধু–
এই;
চাঁদ আসে একলাটি;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায়;
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের– রক্তের উপরে আকাশে।
এ-ছাড়া পাখির কোনো সুর–

বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হ'য়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো-বড় চেতনার লোকে;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

## দীপ্তি

তোমার নিকট থেকে
যতো দূর দেশে
আমি চ'লে যাই
ততো ভালো।
সময় কেবলি নিজ নিয়মের মতো;– তবু কেউ
সময়স্রোতের 'পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায়;
ভেঙে যায়;
যতো ভাঙে ততো ভালো।
যত স্রোত ব'য়ে যায়
সময়ের
সময়ের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নিপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
তুমি ততো বহে যাও,
আমি ততো বহে চলি,
তবুও কেহই কারু নয়।
আমরা জীবন তবু।

তোমার জীবন নিয়ে তুমি
সূর্যের রশ্মির মতো অগণন চুলে
রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙে
খরতর নদী হ'য়ে গেলে
হ'য়ে যেতে।
তবুও মানুষী হ'য়ে
পুরুষের সন্ধান পেয়েছো;

জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস;
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।
বালুচরে নদীটির জল ঝরে,
খেলে যায় সূর্যের ঝিলিক,
মাছরাঙা ঝিকমিক ক'রে উড়ে যায়;
মৃত্যু আর করুণার দুটো তরোয়াল আড়াআড়ি
গ'ড়ে ভেঙে নিতে চায় এইসব সাঁকো ঘর বাড়ি;
নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।

এ-রকম হয়েছে অনেক দিন– রৌদ্রে বাতাসে;
যারা সব দেখেছিলো–
যারা ভালোবেসেছিলো এইসব– তারা
সময়ের সুবিধায় নিলেমে বিকিয়ে গেছে আজ।
তারা নেই।
এসো আমরা যে যার কাছে– যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হ'য়ে প্রতিভাত হ'য়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে ?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোথাও সূর্যের ভোর র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয় !
মরণকে নয় শুধু–
মরণসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হ'য়ে
যা-কিছু দ্যাখার আছে
আমরাও দেখে গেছি;
ভুলে গেছি, স্মরণে রেখেছি।
পৃথিবীর বালি রক্ত কালিমার কাছে তারপর
আমরা খারিজ হ'য়ে দোটানার
অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুস্থির রেখে
গণিকাকে দ্যাখায়েছি ফাঁদ;
প্রেমিককে শিখায়েছি ফাঁকির কৌশল।
শেখাইনি ?

শতাব্দী আবেশে অস্তে চ'লে যায় :
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ ক'রে যায়
স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোন্‌খানে জীবনের আশ্বাস রয়েছে।

আমরা অপেক্ষাতুর;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় যোগান দিয়ে ভেসে
এ-অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।

পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা ক'রে ভেসে গেছে;
সামনের অভিভূত অন্তহীন সমুদ্রের মতন এসেছে;
লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর
ঝাপটার মতো বিশ্বাসহন্তার মতো কেউ
সমুদ্রের অন্ধকার পথে প'ড়ে আছে।
মৃত্যু আজীবন অগণন হ'লো, তবু
এ-রকমি হবে।

'কেবলি ব্যক্তির– ব্যক্তির মৃত্যু শেষ ক'রে দিয়ে আজ
আমরাও ম'রে গেছি সব–'
দরিলে না ম'রে তবু এ-রকম মৃত্যু অনুভব
ক'রে তারা হৃদয়বিহীনবাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ ক'রে দিতে চেয়ে যতোদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লানায়মান হ'য়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের
অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

প্রথম প্রকাশ
১৩৬১ বাংলা, ১৯৫৪ ইংরেজি

আবহমান ২৮১ ভিখিরি ২৮৩ তোমাকে ২৮৪ মনোকণিকা ২৮৫ সুবিনয় মুস্তফী ২৮৭ অনুপম ত্রিবেদী ২৮৭ তবু ২৮৮ পৃথিবীতে ২৮৯ এই সব দিনরাত্রি ২৯০ লোকেন বোসের জর্নাল ২৯৩ ১৯৪৬-৪৭ ২৯৪ মানুষের মৃত্যু হ'লে ২৯৮ অনন্দা ৩০০ আছে ৩০৩ যাত্রী ৩০৩ স্থান থেকে ৩০৪ দিনরাত ৩০৫ পৃথিবীতে এই ৩০৫

## নাভানা-সংস্করণ *শ্রেষ্ঠ কবিতার* আদি-সূচি

[পৃষ্ঠা-নির্দেশ : *জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতাসমগ্র* অনুসারে]

### ঝরা পালক

নীলিমা ৭১ পিরামিড ১০৭ সেদিন এ-ধরণীর ১১৫

### ধূসর পাণ্ডুলিপি

মৃত্যুর আগে ১৭৭ বোধ ১৪৩ নির্জন স্বাক্ষর ১২১ অবসরের গান ১৪৬ ক্যাম্পে ১৫১ মাঠের গল্প ১২৩ সহজ ১২৬ পাখিরা ১৭৫ শকুন ১৭৭ স্বপ্নের হাতে ১৭৯

### বনলতা সেন

ধান কাটা হ'য়ে গেছে ২০০ পথ হাঁটা ২০৫ বনলতা সেন ১৮৫ আমাকে তুমি ১৯৮ তুমি ১৯৯ অন্ধকার ১৯৪ সুরঞ্জনা ২০১ সবিতা ২০২ সুচেতনা ২০৩
* আবহমান ২৮১ * ভিখিরি ২৮৩ * তোমাকে ২৮৪

### মহাপৃথিবী

হাজার বছর শুধু খেলা করে ২০১ শব ২১৩ হায় চিল ১৮৯ সিন্ধুসারস ২১০ কুড়ি বছর পরে ১৮৫ ঘাস ১৮৮ হাওয়ার রাত ১৮৬ বুনো হাঁস ১৮৯ শঙ্খমালা ১৮৯ বিড়াল ১৯৩ শিকার ১৯১ নগ্ন নির্জন হাত ১৯০ আট বছর আগের একদিন ২১৫
* মনোকণিকা ২৮৫ * সুবিনয় মুস্তফী ২৮৭ * অনুপম ত্রিবেদী ২৮৭

### সাতটি তারার তিমির

আকাশলীনা ২৩৭ ঘোড়া ২৩৭ সমারূঢ় ২৩৮ নিরঙ্কুশ ২৩৮ গোধূলিসন্ধির নৃত্য ২৩৯ একটি কবিতা ২৪১ নাবিক ২৪৪ খেতে-প্রান্তরে ২৫০ রাত্রি ২৪৫ লঘু মুহূর্ত ২৪৬ নাবিকী ২৬৭ উত্তরপ্রবেশ ২৭৩ সৃষ্টির তীরে ২৫৮ তিমিরহননের গান ২৬২ জুহু ২৫৯ সময়ের কাছে ২৬৮ জনান্তিকে ২৭০ সূর্যতামসী ২৬৫ বিভিন্ন কোরাস ২৫২
* তবু ২৮৮ * পৃথিবীতে ২৮৯ * এই সব দিনরাত্রি ২৯০ * লোকেন বোসের জর্নাল ২৯৩
* ১৯৪৬-৪৭ ২৯৪ * মানুষের মৃত্যু হ'লে ২৯৮ ** অনন্দা ৩০০ * আছে ৩০৩ * যাত্রী ৩০৩ ** স্থান থেকে ৩০৪ ** দিনরাত ৩০৫ ** পৃথিবীতে এই ৩০৫

* চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি। ** চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে কিংবা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

## আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।
সকলেরি চোখ ক্রমে বিজড়িত হ'য়ে যেন আসে;
যদিও আকাশ সিন্ধু ভ'রে গেলো অগ্নির উল্লাসে;
যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় খেতের গোধূম
চিলের কান্নার মতো শব্দ ক'রে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম

গাঢ় ক'রে দিয়ে যায়।– এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ
নদীর তরঙ্গে– ক্রমে– তুষারের স্তূপে তার ঢেউ
একবার টের পাবে– দ্বিতীয়বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতোদূর দ্যাখা যায় চোখে
নির্জন খেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা;
এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান ক'রে ফেলে জলের মতন এক ঢোকে;
অঘ্রাণের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো খেতের কাজ ক'রে যায় ধীরে;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।
পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হ'য়ে খ'সে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে;
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হ'য়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হ'লো মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিষের মতন।
অভিভূত হ'য়ে আছে– চেয়ে দ্যাখো– বেদনার নিজের নিয়ম।

নেউলধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয়;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা;
ওইদিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয়;
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ

অনেক মনীষা, প্রেমে, নিমীল ফসলরাশি ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।
পৃথিবীর রাজপথে– রক্তপথে– অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।
তাহার পায়ের নিচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায়;
তাহার মাথার 'পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড়;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হ'য়ে থেকে ক্রমে একদিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ ?

চেয়েছে মাটির দিকে– ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার;
দূরবীনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তা'রা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম'রে
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে;
চিরদিন এইসব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।
মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্রও প্রামাণিক; পরলোক রেখেছে সে জ্বেলে;
অনৃত সে আমদের মৃত্যুকে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে ব'সে– অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতোটা দূরে চ'লে যাই– চেয়ে দেখি আরো-কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারো বিবরে
ছায়া ফেলে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যে-সব থাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।
হয়তো অনেক এগিয়ে তা'রা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোলতার নেই অবলেশ।

তাই তা'রা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরো জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়– এই জ্ঞানে
লোকসানি বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর ক'রে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।
অকৃত্রিম নীল আলো খেলা করে ঢের আগে মৃত প্রেমিকের শব থেকে।

একটি আলোক নিয়ে ব'সে থাকা চিরদিন;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে;
সে-সবের দিন শেষ হ'য়ে গেছে
এখন সৃষ্টির মনে– অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।
একদিন ছিলো যাহা অরণ্যের রোদে– বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হ'য়ে গেছি– বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে : 'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ–'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিলো ইতিহাসে;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলং ছবি;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে ম'রে গেছি– মনে পড়ে বটে
এইসব ছবি দেখে; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেনী স্থাণু।
এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হ'য়ে গেছে অন্য-এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তা'রা সব।

(আমাদের পূর্বপুরষেরা কোন্ বাতাসের শব্দ শুনেছিলো;
তারপর হয়েছিলো পাথরের মতন নীরব ?)
আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী;
সুমদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো;
তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব একসাথে প্রচারিত করে।
সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ;
তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

## ভিখিরি

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো–
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে।

– ব'লে সে বাড়ায়ে দিল অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত;
তবুও তা নুলো শাঁখারির হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো–
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
– ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু– হ্যারিসন রোডে– আরো গভীর অসুখ
এক পৃথিবীর ভুল; ভিখিরির ভুলে : এক পৃথিবীর ভুলচুক।

## তোমাকে

একদিন মনে হ'তো জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা–
অথবা দুপুরবেলা– বিকেলের আসন্ন আলোয়–
চেয়ে আছে– চ'লে যায়– জলের প্রতিভা।

মনে হ'তো তীরের উপরে ব'সে থেকে।
আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল
কেউ-কেউ তুলে নিয়ে চ'লে গেলে– নিচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

নির্জন জলের রং তাকায়ে রয়েছে;
স্থানান্তরিত হ'য়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে;

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হ'য়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিভে যায় ব'লে
রঙিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয় :
অপরাহ্ণে আকাশের রং ফিকে হ'লে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিম বিন্যাস;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

## ও. কে.

একটি বিপ্লবী তার সোনা রুপো ভালোবেসেছিলো;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিলো পরবর্তী জীবনের লোভে;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিলো দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।

বুকের উপরে হাত রেখে দিয়ে তা'রা
নিজেদের কাজ ক'রে গিয়েছিলো সব।
অবশেষে তা'রা আজ মাটির ভিতরে
অপরের নিয়মে নীরব।

মাটির আহ্নিক গতি সে-নিয়ম নয়;
সূর্য তার স্বাভাবিক চোখে
সে-নিয়ম নয়– কেউ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়;
সব দিক ও.কে.।

## সাবলীল

আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না– তবু–
দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে।
আমরা দণ্ডিত হ'য়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।

মাঝে-মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হ'লে–
(এ রকম উত্তেজিত হয়;)
উপস্থাপয়িতার মতন
আমাদের চায়ের সময়

এসে প'ড়ে আমাদের স্থির হ'তে বলে।
সকলেই স্নিগ্ধ হ'য়ে আত্মকর্মক্ষম;
এক পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা কেটে ফেলে
চেয়ে দ্যাখে স্তূপাকারে কেটেছে রেশম।

এক পৃথিবীর মতো বর্ণময় রেশমের স্তূপ কেটে ফেলে
পুনরায় চেয়ে দ্যাখে এসে গেছে অপরাহ্নকাল :
প্রতিটি রেশম থেকে সীতা তার অগ্নিপরীক্ষায়–

অথবা খ্রীস্টের রক্ত করবী ফুলের মতো লাল।

## মানুষ সর্বদা যদি

মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিতো–
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিলো ভুলে),
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিতো,
পরচুলা এঁটে নিতো স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ-সব কাজ ক'রে যেতো যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হ'তো, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হ'তো কে নিজের মুখের রগড়ে।

## চার্বাক প্রভৃতি–

'কেউ দূরে নেপথ্যের থেকে, মনে হয়,
মানুষের বৈশিষ্ট্যের উত্থান-পতন
একটি পাখির জন্ম– কীচকের জন্মমৃত্যু সব
বিচারসাপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

'তবু এই অনুভূতি আমাদের মর্ত্য জীবনের
কিংবা মরণের কোনো মূলসূত্র নয়।
তবুও শৃঙ্খলা ভালোবাসি ব'লে হেঁয়ালি ঘনালে
মৃত্তিকার অন্ধ সত্যে অবিশ্বাস হয়।'

ব'লে গেলো বায়ুলোকে নাগার্জুন, কৌটিল্য, কপিল,
চার্বাক প্রভৃতি নিরীশ্বর;
অথবা তা এডিথ, মলিনা নাম্নী অগণন নার্সের ভাষা–
অবিরাম যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বায়ুর ভিতর।

## সমুদ্রতীরে

পৃথিবীতে তামাশার সুর ক্রমে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে
জন্ম নেবে একদিন। আমোদ গভীর হ'লে সব
বিভিন্ন মানুষ মিলে মিশে গিয়ে যে-কোনো আকাশে
মনে হবে পরস্পরের প্রিয়প্রতিষ্ঠ মানব।

এইসব বোধ হয় আজ এই ভোরের আলোর পথে এসে

জুহুর সমুদ্রপারে, অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে।
এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাঁক, ধর্ম মরেছে;
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

## সুবিনয় মুস্তফী

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।
একসাথে বিড়াল ও বিড়ালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।
ইঁদুরকে খেতে-খেতে শাদা বিড়ালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হ'তে-হ'তে সেই ভারিক্কে ইঁদুর :
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তা'রা দুই জনে কতোখানি দূর
ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচকা মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছুদিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা ক'রে দিতে যেতো– মাটির দরের মতো রেটে:
তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেতো ব'লে বিড়ালের পেটে
ইঁদুর 'হুর্‌রে' ব'লে হেসে খুন হ'তো সেই খিল কেটে-কেটে।

## অনুপম ত্রিবেদী

এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
যদিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড়ো গোল পেটের ভিতরে
সশরীরে; টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা
এক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয় মানুষের কথা
হৃদয়ে জাগায়ে যায়; টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়
যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ-নিজ চিন্তার বিষয়
পরিশেষ ক'রে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে
এখন ঘুমায়ে আছে– তাহাদের ঘুম ভেঙে দিতে
নিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে– ওই পারে মৃত্যুর তালা
ত্রিবেদী কি খোলে নাই ? তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা
ঈশার শবোত্থান– বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস : তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো; এমন সময়
দু-পকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়
জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেলো মাটি মানুষের প্রেম;
প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হ'লো একটি টোটেম :
উটের ছবির মতো– একজন নারীর হৃদয়ে;

মুখে-চোখে আকুতিতে মরীচিকা জয়ে
চলেছে সে; জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মতো শাড়ি;
ভালো ক'রে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
দিব্য মহিলা এক; কোথায় যে আঁচলের খুঁট;
কেবলি উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট
ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু, ব্লক, অথবা রায়ের বোঝা ব'য়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?
তা হ'লে তা প্রেম নয়; ভেবে গেলো ত্রিবেদীর হৃদয়ের জ্ঞান।
জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দু-দিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি– ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিলো টান।

## তবু

সে অনেক রাজনীতি রুগ্ন নীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে
উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছরে বয়সী আমি;
বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চ'লে যেতে দেখে– তবু– অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা 'করে
এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি;
আজে ভোরে বাংলার তেরোশো চুয়ান্ন সাল এই
কোথাও নদীর জলে নিজেকে গণনা ক'রে নিতে ভুলে গিয়ে
আগামী লোকের দিকে অগ্রসর হ'য়ে যায়; আমি
তবুও নিজেকে রোধ ক'রে আজ থেমে যেতে চাই
তোমার জ্যোতির কাছে : আড়াই হাজার
বছর তা হ'লে আজ এইখানে শেষ হ'য়ে গেছে।

নদীর জলের পথে মাছরাঙা ডানা বাড়াতেই
আলো ঠিকরায়ে গেছে– যারা পথে চ'লে যায় তাদের হৃদয়ে;
সৃষ্টির প্রথম আলোর কাছে; আহা,
অন্তিম আভার কাছে; জীবনের যতিহীন প্রগতিশীলতা
নিখিলের স্মরণীয় সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে; দ্যাখো
পাখি চলে, তারা চলে, সূর্য মেঘে জ্ব'লে যায়, আমি
তবুও মধ্যম পথে দাঁড়ায়ে রয়েছি– তুমি দাঁড়াতে বলোনি।
আমাকে দ্যাখোনি তুমি; দ্যাখাবার মতো
অপব্যয়ী কল্পনার ইন্দ্রত্বের আসনে আমাকে
বসালে চকিত হ'য়ে দেখে যেতে যদি– তবু, সে-আসনে আমি
যুগে-যুগে সাময়িক শত্রুদের বসিয়েছি, নারি,

ভালোবেসে ধ্বংস হ'য়ে গেছে তা'রা সব।
এ-রকম অন্তহীন পটভূমিকায়– প্রেমে–
নতুন ঈশ্বরদের বার-বার লুপ্ত হ'তে দেখে
আমারো হৃদয় থেকে তরুণতা হারায়ে গিয়েছে;
অথচ নবীন তুমি।

নারি, তুমি সকালের জল উজ্জ্বলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো নদীকেই
বিকেলে অপর ঢেউয়ে খরশান হ'তে
দিতে ভুলে গিয়েছিলে; রাতের প্রখর জলে নিয়তির দিকে
ব'হে যেতে দিতে মনে ছিলো কি তোমার?
এখনো কি মনে নেই?

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলি শিথিল হ'য়ে যায়; তবু তুমি
সেই শিথিলতা নও, জানি, তবু ইতিহাসরীতিপ্রতিভার
মুখোমুখি আবছায়া দেয়ালের মতো নীল আকাশের দিকে
ঊর্ধ্বে উঠে যেতে চেয়ে তুমি
আমাদের দেশে কোনো বিশ্বাসের দীর্ঘ তরু নও।

তবু
কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্ব'লে ওঠে রোদে !
উদয় সমাপ্ত হ'য়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে ?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হ'য়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু, নব সৃষ্টিমরালের মতো কলস্বরে
কেন কথা বলি; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশহংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।

## পৃথিবীতে

শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায়
কোনো এক কবি ব'সে আছে;
অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে;
তবুও সে প্রীত অবহিত হ'য়ে আছে

এই পৃথিবীর রোদে– এখানে রাত্রির গন্ধে– নক্ষত্রের তরে
তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ

মুছে ক'রে দিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,
সব অবিশ্বাসের অন্ধকারে দেশ

ছিলে গেলে, জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হ'লে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অম্লান হ'য়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হ'তো।

## এই সব দিনরাত্রি

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অসার কিনারার দেশে
এখানে আদর্শ সব মাচুম হয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই;
তাদের জন্যে কোনো সভাপতি নেই;
শরীর বিবশ হ'লে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের
কর্তাদের মতো কোনো আশা-ভরসার
কোলাহল নেই।

অনেক ক্লেদিক আছে এইখানে।
অনেক ক্লেদ লোক আছে
সঠিক ক্লেদিক না তা'রা।
আজকের মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা শুধু মৃত নয়; অবিশ্বাসীর মতন মৃতদেহ নেড়ে।
আমাদের মৃত্যু নয়, এ-পৃথিবীর ক্লেদ-জ্বালা নাম এইসব।
অনেক অনেক দিন এ-সব নামের সঙ্গে পরিচিত; তবু,
পুর শিশু নির্বাসন সভাটি অবাধে ক্লেদে এরা
অবাধে না কোনোরা দেখে মানুষের সমাজের পরিশ্রেণিদের
সকল চিহ্নিত কোনো ক্ষুধার নিবাস পাওয়া যাবে;
অবাধে না কোনোরা দেখে জ্ঞান কোনো আলো পাওয়া যাবে;
অনেক কোনোরা মৃত পরিচ্ছন্ন সকলের নিষ্ঠুরতার আছে।

ক্লেদিকের সমাজের কোনোরাও
সমাজের কোনো কাঁচাপাকার কোনো সব ছিলে কখনো নয়?
এরা নয়— সমাজ এরের হ'য়ে আছি
কোনোরে অবাধে কোনো চিরকালের অবাধ পাইনি।
কোনো আছে, কোনো নেই— সকলের অবাধাকারে নেই।

যাদের আস্তানা মর্ত্য পৃথিবীতে নেই
হাসপাতালের বেড ছাড়াও তাদের ঘর নেই।
পাতলা মুচিপাড়া ঢালাতলা জোড়াসাঁকো আরো কোন কোন অঞ্চলে
সারা বৃষ্টিপাত ম'রে অথবা ট্রামের লাইন সাঁকুয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোন দিকে?
জানু জোড় প'ড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আলাদীন
হ'য়ে কিছু চায় কিছু দেখে;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই।

তাদের আকাশ
সর্বদাই বৃষ্টিপাতে;
মাঝে মাঝে এম্বুলেন্স গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা সরে
ফিরে আসে
যেন এক অসীম আকাশে।

এ-রকম ভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হ'য়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলি পাথুরেদাঁড়া নিমতলা চিৎপুর—
পাশের এপার ওপার রাজাবাজারের আস্তাবল নির্দেশে
হাসপাতালের ভরে
অনেক রোডের প্রয়োজন;
বিলাসের প্রয়োজন আছে;
নিটোল মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।
হাসপাতালের জন্যে সাতাশের অঞ্চলা দাদন,
কিংবা সারা সরণের আগে মৃতদের
জাতিধর্ম নির্বিচারে সকলকে— সব ভুক্তভোগ আর্তকেও
শরীরের সান্ত্বনা এনে দিতে চায়,
কিংবা সারা এইসব মৃত্যু রোধ ক'রে এক সাহসী পৃথিবী
সুস্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।
মানুষের অবিশ্রান্ত কাজ চিন্তা কলা
রক্তের নদীর মতো ঢেলে গেলে, অরণ্য, জল, এক অঞ্জলা ভূতল
অধিকার ক'রে নিয়ে কেবলই নির্মল হ'তে পারে।

ইতিহাস অর্ধশতো কামাচ্ছন্ন এখনো কালের বিমানতা;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের জন্য
আসে জীবনের পাশে; সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।

কিন্তু সেই শুভরাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়– অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে
শুনেছি একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারী
কেমন আশ্চর্য গান গায় :
বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায়;
গানের ঝংকারে যেন সে এক একান্ত শ্যাম দেবদারু গাছে
রাত্রির বর্ণের মতো কালো-কালো শিকারি বিড়াল
প্রেম নিবেদন করে আলোর রঙের মতো অগণন পাখিদের কাছে;
ঝর্-ঝর্-ঝর্
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত ক্লেদরক্ত বৃষ্টির ভিতর
এ-পৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস
শঠতা রিরংসা মৃত্যু নিয়ে
কেমন প্রদত্ত কালো গণিকার উল্লোল সংগীতে
মুখের ব্যাদান সাধ দুর্দান্ত গণিকালয়– নরক শ্মশান হ'লো সব।
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথিবীকে এ-রকম ভাবে অনুভব
আমিও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে
বিকেলে– রাত্রির পথে হেঁটে;
দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে
আমরা অঙ্গার রক্ত : শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে।

এ-আগুন এতো রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো ?
তবুও সকল কাল শতাব্দীকে হিসেব নিকেশ ক'রে আজ
শুভ কাজ সূচনার আগে এই পৃথিবীর মানবহৃদয়
স্নিগ্ধ হয়– বীতশোক হয় ?
মানুষের সব গুণ শান্ত নীলিমার মতো ভালো ?
দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো।

## লোকেন বোসের জর্নাল

সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি–
এখনো কি ভালোবাসি ?
সেটা অবসরে ভাববার কথা,
অবসর তবু নেই;
তবু একদিন হেমন্ত এলে অবকাশ পাওয়া যাবে;
এখন শেল্‌ফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভ্‌লভ্‌ ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কি না।

পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে :
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা;
ফাইল নাড়া কি যে মিহি কেরানির কাজ;
নাড়বো না আমি,
নেড়ে কার কি সে লাভ;
মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,
সুবলেরি শুধু ? অবশ্য আমি তাকে
মানে এই– এই অমিতা বলছি যাকে–
কিন্তু কথাটা থাক;
কিন্তু তবুও–
আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,
নারী যদি মৃগতৃষ্ণার মতো– তবে
এখন কি ক'রে মন ক্যারভান হবে।

প্রৌঢ় হৃদয়, তুমি
সেইসব মৃগতৃষ্ণিকাতালে ঈসৎ সিমুমে
হয়তো কখনো বৈতাল মরুভূমি,
হৃদয়, হৃদয় তুমি !
তারপর তুমি নিজের ভিতরে ফিরে এসে তবু চুপে
মরীচিকা জয় করেছো বিনয়ী যে ভীষণ নামরূপে–
সেখানে বালির সৎ নীরবতা ধুধু
প্রেম নয় তবু প্রেমেরি মতন শুধু।

অমিতা সেনকে সুবল কি ভালোবাসে ?
অমিতা নিজে কি তাকে ?
অবসর মতো কথা ভাবা যাবে,
ঢের অবসর চাই;
দূর ব্রহ্মাণ্ডকে তিলে টেনে এনে সমাহিত হওয়া চাই;

এখুনি টেনিসে যেতে হবে তবু,
ফিরে এসে রাতে ক্লবে:
কখন সময় হবে।

হেমন্তে ঘাসে নীল ফুল ফোটে–
হৃদয় কেন যে কাঁপে,
'ভালোবাসতাম'– স্মৃতি– অঙ্গার– পাপে
তর্কিত কেন রয়েছে বর্তমান।
সে-ও কি আমায়– সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিলো ?
আজো ভালোবাসে না কি ?
ইলেকট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হ'য়ে রবে;
কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে ?

সুজাতা এখন ভুবনেশ্বরে,
অমিতা কি মিহিজামে?
বহুদিন থেকে ঠিকানা না জেনে ভালোই হয়েছে– সবি।
ঘাসের ভিতরে নীল শাদা ফুল ফোটে হেমন্তরাগে;
সময়ের এই স্থির এক দিক,
তবু স্থিরতর নয়;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

১৯৪৬-৪৭

দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা :
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে;
কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে– মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

অনেকেরি ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব– অথবা যা নিলেমের নয়
সে-সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত ক'রে দু-জন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন দু-জনের হাতে।
পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবি নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।

বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
অথবা মাটির দিকে– পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে
মিশে গিয়ে। পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হ'য়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার ক'রে নিতে হবে :
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হ'য়ে যায়।

লীন হ'য়ে গেলে তা'রা তখন তো– মৃত।
মৃতেরা এ-পৃথিবীতে ফেরে না কখনো।
মৃতেরা কোথাও নেই; আছে ?
কোনো-কোনো অঘ্রাণের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের
হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই ব'লে মনে হয়:
তা হ'লে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হ'তো।

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্ত চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে– কিন্তু কার হাতে ?
আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে– কিন্তু কার তরে ?
হাত নেই– কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্য, পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিলো প্রায়; নিভে গেছে সব।

এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনো পেয়েছে;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো... ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেতো:
এখন টুঁ-শব্দ নেই সেইসব কাকপাখিদেরো;
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়:
সময়ের হাতে অন্তহীন।

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হ'তো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি-বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে– বিবাহের কিছু পরে– সন্তানের জন্মাবার আগে।
সে-সব সন্তান আজ এ-যুগের কুরুক্ষেত্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা প'ড়ে
মৃতপ্রায়; আজকের এইসব গ্রাম্য সন্ততির

প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে– অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষতায়
অন্ধ শতচ্ছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

আজকে অস্পষ্ট সব ? ভালো ক'রে কথা ভাবা এখন কঠিন:
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ ক'রে নেওয়ার রেওয়াজ
র'য়ে গেছে: সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়– দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরি আন্তরিকতাতে
আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়;
মানুষ মেরেছি আমি– তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেলো, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি– তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে ক'রে অগ্রসর হ'য়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই ব'লে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ–
আর তুমি ?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে– রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালীর–'
কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর

মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এইসব প্রাণকণা জেগেছিলো– বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।
সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে
কথা বলে; কাকে বলে ? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা ব'লে গিয়েছিলো; তবু–
অনন্ত তো খণ্ড নয়; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই– সূর্য নিভে গেছে।

এ-যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ-পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না-পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল;
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু– বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই ব'লে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো– কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো : মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়– মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর সুধায় না– অতীতের সুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর– শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন

অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুলে পাপ
বীতকাম হয় যাতে– এ-জীবন ধীরে-ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে
কয়েকটি দেবদারুগাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ কাছে আসে– মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের– মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর ? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই ?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো– তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণে র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

## মানুষের মৃত্যু হ'লে

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আজকের আগে যেই জীবনের ভিড় জমেছিলো
তা'রা ম'রে গেছে;
প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে;
তবু তা'রা আজকের আলোর ভিতরে
সঞ্চারিত হ'য়ে উঠে আজকের মানুষের সুরে
যখন প্রেমের কথা বলে
অথবা জ্ঞানের কথা বলে–
অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে-সময়
দীপংকর শ্রীজ্ঞানের;
চলেছে– চলেছে–

একদিন বুদ্ধকে সে চেয়েছিলো ব'লে ভেবেছিলো।
একদিন ধূসর পাতায় যেই জ্ঞান থাকে– তাকে।
একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে
বিজ্ঞানে প্রবীণ হ'য়ে– তবু– কেন অম্বাপালীকে
চেয়েছিলো প্রণয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠে !

চেয়েছিলো–
পেয়েছিলো শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে :
সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে;
সিঁড়ি উদ্ভাসিত ক'রে রোদ;
সিঁড়ি ধ'রে ওঠার ওঠার পথে আরেক রকম
বাতাস ও আলোকের আসা-যাওয়া স্থির ক'রে কী অসাধারণ
প্রেমের প্রয়াণ ? তবু– এই শেষ অনিমেষ পথে
দেখেছে সে কোনো এক মহীয়সী আর তার শিশু;
দু-জনেই মৃত।
অথবা কেউ কি নেই !

ওইখানে কেউ নেই।
মৃত্যু আজ নারীনর্দামার ক্লাথে;
অন্তহীন শিশুফুটপাতে;
আর সেই শিশুদের জনিতার কিউক্লীবতায়।

সকল রৌদ্রের মতো ব্যাপ্ত আশা যদি
গোলকধাঁধায় ঘুরে আবার প্রথম স্থানে ফিরে আসে
শ্রীজ্ঞান কি তবে চেয়েছিলো ?

সূর্য যদি কেবলি দিনের জন্ম দিয়ে যায়,
রাত্রি যদি শুধু নক্ষত্রের,
মানুষ কেবলি যদি সামজের জন্ম দেয়,
সমাজ অস্পষ্ট বিপ্লবের,
বিপ্লব নির্মম আবেশের,
তা হ'লে শ্রীজ্ঞান কিছু চেয়েছিলো ?

নগরীর সিঁড়ি প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে;
অথচ নগরী মৃত।
সে-সিঁড়ির আশ্চর্য নির্জন
দিগন্তরে এক মহীয়সী,
আর তার শিশু;
তবু কেউ নেই।

ঢের ভারতীয় কাল– পৃথিবীর আয়ু– শেষ ক'রে
জীবনের বঙ্গাব্দ পর্বের প্রান্তে ঠেকে,
পুনরুদ্‌যাপনের মতন আরেকবার এই
তেরোশো পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু ক'রে ঢের দিন
আমারো হৃদয় এইসব কথা ভেবে

স্ফীত উৎস অথবা উৎসারিত মানুষকে তবু
হনাবক ফিরে যায়
কেননা স্ফীত নিহিত হলনা ছেলে-ভুলাবার মতো তবু নয়:
মানুষে ঘুমের আগে কথা ভেবে সব সমাধান
ক'রে নিতে চায়:
কথা ভেবে হৃদয় ওকায় জেনে কষ্ট করে।

সময় এবং শক্তা জলের বন্ধনে কোনভয়ের
নিহত হিংস্র রক্ত ক্লেদ
মানুষকে ফিরে যায়:
হৃদয়ের পরিবর্তে মানুষের শরীরে মানুষ
ঘোলাবাড়ি উঁচু ক'রে রেখে নিয়তির
অন্ধকারে অমানব:
তবুও গ্লানির মতো মানুষের মনের ভিতরে
এইসব জেগে থাকে ব'লে
শতকের আয়ু– অথবা আয়ু– আজ ফুরিয়ে গেলেও এই শতাব্দীকে তা'রা
কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা ক'রে
আশার উজ্জ্বল রথে: না-হ'লে এ-ছাড়া
কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।
মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়: অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো আলো– আরো স্থির নির্ঝরের মতো চেতনায়
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতোদূর অগ্রসর হ'য়ে গেলো জেনে নিতে আসে।

## অনন্দা

এই পৃথিবীর এ এক শতচ্ছিন্ন নগরী:
দিন ফুরালে তারার আলো খানিক নেমে আসে।
পাশের বাতি দাঁড়িয়ে থাকে রাতের বাতাসে:
দ্রুতগতি নরনারীর খানিক শরীর থেকে
উৎসারিত ছায়ার কালো ভারে
আঁধার আলোর মনে হ'তে পারে
এ-সব দেয়াল যে-কোনো নগরীর:
সন্দেহ তার আশ্রয় দেয় অবকাশের ভিড়
সূর্য তারার আলোর অচেল রক্ত হ'তে পারে
যে-কোনোদিন: সে কতোবার আঁধার বেশি শানিত হয়েছে:
বাহক নেই– মৃত্যু কাল নিজেই রয়েছে

নিজেরি শব নিজে মানুষ,
মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে।

হৃদয় আছে ব'লেই মানুষ, দ্যাখো, কেমন বিচলিত হ'য়ে
বোনভায়েকে খুন ক'রে সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে
জেগে উঠে ইতিহাসের অধম ক্রূরতাকে
ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞানপ্রতিভা আকাশ প্রেম নক্ষত্রকে ডাকে।

এই নগরী যে-কোনো দেশ: যে-কোনো পরিচয়ে
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের কলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে ট্র্যাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডাকে।

'তুমি কি গ্রীস পোল্যান্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক
লন্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন ?
একটি মৃত্যু, এক ভূমিকা, একটি শুধু আইন।'
বলছে মেশিন। মেশিনপ্রতিম অধিনায়ক বলে :
'সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন ক'রে গ'ড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে,
নতুন সময় সীমাবলয় সবি তো আজ আমি:
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার স্বত্বাধিকারক্ষমী:
আমি সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল:
সবুজ শাদা মেরুন অশ্লীল
নিয়মগুলো বাতিল করি: কালো কোর্তা দিয়ে
ওদের ধূসর পাটকিলে বক্ কোর্তা ডাড়িয়ে
আমার অনুচরের বৃন্দ অন্ধকারের বার
আলোক ক'রে বী অবিনাশ দৈশ-পরিবার।

'এই দ্বীপই দেশ: এ-দ্বীপ নিখিল ভবে।
অন্য সকল দ্বীপের হ'তে হবে
আমার মতো— আমার অনুচরের মতো ধ্রুব।
হে রক্তবীজ, তুমি হবে আমার আঘাত পেয়ে
অনবতুল আমির মতো শুভ।'

সবাই তো আজ যে যার অন্তরঙ্গ জিনিস খুঁজে
মানবত্রাণবোধকে বুকে টেনে নেবার ছলে

তাদের নিকেশ ক'রে অনির্বচন রক্তে এই পৃথিবীর জলে
নানারকম নতুন নামের বৃহৎ ভীষণ নদী হ'য়ে গেলো;
এই পৃথিবীর সব নগরী পরিক্রমা ক'রে
নতুন অভিধানের শব্দে ছন্দে জেগে সুপরিসর ভোরে
এ-সব নদী গভীরতর মানে পেতে চায়–
দিকসময়ের আতল রক্ত ক্ষালন ক'রে অননুতপ্ততায়;
বাস্তবিকি জল কি জলের নিকটতম মানে ?
অথবা কি মানবরক্ত বহন করি নির্মম অজ্ঞানে ?
কি আন্তরিক অর্থ কোথায় আছে ?
এই পৃথিবীর গোষ্ঠীরা কি পরস্পরের কাছে
ভাইয়ের মতো : সৎ প্রকৃতির স্পষ্ট উৎস থেকে
মানবসভ্যতার এই মলিন ব্যতিক্রমে জেগে উঠে ?
যে যার দেহ আত্মা ভালোবেসে অমল জলকণার মতন সমুদ্রকে এক মুঠে
ধ'রে আছে ?
ভালো ক'রে বেঁচে থাকার বিশদ নির্দেশে
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে এসে
হিংসা গ্লানি মৃত্যুকে শেষ ক'রে
জেগে আছে?

জেগে উঠে সময়সাগরতীরে সূর্যস্রোতে
তবুও ক্লান্ত পতিত মলিন হ'তে
কি আবেদন আসছে মানুষ প্রতিদিনি–
কোথার থেকে শকুনক্রান্তি বলে :
'জলের নদী ? জেগে উঠুক আপামরের রক্তকোলাহলে !'

এ-সুর শুরু হয়েছিলো কুরুবর্ষে– বেবিলনে ট্রয়ে;
মানুষ মানী জ্ঞানী প্রধান হ'য়ে গেছে; তবুও হৃদয়ে
ভালোবাসার যৌনকুয়াশা কেটে
যে-প্রেম আসে সেটা কি তার নিজের ছায়ার প্রতি ?
জলের কলরোলের পাশে এই নগরীর অন্ধকারে আজ
আঁধার আরো গভীরতর ক'রে ফেলে সভ্যতার এই অপার আত্মরতি;
চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হ'য়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।

## আছে

এখন চৈত্রের দিন নিভে আসে– আরো নিভে আসে;
এখানে মাঠের 'পরে শুয়ে আছি ঘাসে;
এসে শেষ হ'য়ে যায় মানুষের ইচ্ছা কাজ পৃথিবীর পথে,
দু-চারটে– বড়ো জোর একশো শরতে;

উর ময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর শর্তে র'য়ে গেছে শেষ;
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ
পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছেদের ভূমা– মনে হয়– এক তিলের সমান;
কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি– অফুরান

চারিদিকে বড়ো-বড়ো আকাশ ও গাছের শরীরে
সময় এসেছে তার নীড়ে।
ভালো লাগে পৃথিবীর রূঢ় নষ্ট সভ্যতার দিনের ব্যত্যয়;
অন্ধকার সনাতনে মিশে যাওয়া– কিন্তু মরণের ঘুম নয়;

জেগে থাকা : নক্ষত্রের বাগীশ্বরী দ্যোতনার থেকে কিছু দূরে;
পৃথিবীর অবলুপ্ত জ্ঞানী বন্ধুরে
এই স্তব্ধ মাটিতেই মিশে যেতে হ'লো জেনে তবু চোখ রেখে নীলাকাশে
শুয়ে থাকা পৃথিবীর মাধুরীর অন্ধকার ঘাসে।

## যাত্রী

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিলো কবে;
পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিলো–
সেইসব ধীরে-ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে– আলো জল আকাশের টানে;
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।

মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ-পৃথিবীর দেশে;
কঙ্কাল অঙ্গার কালি– চারিদিকে রক্তের ভিতরে
অন্তহীন করুণ ইচ্ছার চিহ্ন দেখে
পথ চিনে এ-ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম;

কাকে তবু ?
পৃথিবীকে ? আকাশকে ? আকাশে যে-সূর্য জ্বলে তাকে ?
ধূলোর কণিকা অণুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে ?
নগর বন্দর রাষ্ট্র অজ্ঞানের পৃথিবীকে?

যেই কুজ্ঝটিকা ছিলো জন্মসৃষ্টির আগে, আর
যে-সব কুয়াশা রবে শেষে একদিন
তার অন্ধকার আজ আলোর বলয়ে এসে পড়ে পলে-পলে;
নীলিমার দিকে মন যেতে চায় প্রেমে:
সনাতন কালো মহাসাগরের দিকে যেতে বলে।

তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোদ্র সঙ্গে ক'রে আনে
যেই ঋতু যেই তিথি যে-জীবন যেই মৃত্যুরীতি
মহাইতিহাস এসে এখনো জানেনি যার মানে;

সেদিকে যেতেছে লোক গ্লানি প্রেম ক্ষয়
নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে ক'রে;
নদী আর মানুষের ধাবমান ধূসর হৃদয়
রাত্রি পোহালো ভোরে— কাহিনীর কতো শত ভোরে
নব সূর্য নব পাখি নব চিহ্ন নগরে নিবাসে;
নব-নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়
প্রাণলোকযাত্রীদের ভিড়;
হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে, অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।

## স্থান থেকে

স্থান থেকে স্থানচ্যুত হ'য়ে
চিহ্ন ছেড়ে অন্য চিহ্নে গিয়ে
ঘড়ির কাঁটার থেকে সময়ের স্নায়ুর স্পন্দন
খসিয়ে বিমুক্ত ক'রে তাকে
দ্যাখা যায় অবিরল শাদা-কালো সময়ের ফাঁকে
সৈকত কেবলি দূর সৈকতে ফুরায়;
পটভূমি বার-বার পটভূমিচ্ছেদ
ক'রে ফেলে আঁধারকে আলোর বিলয়
আলোককে আঁধারের ক্ষয়

শেখায় শুক্র সূর্যে: গ্লানি রক্তসাগরের জয়
দ্যাখায় কৃষ্ণ সূর্যে: ক্রমেই গভীর কৃষ্ণ হয়।

## দিনরাত

সারাদিন মিছে কেটে গেলো;
সারারাত বড্ডো খারাপ
নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে: জীবন
দিনরাত দিনগতপাপ

ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু।
ফণীমনসার কাঁটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে; একটিও পাখি শূন্যে নেই;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।

## পৃথিবীতে এই

পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো;
ভূমিষ্ঠ হবার পরে যদিও ক্রমেই মনে হয়
কোনো এক অন্ধকার স্তব্ধ সৈকতের
বিন্দুর ভেতর থেকে কোনো
অন্য দূর স্থির বলয়ের
চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে দুই শব্দহীন শেষ সাগরের
মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত এই সূর্যের আলো।

কেন আলো ? মাছিদের ওড়াউড়ি ?
কেবলি ভঙ্গুর চিহ্ন মুখে নিয়ে জল
সুয়েজ হেলেস্‌পন্ট প্রশান্ত লোহিতে
পরিণতি চায় এই মাছি মাছরাঙা
প্রেমিক নাবিক নষ্ট নাসপাতি মুখ
ঠোঁট চোখ নাক করোটির গন্ধ
স্পষ্ট এক নিরসনে স্থির ক'রে রেখে দেবে ব'লে;
চলেছে– চলেছে–

শিশির কুয়াশা বৃষ্টি ঝড়ের বিহ্বল আলোড়ন
সমুদ্রের শত মৃত্যুশীল ফাঁকি
ডানে-বাঁয়ে সারাদিন আবছা মরণ

ঝেড়ে ফেলে– ঝাপসায় বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে
আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি
চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত
খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি চায়;

জলের মরণশীল চ্ছলচ্ছল শুনে
কম্পাসের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হ'তে ব'লে
আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই– প্রেমে;
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বার-বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে।

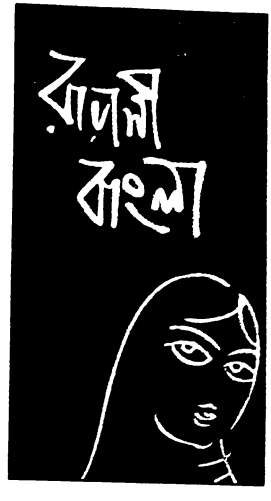


প্রথম প্রকাশ
১৩৬৪ বাংলা, ১৯৫৭ ইংরেজি

রূপসী বাংলা ৩০৯-৩৪৯

১

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও– আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাবো; দেখিবো কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিবো খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হ'য়ে আসে,
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে– একবার– দুইবার– তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;
দেখিবো মেয়েলি হাত সকরুণ– শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে : সন্ধ্যায় দাঁড়ালো সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন্ কাহিনীর দেশে–
'পরণ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে.
কলমিদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে–
নীরবে পা ধোয় জলে একবার– তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চ'লে যায় কুয়াশায়– তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাবো না তারে আমি– সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

২

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি– চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম– বট– কাঁঠালের– হিজলের– অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে ষঠীবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনি হিজল– বট– তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে–
কৃষ্ণা-দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়–
সোনালি ধানের পাশ অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো– একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী-মাঠ-ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

৩

যতোদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হ'য়ে– আরো নীল আরো নীল হ'য়ে
আমি যে দেখিতে চাই;– সে আকাশ পাখনায় নিঙরায়ে ল'য়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে
আমি যে দেখিতে চাই– আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাবো ব'য়ে
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে– আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা
যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ– সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা
যেখানে শুকায় পদ্ম– বহুদিন বিশালাক্ষি যেখানে নীরব
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মাণিকমালার
কাঁকন বাজিতো, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর !

৪

একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নীচে শুয়ে রবো– পশমের মতো লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে– বাঁকা চাঁদ জেগে রবে– নদীটির জল
বাঙালি মেয়ের মতো বিশালাক্ষি মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে-ভয়ে– তারপর যেই ভাঙা ঘাটে
রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল
সেইখানে কলমির দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারারাত– দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে

সাজায়ে রেখেছে চিতা : বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ
চেয়ে রবে; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প– ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে
চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি– শাদা শাখা– বাংলার ঘাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ– আপনার মনে
ভাঙিতেছে ধীরে-ধীরে– চারিদিকে এইসব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস–

৫

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
ব'সে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মুনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে– আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা– কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দ্যাখে নিকো– দেখি নাই অতো
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত
জানি নাই এতো স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে : নরম ধানের গন্ধ– কলমির ঘ্রাণ
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত– শীত হাতখান
কিশোরের পায়ে দলা মুথাঘাস– লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা– এরি মাঝে বাংলার প্রাণ
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

৬

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস– প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে– [illegible]কে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা– বটের অজস্রফল ঝরে বারে-বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে– পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে– ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে-ঘাসে– বক তাহা জানে নাকো, পায় নাকো টের
শালিখ খঞ্জনা তাহা– লক্ষ-লক্ষ ঘাস এই নদীর দুধারে

নরম কান্তারে এই পাড়াগাঁর বুকে শুয়ে সে কোন্ দিনের
কথা ভাবে; তখন এ জলসিড়ি শুকায়নি, মজেনি আকাশ
বল্লাল সেনের ঘোড়া– ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হ'তো এই পথে– আরো আগে রাজপুত্র কতোদিন রাশ
টেনে-টেনে এই পথে– কি যেন খুঁজেছে, আহা, হয়েছে উদাস
আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু– নাটাফলে মিটিতেছে আশ–

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৯

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১১

ঘুমায়ে পড়িবো আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
মাথায় বৈশাখ মেঘ– শাদা-শাদা যেন কড়ি শঙ্খের পাহাড়
মাঠের ওপার থেকে চেয়ে রবে– কোনো এক শঙ্খবালিকার
ধূসর রূপের কথা মনে হবে– এই আম জামের ছায়াতে
কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি– কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত– কবে যেন তারপর শ্মশান চিতায় তার হাড়
ঝ'রে গেছে, কবে যেন; এ জনমে নয় যেন– এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা– আমি তার সাথে

কাটায়েছি;– পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা– সাতশো বছর
কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে
ধান কাটা হ'য়ে গেলে মাঠে মাঠে কতোবার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে
ভাসানের গান শুনে কতোবার ঘর আর খড় গেলো ভেসে
মাথুরের পালা বেঁধে কতোবার ফাঁকা হ'লো খড় আর ঘর।

১২

ঘুমায়ে পড়িবো আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
তখনো যৌবন প্রাণে লেগে আছে হয়তো বা– আমার তরুণ দিন
তখনো হয়নি শেষ– সেই ভালো– ঘুম আসে– বাংলার তৃণ
আমার বুকের নিচে চোখ বুজে– বাংলার আমের পাতাতে
কাঁচপোকা ঘুমায়েছে– আমিও ঘুমায়ে রবো তাহাদের সাথে
ঘুমাবো প্রাণের সাধে এই মাঠে– এই ঘাসে– কথাভাষাহীন
আমার প্রাণের গল্প ধীরে-ধীরে মুছে যাবে– অনেক নবীন
নতুন উৎসব রবে উজানের– জীবনের মধুর আঘাতে

তোমাদের ব্যস্ত মনে;– তবুও কিশোর তুমি পায়ের আঘাতে
যখন এ ঘাস ছিঁড়ে চ'লে যাবে– যখন মাণিকমালা ভোরে
লাল-লাল বটফল কামরাঙা কুড়াতে আসিবে এই পথে
যখন হলুদ বোঁটা শেফালিরা কোনো এক নরম শরতে
ঝরিবে ঘাসের পরে– শালিখ খঞ্জনা আজ কতোদূর ওঠে
কতোখানি রোদ-মেঘ– টের পাবো শুয়ে-শুয়ে মরণের ঘোরে।

১৩

যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রবো– অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে
কাঁঠালগাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে–
দিনমানে কোনো মুখ হয়তো সে-শ্মশানের কাছে নাহি আসে–
তবুও কাঁঠাল-জাম বাংলার– তাহাদের ছায়া যে পড়িছে
আমার বুকের 'পরে– আমার মুখের 'পরে নীরবে ঝরিছে
খয়েরি অশথপাতা– বইচি-শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,
নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাইয়ে– বাংলার ঘাসে
গভীর ঘাসের গুচ্ছে রয়েছি ঘুমায়ে আমি– নক্ষত্র নড়িছে

আকাশের থেকে দূর– আরো দূর– আরো দূর– নির্জন আকাশে
বাংলার– তারপর অকারণ ঘুমে আমি প'ড়ে যাই ঢুলে;
আবার যখন জাগি, আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে
ভ'রে আছে, চেয়ে দেখি;– বাসকের গন্ধ পাই– আনারস ফুলে
ভোমরা উড়িছে, শুনি– গুবরেপোকার ক্ষীণ গুমরানি ভাসিছে বাতাসে
রোদের দুপুর ভ'রে– শুনি আমি; ইহারা আমারে ভালোবাসে–

১৪

আবার আসিবো ফিরে ধানসিড়িটির তীরে– এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এ কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিবো এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো– কিশোরীর– ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ-ভরা জলে ভেসে-ভেসে;
আবার আসিবো আমি বাংলার নদী-মাঠ-খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;– রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে–

১৫

যদি আমি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়
যখন ঝরিছে ধান বাংলার খেতে-খেতে ম্লান চোখ বুজে
যখন চড়াই পাখি কাঁঠালিচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে
যখন হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরি পাতায়
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদাজলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়
শামুক গুগলিগুলো প'ড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে
তখন আমারে যদি পাও নাকো লালশাক ছাওয়া মাঠে খুঁজে
ঠেস্ দিয়ে ব'সে আর থাকি নাকো যদি বুনো চালতার গায়

তাহলে জানিও তুমি আসিয়াছে অন্ধকারে মৃত্যুর আহ্বান
যার ডাক শুনে রাঙা রৌদ্রেরো চিল আর শালিখের ভিড়
একদিন ছেড়ে যাবে আম জাম বনে নীল বাংলার তীর
যার ডাক শুনে আজ খেতে-খেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরীর ধান
কবে যে আসিবে মৃত্যু : বাসমতী চালে ভেজা শাদা হাতখান
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরচনারূপে আমি করিবো যে স্নান–

১৬

মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিবো না আর
দেখিবো না হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে একঝাড় জোনাকি কখন
নিভে যায়– দেখিবো না আর আমি পরিচিত এই বাঁশবন
শুক্‌নো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হ'য়ে যাবে গভীর আঁধার
আমার চোখের কাছে– লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার
পেঁচা ডাকে জ্যোৎস্নায়– হিজলের বাঁকা ডাল করে গুঞ্জরণ
সারারাত কিশোরীর লাল পাড় চাঁদে ভাসে– হাতের কাঁকন
বেজে ওঠে : বুঝি না– গঙ্গাজল, নারকোলনাড়ুগুলো তার

জানি না সে কারে দেবে– জানি না সে চিনি আর শাদা তালশাঁস
হাতে ল'য়ে পলাশের দিকে চেয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে রবে কি না...
আবার কাহার সাথে ভালোবাসা হবে তার– আমি তা জানি না
মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?...কীর্তিনাশা খুঁড়ে-খুঁড়ে চলে বারোমাস
নতুন ডাঙার দিকে– পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায়– শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ ?

১৭

যে শালিখ ম'রে যায় কুয়াশায়  সে তো আর ফিরে নাহি আসে
কাঞ্চনমালা যে ঝরে ঝ'রে গেছে;— বনে আজো কলমির ফুল
ফুটে যায়  সে তবু ফেরে না হায়  বিশালাক্ষি ! সেও তো রাতুল
চরণ মুছিয়া নিয়া চ'লে গেছে;  মাঝপথে জলের উচ্ছ্বাসে
বাধা পেয়ে নদীরা মজিয়া গেছে দিকে-দিকে  শ্মশানের পাশে
আর তারা আসে নাকো  সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুলজুল
চোখ তুলে চেয়ে থাকে— কতো পটিরাণীদের গাঢ় এলো চুল
এই গৌড় বাংলার— প'ড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাসে

জানে সে কি ! দেখে নাকি তারাবনে প'ড়ে আছে সিঁদুর সেউল
বিশুদ্ধ পদ্মের দীঘি— ফোঁপরা মহলা ঘাট, হাজার মহাল
মৃত সব রূপসীরা ! বুকে আজ ভেরেণ্ডার ফুলে ভীমরুল
গাস গায়— পাশ দিয়ে খল্ খল্ খল্ খ'য়ে যায় খাল
তবু ঘুম ভাঙে নাকো— একবার ঘুমালে কে উঠে আসে আর
যদিও ডুকারি যায় শঙ্খচিল— মর্মরিয়া মরে গো মাদার।

১৮

কোথাও চলিয়া যাবো একদিন— তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতোকাল জানিবো না আমি
জানিবো না কতোকাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ-বাদামি
পাতাগুলো— মাদারের ডুমুরের— সোঁদা গন্ধ— বাংলার শ্বাস
বুকে নিয়ে তাহাদের— জানিবো না পরখুপী মধুরূপী ঘাস
কতোকাল প্রান্তরে ছড়ায়ে রবে— কাঁঠাল শাখার থেকে নামি
পাখনা ডলিবে পেঁচা এই ঘাসে— বাংলার সবুজ বালামি
ধানী শাল পশমিনা বুকে তার— শরতের রোদের বিলাস

কতোকাল শিউরাবে;— আঁচলে মাটার কথা ভুলে গিয়ে বুঝি
কিশোরের মুখ চেয়ে কিশোরী করিবে তার মৃদু মাথা নিচু
আসন্ন সন্ধ্যায় কাক— করুণ কাকের দল খোড়ো নীড় খুঁজি
উড়ে যাবে— দুপুরে ঘাসের বুকে সিঁদুরের মতো রাঙা নিচু
মুখ গুঁজে প'ড়ে রবে— আমিও ঘাসের বুকে রবো মুখ গুঁজি
মৃদু কাঁকনের শব্দ— গোরোচনা জিনি রং চিনিবো না কিছু—

১৯

তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চ'লে যাবে; যে হাঁসিতে সন্ধ্যাও ঝ'রে
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়— কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে-দিকে রূপশালিধান
একদিন— হয়তো বা নিরপেক্ষ অন্ধকারে পাবে তার গান
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে
ক্লান্তে খুঁজিয়া পথ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষায়— তবুও চোখের 'পরে
নীল মৃত্যু উপচায়— বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ

কখন মরণ আসে কে বা জানে— কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের দল ভাঙে— ছিঁড়ে ফেলে পাণ্ডুলিপি শালিকের প্রাণ
জানি নাকো— তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর
কৃষ্ণা যমুনার নয়— যেন এই পাণ্ডুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে— রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

২০

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায়— মিশে যায় আমমনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে—
পুকুরের লাল সর ফীণ ঢেউয়ে বার-বার চায় যে জড়াতে
বাঁশের হলুদ পাতা; ঘুমো খেতে চায় মাদুরাঙাটির পায়
এক-একটি ইঁট খসে— ডুবজলে ডুব দিয়ে কোথায় হারায়
ভাঙা ঘটিলায় এই— আজ আর কেউ এসে চালধোয়া হাতে
কিছুটি খসায় নাকো— শুকনো পাতা সারাদিন থাকে যে পড়াতে
কাঁচি খেলিবার ঘর মেজে দিয়ে গোক্ষুরার ফাটলে হারায়

ডাইনীর মতো হাত দুলে-দুলে ওঠে আঁশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝি নাকো— বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি হায় এমন বিজন
শাদা পথ— শোনা পথ বাঁশের মোরাটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চ'লে গেছে— শ্মশানের পারে বুঝি— সন্ধ্যা আসে সহসা কখন
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম— নিম— নিম কার্তিকের চাঁদে।

২১

দেশবন্ধু : ১৩১৬-১৩৩১এর স্মরণে

অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে
মাঠে-মাঠে ফিরি একা : মনে হয় বাংলার জীবনের সঙ্কট
ফুরায়েছে এইবার,— চেয়ে দ্যাখো কতো শত শতাব্দীর বট
হাজার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে ল'য়ে শাখার ব্যজনে
আকাঙ্ক্ষার গান গায় অশ্বত্থেরো কি যেন কামনা জাগে মনে
সতীর শীতল শব বর্ষদিন কোলে ল'য়ে যেন অকপট
উমার প্রেমের গন্ধ পেয়েছে সে— চন্দ্রশেখরের মতো তার জটা
উজ্জ্বল হয়েছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে

মধুরূপী ঘাস হাওয়া জলসিঁড়িটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি— রায়গুণাকর
আসিবে না— দেশবন্ধু আসিয়াছে ক্ষুরধার পন্থায় এবার
কালীদহে ক্লান্ত গাঙশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়
আসিয়াছে চণ্ডীদাস— রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে-সাথে তার :
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

২২

ভিজে হ'য়ে আসে মেঘে এ-দুপুর— চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে ব'সে-ব'সে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে
পায়রা গিয়েছে উড়ে চরুতরে, খোপে তার— শসালতাটিকে
ছেড়ে গেছে মৌমাছি— কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চ'লে যায়— দুই দণ্ড আমগাছে শালিখে-শালিখে
ঝুটোপুটি, কোলাহল— বউকথাকও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো— হলুদ পাখনা তার কোন্ যেন কাঁঠালে পলাশে

হারায়েছে বউও তো উঠানে নাই— প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি
ধান কে কুটিবে বলো— কতোদিন সে তো আর কোটে নাকো ধান
রোদেও শুকুতে সে যে আসে নাকো চুল তার— করে নাকো স্নান
এ-পুকুরে— ডাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার সেথি
তবুও সে আসে নাকো;— আজ এ-দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি
হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে না কি প্রাণ ?

২৩

দাঁড়কাক

খুঁজে তারে মরো মিছে– পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে নাকো আর
রয়েছে অনেক কাক এ-উঠানে– তবু সেই ক্লান্ত দাঁড়কাক
নাই আর– অনেক বছর আগে আমে জামে দুষ্ট এক ঝাঁক
দাঁড়কাক দেখা যেতো দিনরাত– সে আমার ছেলেবেলাকার
কবেকার কথা সব : আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার
রাত না ফুরাতে সে যে কদমের ডাল থেকে দিয়ে যেতো ডাক
এখনো কাকের শব্দে অন্ধকার ভোরে আমি বিমনা, অবাক
তার কথা ভাবি শুধু; এতোদিনে কোথায় সে ? কী যে হ'লো তার

কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, খেত, মাঠ, ঘাস
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত
সেইসব সোনা পাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, তালশাঁস
সেইসব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি ছাওয়া পথ– ধোঁয়াভরা ভাত
কোথায় গিয়েছে সব ?– অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে– নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত

২৪

পাড়াগাঁর দুপহর ভালোবাসি– রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে
স্বপনের;– কোন্ গল্প, কি কাহিনী, কি স্বপ্ন যে বাঁধিয়াছে ঘর
আমার হৃদয়ে আহা, কেউ তাহা জানে নাকো– কেবল প্রান্তর
জানে তাহা, আর ওই প্রান্তরের শঙ্খচিল; তাহাদের কাছে
যেন এ-জনমে নয়– যেন ঢের যুগ ধ'রে কথা শিখিয়াছে
এ-হৃদয়– স্বপ্নে যে-বেদনা আছে : শুষ্ক পাতা– শালিকের স্বর
ভাঙা মঠ– নরম্যাপেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর
হলুদ পাতার মতো স'রে যায়, জলসিঁড়িটির পাশে ঘাসে

শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দহীন ঘুমো চালতার
জলে তার মুখখানা দ্যাখা যায়– ডিঙিও ভাসিছে কার জলে
মালিক কোথাও নাই– কোনোদিন এই দিকে আসিবে না আর
কাঁকরা কোঁপরা আহা ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গিয়েছে হিজলে
পাড়াগাঁর দুপহর ভালোবাসি– রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনায়
গন্ধ লেগে আছে, আহা, কেঁপে-কেঁপে ভাসিতেছে আকাশের তলে।

২৫

কখন সোনার রোদ নিভে গেছে— অবিরল গুপুরির সারি
আঁধারে যেতেছে ডুবে— প্রান্তরের পার থেকে গরম বাতাস
ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ-অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস
কোন্ চৈতে চ'লে গেছে সেই মেয়ে আসিবে না ক'রে গেছে আড়ি
ক্ষীরুই গাছের পাশে একাকী দাঁড়ায়ে আজ বলিতে কি পারি
কোথাও সে নাই এই পৃথিবীতে— তাহার শরীর থেকে শ্বাস
ঝ'রে গেছে ব'লে তারে ভুলে গেছে নক্ষত্রের অসীম আকাশ
কোথাও সে নাই আর— পাবো নাকো তারে কোনো পৃথিবী নিঙাড়ি ?

এই ঘাসে— ফলসা এ-ক্ষীরুয়ে যে গন্ধ লেগে আছে
আজো তার; যখন তুলিতে যাই ঢেঁকিশাক— দুপুরের রোদে
সর্ষে খেতের দিকে চেয়ে থাকি— অঘ্রাণে যে ধান ঝরিয়াছে
তাহার দু-এক গুচ্ছ তুলে সেই চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে
পৃথিবীর রাঙা রোদ চড়িতেছে আকাঙ্ক্ষায় চিনিচাঁপা গাছে
জানি সে আমার কাছে আছে আজো— আজো সে আমার কাছে আছে।

২৬

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুরূপী ঘাসে অবিরল
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গিরে দেয় অবিরল জল
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ

সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর
শঙ্খমালা নাম তার। এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে পাবে নাকো— বিশালাক্ষি দিয়েছিলো বর
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

২২

ঝড়ে ভেরে– দুপুরে– সন্ধ্যায় দেখি নীল তুপুরির রঙ
বাতাসে কাঁপিয়ে ধীরে– বাঁচার স্বপ্নে মত্ত পাখিদের মন
কেন এক রক্তকরা– পাখনে ঘাসের শাড়ি– কালচুলে ঘন
বাতাসে শাসিয়ে– অভিমানে ইহলোকে করেছে বরণ
ফুলের জলের গন্ধ কানার– ঘুম নেই, নদিকে মরণ
চর মাঝ কেনেছিল– পালাচ্ছে সে শোর নাকে, হয় নাকে ভুল
নদীতীরে শ্যাম অর শাসিয়ে গানে চর জাগিয়েছে প্রাণ
সন্ধ্যাদিন– সরবাহ বুকে কাঁপে আজ ভাবে তুপুরির রঙ

সন্ধ্যে বাতাসে চকে জালে আলে– সুর দেখি কানে নড়কক
সবুজ ছাদ সুরে তুপুরি– শ্রীমন্তও নেবেছে এমন
বক মাতাল্লী জেগে সিঁদুর মেঘে হয়েছে অবক
দূর প্রবাস থেকে ফিরে প্রাণে বাসনার তুপুরির রঙ
দেখিয়াছে– অকস্মাৎ পড় নীল, করুণ কাকে চক
জানিয়াছে– সে কতে শতাব্দী আগে ডেকেছিলো তাহার বরণ

২৮

এই ছাড় ছেড়ে হয় রাত কে বুঝিবে যায় পৃথিবীর পথে
অন্ধকার কার পাত কেন এক দুপাশের পথ ডেকে আনে
হারায়ে রয়েছে তার প্রহরের পথে-পথে নির্জন আকাশে
অজানা উদ্দেশ্য কাঁপে কে যাবে বিদেশে বলে– অমি বোলেছিলে
কাকাতী বাসকের ছেড়ে দিয়ে যাবার– উটির পর্বতে
যাবে নাকে– দেখিবে না পাকাপথ মাঝ বাড়ে সমুদ্রের গানে
কোন দেশে– কোথায় প্রেমিকের নকশিনী কারাবীর প্রাণে
কিছুনি কাবার বাঁধে থাকিবার স্বপ্ন আনে– পৃথিবীর পথে

যাবে নাকে : সন্ধ্যের কারাগত সুন্দর শাল ধুলোর ভিতর
কখন এ দুপুরের বেটি বাই বোলে দিকে– পাখিটিও নাই
অবিরাম ঘাস সু হারায়ে রয়েছে বাটি-কাঁকরের 'পর
কয়েকটি চাঁদের বিদিয়েছে মুখোটি কিছু চাই
অন্ধকার পাতাগুলো পড়ে আছে সুন্দর শাল ধুলোর ভিতর
এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ জীবন বোলেছিলো যেতে নাকে তাই ;

২৯

এখানে আকাশ নীল— নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে স্থির শব্দ— শুধু তার অশ্বিনীর আলোর মতন;
আকন্দফুলের কাছে ঈষৎ এইখানে ঘাস থাকে
রৌদ্রের দুপুর তাঁরে— বরবর রোদ তার ঝিল নেমেছে দূর
কাঁঠাল ছায়ার বুকে নিস্তব্ধ— নড়ে যায় পক্ষ অনুক্ষণ
কুলায়-কুলায় ফেরে এইখানে তার দিন কাঁঠালের বন
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ঘুমোয় চক্ষু
সেই পথ মিশে আছে কবে তার কেঁকিলার শাঁখের ধূ

কবেকার কেঁকিলার জানে কি তা ? বলে মুকুন্দরাম হয়
লিখেছিলেন বসে দুপহরে সাধে সে অকুক্ষণ
কেঁকিলার চক্ষু তার লেখা তার বাক্য পড়ে— যেন-যেন হয়
অথবা বেহুলা এক যখন চলেছে ভেসে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধনেখেতে, আমবনে, জলাশয়ে শাঁখের
কেঁকিলার চক্ষু তার চোখে তার কুটীরের কুয়াশা ঝরে

৩০

কেবলও মাঠের কাছে— যেইখানে ভাঙা মাঠ নীল হয়ে আছে
শাঙনের— অনেক গভীর ঘাস জমে গেছে বুকের ভিতর
পাশে নদী বাঁকে আছে— কপালি মাছের কণ্ঠ স্বর
যেইখানে পাটকেলি আর তার রূপালী শরীর ঝলমলায়
বহু-বহুদিন আগে— যেইখানে শ্যামলা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কবে শতাব্দী আগে মহাকাল-বিলীন;— একেছে কড়ির ঘর
কোন্ যেন কুহকীর কাজলে ঘুরে গেছে সব তারপর
একদিন আমি যাবে দুপহরে সেই দূর প্রান্তরের মাঠে

সেখানে মানুষ কেউ যায় নাকে— সেখা আর কাঁকনীর ঢেউ
বেতের বনের কাঁকে— জারুল গাছের তলে রৌদ্র পোহায়
রূপালী নদীর মুখ দাবা যায়— শাদা ঝাঁটফুলের ঢেউ
অশ্বত্থ-ওড়ার নিচে গরু চলে ঘোমটার কাকের গায়
তবুও সেখানে আমি নিয়ে যাবে একদিন পাটকিলে ঘোড়া
যার রূপ জনে-জনে কাঁদায়েছে আমি তারে খুঁজিবে সেখায়

৩১

চ'লে যাবে শুকনো পাতা ছাওয়া ঘাসে– জামরুল হিজলের বনে
জলের বাঁশের ছিপ হাতে রবে– মাছ আমি ধরিবো না কিছু
ঈষৎ জলের গন্ধে রূপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর মায় ছাওয়া শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে
অনেক রোদে ওই মাছরাঙা তার মাছরাঙাটির মনে
অস্পষ্ট আলোর যেন মুছে যায়– সিন্দুরের মতো রাঙা লিচু
ঝ'রে পড়ে পাতা ঘাসে– চেয়ে দেখি কিশোরী করেছে মাখা লিচু
এসেছে সে দুপুরের অবসরে জামরুল লিচু আহরণে–

চ'লে যায়: নীলাম্বরী স'রে যায় কোকিলের পাখনার মতো
ঝিকুকের শাখা ছুঁয়ে চলতার চাল ছেড়ে বাঁশের পিছনে
কোনো দূর আকাঙ্ক্ষার খেতে-মাঠে চ'লে যায় যেন অব্যাহত
যদি তার পিছু যাও দেখিবে সে আকন্দের করবীর বনে
ভোমরার ভয়ে ভীরু: বহুক্ষণ পায়চারি ক'রে অন্যমনে
তারপর চ'লে গেলো : উড়ে গেলো যেন নীল ভোমরার সনে।

৩২

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের মনে
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে
জামের আড়ালে সেই বউকথাকওটিরে যদি ফেলো দেখে
একবার: একবার দুপহর অপরাহ্ণে যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও– তাহলে অনন্তকাল থাকিতে হবে যে এই বনে
মৌরীর গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে রেখে
অঘ্রানের খেতকরা কচি-কচি শ্যামপোকাদের কাছে ডেকে
রবে আমি এইখানে চকোরীর সাথে যেন চকোরের মতন মিলনে

ঠাঁয়ে কে রূপবতী খেলা করে– ছড়াতে দিতেছে বুঝি ধান
শালিখেরে : ঘাস থেকে ঘাসে-ঘাসে খুঁটে-খুঁটে খেতেছে সে তাই
হলুদ নরম পায়ে ঝরেরি শালিখগুলো চলিছে ঠাঁয়ে
চেয়ে দ্যাখো সুন্দরীরে : পেয়েছো রূপ নিয়ে এসেছে কি রাই
অথবা মিশরে তারে করে আমি দেখিয়াছি– করেছিলো সুন

৩৩

শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছো– বহুকাল পেয়ে গেছো গান
সোনালি চিলের মতো উড়ে-উড়ে আকাশের রৌদ্র আর মেঘে
লক্ষ্মীর বাহন যেই স্নিগ্ধ পাখি আশ্বিনের জ্যোৎস্নার আবেগে
গান গায়– শুনিয়াছি রাখিপূর্ণিমার রাতে তোমার আহ্বান
তার মতো; আম চাঁপা কদমের গাছ থেকে গাহে অনুরান
যেন স্নিগ্ধ ধান ঝরে... অনন্ত সবুজ শালি আছে যেন জেগে
বুকে তব; বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে
পদ্মা মেঘনা ইছামতী নয় শুধু– তুমি কবি করিয়াছে স্নান

সাত সমুদ্রের জলে– ঘোড়া নিয়ে গেছো তুমি ধূসর নীলিমে
অর্জুনের মতো আহা– আরো দূর ম্লান নীল রূপের কুয়াশা
খুঁড়েছো সুপর্ণ তুমি– দূর রং আরো দূর রেখা ভালোবেসে
আমাদের কালীদহ– গাছুড়– গাছের চিল তবু ভালোবাসা
চায় যে তোমার কাছে– চায় তুমি ঢেলে দাও নিজের নিঃশেষে
এই দহে– এই চূর্ণ মঠে-মঠে– এই জীর্ণ বটে বাঁধে বাসা

৩৪

তবু তাহা ভুল জানি রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা
তবুও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়
আরো ঢের প্রাণ তার, বেগ তার, আরো ঢের জল, জল আরো
তোমারো পৃথিবী পথ; নক্ষত্রের সাথে তুমি খেলিতেছে পাশা
শস্যমালা নয় শুধু অনুরাধা রোহিণীরো চাও ভালোবাসা
না জানি সে কতো আশা– কতো ভালোবাসা তুমি বসিতে গো পারো
এখানে নদীর ধারে বসমতী ধানগুলো করিছে আবারো
প্রান্তরের কুয়াশায় এইখানে বাদুড়ের যাওয়া আর আসা

এসেছে সন্ধ্যার কাক ঘরে ফিরে– দাঁড়ায়ে রয়েছে জীর্ণ মঠ
মাঠের আঁধারপথে শিশু কাঁদে– লালপেড়ে পুরোনো শাড়ির
ছবিটি মুছিয়া যায় ধীরে-ধীরে– কে এসেছে আমার নিকট ?
কার শিশু ? বলো তুমি; শুধালাম– উত্তর দিলো না কিছু বট
কেউ নাই কোনোদিকে– মাঠেপথে কুয়াশার ভিড়
তোমারে শুধাই কবি : তুমিও কি জানো কিছু এই শিশুটির ?

৩৫

সোনার খাঁচার বুকে রহিবো না আমি আর শুকের মতন
কী গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে– কোন্ গান বলো
তাহলে এ দেউলের খিলানের গল্প ছেড়ে চলো, উড়ে চলো
যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়াছে– আছে আতাবন
পউষের ভিজে ভোরে আজ হায় মন যেন করিছে কেমন
চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, মুখ তুলে চেয়ে দ্যাখো– শুধাই শুনো লো
কি গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে কোন্ গান বলো
আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও, আমি যে বনের হীরামন

রাজকন্যা শোনে নাকো– আজ ভোরে আরশিতে দ্যাখে নাকো মুখ
কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হ'য়ে আছে যেন কড়ির মতন
সেইদিকে চেয়ে-চেয়ে দিনভোর ফেটে যায় রূপসীর বুক
তবুও সে বোঝে না কি আমারো যে সাধ আছে– আছে আনমন
আমারো যে... চন্দ্রমালা রাজকন্যা, শোনো-শোনো তোলো তো চিবুক
হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে-চেয়ে হিম হ'য়ে গেলো নাকি স্তন।

৩৬

কতোদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে
আকাশপ্রদীপ জ্বেলে তখন কাহারা যেন কার্তিকের মাস
সাজায়েছে– মাঠ থেকে গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস
ভেসে আসে– ডানা তুলে সাপমাসী উড়ে যায় আপনার মনে
আকন্দ বনের দিকে– একদল দাঁড়কাক ম্লান গুঞ্জরণে
নাটার মতন রাঙা মেঘ নিঙরায়ে নিয়ে সন্ধ্যার আকাশ
দু মুহূর্ত ভ'রে রাখে– তারপর মৌরীর গন্ধমাখা ঘাস
প'ড়ে থাকে; লক্ষ্মীপেঁচা ডাল থেকে ডালে শুধু উড়ে চলে বনে

আধোফোটা জ্যোৎস্নায়; তখন ঘাসের পাশে কতোদিন তুমি
হলুদ শাড়িটি বুকে অন্ধকারে ফিঙার পাখনার মতো
বসেছো আমার কাছে এইখানে– আসিয়াছে ষঠীবন চুমি
গভীর আঁধার আরো– দেখিয়াছি বাদুড়ের মৃদু অবিরত
আসা যাওয়া আমরা দুজনে ব'সে– বলিয়াছি ছেঁড়াফাঁড়া কতো
মাঠ ও চাঁদের কথা : ম্লান চোখে একদিন সব শুনেছো তো।

৩৭

এসব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা
চালতার পাতা থেকে টুপ টুপ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির
কুয়াশায় স্থির হয়েছিলো ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর
বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়েছে রেখা
আকাঙ্ক্ষার; নিভু দীপ আপনারে মনোরম দিয়ে গেছে ঢাকা
সঙ্গে তার কবেকার সৌমাছির কিশোরীর ভিড়
আমের বউল দিলো শীতরাতে;– আনিলো আতর ক্ষীর
মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম,– এ-কবিতা লেখ

তাহাদের ম্লান চুল মনে ক'রে; তাহাদের কড়িন মতন
ধূসর হাতের রূপ মনে ক'রে; তাহাদের হৃদয়ের স্তর
সে কতো শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শব্দের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি– ক্ষীর দেহ– তাহাদের অপরূপ মন
চ'লে গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে
আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে-থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে

৩৮

কতোদিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে– সন্ধ্যায় ধূসর, সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে– বাদুড় কেবল
করিতেছে আসা যাওয়া আকাশের মৃদুপথে,– ছিন্ন ভিজে বড়
বুকে নিয়ে সনকার মতো যেন প'ড়ে আছে নরম প্রান্তর
বাঁকা চাঁদ চেয়ে আছে;– কুয়াশায় গা ভাসায়ে নেয় অবিরল
নিঃশব্দ গুবরেপোকা– সাপমাসী– ধানী শ্যামাপোকাদের দল
দিকে-দিকে চালধোয়া গন্ধ মৃদু– ধূসর শাড়ির স্বর

শোনা যায়;– মানুষের হৃদয়ের পুরোনো নীরব
বেদনার গন্ধ ভাসে;– খড়ের চালের নিচে তুমি আর আমি
কতোদিন মলিন আলোয় ব'সে দেখেছি বুঝেছি এইসব
সময়ের হাত থেকে ছুটি পেয়ে স্বপনের গোধূলিতে নামি
খড়ের চালের নিচে মুখোমুখি ব'সে থেকে তুমি আর আমি
ধূসর আলোয় ব'সে কতোদিন দেখেছি বুঝেছি এইসব।

৩৯

এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়– সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে
মাটির ভিটের পরে– লেগে থাকে অন্ধকার ধুলোর আঘ্রাণ
তাহাদের চোখে-মুখে– কদমের ডালে পেঁচা গেয়ে যায় গান
মনে হয় একদিন পৃথিবীতে হয়তো এ জ্যোৎস্না শুধু রবে
এই শীত রবে শুধু;– রাত্রি ভ'রে এই লক্ষ্মীপেঁচা কথা কবে
কাঁঠালের ডাল থেকে হিজলের ডালে গিয়ে করিবে আহ্বান
সাপমাসী পেঁচাটিরে...সেই দিন আঁধারে উঠিবে ন'ড়ে ধান
ইঁদুরের ঠোঁটে-চোখে– বাদুড়ের কালো ডানা করমচা পল্লবে

কুয়াশারে নিঙরায়ে উড়ে যাবে আরো দূর নীল কুয়াশায়
কেউ তাহা দেখিবে না– সেদিন এ-পাড়াগাঁর পথের বিস্ময়
দেখিতে পাবো না আর– ঘুমায়ে রহিবে সব : যেমন ঘুমায়
আজ রাত্রে: যেমন ঘুমায় মৃত যারা: যেমন হতেছে ক্ষয়
অশ্বত্থ কাউয়ের পাতা চুপে-চুপে আজ রাতে হায়
যেমন ঘুমায় মৃতা,– তাহার বুকের শাড়ি যেমন ঘুমায়।

৪০

একদিন যদি আমি কোনো দূর বিদেশের সমুদ্রের জলে
ফেনার মতন ভাসি শীতরাতে– আসি নাকো তোমাদের মাঝে
ফিরে আর– লিচুর পাতার পরে বহুদিন সাঁঝে
যেই পথে আসাযাওয়া করিয়াছি– একদিন নক্ষত্রের তলে
কয়েকটা নাটাফল তুলে নিয়ে আনারসী শাড়ির আঁচলে
ফিঙের মতন তুমি লঘু চোখে চ'লে যাও জীবনের কাজে
এই শুধু... বেজির পায়ের শব্দ পাতার উপরে যদি বাজে
সারারাত... ডানার অস্পষ্ট ছায়া বাদুড়ের ক্লান্ত হ'য়ে চলে

যদি সে পাতার 'পরে; শেষরাতে পৃথিবীর অন্ধকারে শীতে
তোমার ক্ষীরের মতো মৃদু দেহ– ধূসর চিবুক, বাম হাত
চালতা গাছের পাশে খোড়ো ঘরে স্নিগ্ধ হ'য়ে ঘুমায় নিভৃতে
তবুও তোমার ঘুম ভেঙে যাবে একদিন চুপে অকস্মাৎ
তুমি যে কড়ির মালা দিয়েছিলে– সে-হাড় ফিরায়ে দিতে
কখন কে এক ছায়া এসেছিলো... দরজায় করেনি আঘাত।

৪১

দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালির মন
আজ রাতে; একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে
তবুও সে-ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরির মৃদু গন্ধে ভ'রে রবে;– কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হ'য়ে যেমন নরম দুধে গলে
পৃথিবীর সব দেশে– সবচেয়ে ঢের দূর নক্ষত্রের তলে
সব পথে এইসব শান্তি আছে : ঘাস– চোখ– শাদা হাত– স্তন–

কোথাও আসিবে মৃত্যু– কোথাও সবুজ, মৃদু ঘাস
আমারে রাখিবে ঢেকে– ভোরে, রাতে, দুপহরে পাখির হৃদয়
ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে– রাতের আকাশ
নক্ষত্রের নীল গন্ধে ফুটে রবে;– বাংলার নক্ষত্র কি নয় ?
জানি নাকো; তবুও তাদের বুকে স্থির শান্তি– শান্তি লেগে রয়
আকাশের বুকে তারা যেন চোখ– শাদা হাত– যেন স্তন– ঘাস–

৪২

১৩২৬-এর কতকগুলো দিনের স্মরণে

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী
ছড়ায়েছি খই ধান বহুদিন উঠানের শালিখের তরে
সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেক দিন– দেখিয়াছি ধূপ জ্বলে, ধরো সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে– এখুনি আসিবে কিনা রাতি
বিনুনি বেঁধেছো তাই– কাঁচপোকা-টিপ তুমি কপালের 'পরে
পরিয়াছো... তারপর ঘুমায়েছো : জড়িপাড় আঁচলটি ঝরে
পানের বাটার 'পরে; নোনার মতন ভিজে শরীরটি পাতি

নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছো– বউকথাকওটির ছানা
নীল জামরুল নীড়ে– জ্যোৎস্নায়– ঘুমায়ে রয়েছো যেন হ'য়
আর রাত্রি মাতা-পাখিটির মতো ছড়ায়ে রয়েছে তার ডানা ;...
আর আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোয় কাঁটায়
চ'লে গেছি বহুদূরে;– দ্যাখোনিকো, বোঝোনিকো, করোনিকো মানা
রূপসী শঙ্খের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন– পানের বাটায় ;

৪৩

ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর
সবুজ ঘাসের থেকে: তাই রোদ ভালো লাগে– তাই নীলাকাশ
মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয়– পথে-পথে তাই এই ঘাস
জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয়– মউমাছিদের যেন নীড়
এই ঘাস– যতোদূর যাই আমি আরো যতোদূর পৃথিবীর
নরম পায়ের তলে যেন কতো কুমারীর বুকের নিঃশ্বাস
কথা কয়– তাহাদের শান্ত হাত খেলা করে– তাদের খোঁপার ফাঁস
খুলে যায়– ধূসর শাড়ির গন্ধে আসে তারা– অনেক নিবিড়

পুরোনো প্রাণের কথা ক'য়ে যায়– হৃদয়ের বেদনার কথা
সান্ত্বনার নিভৃত নরম কথা– মাঠের চাঁদের গল্প করে
আকাশের নক্ষত্রের কথা কয়– শিশিরের শাদা সরলতা
তাহাদের ভালো লাগে– কুয়াশারে ভালো লাগে চোখের উপরে
গরম বৃষ্টির ফোঁটা ভালো লাগে শীতরাতে– পেঁচার নম্রতা
ভালো লাগে এই যে অশ্বত্থপাতা আমপাতা সারারাত ঝরে।

৪৪

বৃষ্টির জল

এই জল ভালো লাগে– বৃষ্টির রুপালি জল কতোদিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ– বুলায়ে দিয়েছে চুল– চোখের উপরে
তার শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে খেলিয়াছে– আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চ'লে গেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে
এই জল ভালো লাগে– নীলপাতা মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশে
ফিঙ্গা যেমন তার দিনগুলো ভালোবাসে– বনের ভিতরে
বার-বার উড়ে যায়– তেমনি গোপন প্রেমে এই জল ঝরে
আমার দেহের 'পরে আমার চোখের 'পরে ধানের আবেশে

ঝ'রে পড়ে– যখন অঘ্রাণ রাতে ভরা খেত হয়েছে হলুদ
যখন জামের ডালে পেঁচার নরম হিম গান শোনা যায়
বনের কিনারে ঝরে যেই ধান বুকে ক'রে শান্ত শালি খুদ
তেমনি ঝরিছে জল আমার ঠোঁটের 'পরে– চোখের পাতায়
আমার চুলের 'পরে– অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আতায়
রেখেছে নরম হাত যেন তার– ঢালিছে বুকের থেকে দুধ।

৪৫

একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি; আমার শরীর
নরম ঘাসের পথে হাঁটিয়াছে; বসিয়াছে ঘাসে
দেখিয়াছে নক্ষত্রেরা জোনাকিপোকার মতো কৌতুকের মতন আকাশে
খেলা করে; নদীর জলের গন্ধে ভ'রে যায় ভিজে স্নিগ্ধ তীর
অন্ধকারে; পথে-পথে শব্দ পাই কাহাদের নরম শাড়ির
ম্লান চুল দ্যাখা যায়; সান্ত্বনার কথা নিয়ে কারা কাছে আসে
ধূসর কড়ির মতো হাতগুলো– ভিজে হাত সন্ধ্যার বাতাসে
দ্যাখা যায়; হলুদ ঘাসের কাছে মরা প্রজাপতিটির

সুন্দর করুণ পাখা প'ড়ে আছে– দেখি আমি; চুপে থেমে থাকি
আকাশে কমলা রং ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়– কাকগুলো নীল মনে হয়
অনেক লোকের ভিড়ে ডুবে পড়ি– কথা কই– হাতে হাত রাখি
করুণ বিষণ্ন চুলে কার যেন কোথাকার গভীর বিস্ময়
লুকায়ে রয়েছে বুঝি;... নক্ষত্রের নিচে আমি ঘুমাই একাকী
পেঁচার ধূসর ডানা সারারাত জোনাকির সাথে কথা কয়।

৪৬

পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর
অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি; পৃথিবীতে আমি বহুদিন
কাটায়েছি; বনে-বনে ডালপালা উড়িতেছে–যেন পরী জিন
কথা কয়; ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের পর
খইয়ের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর্ ঝর্
দু-ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি,– শাদা ধুলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন
ম্লান গন্ধ মাঠে খেতে– গুবরেপোকার তুচ্ছ বুক থেকে ক্ষীণ
অস্পষ্ট করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে বনের ভিতর

এইসব দেখিয়াছি; দেখিয়াছি নদীটিরে– মজিতছে ঢালু অন্ধকারে
সাপমাসী উড়ে যায়; দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর
পাখনার শব্দ করে অবিরাম; কুয়াশায় একাকী মাঠের ধারে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে; আরো দূরে দু-একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর
প'ড়ে আছে; নলখাগড়ার বনে ব্যাং ডাকে কেন যেন– থামিতে কি পারে
'তুমি কেন এইখানে' 'তুমি কেন এইখানে' শরের বনের থেকে দেয় সে উত্তর।
(আবার পাখনা নাড়ে– কাকের করুণ ডিম পিছলায়ে প'ড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে)

৪৭

মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে— হাসির আস্বাদ
পেয়ে গেছি; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
সূর্যের রাঙা ঘোড়া : পক্ষিরাজের মতো কমলা রঙের পাখা ঝাড়ে
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে; দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসদের সাধ
উঠেছে আনন্দে জেগে— নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন অবাধ
চ'লে গেছে কলরবে; দেখেছি সবুজ ঘাস— যতোদূর চোখ যেতে পারে
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল— পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ঢেকে আছে; দেখিয়াছি বাসমতী, কাশবন আকাঙ্ক্ষার রক্ত, অপরাধ

মুছায়ে দিতেছে যেন বার-বার— কোন্ এক রহস্যের কুয়াশার থেকে
যেখানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ সেই কুহকের থেকে এসে
রাঙা রোদ, শালিধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বার-বার রাখিতেছে ঢেকে
আমাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু— আমাদের বিস্মিত নীরব
রেখে দেয়— পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের অশ্রু গেছি রেখে
তবু ওই মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে-এসে মুছে দেয় সব।

৪৮

তুমি কেন বহুদূরে— ঢের দূরে— আরো দূরে— নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ
তুমি কেন কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বলো নাকো একটিও কথা
আমরা মিনার গড়ি— ভেঙে পড়ে দু-দিনেই— স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা
রক্ত হ'য়ে ঝরে শুধু এইখানে— ক্ষুধা হ'য়ে ব্যথা দেয়— নীল নাভিশ্বাস
ফেনায়ে তুলিছে শুধু পৃথিবীতে পিরামিড যুগ থেকে আজো বারোমাস
আমাদের সত্য আহা রক্ত হ'য়ে ঝরে শুধু— আমাদের প্রাণের মমতা
ফড়িঙের ডানা দিয়ে ওড়ে শুধু : চেয়ে দ্যাখে অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা
ক্ষমাহীন— বার-বার পথ আটকায়ে ফেলে— বার-বার করে তারে গ্রাস

তারপর চোখ তুলে দেখি ওই কোন্ দূর নক্ষত্রের ক্লান্ত আয়োজন
ক্লান্তিরে ভুলিতে বলে— ঘিয়ের সোনার-দীপে লাল নীল শিখা
জ্বলিতেছে যেন দূর রহস্যের কুয়াশায়— আবার স্বপ্নের গন্ধে মন
কেঁদে ওঠে— তবু জানি আমাদের স্বপ্ন হ'তে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
ঝরে শুধু— স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ— নিউসিডিয়ায় ব'সে দেখেনি মণিকা ?
স্বপ্ন কি দ্যাখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, দিল্লী, বেবিলন ?

৪৯

আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি স'রে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ
তোমার অনন্ত নীল সোনালি তোমরা নিয়ে কোনো দূর শান্তির ভিতরে
ডুবে যাবে ?... কতোকাল কেটে গেলো, তবু তার কুয়াশার পর্দা না স'রে
পিরামিড বেবিলন শেষ হ'লো ঝ'রে গেলো কতোবার প্রান্তরের ঘাস
তবুও লুকায়ে আছে যেইরূপ নক্ষত্রে তা কোনোদিন হ'লো না প্রকাশ
যেই স্বপ্ন সেই সত্য নিয়ে আজ আমরা চলিয়া যাই দূরে
কোনো এক অন্ধকারে হয়তো তা আকাশের যাযাবর মরালের স্বরে
নতুন স্পন্দন পায়– নতুন আগ্রহে গন্ধে ভ'রে ওঠে পৃথিবীর শ্বাস

তখন আমরা ওই নক্ষত্রের দিকে চাই– মনে হয় সব অস্পষ্টতা
ধীরে-ধীরে ঝরিতেছে– যেইরূপ কোনোদিন দেখি নাই পৃথিবীর পথে
যেই শান্তি মৃত জননীর মতো চেয়ে থাকে– কয় নাকো কথা
যেই স্বপ্ন বার-বার নষ্ট হয় আমাদের এই সত্য রক্তের জগতে
আজ যাহা ক্লান্ত ক্ষীণ আজ যাহা নগ্ন চূর্ণ– অন্ধ মৃত হিম
একদিন নক্ষত্রের দেশে তারা হ'য়ে রবে গোলাপের মতন রক্তিম।

৫০

সমুদ্রের জলে আমি দেহ ধুয়ে চেয়ে থাকি নক্ষত্রের আকাশের পানে
চারিদিকে অন্ধকার : নারীর মতন হাত, কালো চোখ, ম্লান চুল ঝরে
যতোদূর চোখ যায় নীলজল হৃষ্ট মরালের মতো কলরব করে
রাত্রিরে ডাকিতে চায়– বুকে তার, প্রেমমূঢ় পুরুষের মতন আহ্বানে
পৃথিবীর কতো প্রেম শেষ হ'লো– তবু এই সমুদ্রের আকাঙ্ক্ষার গানে
বাধা নাই, ভয় নাই, ক্লান্তি নাই, অশ্রু নাই– মালাবার ঢেউয়ের ভিতরে
চারিদিকে নীল নারিকেল বন সোনালি ফুলের গন্ধে, বিস্ময়ের ভরে
জানে তাহা– কতোদিন থেকে ওই মলয়ালী আর তার শিশু তাহা জানে

জানি না মান্দ্রাজ নাকি এই দেশ ? জানি না মলয় নাকি ? কিংবা মালাবার ?
জানি না এ পৃথিবীর কোন্ পথ– কোন্ ভাষা কোন্ মুখে এখানে বাতাসে
জানি না যৌবন কবে শেষ হ'য়ে গেছে কোন্ পৃথিবীর ধুলোতে আমার
তবুও আমার প্রাণ তামিলের কিশোরের মতো ওই কিশোরীর পাশে
আবার নতুন জন্ম পায় আজ : কেউ নাই অন্ধকারে কবেকার ঘাসে
কতো যে মউরি খই ঝ'রে গেছে– চারিদিকে ফুটে সব উঠিছে আবার।

৫১

এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি– আমি হৃষ্ট কবি
আমি এক,– ধুয়েছি আমার দেহ অন্ধকারে একা-একা সমুদ্রের জলে
ভালোবাসিয়াছি আমি রাঙা রোদ, ক্ষান্ত কার্তিকের মাঠে– ঘাসের আঁচলে
ফড়িঙের মতো আমি বেড়ায়েছি– দেখেছি কিশোরী এসে হলুদ করবী
ছিঁড়ে নেয়– বুকে তার লালপেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো ছবি
ফুটাতেছে– ভোরের আকাশখানা রাজহাঁস ভ'রে গেছে নব কোলাহলে
নব-নব সূচনার: নদীর গোলাপি ঢেউ কথা বলে– তবু কথা বলে
তবু জানি তার কথা কুয়াশায় ফুরায় না– কেউ যেন শুনিতেছে সবি

কোন্ রাঙা শাটিনের মেঘে বসে– অথবা শোনে না কেউ, শূন্য কুয়াশায়
মুছে যায় সব তার; একদিন বর্ণচ্ছটা মুছে যাবো আমিও অমন
তবু আজ সবুজ ঘাসের 'পরে ব'সে থাকি, ভালোবাসি; প্রেমের আশায়
পায়ের ধ্বনির দিকে কান পেতে থাকি চুপে; কাঁটাবহরের ফল করি আহরণ
কারে যেন এইগুলো দেবো আমি: মৃদু ঘাসে একা-একা ব'সে থাকা যায়
এইসব সাধ নিয়ে: যখন আসিবে ঘুম তারপর, ঘুমাবো তখন।

৫২

বাতাসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি– ঝরিতেছে ধীরে-ধীরে অপরাহ্ণ ভ'রে
সোনালি রোদের রঙ দেখিয়াছি– দেহের প্রথম কোন প্রেমের মতন
রূপ তার– এলোচুল ছড়ায়ে রেখেছে ঢেকে গূঢ় রূপ– আনারস বন;
ঘাস আমি দেখিয়াছি; দেখেছি সজনে ফুল চুপে-চুপে পড়িতেছে ঝ'রে
মৃদু ঘাসে; শান্তি পায়: দেখেছি হলুদ পাখি বহুক্ষণ থাকে চুপ ক'রে
নির্জন আমের ডালে দুলে যায়– দুলে যায়– বাতাসের সাথে বহুক্ষণ
শুধু কথা, গান নয়– নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবের জীবন
বুঝিয়াছি : শুপুরির সারিগুলো দিনরাত হাওয়ায় যে উঠিতে আছে ন'ড়ে

দিনরাত কথা কয়, ক্ষীরের মতন ফুল বুকে ধরে, তাদের উৎসব
ফুরায় না; মাছরাঙাটির সাথী ম'রে গেছে– দুপুরের নিঃসঙ্গ বাতাসে
তবু ওই পাখিটির নীল লাল কমলা রঙের ডানা স্ফুট হ'য়ে ভাসে
আম নিম জামরুলে; প্রসন্ন প্রাণের স্রোত– অশ্রু নাই– প্রশ্ন নাই– কিছু
ঝিল্‌মিল্ ডানা নিয়ে উড়ে যায় আকাশের থেকে দূর আকাশের পিছু
চেয়ে দেখি ঘুম নাই– অশ্রু নাই– প্রশ্ন নাই বটফল গন্ধ মাখা ঘাসে

৫৩

একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার
জেগেছিলো; বাঙালি নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিলো দেহ একদিন
বাংলার পথে-পথে হেঁটেছিলো গাঙচিল শালিখের মতন স্বাধীন
বাংলার জল দিয়ে ধুয়েছিলো ঘাসের মতন স্ফুট দেহখানি তার
একদিন দেখেছিলো ধূসর বকের সাথে ঘরে চ'লে আসে অন্ধকার
বাংলার; কাঁচা কাঠ জ্ব'লে ওঠে– নীল ধোঁয়া নরম মলিন
বাতাসে ভাসিয়া যায় কুয়াশার করুণ নদীর মতো ক্ষীণ
ফেনসা ভাতের গন্ধে আমমুকুলের গন্ধ মিশে যায় যেন বার-বার

এইসব দেখেছিলো; রূপ যেই স্বপ্ন আনে– স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে
শিখেছিলো সেইসব একদিন বাংলার চন্দ্রমালা রূপসীর কাছে
তারপর বেতবনে, জোনাকি ঝিঁঝির পথে হিজল আমের অন্ধকারে
ঘুরেছে সে সৌন্দর্যের নীল স্বপ্ন বুকে ক'রে– রূঢ় কোলাহলে গিয়ে তারে
ঘুমন্ত কন্যারে সেই জাগাতে যায়নি আর– হয়তো সে কন্যার হৃদয়
শঙ্খের মতন রুক্ষ, অথবা পদ্মের মতো– ঘুম তবু ভাঙিবার নয়।

৫৪

তোমরা স্বপ্নের হাতে ধরা দাও– আকাশের রৌদ্র ধুলো ধোঁয়া থেকে স'রে
এইখানে চ'লে এসো; পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন তোমাদের কথা
শুনিয়াছি– তোমাদের ম্লান মুখ দেখিয়াছি– তোমাদের ক্লান্ত রক্তাক্ততা
দেখিয়াছি কতোদিন– ব্যথিত ধানের মতো বুক থেকে পড়িতেছে ঝ'রে
তোমাদের আশা শান্তি, ম্লান মেঘে সোনালি চিলের মতো কলরব ক'রে
মিছে কেন ফেরো, আহা,– পৃথিবীর পথ থেকে হে বিষণ্ণ, হে ক্লান্ত জনতা
তোমরা স্বপ্নের ঘরে চ'লে এসো– এখানে মুছিয়া যাবে হৃদয়ের ব্যথা
সন্ধ্যার বকের মতো চ'লে এসো ধূসর স্তনের মতো শান্ত পথ ধ'রে

চারিদিকে রাত্রিদিন কলরব ক'রে যায় দাঁড়কাক বাদুড়ের মতো
পৃথিবীর পথে ওই– সেখানে কি ক'রে তবে শান্তি পাবে মানুষ বলো তো
এখানে গোধূলি নষ্ট হয় নাকো কোনোদিন– কয়লার মতো রং– ম্লান
পশ্চিমের মেঘে ওই লেগে আছে চিরদিন; কড়ির মতন শাদা করুণ উঠান
প'ড়ে আছে চিরকাল; গোধূলি নদীর জলে রূপসীর মতো তার মুখখানা দেখে
ধীরে– ধীরে– আরো ধীরে শান্তি ঝরে, স্বপ্ন ঝরে আকাশের থেকে

৫৫

আজ তারা কই সব ? ওখানে হিজল গাছ ছিলো এক– পুকুরের জলে
বহুদিন মুখ দেখে গেছে তার:– তারপর কি যে তার মনে হ'লো কবে
কখন সে ঝ'রে গেলো, কখন ফুরালো, আহা– চ'লে গেলো কবে যে নীরবে
তাও আর জানি নাকো– ঠোঁটভাঙা দাঁড়কাক ঐ বেলগাছটির তলে
রোজ তোরে দাখা দিতো– অন্য সব কাক আর শালিখের হৃষ্ট কোলাহলে
তারে আর দেখি নাকো– কতোদিন দেখি নাই: সে আমার ছেলেবেলা হবে
জানালার কাছে এক বেলতার চাক ছিলো– হৃদয়ের গভীর উৎসবে
খেলা ক'রে গেছে তারা বহুদিন– ফড়িং কীটের দিন যতোদিন চলে

তাহারা নিকটে ছিলো– রোদের আনন্দে মেতে– অন্ধকারে শান্ত ঘুম খুঁজে
বহুদিন কাছে ছিলো:– অনেক কুকুর আজ পথে ঘাটে নড়াচড়া করে
তবুও আঁধারে ঢের মৃতকুকুরের মুখ– মৃত বিড়ালের ছায়া ভাসে
কোথায় গিয়েছে তারা ? ওই দূর আকাশের নীল লাল তারার ভিতরে
অথবা মাটির বুকে মাটি হ'য়ে আছে শুধু– ঘাস হ'য়ে আছে শুধু ঘাসে ?
শুধালাম... উত্তর দিলো না কেউ উদাসীন অসীম আকাশে।

৫৬

হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়– চিতা শুধু প'ড়ে থাকে তার
আমরা জানি না তাহা– মনে হয় জীবনে যা আছে আজো তাই শালিধান
রূপশালি ধান তাহা... রূপ, প্রেম... এই ভাবি... তারপর খোসার মতন ম্লান
একদিন তাহাদের অসাড়তা ধরা পড়ে– যখন সবুজ অন্ধকার
নরম রাত্রির দেশ নদীর জলের গন্ধ কোন্ এক নবীনাগতার
মুখখানা নিয়ে আসে– মনে হয় কোনোদিন পৃথিবীতে প্রেমের আহ্বান
এমন গভীর ক'রে পেয়েছি কি : প্রেম যে নক্ষত্র আর নক্ষত্রের গান
প্রাণ যে অন্ধকারের মতো প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যার

চ'লে যায় আকাশের সেই দূর নক্ষত্রের লাল নীল শিখার সন্ধানে
প্রাণ যে অন্ধকারের মতো আমার এ– আর তুমি স্বাতীর মতন
রূপের বিচিত্র বাতি নিয়ে এলে– তাই প্রেম ধুলায় কাঁটায় যেইখানে
মৃত হ'য়ে পড়েছিলো পৃথিবীর শূন্য পথে পেলো সে গভীর শিহরণ
তুমি সখি ডুবে যাবে মুহূর্তেই রোমহর্ষে– অরুণের স্নানে
জানি আমি: প্রেম যে তবুও প্রেম : স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রবে, বাঁচিতে সে জানে।

৫৭

কোনোদিন দেখিবো না তারে আমি : হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে
কালো মেঘ নিঙরায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে উচ্ছ্বাসের গান
সারারাত– তবু আমি সাপচেরা অন্ধপথে– বেণুবনে তাহার সন্ধান
পাবো নাকো : পুকুরের পাড়ে সে যে আসিবে না কোনোদিন হাসিনের সাথে
সে কোনো জ্যোৎস্নায় আর আসিবে না– আসিবে না কখনো প্রভাতে
যখন দুপুরে রোদে অপরাজিতার মুখ হ'য়ে থাকে ম্লান
যখন মেঘের রঙে পথহারা দাঁড়কাক পেয়েছে গো ঘরের সন্ধান
ধূসর সন্ধ্যায় সেই আসিবে না সে এখানে– এইখানে ধুন্দুল লতাতে

জোনাকি আসিবে শুধু; ঝিঁঝি শুধু সারারাত কথা কবে ঘাসে আর ঘাসে
বাদুড় উড়িবে শুধু পাখনা ভিজায়ে নিয়ে শান্ত হ'য়ে রাতের বাতাসে;
প্রতিটি নক্ষত্র তার স্থান খুঁজে জেগে রবে প্রতিটির পাশে
নীরব ধূসর কণা লেগে রবে তুচ্ছ অণুকণাটির শ্বাসে
অন্ধকারে;– তুমি সখি চ'লে গেলে কেন তবু– হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে
অশ্বত্থের শাখা ওই দুলিতেছে : আলো আসে, ভোর হ'য়ে আসে

৫৮

ঘাসের ভিতরে যেই চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে– আমি ভালোবাসি
নিস্তব্ধ করুণ মুখ তার এই– কবে যেন ভেঙেছিলো– ঢের ধুলো খড়
লেগে আছে বুকে তার– বহুক্ষণ চেয়ে থাকি;– তারপর ঘাসের ভিতর
শাদা-শাদা ধুলোগুলো প'ড়ে আছে দ্যাখা যায় : খইধান দেখি একরাশি
ছড়ায়ে রয়েছে চুপে; নরম বিষণ্ন গন্ধ পুকুরের জল থেকে উঠিতেছে ভাসি
কান পেতে থাকো যদি– শোনা যায় সরপুঁটি চিতলের স্বর
মীনকন্যাদের মতো যেন; সবুজ জলের ফাঁকে তাদের পাতালপুরীর ঘর
দ্যাখা যায়– রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ– রুপালি মাছের দেহ : গভীর উদাসী

চ'লে যায় মন্ত্রিকুমারের মতো, কোটাল-ছেলের মতো রাজার ছেলের মতো মিলে
কোন্ এক আকাঙ্ক্ষার উদ্ঘাটনে কতোদূরে– বহুক্ষণ চেয়ে থাকি একা
অপরাহ্ণ এলো বুঝি ?– রাঙা রৌদ্রে মাছরাঙা উড়ে যায়– ডানা ঝিলমিলে
এখুনি আসিবে সন্ধ্যা– পৃথিবীতে ম্রিয়মাণ গোধূলি নামিলে
নদীর নরম মুখ দ্যাখা যাবে– মুখে তার দেহে তার কতো মৃদু রেখা
তোমারি মুখের মতো : তবুও তোমার সাথে কোনোদিন হবে নাকো দেখা।

৫৯

তবুরে ফড়িং শুধু উড়ে যায় আজ এই সন্ধ্যার বাতাসে
খড়কুটো ঝরে শুধু শালিখের মুখ থেকে চুপে
আবার শালিখ, সেই, খড়গুলো কুড়ায় নিশ্চুপে
সন্ধ্যার লাল শিরা মৃদু চোখে ঘরে ফিরে আসে
ঘুঘুর নরম ডাকে- নীরব আকাশে
নক্ষত্রেরা শান্তি পায়- পউষের কুয়াশার ধূপে
পুরের সবুজ রাঙালতা আছে ঘুমে
এ-কোমল স্নিগ্ধ হিম সান্ধ্যমার মাসে
চোখে তার শান্তি শুধু- লাল-লাল ফলে বুক আছে ন্যাখো ভ'রে
তবুরে ফড়িং কই উড়ে যায় আজ এই সন্ধ্যার বাতাসে
খড়কুটো ঝরে শুধু শালিখের মুখ থেকে চুপে
আবার শালিক ওই খড়গুলো কুড়ায় নিশ্চুপে
সন্ধ্যার লাল শিরা মৃদু চোখে ঘরে ফিরে আসে
তবুও তোমারে আমি কোনোদিন পাবো নাকো অসীম আকাশে।

৬০

অনন্ত জীবন যদি পাই আমি- তাহলে অনন্তকাল একা
পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি দেখিবো সবুজ ঘাসের
ফুটে ওঠে- দেখিবো হলুদ ঘাস খ'সে যায়- দেখিবো আকাশ
শাদা হ'য়ে ওঠে ভোরে- ছেঁড়া মুনিয়ার মতো রাত্রি রক্ত-ঢেলা
লেগে থাকে বুকে তার সন্ধ্যায়- যায়-যায় নক্ষত্রের ন্যাখা
পাবো আমি; দেখিবো অচেনা নারী আলগা খোঁপায় ফুল
খুলে ফেলে চ'লে যায়- মুখে তার নাই আভা গোধূলির মায়া আকাশ

অনন্ত জীবন যদি পাই আমি- তাহলে অসীমকাল একা
পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি- ট্রাম বাস ধুলো
দেখিবো অনেক আমি- দেখিবো অনেকগুলো
বস্তি, হাট,- এলো গলি, ভাঙা কলকাতা ইঁটি
মারামারি, গালাগালি, চাঁদা চোখ, পয়া ছিনিয়ে- কতো কি দেখিবো নাহি লেখা
তবুও তোমার সাথে অনন্তকালেও আমা ঘুমে নাকো ন্যাখা।

৬১

[illegible] ধীরে ধীরে পৃথি [illegible]
[illegible] ধীরে ধীরে পৃথি [illegible]
[illegible] পাখা [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
পৃথিবীর পথে [illegible]
[illegible] পাখা [illegible] ধীরে ধীরে পৃথি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] পৃথি [illegible]
[illegible] ধীরে-ধীরে পৃথি [illegible]
[illegible] পাখা [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

৬২

(একদিন [illegible]) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
পৃথিবীর [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

৬৩

কতোদিন ঘাসে আর মাঠে
আমার উৎসাহে প্রাণ কাটে
খড় খুঁটি – অশ্বত্থের শুকনো পাতা চুপে উল্টাই
দুএকটা পোকা যদি পাই
আমারে চেনো না নাকি : আমি যে চড়াই

কতোদিন তোমাদের ভোরের উঠানে
দুএকটা খই আর মুড়কির ঘ্রাণে
উড়ে আসি চুপে
দেখি কোনো রূপে
চাল ডাল ছোলা খুদ খুঁজে পাই কিনা
ঝুরঝুর ক'রে ফুল ঝরায় সজিনা
খুপ্ খুপ খুপ্ খুপ্– একাকী লাফাই
ঘুম নাই– চোখে ক্লান্তি নাই
খুপ্ খুপ্ খুপীর মতন
দ্যাখোনি কি করি আহরণ
চিনি মিঠায়ের গুঁড়ি– মিশ্রির কণা
ছাতু আটা... কলসির পাশে বুঝি নাচিছে খঞ্জনা
আকাশে কতোটা রোদ

তোমাদের এতো কী আমোদ
ছোটো-ছোটো ছেলে আর মেয়েদের দল
উঠানে কিসের এতো ভিড়
ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে– তোমাদের নরম শরীর
হাতে তবু পাটকেল– ঢিল ?
আমারে তাড়াও কেন ? আমি বুঝি দাঁড়কাক চিল।
চীনেবাদামের খোসা শূন্য ঠোঙা এই শুধু চাই
আমি যে চড়াই
যাই উড়ে যাই
জানালার পাশে
বোলতার চাক খুব বড়ো হ'য়ে আসে
হলদে বোলতা পাখি, ভাই
এসেছি চড়াই
এনেছি একটা কুটো আর এক খড়
এই নিয়ে ঘরের ভিতর
আমিও বানাবো এক ঘর
কী বলো তোমরা

ভাটের বনের থেকে এলে কি ভোমরা
মধু পেলে খুঁজে
সারাদিন একটুও ঘুমাইনি, চোখ আসে বুজে
মাকড়সা, অন্ধকারে আছো তুমি মিশে
এখানে কার্নিশে
আমারে ঘুমাতে দেবে ভাই
আমি যে চড়াই--
থাক ঘুম-- যাই উড়ে যাই
আমি যে চড়াই।
ঘুম নাই-- চোখে ক্লান্তি নাই
কাঠমল্লিকায়
কাঁঠালি শাখায়
করবীর বনে
হিজলের সনে
বেগুনের ভিড়ে
ঘাসের শরীরে
যাই-- যাই-- যাই
চাই-- চাই-- চাই
গাই-- গাই-- গাই
ঘুম নাই-- নাই
আমি যে চড়াই
তবু একদিন
যখন হলুদ তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে
পাতায় শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দেখিলাম খানিকটা রোম
মাঠের কিনারে ঘাসে-- নির্জন নরম
শিশিরে রয়েছে ডুবে-- চোখ বুজে আছে
কেমন সহিষ্ণু ছায়া মুখের উপরে পড়িয়াছে
বহুক্ষণ আমারে থাকিতে বলে এইখানে
এই স্থির নীরবতা, এই করুণতা
মৃত্যুরে নিঃশেষ ক'রে দেয় নাকি : নক্ষত্রের সাথে গিয়ে কয় নাকি কথা ?
এর চেয়ে বেশি রূপ, বেশি রেখা, বেশি করুণতা
আর কে দ্যাখাতে পারে
আকাশের নীলে বুকে-- অথবা এ ধুলোর আঁধারে।

৬৪

১

আকাশে চাঁদের আলো– উঠানে চাঁদের আলো– নীলাভ চাঁদের আলো– এমন চাঁদের আলো
আজ
বাতাসে ঘুঘুর ডাক– অশথে ঘুঘুর ডাক– হৃদয়ে ঘুঘু যে ডাকে– নরম ঘুঘুর ডাক আজ
তুমি যে রয়েছো কাছে– ঘাসে যে তোমার ছায়া– তোমার হাতের ছায়া–
তোমার শাড়ির ছায়া ঘাসে
আকাশে চাঁদের আলো– উঠানে চাঁদের আলো– নীলাভ চাঁদের আলো– এমন চাঁদের আলো
আজ

২

কেউ যে কোথাও নাই– সকলে গিয়েছে ম'রে– সকলে গিয়েছে চ'লে– উঠান রয়েছে শুধু একা
শিশুরা কাঁদে না কেউ– রুগিরা হাঁপায় না তো– বুড়োরা কয় না কথা : থুবড়ো ব্যথার কথা যতো
এখানে সকাল নাই– এখানে দুপুর নাই– এখানে জনতা নাই– এখানে
সমাজ নাই– নাইকো মূর্খ ধাঁধাঁ কিছু
আকাশে চাঁদের আলো– উঠানে চাঁদের আলো– নীলাভ চাঁদের আলো– এমন চাঁদের আলো
আজ

৩

আর তো ক্লান্তি নাই– নাইকো চেষ্টা আজ– নাইকো রক্ত ব্যথা– বিমূঢ় ভিড়ের থেকে নিয়েছি
জীবন ভ'রে ছুটি
হেঁটেছি অনেক পথ– আমার ফুরালো পথ– এখানে সকল পথ তোমার পায়ের পথে গিয়েছে
নীলাভ ঘাসে মুছে
তুমি যে রয়েছো কাছে– ঘাসে যে তোমার ছায়া– তোমার হাতের ছায়া–
তোমার শাড়ির ছায়া ঘাসে
আকাশে চাঁদের আলো– উঠানে চাঁদের আলো– নীলাভ চাঁদের আলো– এমন চাঁদের আলো
আজ

৬৫

কেমন বৃষ্টি ঝরে– মধুর বৃষ্টি ঝরে– ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে– রোদে যে বৃষ্টি ঝরে আজ
কেমন সবুজ পাতা– জামীর সবুজ আরো– ঘাস যে হাসির মতো– রোদ যে সোনার মতো ঘাসে
সোনার রেখার মতো– সোনার রিঙের মতো– রোদ যে মেঘের কোলে–
তোমার গালের টোলে রোদ
তোমার চুলে যে রোদ– মেঘের মতন চুলে– তোমার চোখে যে রোদ–

সেও যে মেঘের মতো চোখ
আকাশে সোনালি চিল পাখনা ছড়ায়ে কাঁদে– (এমন সোনালি চিল)
– সোনালি রেণুর মতো ঝরিছে কান্না
আহা, মিশরে শুনেছি যেন কবে
আকাশে এম্নি ছেঁড়া ময়লা মেঘের রাশ– পড়েছে তাদের ছায়া নীলের নিঝুম পিরামিডে
এমনি সোনালি রোদ– সোনার থামের মতো– ঘিয়ের শিখার মতো রয়েছে আকাশ ছিঁড়ে তবু
কেঁদেছে সোনালি চিল এমনি আকাশ ঘুরে– শুনেছি মিশরে আমি হাজার-হাজার যুগ আগে
তোমার চুলে যে রোদ– মেঘের মতন চুলে– তোমার চোখে যে রোদ–
সেও যে মেঘের মতো চোখ
কেমন বৃষ্টি ঝরে– মধুর বৃষ্টি ঝরে– ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে– রোদে যে বৃষ্টি ঝরে আজ

৬৬

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে– সন্ধ্যা হ'য়ে আসে
একা-একা মাঠের বাতাসে
ঘুরি আমি– বসি আমি ঘাসে

ওই দূরে দ্যাখা যায় কার লাল-পাড়
প্রসাদের বউ বুঝি– পাশে বুঝি তার
প্রসাদ রয়েছে ব'সে– বাড়িতেছে সন্ধ্যার আঁধার

বছর চারেক হ'লো হয়েছিলো দুজনের বিয়ে
মনে পড়ে; তারপর কুড়িয়ে-বাড়িয়ে
আজো তারা যায়নি হারিয়ে

রোজই তারা সন্ধ্যা হ'লে আসে
এই মাঠে– ব'সে থাকে ঘাসে
লক্ষ-লক্ষ তারার আকাশে

ব'সে থাকে– মনে হয়
মাঠের চাঁদের কথা কয়
দুজনার প্রাণে ঢের শান্তি ও বিস্ময়

আছে আমি জানি
এরা দুটি পৃথিবীর আঁচলের প্রাণী
মনে কোনো প্রশ্ন নাই– দ্বিধা নাই জানি

প্রাণের আশ্চর্য টান আছে

চিরদিন থাকে কাছে কাছে
বিচ্ছেদে নিদারুণ হয় পাছে

জীবনের পাতা পড়া প্রসাদ কখনো তাই
বড় বেশি জীর্ণে যায় নাই
যদি তারে এ কথা শুধাই

মৃত্যুরেও দেখো নাকি ফাঁকি ?
কিন্তু থাক... চেয়ে দ্যাখো যেন দুটি পাখি
ব'সে আছে পাখনায় পাখা ঢাকি

নক্ষত্রও চেয়ে দ্যাখে সব
এমন নিবিড় স্নিগ্ধ- এমন নীরব
ভালোবাসা। মাটিতেও নয় অসম্ভব ?

এই তারা বসে
নীল লাল আলো নিয়ে জ্বলে
চেয়ে দ্যাখে আকাশের তলে

রক্তে-রক্তে ভ'রে আছে মানুষের মন
রোম নষ্ট হ'য়ে গেছে... গেছে বেদিলন
পৃথিবীর সব পথ ক্রীটের মতন

একদিন ভেঙে যাবে। হ'য়ে যাবে ধুলো আর ছাই
রোম নাই আজ আর- বেদিলন নাই
আছো তবু হৃদয়কে চাই।

৬৭

সন্ধ্যা হয়- চারিদিকে মৃদু নীরবতা
কুটা মুখে নিয়ে এক পাখিরা ঘেঁষেছে উড়ে চুপে
পোকার পাখাটি যায় মেলে পথ বেয়ে ধীরে (ধীরে)
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের খসে স্তূপে

পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে
পৃথিবীর সব মৃত্যু ভাবিতেছে হিজলের বসে
আকাশ ছড়ায়ে আছে পাখি হ'য়ে আকাশে-আকাশে
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে

৬৮

চারিদিকে শান্ত নাচি  জিজ্ঞে পথ  মৃদু কলরব
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের কাছে
পৃথিবীর এই গল্প বেঁচে রবে চিরকাল
এশিরিয়া ধুলো আজ  বেবিলন ছাই হ'য়ে আছে।

৬৯

গল্পে আমি পড়িয়াছি কাজী কাঁদী বিদিশার কথা
কোনোদিন চোখে দেখি নাই
একদিন জানিলাম মাঠে মাঠে কুয়াশায়
যদি আমি কোনোদিন বিদিশায় যাই

মাঠে মাঠে কুয়াশায় জানিলাম এই কথা
শতদিন শত-শত রাত ধ'রে আমি
যদি আমি  কোনোদিন যদি আমি
অনন্তীর পথে গিয়ে নামি

পউষের কুয়াশায় সাপের খোলস, পাতা, ডিম
প'ড়ে আছে ঘাসে
কেন যে করুণ চোখ পথ ভুলে ভেসে গেলো
ময়ূরাক্ষী নদীটির পাশে

এসেছে এ কার নজরা
চারিদিকে শীত নদী। গেল মরুভূমি
নজরার জালালায় কার মুখ
এই পথে এতদিন পরে কেন তুমি?

করেজার মাঠ-পথ—মন্দির কুয়াশায় ঢাকে দিলো দাখা
হৃদয়ে তাতাল বালির মতো ভুষা
নদীর আঁধার জলে ভ'রে গেলো
আমি যে গো দেখেছি বিদিশা

সব কথা মনে পড়ে
জলালিঢ় নদী আর জানে না সে কথা
নীলাভ ঘাসের পথে জোৎস্নায়

৭০

চিরদিন শহরেই থাকি
প'ড়ে থাকি পাটের আড়তে
করি কেরানির কাজ– শুভে-লাভে যদি কোনোমতে
দিন যায় চ'লে
আকাশের তলে
নক্ষত্রেরা কয় কোন্ কথা
জ্যোৎসায় প্রাণের জড়তা
ব্যথা কেন পায়
সে-সব খবর নিয়ে কাজ কিবা হায়

বিয়ে হয়েছিলো কবে– ম'রে গেছে বউ
যদিও মহুয়া গাছে ফুটে ওঠে মউ
একবার ঝ'রে গেলে তবু তারপর
মহুয়া-মহুয়া তবু : কেরানির ঘর
কেরানির ঘর শুধু হায়
জীবনের গল্প শুধু একবার আসে– শুধু একবার নীল কুয়াশায়
নিঃশেষে ফুরায়

দেবতা বুঝি না আমি
তীর্থ করি নাকো
তোমরা ঠাকুর নিয়ে থাকো
তবু আমি একবার ছুটি পেয়ে বেড়াবার তরে
গেলাম খানিকটা দূরে– তারকেশ্বরে
গভীর অসাধ নিয়ে– গাঢ় অনিচ্ছায়
ট্রেনে আমি চড়িলাম হায়
কলরবে ধোঁয়ায় ধুলায়
সাধ ক'রে কে-বা মিছে যায়

জানি না ঈশ্বর কে-বা– জানি শুধু ভুখা ভগবান
দিনগত পাপক্ষয় ক'রে পাবো ত্রাণ
তারপর একদিন নিমতলা ঘাটে
কিংবা কাশী মিত্রের তল্লাটে
প'ড়ে রবো

তবুও যখন আমি ঢের রাতে ফিরিলাম ঘর
বুকে জাগে সেই দেশ : তারকেশ্বর।
দেবতারে কে খুঁজেছে– সারাদিন ঘুরিয়াছি পথে

অবসন্ন ধুলোর জগতে
অসংখ্য ভিড়ের মাঝে আমি
একখানা মুখ দেখে গিয়েছি যে থামি
কবে যেন সিংহের মূর্তির কাছে তারে
এশিরিয়া বেবিলনে তাহারে ফেলেছি দেখে আমি
দেখেছি মিশরে
ঈসিসের ঘরে
সারাদিন– দিনমান আজ এই তারকেশ্বরে
আবার তাহার মুখ দেখিলাম, (আহা,)
ধানসিড়ি নদীটির বিকেলবেলার মৌন জলে
বেতের ফলের মতো যেই চোখ, যেই রূপ
ধরা দেয় পৃথিবীর নীরব আঁচলে
দেখিলাম তাহা
আবার তাহার মুখ দেখিলাম, আহা।

৭১

ঘাটশীলা– ঘাটশীলা–
কলকাতা ছেড়ে বলো ঘাটশীলা কে যায় মিছাই
চিরদিন কলকাতা থাকি আমি
ঘাটশীলা ছাই

চিঠির উপরে তবু চিঠি
কয়েকটা দিন
এইখানে এসে তুমি থেকে যাও
চিঠিগুলো হ'য়ে গেলো পুরোনো মলিন

তবু আমি গেলাম না
যদিও দেখেছি আমি কলকাতা থেকে
কতোদিন কতোরাত
ঘাটশীলা গিয়েছে অনেকে

একদিন তারপর– বহুদিন পরে
অনেক অসাধ অনিচ্ছায়
ঘাটশীলা চলিলাম
ঘাটশীলা দেখিলাম হায়

আবার এসেছি ফিরে– ধোঁয়ায় ধুলায় ভিড়ে

ফুটপাথে– ট্রামের জগতে
পথ থেকে পথে ফিরি
পথ থেকে ক্লান্ত পথে-পথে
কি হ'লো তোমার, আহা,
আমার হৃদয়
তোমারে যে গোধূলির তেপান্তরে
মায়াবীর মতো মনে হয়

যেন এই পৃথিবীর বেলা শেষে হ'য়ে গেছে
ম্লান ঘোড়া নিয়ে একা তুমি
কড়ির পাহাড় খুঁজে ঘুরিতেছো
ঘুরিছো হাড়ের মরুভূমি।

৭২

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হ'লো সেইদিন– গিয়েছে সে সান্ত্বনার ঘরে
অথবা সান্ত্বনা পেতে দেরি হবে কিছুকাল– পৃথিবীর এই মাঠখানি
ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছুদিন; এ মাঠের কয়েকটা শালিখের তরে

আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রবো কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে
কিংবা সেই সোনালি চিলের ডানা দূর থেকে আজো কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে ? সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজো চ'লে যায় সন্ধ্যা সোনার মতো হ'লে
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজো চায় ?

সন্ধ্যা হ'লে ? মউমাছি চাক আজো বাঁধে নাকি জামের নিবিড় ঘন ডালে
মউ খাওয়া হ'য়ে গেলে আজো তারা উড়ে যায় কুয়াশায় সন্ধ্যার বাতাসে
কতো দূরে যায়, আহা... অথবা হয়তো কেউ চালতার ঝরাপাতা জ্বালে
মধুর চাকের নিচে– মাছিগুলো উড়ে যায়– ঝ'রে পড়ে– ম'রে থাকে ঘাসে

ভেবে-ভেবে ব্যথা পাবো– মনে হবে পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে
কিন্তু থাক্ লক্ষ্মীপেঁচাটির মুখ কোনোদিন ভালো ক'রে দেখি নাই আমি
এমনি লাজুক পাখি– ধূসর ডানা কি তার কুয়াশার ঢেউয়ে ওঠে নেচে
যখন সাতটি তারা ফুটে ওঠে গাবের নিবিড় বুকে আসে সে কি নামি ?

জিউলির বাবলার আঁধার গলির ফাঁকে জোনাকির আলো
ঝরে না কি ? ঝিঁঝিঁর সবুজ মাংসে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে বউদের প্রাণ

ভুলে যায়; অন্ধকারে খোঁজে তারে আকন্দবনের ভিড়ে কোথায় হারালো
মাকাল লতার তলে শিশিরের নীল জলে কেউ-তার পাবে না সন্ধান

৭৩

সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি– এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন– সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে করে আর ঝরে
আমি চ'লে যাবো ব'লে চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ? লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে না কি তার লক্ষ্মীটির তরে
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !

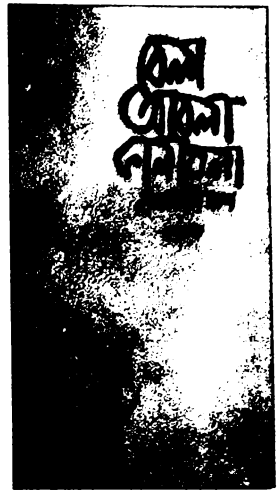


প্রথম প্রকাশ
১৩৬৮ বাংলা, ১৯৬১ ইংরেজি

মাঘসংক্রান্তির রাতে ৩৫৩ আমাকে একটি কথা দাও ৩৫৩ তোমাকে ৩৫৩ সময়সেতুপথে ৩৫৪ যতিহীন ৩৫৪ অনেক নদীর জল ৩৫৫ শতাব্দী ৩৫৬ সূর্য নক্ষত্র নারী ৩৫৭ চারিদিকে প্রকৃতির ৩৫৯ মহিলা ৩৬০ সামান্য মানুষ ৩৬৩ প্রিয়দের প্রাণে ৩৬৪ তার স্থির প্রেমিকের নিকট ৩৬৫ অবরোধ ৩৬৬ পৃথিবীর রৌদ্রে ৩৬৭ প্রয়াণপটভূমি ৩৬৮ সূর্য রাত্রি নক্ষত্র ৩৬৮ জয়জয়ন্তীর সূর্য ৩৬৯ হেমন্তরাতে ৩৭০ নারীসবিতা ৩৭১ উত্তরসমিরিকী ৩৭২ বিস্ময় ৩৭৩ গভীর এরিয়েলে ৩৭৫ ইতিহাসযান ৩৭৬ মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প ৩৭৯ পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ৩৮১ পটভূমির ৩৮৩ অন্ধকার থেকে ৩৮৩ একটি কবিতা ৩৮৫ সারাৎসার ৩৮৫ সময়ের তীরে ৩৮৬ যতোদিন পৃথিবীতে ৩৮৭ মহাত্মা গান্ধী ৩৮৮ যদিও দিন ৩৯১ দেশ কাল সন্ততি ৩৯২ মহাগোধূলি ৩৯৩ মানুষ যা চেয়েছিলো ৩৯৩ আজকে রাতে ৩৯৪ হে হৃদয় ৩৯৪

## মাঘসংক্রান্তির রাতে

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানবহৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্বলে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্কশিখায়;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হ'য়ে গেলে
মুখে যা বলোনি, নারি, মনে যা ভেবেছো তার প্রতি
লক্ষ রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে– তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

## আমাকে একটি কথা দাও

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর;– সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুক্‌দের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন :
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর
সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো;
সেই দিনের– আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর– পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন।

## তোমাকে

মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্রে ওই :
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকি রৌদ্র এখন ? সত্যিকারের পাখি ?
কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত করে।
রৌদ্রবরন দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে–
নারীর,– তবু ভেবেছিলাম বহিঃপ্রকৃতির।

আজকে সে সব মীনাকেতনের সাড়ার মতো, তবু
অন্ধকারের মহাসমাতনের থেকে চেয়ে
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হ'লে
বলে : 'আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী ?'
পাতা পাখর মৃত্যু কালের ভূকম্পনের থেকে আমি শুনি।
নদী শিশির পাখি বাতাস কথা ব'লে ফুরিয়ে গেলে পরে
শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর প্রাণে
সফল হ'তে গিয়ে-ও তবু বিষণ্ণতার মতো।
যদিও পথ আছে তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দীপের মতো—
কি এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের শেষে এসে। মানবপ্রতিভার
জড়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিশ্ব কী রকম মধুর হ'তে পারে।

## সমন্বয়সেতুপথে

ভোরের বেলার মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি,
দুপুরবেলার আকাশে নীল পাহাড় নীলিমা,
সারাটি দিন মীনরৌদ্রমুখর জলের স্বর,—
অনখণ্ডিত বাহির-ঘরের ধরণীর এই সীমা।

তবুও রৌদ্র সাগরে নিতে গেলো;
ব'লে গেলো : 'অনেক মানুষ ম'রে গেছে'; 'অনেক নারীরা কি
অনেক সাথে হারিয়ে গেছে ?'— বলতে গেলাম আমি;
উড়ু পাখের ধূসর হাতে চিল না কি সে পাখি
বাতাস আকাশ সকল চিত্ত বুজে
ব'সে আছে এই প্রকৃতির পলকে নিবিড় হ'য়ে।
পুরুষবাণী হারিয়ে গেছে শস্য নদীর অমলোদিবেশে,
অনেক মুখমণ্ডলের অতো হারিয়েছে হৃদয়ে।

[illegible]

[illegible] অনেক মেঘের ভিড়
অনেক [illegible] মুখে

জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলা রঙের আলোয়
জ্ব'লে উঠে ঝ'রে গেলো অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো।
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি ? স্বর্গপারী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো,
মানব ক্রমপরিণতির পথে নিজশরীরী
হ'য়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার বৈপসাগর দখল ক'রে !
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হ'য়ে গেলে,— তবু আর এক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চরিত হ'য়ে
পথে-পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দীপ বানালো যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন ক'রে এই পৃথিবীর অনন্ত যোনগহ্বরে।
ভাবছে একা-একা ব'সে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে :
আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
যে দোর কঠিন; সেই মনে হয়।— সে দ্বার খুলে দিয়ে
যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর বাসন ছাড়িয়ে।

## অনেক নদীর জল

অনেক নদীর জল উবে গেছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেলো;
সে-সব সময় ভেদ ক'রে ফেলে আজ
কান্না তবু কাছে চ'লে এলো।
যে-সূর্য অয়নে সেই কোলোদিন,
— মনে তাকে দ্যাখা যেতো যদি—
যে-নারী দ্যাখেনি কেউ— ছ'-সাতটি তারার ভিড়িয়ে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।
তুমি কথা বলো— আমি জীবন-মৃত্যুর শব্দ শুনি :
সকালে শিশিরকণা যে-রকম ঘাসে
অচিরে মরণশীল হ'য়ে তবু সূর্য আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।
জন্মতারকার তাকে বার-বার পৃথিবীতে ফিরে এসে আমি
দেখেছি তোমার চোখে একি ছায়া পড়ে :

সে কি প্রেম ? অন্ধকার ? হিম ঘুম মৃত্যু প্রকৃতির
অন্ধ ফুলফলের ভিতরে
স্থির হ'য়ে আছে মন; মনে হয় তবু
সে ধ্রুব পৃথিবী রোপে চুপে,
যহ-যহ রক্তীর বৃক্ষগুলি ধরে;
স্থির গভীর-গভীর হিংসা প্রেম
নেমেছে এসেছে আজ রক্তের ভিতরে

'এখানে পৃথিবী ঘর নেই—'
ব'লে তবু পৃথিবীর জনকল্যাণেই
কিছু নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির পানে;
কল্যাণ-কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতর মানে :
শান্তি এই আজ;
এইখানে স্মৃতি;
এখানে বিস্মৃতি তবু; প্রেম
ক্রমাগত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

## শতাব্দী

চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি;
ওইখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে ঢের
একটি-দুটি তারা সাথে:— তারপরেতে অনেকগুলো তারা;
অন্ন ক্ষুধা মিটে গেলেও মনের ভিতরের
ব্যথার কোনো মীমাংসা নেই জানিয়ে দিয়ে আকাশ ভ'রে জ্বলে;
হেমন্ত-রাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হ'য়ে
চলবে কি না ভাবতে আছে— ঋতুর কামচক্রে সে তো চলে;
কিন্তু আরো আশা আলো চলার আকাশ রয়েছে কি মানবহৃদয়ে।
অথবা এ মানবপ্রাণের অনুতর্ক; হেমন্ত খুব স্থির
সম্প্রতিত ব্যাপ্ত হিরণশতীর সময় ব'লে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হ'লে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি;
চারিদিকে রক্তে রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছুই তবু ফল হলো না: এসো মানুষ, আবার দ্যাখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কি লাভ হ'তে পারে।
ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে;
কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক
ক'রে দিতে পারে বুঝি মানবভাবনাকে;

অন্ধ অভিভূতের মতো যদিও আজ লোক
চলছে, তবু মানুষকে সে চিনে নিতে বলে :
কোথায় মধু– কোথায় কালের মক্ষিকারা– কোথায় আহ্বান
নীড় গঠনের সমবায়ের শক্তি-সহিষ্ণুতার;–
মানুষো জ্ঞানী; তবুও ধন্য মক্ষিকাদের জ্ঞান ;
কাছে-দূরে এই শতাব্দীর প্রাণনদীরা রোল
স্তব্ধ ক'রে রাখে গিয়ে যে-ভূগোলের অসারতার পরে
সেখানে নীলকণ্ঠ পাখি ফসল সূর্য নেই,
ধূসর আকাশ,– একটি শুধু মেরুন রঙের গাছের মর্মরে
আজ পৃথিবীর শূন্য পথ ও জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়
জেগে ওঠে,– এ-সুর ক্রমে নরম– ক্রমে হয়তো আরো কঠিন হ'তে পারে;
সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ-ব্যর্থতা জেনেছিলো; জানি;
আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে ;

## সূর্য নক্ষত্র নারী

এক

তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিলো
সবচেয়ে আগে; জানি আমি।
সে-দিনো তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই ;
তুমি যে এ-পৃথিবীতে র'য়ে গেছো
আমাকে বলেনি কেউ ;
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
র'য়ে গেছে;–
যে যার নিজের কাজে আছে, এই অনুভবে চ'লে
শিয়রে নিয়ত স্ফীত সূর্যকে চেনে তারা;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কি ক'রে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের ?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি;–
আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।

স'রে যেতো; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব-নব সূর্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয় ? কেন দেবো ? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়ো
স্থিরতর প্রিয় তুমি;– নিঃসূর্য নির্জন

ক'রে দিতে এলে।
মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে আমি যদি মিলিত হতাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মতো
বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা ক'রে আত্মস্থ হতাম।
তুমি তা জানো না, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি;–
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিলো, নেই;– বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভো যায়;– মানুষ অপরিজ্ঞাত সে-অমায়; তবুও তাদের একজন
ভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায় !
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি !

## দুই

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার র'য়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই, যা জ্বালালে
তোমার শরীর সব আলোকিত ক'রে দিয়ে স্পষ্ট ক'রে দেবে কোনো কালে
শরীরে যা র'য়ে গেছে।
এইসব ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে
নতুন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গ'ড়ে তবু তুমি
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু
অনুভব করেছিলে;–
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে ব'লে আজ
আমাকে ইশারাপাত ক'রে গেলে তারি;–
অপার কালের স্রোত না পেলে কি ক'রে তবু, নারি,
তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে–
তোমার নিবিড় নিজ চোখ এসে নিজের বিষয়ে নিয়ে যাবে ?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্মঅন্তরঙ্গতার দান
দ্যাখায়ে অনঙ্ককাল ভেঙে গেলে পরে,
যে-দেশে নক্ষত্র নেই– কোথাও সময় নেই আর–
আমারো হৃদয়ে নেই বিভা–
দ্যাখাবে নিজের হাতে– অবশেষে– কি মকরকেতনে প্রতিভা।

তিন

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিলো অন্য-কোনো নাম।
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপাতিত লক্ষ্যে অবিরাম চ'লে যাওয়া।
শোককে স্বীকার ক'রে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।
আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে র'য়ে গেছো, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু– হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে ?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ ?–
ভাবি আমি;– জানি আমি, তবু
সে-কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই;–
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হ'য়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।

## চারিদিকে প্রকৃতির

চারিদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে রয়েছে।
সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী–
মনে হয় ইহাদের প্রেম
মনে ক'রে নিতে গেলে, চুপে
তিমিরবিদারী রীতি হ'য়ে এরা আসে
আজ নয়,– কোনো এক আগামী আকাশে।
অন্নের ঋণ, বিমলিন স্মৃতি সব
বন্দরবস্তির পথে কোনো একদিন
নিমেষের রহস্যের মতো ভুলে গিয়ে
নদীর নারীর কথা– আরো প্রদীপ্তির কথা সব
সহসা চকিত হ'য়ে ভেবে নিতে গেলে বুঝি কেউ
হৃদয়কে ঘিরে রাখে, দিতে চায় একা আকাশের
আশেপাশে অহেতুক ভাঙা শাদা মেঘের মতন।
তবুও নারীর নাম ঢের দূরে আজ,

ঢের দূরে মেঘ:
সারাদিন নিলেমের কালিমার খারিজের কাজে মিশে থেকে
ছুটি নিতে ভালোবেসে ফেলে যদি মন
ছুটি দিতে চায় না বিবেক।
মাঝে-মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রসারের থেকে
মানুষের চোখে-পড়া-না-পড়া সে কোনো স্বভাবের
সুর এসে মানবের প্রাণে
কেনো এক মানে পেতে চায় :
যে-পৃথিবী শুভ হ'তে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।
চারিদিকে কলাকাত টোকিয়ো দিল্লী মস্কৌ অতলান্তিকের কলরব,
সরবরাহের ভোর,
অনুপম ভোরাইয়ের গান;
অগণন মানুষের সময় ও রক্তের যোগান
ভাঙে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমি চাঁদ
রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক;
প্রীতি নেই,– পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের
প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত ক'রে তোলে মোহিনী নরক।
আমাদের এ-পৃথিবী যতোদূর উন্নত হয়েছে
ততোদূর মানুষের বিবেক সফল।
সে-চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিন্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতার চরিত্রের বল।
শাদাসিদে মনে হয় সে-সব ফসল :
পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন;–
তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত করে বারবার উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

## মহিলা

### এক

এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে
ভোরের ভিতর থেকে অন্য এক পৃথিবীর মতো;
এইখানে এসে পড়ে– থেমে গেলে– একটি নারীকে
কোথাও দেখেছি ব'লে স্বভাববশত

মনে হয়;– কেননা এমন স্থান পাথরের ভারে কেটে তবু
প্রতিভাত হ'য়ে থাকে নিজের মতন লঘুভারে;
এইখানে সেদিনো সে হেঁটেছিলো– আজো ঘুরে যায়;

এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিতে পারে;

সুন্দিয়া কাজল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা

অনিত্য নারীর রূপ বর্ণনায় যদিও সে কুটিল কলম
নিয়োজিত হয় নাই কোনোদিন,– তবুও মহিলা
না ম'রে অমর যারা তাহাদের স্বর্গীয় কাপড়
কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা

অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়ে বানায়েছে নিজের শরীর।
চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসম বাতাস।
দিনগত পাপক্ষয় ভুলে গিয়ে হৃদয়ের দিন
ধারণ করেছে তার শরীরের ফাঁস।

চিতাবাঘ জন্মাবার আগে এই পাহাড়ে সে ছিলো;
অজগর সাপিনীর মরণের পরে।
সহসা পাহাড় ব'লে মেঘখণ্ডকে
শূন্যের ভিতরে

ভুল হ'লে– প্রকৃতিস্থ হ'য়ে যেতে হয়;
(চোখ চেয়ে ভালো ক'রে তাকালেই হ'তো;)
কেননা কেবলি যুক্তি ভালোবেসে আমি
প্রমাণের অভাববশত

তাহাকে দেখিনি তবু আজো;
এক আচ্ছন্নতা খুলে শতাব্দী নিজের মুখের নির্থলতা
দ্যাখাবার আগে নেমে ডুবে যায় দ্বিতীয় ব্যথায়:
আদার ব্যাপারী হ'য়ে এইসব জাহাজের কথা

না ভেবে মানুষ কাজ ক'রে যায় শুধু
ভয়াবহ অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে-নারীর রাং দেখে হো-হো ক'রে হাসে।

## দুই

মহিলা তবুও নেমে আসে মনে হয় :
(বমারের কাজ সাঙ্গ হ'লে
নিজের এয়ারোড্রোমে– প্রশান্তির মতো ?)
আছেও জেনেও জনতার কোলাহলে

তাহার মনের ভাব ঠিক কি রকম–
আপনারা স্থির ক'রে নিন:
মনে পড়ে, সেন রায় নওয়াজ কাপুর
অয়াঙ্কর আগে পেরিন–

এমনি পদবী ছিলো মেয়েটির কোনো একদিন;
আজ তবু উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল:
সম্বর মৃগের বেড় জমায়েছে যখন পাহাড়ে
কখনো বিকেলবেলা বিরাট ময়াল,

অথবা যখন চিল শরতের ভোরে
নীলিমার আধপথে তুলে নিয়ে গেছে
রসুয়েকে ঠোনা দিয়ে অপরূপ চিতলের পেটি,–
সহসা তাকায়ে তারা উৎসারিত নারীকে দেখেছে:

এক পৃথিবীর মৃত্যু প্রায় হ'য়ে গেলে
অন্য-এক পৃথিবীর নাম
অনুভব ক'রে নিতে গিয়ে মহিলার
ক্রমেই জাগছে মনস্কাম;

ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দ্যাখায়ে সমাপ্ত হ'লে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সংকেতে
পৃথিবীকে জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিলো আড়ি পেতে

তাহারা বিশেষ কেউ কিছু নয়,–
এখনো প্রাণের হিতাহিত
না জেনে এগিয়ে যেতে চেয়ে তবু পিছু হটে গিয়ে
হেসে ওঠে গৌড়জনোচিত

গরম জলের কাপে ভবেনের চায়েল দোকানে;
উত্তেজিত হ'য়ে মনে করেছিলো (কবিদের হাড়
যতোদূর উদ্বোধিত হ'য়ে যেতে পারে–
যদিও অনেক কবি প্রেমিকের হাতে স্ফীত হ'য়ে গেছে রাঁড়) :

উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে এসে উনিশশো পঁচিশের জীব–
সেই নারী আপনার হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন;
সে না হ'লে মহাকাল আমাদের রক্ত ছেঁকে নিয়ে
বার ক'রে নিতো না কি জনসাধারণভাবে স্যাকারিন।

আমাদের প্রাণে যেই অসন্তোষ জেগে ওঠে, সেই স্থির করে:
পুনরায় বেদনায় আমাদের সব মুখ স্থূল হ'য়ে গেলে
গাধার সুদীর্ঘ কান সন্দেহের চোখে দেখে তবু
শকুনের শেয়ালের চেকনাই কান কেটে ফেলে

## সামান্য মানুষ

একজন সামান্য মানুষ দেখা যেতো রোজ
ছিপ হাতে চেয়ে আছে; ভোরের পুকুরে
চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে;
উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খনিকটা দূরে

আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান;
মনে হয়েছিলো এক হেমন্তের সকালবেলায়;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে; তবুও আবার কেটে যায়।

আমার বয়স আজ চল্লিশ বছর;
সে আজ নেই এ-পৃথিবীতে;
অথবা কুয়াশা ফেঁসে– ওপারে তাকালে
এ-রকম অঘ্রাণের শীতে

সে-সব রুপোলি মাছ জ্ব'লে ওঠে রোদে,
ঘাসের ঘ্রাণের মতো স্নিগ্ধ সব জল;
অনেক বছর ধ'রে মাছের ভিতরে হেসে-খেলে
তবু সে তাদের চেয়ে এক তিল অধিক সরল,

এক বীট অধিক প্রবীণ ছিলো আমাদের থেকে:
ওইখানে পায়চারি করে তার ভূত–
নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত;

প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় সে-সব।
আমাদের পাওয়ার ও পার্টি-পলিটিক্স
জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরেক রকম শ্রীছাঁদ।
কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে–
সে আর সপ্তমী তিথি : চাঁদ।

## প্রিয়দের প্রাণে

অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে
আমি আজ দাঁড়ালাম এসে।
চোখের পলকে তবু বোঝা গেলো জনতাগভীর তিথি আজ;
কোনো ব্যতিক্রম নেই মানুষবিশেষে।

এখানে রয়েছে ভোর,— নদীর সমস্ত প্রীত জল;—
কবের মনের ব্যবহারে তবু হাত বাড়াতেই
দ্যাখা গেলো স্বাভাবিক ধারণার মতন সকাল—
অথবা তোমার মতো নারী আর নেই।

তবুও রয়েছে সব নিজেদের আবিষ্ট নিয়মে
সময়ের কাছে সত্য হ'য়ে,
কেউ যেন নিকটেই র'য়ে গেছে ব'লে;—
এই বোধ ভোর থেকে জেগেছে হৃদয়ে।

আগাগোড়া নগরীর দিকে চেয়ে থাকি;
অতীব জটিল ব'লে মনে হ'লো প্রথম আঘাতে;
সে-রীতির মতো এই স্থান যেন নয়;
সেই দেশ বহুদিন সয়েছিলো ধাতে

জ্ঞান মানমন্দিরের পথে ঘুরে বই হাতে নিয়ে;
তারপর আজকের লোকসাধারণ রাতদিন চর্চা করে,
মনে হয় নগরীর শিয়রের অনিরুদ্ধ উষা সূর্য চাঁদ
কালের চাকায় সব আর্ষপ্রয়োগের মতো ঘোরে।

কেমন উচ্ছিন্ন শব্দ বেজে ওঠে আকাশের থেকে;
মানে বুঝে নিতে গিয়ে তবুও ব্যাহত হয় মন;
একদিন হবে তবু এরোপ্লেনের—
আমাদেরো শ্রুতিবিশোধন।

দূর থেকে প্রপেলার সময়ের দৈনিক স্পন্দনে
নিজের গুরুত্ব বুঝে হ'তে চায় আরো সাময়িক;
রৌদ্রের ভিতরে ওই বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়ম
আকাশ মাটির মধ্যবর্তিনীর মতো যেন ঠিক।

ক্রমে শীত, স্বাভাবিক ধারণার মতো এই নিচের নগরী
আরো কাছে প্রতিভাত হ'য়ে আসে চোখে;

সকল দুরূহ বস্তু সময়ের অধীনতা মেনে
মানুষ ও মানুষের মৃত্যু হ'য়ে সহজ আলোকে

দ্যাখা দেয়,– সর্বদাই মরণের অতীব প্রসার,–
জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু দু-চারটে জীবনের কথা
ব্যবহার ক'রে নিতে গিয়ে দ্যাখে অল্-ক্লিয়ারেরো চেয়ে বেশি
প্রত্যাশায় ব্যাপ্ত কাল ভোলেনি প্রাণের একাগ্রতা।

আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর–
প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে
স্বাভাবিক মনে হয় : উর ময় লন্ডনের আলো ক্রেমলিনে
না থেমে অভিজ্ঞভাবে চ'লে যায় প্রিয়তর দেশে

## তার স্থির প্রেমিকের নিকট

বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই,– আমি বলি না তা।
কারো লাভ আছে,– সকলেরি;– হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েছি ধবল শব্দ– বাতাসতাড়িত পাখিদের।

মোমের প্রদীপ বড়ো ধীরে জ্বলে– ধীরে জ্বলে– আমার টেবিলে;
মনীষার বইগুলো আরো স্থির,– শান্ত,– আরাধনাশীল;
তবু তুমি রাস্তায় বার হ'লে,– ঘরেরো কিনারে ব'সে টের পাবে না কি
দিকে-দিকে নাচিতেছে কি ভীষণ উন্মত্ত সলিল।

তারি পাশে তোমারো রুধির কোনো বই– কোনো প্রদীপের মতো আর নয়;
হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হ'য়ে সৈকতের 'পরে
সেও সুর আপনার প্রতিভায়– নিসর্গের মতো :
রূঢ়– প্রিয়– প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।
তাই আমি ভীষণ ভিড়ের ক্ষোভে বিস্তীর্ণ হাওয়ার স্বাদ পাই;
না-হ'লে মনের বনে হরিণীকে জড়ায় ময়াল :
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি সে রকম জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেন্ট পাল–
বুঝিবে আমার কথা; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস্ অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।

## অবরোধ

বহুদিন আমার এ-হৃদয়কে অবরোধ ক'রে র'য়ে গেছে;
হেমন্তের স্তব্ধতায় পুনরায় করে অধিকার।
কোথায় বিদেশে যেন
এক তিল অধিক প্রবীণ এক নীলিমার পারে
তাহাকে দেখিনি আমি ভালো ক'রে– তবু মহিলার
মনন-নিবিড় প্রাণ কখন আমার চোখঠারে
চোখ রেখে ব'লে গিয়েছিলো :
'সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবু সময়ো তা বেঁধে দিতে পারে ?'

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর;
কি ক'রে প্রাসাদ তাকে বলি আমি ?
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর– ইলোরার;
মাতিসের– সেজানের– পিকাসোর;
অথবা কিসের ছবি ? কিসের ছবির হাড়গোড় ?

কেবল আধেক ছায়া–
ছায়ায় আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি র'য়ে গেছে।
কেউ দ্যাখে– কেউ তাহা দ্যাখে নাকো– আমি দেখি নাই।
তবু তার অবলং কালো টেবিলের পাশে আধাআধি চাঁদনির রাতে
মনে পড়ে আমিও বসেছি একদিন।
কোথাকার মহিলা সে ? কবেকার ?– ভারতী নর্ডিক গ্রীক মশ্লিম মার্কিন ?
অথবা সময় তাকে শনাক্ত করে না আর;
সর্বদাই তাকে ঘিরে আধো অন্ধকার;
চেয়ে থাকি– তবুও সে পৃথিবীর ভাষা ছেড়ে পরিভাষাহীন।
মনে পড়ে সেখানে উঠোনে এক দেবদারু গাছ ছিলো।
তারপর সূর্যালোকে ফিরে এসে মনে হয় এইসব দেবদারু নয়।
সেইখানে তম্বুরার শব্দ ছিলো।
পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে– বেজে ওঠে; সুর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।
একদিন রাত্রি এসে সকলের ঘুমের ভিতরে
আমাকে একাকী জেনে ডেকে নিলো– অন্য-এক ব্যবহারে
মাইলটাক দূরে পুরোপুরি।
সবি আছে– খুব কাছে; গোলকধাঁধার পথে ঘুরি
তবুও অনন্ত মাইল তারপর– কোথাও কিছুই নেই ব'লে।
অনেক আগের কথা এইসব– এই
সময় বৃত্তের মতো গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জানুহীন, মলিন সমাজ

সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ– একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।

## পৃথিবীর রৌদ্রে

কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী–
যতো দূর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে
মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই
এ-রকম ভোরের ভিতরে।

যতো দূর মানুষের চোখ চ'লে যায়
উর ময় হরপ্পা আথেন্‌স্‌ রোম কলকাতা রোদের সাগরে
অগণন মানুষের শরীরের ভিতরে বন্দিনী
মানবিকতার মতো : তবুও তো উৎসাহিত করে ?

সে-অনেক লোক লক্ষ্য অসম্ভবভাবে ম'রে গেছে।
ঢের আলোড়িত লোক বেঁচে আছে তবু।
আরো স্মরণীয় উপলব্ধি জন্মাতেছে।
যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে।
যা হলো তা কালকের মৃতদের নিয়ে হ'য়ে গেছে।

•

কঠিন অমেয় দিন রাত এইসব।
চারিদিকে থেকে-থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময়সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হ'য়ে
চেয়ে দ্যাখে শুধু মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।
তবু এই পৃথিবীর জীবনি গভীর।
এক– দুই– শত বছরের
পাথর নুড়ির পথে স্রোতের মতন
কোথায় যে চ'লে গেছে কোন্‌ সব মানুষের দেহ,
মানুষের মন।
আজ ভোরে সূর্যালোকিত জল তবু
ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম,–
তোমরা শতকী নও;
তোমরা তো উনিশশো অনন্তের মতন সুগম।
আলো নেই ? নরনারী কলরোল আলোর আবহ
প্রকৃতির ? মানুষেরো; অনাদির ইতিহাসসহ।

## প্রয়াণপটভূমি

বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভেছে আকাশ থেকে।
মেঘের শরীরে বিভেদ ক'রে বর্শাফলার মতো
সূর্যকিরণ উঠে গেছে নেমে গেছে দিকে-দিগন্তরে;
সকলি চুপ কি এক নিবিড় প্রণয়বশত।
কমলা হলুদ রঙের আলো– আকাশ নদী নগরী পৃথিবীকে
সূর্য থেকে লুপ্ত হ'য়ে অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে
ধীরে-ধীরে ডুবিয়ে দেয়;– মানবহৃদয়, দিন কি শুধু গেলো ?
শতাব্দী কি চ'লে গেলো !– হেমন্তের এই আঁধারের হিম লাগে;
চেনা জানা প্রেম প্রতীতি প্রতিভা সাধ নৈরাজ্য ভয় ভুল
সব-কিছুকেই ঢেকে ফেলে অধিকতর প্রয়োজনের দেশে
মানবকে সে নিয়ে গিয়ে শান্ত– আরো শান্ত হ'তে যদি
অনুজ্ঞা দেয় জনমানবসভ্যতার এই ভীষণ নিরুদ্দেশে,–
আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনা কালজয়ী
হ'তে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অমেয় কথা ভাবে,–
আজকে যদি দীন প্রকৃতি দাঁড়ায় যতি যবনিকার মতো
শান্তি দিতে মৃত্যু দিতে;– জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার;– নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লন্ডনে দ্যাখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

## সূর্য রাত্রি নক্ষত্র

এইখানে মাইল-মাইল ঘাস ও শালিখ রৌদ্র ছাড়া কিছু নেই।
সূর্যালোকিত হ'য়ে শরীর ফসল ভালোবাসি :
আমারি ফসল সব– মীনকন্যা এসে ফলালেই
বৃশ্চিক কর্কট তুলা মেষ সিংহ রাশি
বলয়িত হ'য়ে উঠে আমাকে সূর্যের মতো ঘিরে
নিরবধি কাল নীলাকাশ হ'য়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।
এই নদী নীড় নারী কেউ নয়;– মানুষের প্রাণের ভিতরে
এ-পৃথিবী তবুও তো সব।
অধিক গভীরভাবে মানবজীবন ভালো হ'লে
অধিক নিবিড়তরভাবে প্রকৃতিকে অনুভব
করা যায়। কিছু নয়– অন্তহীণ ময়দান অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র;–
তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর;–
অভাবে সমাজ নষ্ট না-হ'লে মানুষ এইসবে
হ'য়ে যেতো এক তিল অধিক বিভোর।

## জয়জয়ন্তীর সূর্য

কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠের বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে;
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হ'য়েও যা কিছু শুভ্র র'য়ে গেছে আজ–
সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে–
সে-রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।
কোথাও রৌদ্রের নাম–
অন্নের নারীর নাম ভালো ক'রে বুঝে নিতে গেলে
নিয়মের নিগড়ের হাত এসে ফেঁদে
মানুষকে যে আবেগে যতোদিন বেঁধে
রেখে দেয়,
যতোদিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যতোদিন শূন্যতার ষোলো কলা পূর্ণ হ'য়ে– তবে
বন্দরে সৌধের ঊর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে,–
ততোদিন পৃথিবীর কবি আমি– অকবির অবলেশ আমি
ভয় পেয়ে দেখি– সূর্য ওঠে;
ভয় পেয়ে দেখি– অস্তগামী।
যে-সমাজ নেই তবু র'য়ে গেছে, সেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গ'ড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই– প্রেম আসে নাকো।
কোথাও নিয়তিহীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্রান্তির শব্দ শোনে; পিছে টানে;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি ক'রে চলে;
কেবলি ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হ'য়ে প'ড়ে থাকে জেনে নিয়ে– তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই– তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হ'তে হবে ?

সংকল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়।
তবুও তো ভোর আসে– হঠাৎ উৎসের মতো; আন্তরিকভাবে;
জীবনধারণ ছেপে নয়– তবু
জীবনের মতন প্রভাবে;

মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।
মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে,– আরো এসে যেতে পারে :
মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী–
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাত স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধ'রে চলে :
কাজ ক'রে ভুল হ'লে, রক্ত হ'লে মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয়
কতো শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

## হেমন্তরাতে

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে
হেমন্তলক্ষ্মীর সব শেষ অনিকেত আবছায়া তারাদের
সমাবেশ থেকে চোখ নামায়ে একটি পাখির ঘুম কাছে
পাখিনীর বুকে ডুবে আছে,–
চেয়ে দেখি:– তাদের উপরে এই অবিরল কালো পৃথিবীর
আলো আর ছায়া খেলে– মৃত্যু আর প্রেম আর নীড়।

এ-ছাড়া অধিক কোনো নিশ্চয়তা নির্জনতা জীবনের পথে
আমাদের মানবীয় ইতিহাসচেতনায়ো নেই,– (তবু আছে।)
এমনি অঘ্রাণরাতে মনে পড়ে– কতো সব ধূসর বাড়ির
আমলকী-পল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
পৃথিবীর তীরে-তীরে ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত
দাঁড়ায়ে রয়েছে কতো মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো–

দ্যাখা যেতো; এক-আধ মুহূর্ত শুধু;– সে-অভিনিবেশ ভেঙে ফেলে
সময়ের সমুদ্রের রক্ত ঘ্রাণ পাওয়া গেলো;– ভীতিশব্দ রীতিশব্দ মুক্তিশব্দ এসে
আরো ঢের পটভূমিকার দিকে-দিগন্তরে ক্রমে
মানবকে ডেকে নিয়ে চ'লে গেলো প্রেমিকের মতো সসম্ভ্রমে।
তবুও সে প্রেম নয়, সুধা নয়– মানুষের ক্লান্ত অন্তহীন
ইতিহাস-আকুতির প্রবীণতা ক্রমায়াত ক'রে সে বিলীন ?

আজ এই শতাব্দীতে সকলেরি জীবনের হৈমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সংকল্পের তরঙ্গকঙ্কাল
দ্বীপসমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ ক'রে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে।

কেবলি কল্লোল আলো,– জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানবহৃদয়
সনাতন মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়ে– তবু– উনিশ'শো অনন্তের জয়

হ'য়ে যেতে পারে, নারি, আমাদের শতাব্দীর দীর্ঘতর চেতনার কাছে
আমরা সজ্ঞান হ'য়ে বেঁচে থেকে বড়ো সময়ের
সাগরের কূলে ফিরে আমাদের পৃথিবীকে যদি
প্রিয়তর মনে করি প্রিয়তম মৃত্যু অবধি;–
সকল আলোর কাজ বিষণ্ন জেনেও তবু কাজ করে– গানে
গেয়ে লোকসাধারণ ক'রে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।

## নারীসবিতা

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের বারে
প্রেমের শরীর চিনে নিতাম চারিদিকের রোদের হাহাকারে–
হাওয়ায় তুমি ভেসে যেতে দখিন দিকে– যেইখানেতে যমের দুয়ার আছে:
অভিচারী বাতাসে বুক লবণ-বিলুণ্ঠিত হ'লে আবার আমার কাছে
উতরে এসে জানিয়ে দিতে পাখিদেরো– শাদা পাখিদেরো স্খলন আছে:
আমরা যদি রাতের কপাট খুলে দিতাম নীল সাগরের দিকে,
বিষণ্নতার মুখের কারুকার্যে বেলা হারিয়ে যেতো জ্যোতির মোজেয়িকে।

দিনের উজান রোদের ঢলে যতোটা দূর আকাশ দ্যাখা যায়
তোমার পালক শাদা আরো শাদা হ'য়ে অমেয় নীলিমায়
ওই পৃথিবীর সাটিন-পরা দীর্ঘগড়ন নারীর মতো– তবুও তো এক পাখি;
সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা কি !
যা হয়েছে যা হতেছে সকল পরখ এইবারেতে নীল সাগরের নীড়ে
গুঁড়িয়ে সূর্য নারী হ'লো, অকূলপাথার পাখির শরীরে।

গভীর রৌদ্রে সীমান্তের এই ঢেউ– অতিবেল সাগর, নারী, শাদা
হ'তে হ'তে নীলাভ হয়;– প্রেমের বিসার, মহীয়সী, ঠিক এ-রকম আধা
নীলের মতো, জ্যোতির মতো। মানব ইতিহাসের আধেক নিয়ন্ত্রিত পথে
আমরা বিজোড়; তাই তো দুধের-বরণ-শাদা পাখির জগতে
অন্ধকারের কপাট খুলে শুকতারাকে চোখে দ্যাখার চেয়ে
উড়ে গেছি সৌরকরের সিঁড়ির বহিরাশ্রয়িতা পেয়ে !

অনেক নিমেষ ওই পৃথিবীর কাঁটা গোলাপ শিশিরকণা মৃতের কথা ভেবে
তবু আরো অনন্তকাল ব'সে থাকা যেতো– তবু সময় কি তা দেবে।
সময় শুধু বালির ঘড়ি সচল ক'রে বেবিলনের দুপুরবেলার পরে
হৃদয় নিয়ে শিপ্রা নদীর বিকেলবেলা হিরণ সূর্যকরে

খেলা ক'রে না ফুরোতেই কলকাতা রোম বৃহৎ নতুন নামের বিনিপাতে
উড়ে যেতে বলে আমায় তোমার প্রাণের নীল সাগরের সাথে।

না-হ'লে এই পৃথিবীতে আলোর মুখে অপেক্ষাতুর ব'সে থাকা যেতো
পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন,– কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত
শাদা রঙের সরোজিনীর মুখের দিকে চেয়ে,
কি এক গভীর ব'সে থাকার বিষণ্ণতার কিরণে ক্ষয় পেয়ে,
নারি, তোমায় ভাবা যেতো।– বেবিলনে নিভে নতুন কলকাতাতে কবে
ক্রান্তি, সাগর, সূর্য জ্বলে অনাথ ইতিহাসের কলরবে।

## উত্তরসামরিকী

আকাশের থেকে আলো নিভে যায় ব'লে মনে হয়।
আবার একটি দিন আমাদের মৃগতৃষ্ণার মতো পৃথিবীতে
শেষ হ'য়ে গেলো তবে;– শহরের ট্রাম
উত্তেজিত হ'য়ে উঠে সহজেই ভবিতব্যতার
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোন্-এক নিরুদ্দেশ কুড়োতে চলেছে।
এই দিকে পায়দলদের ভিড়– ওই দিকে টর্চের মশালে বার-বার
যে যার নিজের নামে সকলের চেয়ে আগে নিজের নিকটে
পরিচিত;– ব্যক্তির মতন নিঃসহায়;
জনতাকে অবিকল অমঙ্গল সমুদ্রের মতো মনে করে
যে যার নিজের কাছে নিবারিত দ্বীপের মতন
হ'য়ে পড়ে অভিমানে– ক্ষমাহীন কঠিন আবেগে।

সে-মুহূর্ত কেটে যায়: ভালোবাসা চায় না কি মানুষ নিজের
পৃথিবীর মানুষের ?– শহরে রাত্রির পথে হেঁটে যেতে-যেতে
কোথাও ট্রাফিক থেকে উৎসারিত অবিরল ফাঁস
নাগপাশ খুলে ফেলে কিছুক্ষণ থেমে থেকে এ-রকম কথা
মনে হয় অনেকেরি;–
আত্মসমাহিতিকূট ঘুমায়ে গিয়েছে হৃদয়ের।

তবু কোনো পথ নেই এখনো অনেক দিন, নেই।
একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হ'য়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসেনি তো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে

ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে হোটেলে অলিগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজো সূর্যের বদলে
দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শক্তি, অর্থ, শুধু মানবীর
মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে। সারাদিন– অনেক গভীর
রাতের নক্ষত্র ক্লান্ত হ'য়ে থাকে তদের বিলোল কাকলিতে।
নকল নেশন আজ এই এক বিলোড়িত মহা-নেশনের
কুয়াশায় মুখ ঢেকে যে যার দ্বীপের কাছে তবু
সত্য থেকে– শতাব্দীর রাক্ষসী বেলায়
দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশন।

শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ
দাঁড়ায়ে এ-জীবনের কতগুলো পরিচিত স্বত্বশূন্য কথা–
যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্চর্য ক্রেংকার
নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই
ভালোবাসা; মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক
দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতা; যুগের নিকটে ঋণ, মন-বিনিময়,
এবং নতুন জননীতিকের কথা– আরো স্মরণীয় কাজ
সকলের সুস্থতার– হৃদয়ের কিরণের দাবি করে; আর অদূরের
বিজ্ঞানের আলাদা সজীব গভীরতা;
তেমন বিজ্ঞান যাহা নিজের প্রতিভা দিয়ে জেনে সেবকের
হাত দিব্য আলোকিত ক'রে দেয়– সকল সাধের
কারণ-কর্দম-ফেনা প্রিয়তর অভিষেকে স্নিগ্ধ ক'রে দিতে–
এইসব অনুভব ক'রে নিয়ে সপ্রতিভ হ'তে হবে না কি।
রাত্রির চলার পথে এক তিল অধিক নবীন
সম্মুখীন– অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা
জেগে আছে। কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাবস্পর্শে আরো ঋত– অন্তর্দীপ্ত হয়।

## বিস্ময়

কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে
দ্যাখা যাবে বসেছে কৃষাণ :
মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।

কখনো ফুরুনো খেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্তের কাছে;

সেও যেন বাবলার কাণ্ড এক
অঘ্রাণের পৃথিবীর কাছে।

সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে :
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত;
চাঁদের ও-পিঠ থেকে নেমেছে এ-পৃথিবীর
অন্ধকার ন্যূজতার মতো।

সে যেন প্রস্তরখণ্ড— স্থির—
নড়িতেছে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তের সাথে;
পুরাতন ছাতকুড়ো ঘ্রাণ দিয়ে
নবীন মাটির ঢেউ মাড়াতে-মাড়াতে।

তুমি কি প্রভাতে জাগো ?
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে ?
আস্তীর্ণ শতাব্দী বহে যায়নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে ?

কী তারা গিয়েছে দিয়ে—
নষ্ট ধান ? উজ্জীবিত ধান ?
সুষুম্না নাড়ীর গতি— অজ্ঞাত;
তবু আমি আরো অজ্ঞান

যখন দেখেছি চেয়ে কৃষাণকে
বিশীর্ণ পাগড়ি বেঁধে অস্তাক্ত আলোকে
গঙ্গাফড়িঙের মতো উদ্বাহু
মুকুর উঠেছে জেগে চোখে;

যেন এই মৃত্তিকার গর্ভ থেকে
অবিরাম চিন্তারাশি— নব-নব আবাসের থাম
জেগে ওঠে একবার;
আর-একবার ওই হৃদয়ের হিম প্রাণায়াম।

সময়ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্ত শুধু :
অবিরল গ্যাসে আলো, জোনাকিতে আলো;
কর্কট, মিথুন, মীন, কন্যা, তুলা ঘুরিতেছে;—
আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়ালো।

## গভীর এরিয়েলে

ডুবলো সূর্য; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।
রক্ত ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের নীচে
নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ;
পায় না নব; তবুও উত্তেজনাও যেন পায় না এখন আর;
চারদিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ– সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।

অন্ধকারের এ-হাত আমি ভালোবাসি; চেনা নারীর মতো
অনেক দিনের অদর্শনার পরে আবার হাতের কাছে এসে
জ্ঞানের আলো দিনকে দিয়ে কী অভিনিবেশে
প্রেমের আলো প্রেমকে দিতে এসেছে সময়মতো;
হাত দু-খানা ক্ষমাসফল; গণনাহীন ব্যক্তিগত গ্লানি
ইতিহাসের গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি–
সবের পরে মৃত্যুতে নয়– নীরবতায় আত্মবিচারের
আঘাত দেবার ছলে কি রাত এমন স্নিগ্ধ তুমি।

আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।
অনেক জীবিতেরা কঠিন সাঁকো বেয়ে মৃত্যুনদীর দিকে
জলের ভিতর নামছে– ব্যবহৃত পৃথিবীটাকে
সন্ততিদের চেয়েও বেশি দৈব আঁধার আকাশবাণীর কাছে
ছেড়ে দিয়ে– স্থির ক'রে যায় ইতিহাসের গতি।
যারা গেছে যাচ্ছে– রাতে যাবো সকলি তবে।
আজকে এ-রাত তোমার থেকে আমায় দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে
তবুও তোমার চোখে আত্মা আত্মীয় এক রাত্রি হ'য়ে রবে।

তোমায় ভালোবেসে আমি পৃথিবীতে আজকে প্রেমিক, ভাবি।
তুমি তোমার নিজের জীবন ভালোবাসো; কথা
এইখানেতেই ফুরিয়ে গেছে। শুনেছি তোমার আত্মলোলুপতা
প্রেমের চেয়ে প্রাণের বৃহৎ কাহিনীদের কাছে গিয়ে দাবি
জানিয়ে নিদয় খৎ দেখিয়ে আদায় ক'রে নেয়
ব্যাপক জীবন শোষণ ক'রে যে-সব নতুন সচল স্বর্ণ মেলে;
যদিও আজ রাষ্ট্র সমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা,
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবুও তোমার গভীর এরিয়েলে।

## ইতিহাসযান

সেই শৈশবের থেকে এ-সব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি;
এইসব নক্ষত্র দেখেছি।
বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতোবার দ্যাখা গেছে মানুষের বাড়ি
রোদের ভিতরে যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের
বিষণ্ন শক্তির মতো আয়োজনে নির্মিত হতেছে;
কোলাহলে– কেমন নিশিত উৎসবে গ'ড়ে ওঠে।
একদিন শূন্যতায় স্তব্ধতায় ফিরে দেখি তারা
কেউ আর নেই।
পিতৃপুরুষেরা সব নিজ স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে অতীতের দিকে
স'রে যায়,– পুরোনো গাছের সাথে সহমর্মী জিনিসের মতো
হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনো শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত
দেখেছি পিপুল গাছ
আর পিতাদের ঢেউ
আর সব জিনিস : অতীত।

তারপর ঢের দিন চ'লে গেলে আবার জীবনোৎসব
যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান, অনেক করুণ।
তবুও আবার মৃত্যু।– তারপর একদিন মউমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হ'য়ে গেলে নীল
আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হ'য়ে ওঠে;– হেমন্তের
অপরাহ্ণে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে
কোথাও শণের বনে– হলুদ রঙের খড়ে– চাষার আঙুলে
গালে– কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুপে নেমে আসে;
প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে
কি যেন কিসের সৌরব্যবহারে এসে লেগে থাকে।
অথবা কখনো সূর্য– মনে পড়ে– অবহিত হ'য়ে
নীলিমার মাঝপথে এসে থেমে র'য়ে গেছে– বড়ো
গোল– রাহুর আভাস নেই– এমনি পবিত্র নিরুদ্বেল।
এইসব বিকেলের হেমন্তের সূর্যছবি– তবু
দ্যাখাবার মতো আজ কোনো দিকে কেউ
নেই আর, অনেকেই মাটির শয়ানে ফুরাতেছে।

মানুষেরা এইসব পথে এসে চ'লে গেছে,– ফিরে
ফিরে আসে,– তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে তারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান

সমুজ্জ্বল কি অভিনেবেশে সোনা হ'য়ে ওঠে– দ্যাখে;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হ'লে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেও ঘুমোবার জুড়োবার মতো
কিছু নেই;– হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফিরতির মতো অন্তহীন
সন্তান-সন্ততির হাতে
কাজ ক'রে চ'লে গেছে কতোদিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিলো কেউ-কেউ :
ছোটো বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড়;–
সেইখানে বই পড়া হ'তো কিছু– লেখা হ'তো;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ির আলোর মতো কী যেন কেমন এক আশাবাদ ছিলো
তাহাদের চোখে-মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায়;
সংসারে সমাজ-দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হ'লে
ইহাদের মনে হ'তো দীনতা জয়ের চেয়েও বড়ো;
অথবা বিজয়-পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের
এপিঠ-ওপিঠ শুধু;– সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

মাঝে-মাঝে প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় তারা সব জড়ো হ'য়ে যেতো–
কোথাও সুন্দর প্রেতসত্য আছে জেনে তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে
কেমন নিবড়িভাবে বিচলিত হ'য়ে উঠে, আহা।
সেখানে স্থবির যুবা কোনো-এক তন্বী তরুণীর
নিজের জিনিস হ'তে স্বীকার পেয়েছে ভাঙা চাঁদে
অর্ধ-সত্যে অর্ধ-নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে;
অনেক তরুণী যুবা– যৌবরাজ্য যাহাদের শেষ
হ'য়ে গেছে– তারাও সেখানে অগণন
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো
অনবলুণ্ঠিত ফিকে মৃগতৃষ্ণিকার
মতন জ্যোৎস্নায় এসে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে প্রান্তরের পথে
চাঁদকে নিখিল ক'রে দিয়ে তবুও পরিমেয় কলঙ্কে নিবিড়
ক'রে দিতে চেয়েছিলো,– মনে-মনে– মুখে নয়– দেহে
নয়; বাংলার মানসসাধনশীত শরীরের চেয়ে আরো বেশি
জয়ী হ'য়ে শুক্ল রাতে গ্রামীণ উৎসব
শেষ ক'রে দিতে গিয়ে শরীরের কবলে তো তবুও ডুবেছে বার-বার
অপরাধী ভীরুদের মতো প্রাণে।
তারা সব মৃত আজ।

তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মতন জীবিত।

'ঢের ছবি দ্যাখা হ'লো– ঢের দিন কেটে গেলো– ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হ'য়ে গেলো, তবু, হাতে খননের
অস্ত্র নেই– মনে হয়– চারিদিকে ঢিবি-দেয়ালের
নিরেট নিঃসক্ত অন্ধকার'– ব'লে যেন কেউ যেন কথা বলে।
হয়তো সে বাংলার জাতীয় জীবন।
সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিস
সকলের; অধিগত হ'লে প্রাণ জানালার ফাঁক দিয়ে চোখের মতন
অনিমেষ হ'য়ে থাকে নক্ষত্রের আকাশে তাকালে।
আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে ?
আমাদের মনীষীরা আমদের অর্ধসত্য ব'লে গেছে
অর্ধমিথ্যার ? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায়; তবু বয়– হয়তো বা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঢের ছবি দ্যাখা হ'লো– ঢের দিন কেটে গেলো– ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হ'য়ে গেলো, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে র'য়ে গেছে,– জ্যোতির্গ্রন্থে;
জীবনের জন্যে আজো নেই।
অনেক মানুষী-খেলা দ্যাখা হ'লো, বই পড়া সাঙ্গ হ'লো– তবু
কে বা কাকে জ্ঞান দেবে– জ্ঞান বড়ো দূর পৃথিবীর
রুক্ষ গল্পে; আমাদের জন্যে দূর– দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই;– স্থবিরতা আছে– জরা আছে।
চারিদিক থেকে ঘিরে কেবলি বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
র'য়ে গেছে। নিজেকে কেবলি আত্মক্রীড় করি; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হ'তে ভয়
পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে– ভয় পাই– গুহায় লুকাই;
লীন হ'তে চাই– লীন– ব্রহ্মশব্দে লীন হ'য়ে যেতে
চাই। আমাদের দু-হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হ'য়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনো লুপ্ত হইনি তো।

এখনো পৃথিবী সূর্যে সুখী হ'য়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হ'তো– হয়তো বা;
তবুও সকলি উৎস গতি যদি,– রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসবে

পাখির প্রমাথী দীপ্তি সাগরের সূর্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,
তাহলে যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে;– তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনো আসেনি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বার-বার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে;– তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর;
সে অনেক প্রতারণা-প্রতিভার সেতুলোক পার
হয় ব'লে স্থির;– হ'তে হবে ব'লে দীন, প্রমাণ, কঠিন;
তবুও প্রেমিক– তাকে হ'তে হবে; সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয়; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে ব'লে
মনে হয়; এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

## মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প

আঁধারে হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই।
সে কারা কাদের এসে বলে :
এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার;
হে আকাশ, হে কালশিল্পী, তুমি আর
সূর্য জাগিয়ো না;
মহাবিশ্বকারুকার্য, শক্তি, উৎস, সাধ :
মহনীয় আগুনের কী উচ্ছ্রিত সোনা ?

তবুও পৃথিবী থেকে–
আমরা সৃষ্টির থেকে নিভে যাই আজ;
আমরা সূর্যের আলো পেয়ে
তরঙ্গকম্পনে কালো নদী
আলো নদী হ'য়ে যেতে চেয়ে
তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
জেনে গেছি কারা ধন্য,
কারা স্বর্ণপ্রাধান্যের সূত্রপাত করে।

তাহাদের ইতিহাস-ধারা
ঢের আগে শুরু হয়েছিলো;

এখুনি সমাপ্ত হ'তে পারে:
তবুও আলেয়াশিখা আজো জ্বালাতেছে
পুরাতন আলোর আঁধারে।

আমাদের জানা ছিলো কিছু;
কিছু ধ্যান ছিলো;
আমাদের উৎস-চোখে স্বপ্নছটা প্রতিভার মতো
হয়তো-বা এসে পড়েছিলো;
আমাদের আশা সাধ প্রেম ছিলো;– নক্ষত্রপথের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে
তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে;
আমাদেরো গেছিলো জাগিয়ে
পৃথিবীতে;

আমরা জেগেছি– তবু জাগাতে পারিনি;
আলো ছিলো– প্রদীপের বেষ্টনী নেই;
কাজ ছিলো– শুরু হ'লো না তো;
তা হ'লে দিনের সিঁড়ি কি প্রয়োজনের ?
নিঃস্বত্ব সূর্যকে নিয়ে কার তবে লাভ !
সচ্ছল শাণিত নদী, তীরে তার সারস-দম্পতি
ওই জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে;
তাদের চোখের রং অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে;
দিনের সূর্যের বর্ণে রাতের নক্ষত্র মিশে যায়;
তবু তারা প্রণয়কে সময়কে চিনেছে কি আজো ?
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কে এসে চেনায় !

আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ওই অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি;
শান্ত হ'য়ে স্তব্ধ হ'য়ে উদ্বেলিত হ'য়ে অনুভব ক'রে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।
ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চ'লে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,

বহমান ইতিহাসমরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে,
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়–
ডাক দেবে, তবু তার আগে
আমরা ওদের হাতে রক্ত ভুল মৃত্যু হ'য়ে
হারায়ে গিয়েছি ?

জানি ঢের কথা কাজ স্পর্শ ছিলো, তবু
নগরীর ঘণ্টা-রোল যদি কেঁদে ওঠে,
বন্দরে কুয়াশা বাঁশি বাজে,
আমরা মৃত্যুর হিম ঘুম থেকে তবে
কি ক'রে আবার প্রাণকম্পনলোকের নীড়ে নভে
জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্যশিখা
বুঝে নিয়ে হে উড্ডীন ভয়াবহ বিশ্বশিল্পলোক,
মরণে ঘুমোতে বাধা পাবো ?–
নবীন-নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর-একবার এসে এখানে দাঁড়াবো।
যা হয়েছে– যা হতেছে– এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে-বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে।

## পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন
আলোকিত হ'য়ে ওঠে– রাত্রি অন্ধকার
হ'য়ে আসে; সর্বদাই পৃথিবীর আহ্নিক গতির
একান্ত নিয়ম, এইসব;
কোথাও লঙ্ঘন নেই তিলের মতন আজো;
অথবা তা হ'তে হ'লে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হ'য়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে; সে-সময় আমাদের জন্যে নয় আজ।
রাতের পরের দিন– দিনের পরের রাত নিয়ে সুশৃঙ্খল
পৃথিবীকে বলয়িত মরুভূমি ব'লে
মনে হ'তে পারে তবু; শহরে নদীতে মেঘে মানুষের মনে
মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
শেষ হয়নিকো তবু; শিশুরা অনপনেয়ভাবে
কেবলি যুবক হ'লো,– যুবকেরা স্থবির হয়েছে,
সকলেরি মৃত্যু হবে,– মরণ হতেছে।

অগণন অঙ্কে মানুষের নাম ভোরের বাতাসে
উচ্চারিত হয়েছিলো শুনে নিয়ে সন্ধ্যার নদীর
জলের মুহূর্তে সেই সকল মানুষ লুপ্ত হ'য়ে গেছে জেনে
নিতে হয়; কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হ'য়ে যায়;
কঠিন নিয়মে নিরঙ্কুশভাবে ভিড়ে মানবের কাজ
অসমাপ্ত হ'য়ে থাকে– কোথাও হৃদয় নেই তবু।
কোথাও হৃদয় নেই মনে হয়, হৃদয়যন্ত্রের
ভয়াবহভাবে সুস্থ সুন্দরের চেয়ে এক তিল
অবান্তর আনন্দের অশোভনতায়।
ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে;– চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ র'য়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,
বন্ধ্যা ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে তার লোকোত্তর মাথার নিকটে
স্বর্গের সিঁড়ির মতো;– হুড়ি হাতে অগ্রসর হ'য়ে যেতে হয়।

আমাদের এই শতাব্দী আজ এই পৃথিবীর সাথে
নক্ষত্রলোকের এই অবিরল সিঁড়ির পসরা
খুলে আত্মক্রীড় হ'লো;– মাঘসংক্রান্তির রাত্রি আজ
এমন নিষ্প্রভ হ'য়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাঁটার মতন
কাকে বোনে ? কেন বোনে ? কোন্ দিকে কোথায় চলেছে ?
এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে– ঝাউ শিশু জারুলে হাওয়ার শব্দ থেমে
আরো থেমে-থেমে গেলে– আমাদের পৃথিবীর আহ্নিক গতির
অন্ধ কণ্ঠ শোনা যায়;– শোনো, এক নারীর মতন,
জীবন ঘুমায়ে গেছে; তবু তার আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট শরীর
নিশির ডাকের শব্দ শুনে বেবিলনে পথে নেমে
উজ্জয়িনী গ্রীসে রেনেসাঁসে রুশে আধো জেগে, তবু,
হৃদয়ে বিকিয়ে গিয়ে ঘুমায়েছে আর একবার
নির্জন হ্রদের পারে জেনিভার পপলারের ভিড়ে
অন্ধ সুবাতাস পেয়ে;– গভীর গভীরতর রাত্রির বাতাসে
লোকার্নো হ্বের্সাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে
ইউ-এন-ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ–
আরো ঘুম– র'য়ে গেছে হৃদয়ের– জীবনের;– নারী,
শরীরের জন্যে আরো আশ্চর্য বেদনা
বিমূঢ়তা লাঞ্ছনার অবতার র'য়ে গেছে; রাত
এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বৃদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হ'তে চায়;– বেলজেনের সবচেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে-নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে;

পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হ'য়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্না,– রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়,– মানুষের মন
সহসা আকাশপথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কি রকম সাহসিকা চেয়ে দ্যাখে– সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হ'য়ে ওঠে;– অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি ? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হ'য়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হ'য়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হ'তে চায়– অগ্রসর হ'য়ে যেতে পারে।

## পটভূমির

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ-পনেরো বছর আগে; সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের :– জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ : চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই,– গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত নাবিক ফিরে আসে;

তারা যুবা, তারা মৃত; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজো তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছো, নারি,–
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারি
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারিদিকে অলীক সাগর– জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো,– ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
আমরা আজো বহন ক'রে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা... প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।

## অন্ধকার থেকে

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ-পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভেতর থেকে কি ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়,–
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
কি ক'রে এ-প্রকৃতিতে– পৃথিবীতে, আহা,

তবুও হয়তো আজ তোমরা উত্তীন নব সূর্যের উদ্দেশে।

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানব-জীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যতো বেশি চেনা যায়– চলা যায় সময়ের পথে
ততো বেশি উত্তরণ সত্য নয়,– জানি; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো
অধিক নির্মল হ'লে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব-প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে.
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে.

## একটি কবিতা

আমার আকাশ কালো হ'তে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে:
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহাসময়েরি কাছে
নদী খেত বনানীর ঝউয়ের ঝরা সোনার মতন
সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন;– আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর করো– নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ;
সকলের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

## সারাৎসার

এখানে কিছুই নেই– এখানে কিছুই নেই আর,
অমল ভোরের বেলা র'য়ে গেছে শুধু;
আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট ক'রে দিয়ে সূর্য আসে;
অনেক আবছা জল জেগে উঠে নিজ প্রয়োজনে
নদী হ'য়ে সমস্ত রৌদ্রের কাছে জানাতেছে দাবি;

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ওইসব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা;
আমার লক্ষ্য ছিলো মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা

সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কি ক'রে মানুষ ও মানুষীর মতো ক'রে রাখে।

তবু তার উপচার নিয়ে সেই নারী
কোথায় গিয়েছে আজ চ'লে:
এই তো এখানে ছিলো সে অনেক দিন:
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হ'লে
তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় :
অনুভব ক'রে আমি অনুভব করেছি সময়।

## সময়ের তীরে

নিচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,
মাথার ওপর অগণন নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে,
কোনো দূর সমুদ্রের বাতাসের স্পর্শ মুখে রেখে,
আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জরণ শুনে,
কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো:
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগ্নলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন:
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর:
একদিকে বালিপ্রলেপী মরুভূমি হু-হু করছে;
আর-একদিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে
মাইলের পর মাইল।
শুধু বাতাস উড়ে আসছে :
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন ক'রে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।
শুধু বাতাসের প্রেতচারণ
অমৃতলোকের অপস্রিয়মান নক্ষত্রযান-আলোর সন্ধানে।
পাখি নেই,— সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ;
কোনো গাছ নেই,— সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দ্যাখা হ'লো, নারি,

অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কি আছে ?
তুমি যে মর্তনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছো নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো;
সকল সময়ে স্থান অনুভবলোক অধিকার ক'রে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।

কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে;
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই;
শাদা সাধারণ নিঃসংকোচ রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আজ;
অথবা ঝর্নার জলে
মিশরী শঙ্খরেখাসর্পিল গাগরীর সমুৎসকতায়
তুমি আজ সূর্যজলস্ফুলিঙ্গের আত্মা-মুখরিত নও আর।

তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম,
কিংবা ভারতের;
অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্যশিখার কোনো স্থান আছে
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা— সকলের জন্যে।
নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতরুৎসারা নীলিমার মতো
কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন ক'রে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে— লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে।

ডানে বাঁয়ে উপরে নিচে সময়ের
জ্বলন্ত তিমিরের ভিতরে তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষীসূর্যের
ডানার উত্তীন কলরোল;
আগুনের মহান পরিধি গান ক'রে উঠেছে।

## যতোদিন পৃথিবীতে

যতোদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর বঞ্চনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি মুক্তির

নির্দেশের পথ ধ'রে চ'লে
হয়তো-বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে– হৃদয়ে;
মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চ'লে যাওয়া;– গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে;
জীবনের কালোরঙা মানে কি ফুরুবে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে।

জেগে ওঠে তবুও মানুষ রাত্রিদিনের উদয়ে;
চারিদিকে কলরোল করে পরিভাষা
দেশের জাতির দ্ব্যর্থ পৃথিবীর তীরে;
ফেনিল অস্ত্র পাবে আশা ?
যেতেছে নিঃশেষ হ'য়ে সব ?
কি তবে থাকবে ?
আধার ও মননের আজকের এ নিস্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হ'য়ে উঠবে প্রকৃতি ?

ব্যর্থ উত্তরাধিকারে মাঝে-মাঝে তবু
কোথাকর স্পষ্ট সূর্য-বিন্দু এসে পড়ে :
কিছু নেই উত্তেজিত হ'লে;
কিছু নেই স্বার্থের ভিতরে;
ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবি
জানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী;
অন্ধকারে সবচেয়ে সে-শরণ ভালো :
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।

## মহাত্মা গান্ধী

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে
ভালো ব'লে মনে হয়;– সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতরভাবে

পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরি হৃদয়ের 'পরে এসে নগ্ন হাত রাখে;
আমরাও আলো পাই– প্রশান্ত অমল অন্ধকার
মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও।

একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিলো– শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের।
কেমন সফল এক পর্বতের সানুদেশ থেকে
ঈশা এসে কথা ব'লে চ'লে গেলো– মনে হ'লো প্রভাতের জল
কমনীয় শুশ্রূষার মতো বেগে এসেছে এ-পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা ক'রে আছে ব'লে– চায় ব'লে,–
নিরাময় হ'তে চায় ব'লে।

পৃথিবীর সেইসব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম উষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু;—
কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি র'য়ে গেছে : মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার;
তোমাদের সে-রকম প্রেম ছিলো, বহ্নি ছিলো, সফলতা ছিলো।
তোমাদের চারপাশে সাম্রাজ্য রাজ্যের কোটি দীন সাধারণ
পীড়িত রক্তাক্ত হ'য়ে টের পেতো কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে
নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভ'রে ফেলে তারপর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মতো একজন মানবীয় মহানুভবকে
পাঠাতেছে,– প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে– মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ ক'রে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে;
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হ'য়ে গেছে;
যেইসব বড়ো-বড়ো মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিলো
তাদের অন্তর্ধান সবিশেষ সুমজ্জ্বল ছিলো, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে-সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে–

সহিষ্ণুতায় ভেবে সে-সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ ক'রে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে– কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়– ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল
দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ ব'লে সম্ভাষণ ক'রে নয়–
কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভ'রে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে নিয়েছে
পৃথিবীরি সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে– সকলের নিচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

আজ এই শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর সচ্ছলতা
এ-রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন এনে সকলের প্রাণ
শতকের আঁধারের মাঝখানে কোনো স্থিরতর
নির্দেশের দিকে রেখে গেছে;
রেখে চ'লে গেছে– ব'লে গেছে : শান্তি এই, সত্য এই।

হয়তো-বা অন্ধকারি সৃষ্টির অন্তিমতম কথা;
হয়তো-বা রক্তেরি পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক–
মানুষও রক্তাক্ত হ'তে চায়;
হয়তো-বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন ব'লে– অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি ব'লে প্রচারিত করার ভিতর;
হয়তো-বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা– সুখে থাকা– রিরংসারক্তিম হ'য়ে থাকা;
হয়তো-বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, এই।

চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে– মানুষের হৃদয় কঠিনতর হ'য়ে গেছে;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশালী দ্যাখো;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে– শীত :
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে স'রে চ'লে গেছে;
প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেইসব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যিই আনন্দসৃষ্টির

সে-সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর ব'লে;
আমরা অজ্ঞান নই– প্রতিদিনি শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার করি, তবু
কেমন দূরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে
যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিলো,
যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে,
আকাশে নক্ষত্র সূর্য নীলিমার সফলতা আছে,–
আছে, তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই,
প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,
তখন তো পৃথিবীতে আবার ঈশার পুনরুদয়ের দিন
প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই;
তবুও উদয় হয়– ঈশা নয়– ঈশার মতন নয়– আজ এই নতুন দিনের
আর-একজনের মতো;
মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় ব'লে;
হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে;
একজন স্থবির মানুষ দ্যাখো অগ্রসর হ'য়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে– সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে;– সত্য আছে, আলো আছে; তবুও সত্যের আবিষ্কারে :
আমরা আজকে এই বড়ো শতকের
মানুষেরা সে-আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি।
আমাদের মৃত্যু হ'য়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়
মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হ'তে ব'লে
জেগে রবে; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয় !

## যদিও দিন

যদিও দিন কেবলি নতুন গল্পবিশ্রুতির
তারপরে রাত অন্ধকারে থেমে থাকা;– লুপ্তপ্রায় নীড়
সঠিক ক'রে নেয়ার মতো শান্ত কথা ভাবা;
যদিও গভীর রাতের তারা (মনে হয়) ঐশী শক্তির;

তবুও কোথাও এখন আর প্রতিভা আভা নেই;
অন্ধকারে কেবলি সময় হৃদয় দেশ ক্ষয়ে

যেতেছে দেখে নীলিমাকে অসীম ক'রে তুমি
বলতে যদি মেঘনা নদীর মতন অকূল হ'য়ে :

'আমি তোমার মনের নারী শরীরিণী– জানি;
কেন তুমি স্তব্ধ হ'য়ে থাকো।
তুমি আছো ব'লে আমি কেবলি দূরে চলতে ভালোবাসি,
চিনি না কোনো সাঁকো।

যতোটা দূরে যেতেছি আমি সূর্যকরোজ্জ্বলতাময় প্রাণে
ততোই তোমার স্বত্বাধিকার ক্ষয়
পাচ্ছে ব'লে মনে করো ? তুমি আমার প্রাণের মাঝে দ্বীপ,
কিন্তু সে দ্বীপ মেঘনা নদী নয়।'–

এ-কথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি
আমাকে– তাকে– যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে
ব'লে যেতে;– শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।

## দেশ কাল সন্ততি

কোথাও পাবে না শান্তি– যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে ?
এ-মাঠ পুরোনো লাগে– দেয়ালে নোনার গন্ধ– পায়রা শালিখ সব চেনা ?
এক ছাদ ছেড়ে দিয়ে অন্য সূর্যে যায় তারা– লক্ষ্যের উদ্দেশে
তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্ত্বনা দেবে না।

কেন লোভে উদ্‌যাপনা ? মুখ ম্লান– চোখে তবু উত্তেজনা সাধ ?
জীবনের ধার্য বেদনার থেকে এ নিয়মে নির্মুক্তি কোথায়।
ফড়িং অনেক দূরে উড়ে যায় রোদে ঘাসে– তবু তার কামনা অবাধ
অসীম ফড়িংটিকে খুঁজে পাবে প্রকৃতির গোলকধাঁধায় ?

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে;
তবে তার দিন শেষ হ'য়ে গেলো; একদিন হ'তোই তো, যেন এইসব
বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্রপ্রাণ জানে তার; যতোবার হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাধা ছিঁড়ে যেতে চায়– পরিচিত নিরাশায় ততোবার হয় সে নীরব।

অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব;
জানে তাহা কীটেরাও, পতঙ্গেরা, শান্ত শিব পাখির ছানাও;
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায়;– হে সৃষ্টির বনহংসী, কি অমৃত চাও ?

## মহাগোধূলি

সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি-- বিকেলের রোদ প'ড়ে আসে।
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় খেতের ভাঁড়ারে;
শাদা পথ ধুলো মাছি– ঘুম হ'য়ে মিশছে আকাশে;
অস্ত-সূর্য গা এলিয়ে অড়র খেতের পারে-পারে

শুয়ে থাকে; রক্তে তার এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে;
আসন্ন এ-খেতটিকে ভালো লাগে-- চোখে অগ্নি তার
নিভে-নিভে জেগে ওঠে;– স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার।

কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয় হয়;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব;
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
ক'রে চুপ হয়েছিলো– আজো সময়ের কাছে তেমনি নীরব।

## মানুষ যা চেয়েছিলো

গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ পাতা হতেছে নরম;
খয়েরি শালিখগুলো খেলছে বাতাবিগাছে– তাদের পেটের শাদা রোম
সবুজ পাতার নিচে ঢাকা প'ড়ে একবার পলকেই বার হ'য়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে-কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।
ও কার গোরুর গাড়ি র'য়ে গেছে ঘাসে ওই পাখা মেলে ফড়িঙের মতো।
হরিণী রয়েছে ব'সে নিজের শিশুর পাশে বড়ো চোখ মেলে;
আঁকাবাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুন গোধূলির
মেঘগুলো লেগে আছে; সবুজ ঘাসের 'পরে ছবির মতন যেন স্থির;
দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ;
সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করবার মতন অশোক
অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।...
আঁধার নেপথ্য সব চারিদিকে– কূল থেকে অকূলের দিক-নিরূপণে
শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর– তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে;
মানুষ যা চেয়েছিলো সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।

## আজকে রাতে

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেতো; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র ঘাস হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর;

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লন্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
নিবিড় নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছো কোন্ পাশার দান হাতে :
কি কাজ খুঁজে; সকল অনুশীলন ভালো নয়;
গভীরভাবে জেনেছি যে-সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে
তারি ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হ'য়ে রয়।

## হে হৃদয়

হে হৃদয়,
নিস্তব্ধতা ?
চারিদিকে মৃত সব অরণ্যেরা বুঝি ?
মাথায় উপরে চাঁদ
চলছে কেবলি মেঘ কেটে পথ খুঁজে–

পেঁচার পাখায়
জোনাকির গায়ে
ঘাসের উপরে কি যে শিশিরের মতো ধূসরতা
দীপ্ত হয় না কিছু ?
ধ্বনিও হয় না আর ?

হলুদ দুঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিখের মতো যেন কথা
ব'লে চলে তবুও জীবন :
বয়স তোমার কতো ? চল্লিশ বছর হ'লো ?
প্রণয়ের পালা ঢের এলো গেলো–
হ'লো না মিলন ?

পর্বতের পথে-পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে

খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে ?
পতঞ্জলি এসে ব'লে দেবে
প্রভেদ কি যারা শুধু ব'সে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে প'ড়ে যায় ?

মৃত সব অরণ্যেরা;
আমার এ জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে :
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নিচে
কেন চ'লে যেতে চাও মিছে;
কোথাও পাবে না কিছু;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হ'য়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।

আমি তবু বলি :
এখনো যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দ্যাখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কি ক'রে যে মহানীলাকাশ,
ভাবা যাক– ভাবা যাক–
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

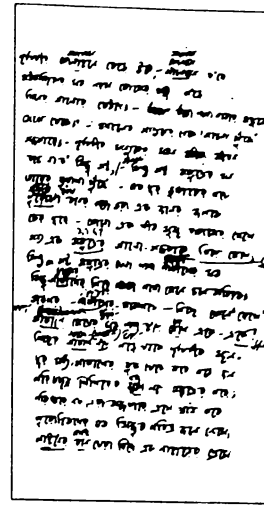

# অগ্রন্থিত কবিতা


বর্ষ আবাহন ৪০১ বেদুইন ৪০১ আঁধারের যাত্রী ৪০২ মোর আঁখিজল ৪০৩
হাজার বর্ষ আগে ৪০৪ ভারতবর্ষ ৪০৫ বিজয়ী ৪০৫ রামদাস ৪০৬
নিবেদন ৪০৬ কোহিনূর ৪০৭ অলকা ৪০৮ ঝরা ফসলের গান ৪০৯
পলাতক ৪১০ যুবা অশ্বারোহী ৪১১ পলাতকা ৪১২ কবি ৪১২ পরবাসী ৪১৪
আদিম ৪১৫ আজ ৪১৫ ফসলের দিন ৪১৬ আমরা ৪১৭ আজ ৪২০ নক্ষত্র
কেমন ক'রে জেগে থাকো তুমি ওই আকাশের শীতে (১-৪০) ৪২৯
মৃত মাংস ৪৫০ নদী ৪৫০ ১৯৩৬ ৪৫১ সমুদ্রচিল ৪৫১ হঠাৎ-মৃত ৪৫৪
বিস্ময় ৪৫৪ জীবন-সংগীত ৪৫৫ পিতৃলোক ৪৫৫ অগ্নি ৪৫৬ একদিন ভাবিনি কি
৪৫৭ উদয়াস্ত ৪৫৭ সুমেরীয় ৪৫৮ মৃত্যু ৪৫৮ আমিষাশী তরবার ৪৫৯
দানবীয় ৪৫৯ কালাতিপাত ৪৬০ হেমন্ত ৪৬১ নিঃসরণ ৪৬২ উদয়াস্ত ৪৬২
অনুভব ৪৬৩ মৃত মানুষ ৪৬৩ সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন ৪৬৪ শান্তি ৪৬৪
হে হৃদয় ৪৬৪ আমি হাত প্রসারিত ক'রে দেই ৪৬৫ ১৩৩৬-৩৮ স্মরণে ৪৬৫
এইঘর অবিকল ৪৬৭ গতিবিধি ৪৬৯ নির্দেশ ৪৭০ প্যারাডিম ৪৭০ রাত্রি ৪৭২
রবীন্দ্রনাথ ৪৭৪ গরিমা ৪৭৫ আবছায়া ৪৭৬ কুহুলিন ৪৭৭ ঘাস ৪৭৭

সমিতিতে ৪৭৮ রবীন্দ্রনাথ ৪৭৮ কোরাস ৪৭৯ রবীন্দ্রনাথ ৪৮০ বাতাসের শব্দ এসে ৪৮০ অনুভব ৪৮১ আলোসাগরের গান ৪৮২ দোয়েল ৪৮২ পৃথিবীলোক ৪৮৩ নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান ৪৮৩ মানুষ চারিয়ে ৪৮৭ এই শতাব্দী সন্ধিতে মৃত্যু ৪৮৯ শতাব্দী শেষ ৪৮৯ কার্তিকের ভোর ১৩৫০ ৪৯০ শীতের রাতের কবিতা ৪৯০ শ্রুতি-স্মৃতি ৪৯১ সমুদ্রপায়রা ৪৯১ অনিবার ৪৯২ সোনালি অগ্নির মতো ৪৯২ সৌরচেতনা ৪৯৩ অন্তর বাহির ৪৯৪ অনির্বাণ ৪৯৫ 'ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ ইন্‌ ট্রপিক্‌স্‌' প'ড়ে ৪৯৬ হেমন্ত-কুয়াশায় ৪৯৬ চেতনা-লিখন ৪৯৭ জার্মানীর রাত্রিপথে : ১৯৪৫ ৪৯৮ আজ বিকেলের ধূসর আলোয় ৫০০ রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে ৫০০ সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম ৫০১ পৃথিবীতে যতো ইতিহাসে যতো ক্ষয় ৫০১ অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে ৫০২ আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো ৫০২ আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে ৫০৩ ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো ৫০৩ দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে ৫০৪ কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি ৫০৫ তোমার সাথে আমার ভালোবাসা ৫০৫ ভোরের বেলায় তুমি আমি– ৫০৬ ধ্বনিপাখির আলোনদীর স্মরণে ৫০৬ মকরসংক্রান্তি প্রাণে ৫০৭ মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা ৫০৮ এই কি সিন্ধুর হাওয়া ৫০৯ নবপ্রস্থান ৫০৯ দাও-দাও সূর্যকে জাগিয়ে দাও ৫১১ পটভূমিবিসার ৫১২ মৃত্যু, সূর্য, সংকল্প ৫১২ রাত্রি ও ভোর ৫১৩ এই পথ দিয়ে ৫১৪ কার্তিক-অঘ্রান ১৯৪৬ ৫১৪ ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২ ৫১৪ পৃথিবী ও সময় ৫১৫ অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে ৫১৬ মহাত্মাজি ৫১৮ মহাত্মা ৫১৮ পৃথিবীগ্রহবাসী ৫১৯ চেতনা-সবিতা ৫১৯ এই চেতনা ৫২০ বিপাশা ৫২১ আলোকপত্র ৫২২ স্বাতীতারা ৫২২ আলোকপাত ৫২৩ দিনরাত্রি ৫২৩ সূর্যকরোজ্জ্বলা ৫২৪ আশা- ভরসা ৫২৬ ক্রান্তিবলয় ৫২৬ আজ ৫২৭ পৃথিবী আজ ৫২৮ রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী ৫২৯ আশা, অনুমিতি ৫৩০ মহাগ্রহণ ৫৩০ অন্ধকারে ৫৩১ অমৃতযোগ ৫৩২ তিমির সূর্যে ৫৩২ মহাপতনের ভোরে ৫৩৩ পৃথিবী, জীবন, সময় ৫৩৪ নিজেকে নিয়মে ক্ষয় ৫৩৫ জীবনবেদ ৫৩৫ শত শতাব্দীর ৫৩৬ সমস্ত দিন অন্ধকারে ৫৩৭ চারিদিকে নীল হ'য়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে ৫৩৭ মনবিহঙ্গম ৫৩৭ নিবিড়তর ৫৩৮ নদী ৫৩৯ রশ্মি এসে পড়ে ৫৪০ যাত্রা ৫৪০ সূর্য নিভে গেলে ৫৪১ যাত্রী ৫৪২ হৃদয় তুমি ৫৪৩ এই পৃথিবীর ৫৪৩ এখন এ-পৃথিবীর ৫৪৪ মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল ৫৪৫ কে এসে যেন ৫৪৬ নদী নক্ষত্র মানুষ ৫৪৬ জীবনে অনেক দূর ৫৪৭ নব হরিতের গান ৫৪৭ দেশ কাল সন্ততি ৫৪৮ দুটি তুরঙ্গম ৫৪৮ নব-নব সূর্যে ৫৫০ একটি নক্ষত্র আসে ৫৫১ শতাব্দীর মানবকে ৫৫১ পটভূমি ৫৫২ জর্নাল : ১৩৪৬ ৫৫৩ মৃত্যুসাগর সরিয়ে সূর্যে বেঁচে আছি ৫৫৪ রবীন্দ্রনাথ ৫৫৫ কখনো নক্ষত্রহীন ৫৫৫ মরুতৃণোজ্জ্বলা ৫৫৬ জন্মতারকা ৫৫৬ সে ৫৫৭ মহাইতিহাস ৫৫৭ লক্ষ্য ৫৫৮ রাত্রিদিন ৫৫৮ তোমাকে ৫৫৯ কোনো এক নারীকে : যে আমাকে আ-ইতিহাস দ্যাখাতে চায় ৫৬০ মানুষ যেদিন ৫৬০ জর্নাল : ১৩৪২ ৫৬০ কার্তিক ভোরে : ১৩৪০ ৫৬১ তোমাকে ভালোবেসে ৫৬১ মহাজিজ্ঞাসা ৫৬২ অনেক রাত্রিদিন ৫৬৪ প্রেমিক ৫৬৪ অবিনশ্বর ৫৬৫ আলোপৃথিবী ৫৬৬ আজ ৫৬৭ বৃক্ষ ৫৬৭ কুজ্‌ঝটিকায় আকাশ

মলিন হ'য়ে ৫৬৮ অন্য প্রেমিককে ৫৭০ অন্য এক প্রেমিককে ৫৭০ এক অন্ধকার থেকে এসে ৫৭১ তোমায় আমি দেখেছিলাম ৫৭১ ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে ৫৭২ অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ ৫৭২ দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ ৫৭২ রক্তনদীর তীরে ৫৭৩ কেন মিছে নক্ষত্রেরা ৫৭৩ উপলব্ধি ৫৭৪ সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে ৫৭৫ ওইখানে সারাদিন ৫৭৫ এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো– ৫৭৬ জানি না কোথায় তুমি ৫৭৬ মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে ৫৭৭ পরস্পর ৫৭৭ কারা করে ৫৭৮ শান্তি ভালো ৫৭৮ কবি ৫৭৯ চারিদিকে পৃথিবীর ৫৮১ ভোরের কবি জ্যোতির কবি ৫৮১ সুন্দরবনের গল্প ৫৮২ আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ ৫৮৩ হে জননী হে জীবন ৫৮৫ প'ড়ে গেলো একেবারে আমারি ছায়ার কাছে ৫৮৫ বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে ৫৮৬ জীবন ভালোবেসে ৫৮৬ সবার উপর ৫৮৭ জীবন মানে ভালো ৫৮৭ জোনাকি ৫৮৮ প্রতীক ৫৮৮ সে ৫৮৯ আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই ৫৮৯ ঘুমায়ে রয়েছো তুমি ক্লান্ত হ'য়ে ৫৯১ আমি এই অম্লানেরে ভালোবাসি ৫৯২ আজ রাতে শেষ হ'য়ে গেলো শীত ৫৯৩ বার-বার সেইসব কোলাহল ৫৯৩ রাত আরো বাড়িতেছে ৫৯৪ আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে ৫৯৪ সে কতো পুরোনো কথা ৫৯৫ এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে ৫৯৫ বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা ৫৯৬ কি যেন কখন আমি অন্ধকারে ৫৯৬ আমার এ ছোটো মেয়ে ৫৯৮ নদী ৫৯৯ তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাবো ৬০০ বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে ৬০০ তখন অনেক দিন হ'য়ে গেছে ৬০১ কেন ব্যথা পাবে তুমি ? ৬০১ কমলাবতীর ভালোবাসা ৬০২ যখন খেতের ধান ঝ'রে গেছে ৬০২ তোমায় আমি ৬০৩ চিঠি এলো ৬০৩ আমি ৬০৪ কনভেন্‌শন্ ৬০৫ তুমি আলো ৬০৮ ইতিবৃত্ত ৬০৮ কোনো ব্যথিতাকে ৬০৯ শবের পাশে ৬১০ রজনীগন্ধা ৬১১ তোমার আমার ৬১১ সুদর্শনা ৬১২ সবারি হাতের কাজ ৬১২ তোমায় আমি ৬১৩ পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে-মাঠে ৬১৪ কোনো-এক জ্যোৎস্না রাতে বার-বার শিকারির গুলির আওয়াজ শুনে ৬১৫ নির্জন হাঁসের ছবি ৬১৫ বড়ো-বড়ো গাছ কেটে ফেলেছে ৬১৫ মনকে আমি নিজে ৬১৬ তুমি যদি ৬১৭ সূর্য এলে মনে আসে ৬১৭ জল ৬১৮ মাঝে-মাঝে ৬১৮ এখন ওরা ৬১৯ ডালপালা নড়ে বার-বার ৬১৯ যাত্রা ৬২০ বিকেলের আলোয় ৬২২ এখন রাতের শেষে ৬২৩ অনেক রক্তে ৬২৩ এসো ৬২৪ যেখানে মনীষী তার ৬২৪ অনেক বছর ধূসরতার ভিতর দিয়ে ৬২৫ কবিতার খসড়া ৬২৫ ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ৬২৬ হেমন্তের নদীর পারে ৬২৬ মৃত, বর্তমানে উপেক্ষিত কবিদের উপরে অনেক সমালোচনা প'ড়ে ৬২৭ শিল্পী ৬২৭ আমাদের বুদ্ধি আজ ৬২৭ টেবিলে অনেক বই ৬২৯ কখনো মুহূর্ত ৬৩০ সুদীর্ঘকাল তারার আলো ৬৩১ কবের সে-রাত্রি আজ ৬৩১ এইখানে সূর্যের ৬৩৩ এখানে নক্ষত্রে ভ'রে ৬৩৭ উনিশশো চৌত্রিশের ৬৩৭ এইসব পাখি ৬৩৯ জর্নাল : '৩৬ ৬৪০ জর্নাল : ১৯৩৪ ৬৪১ উপলব্ধি ৬৪২ হঠাৎ তোমার সাথে ৬৪২ রবীন্দ্রনাথ ৬৪৩ ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ৬৪৫ একবার ভালো নীল ভাঙা ভুল পৃথিবীর ৬৪৬ যখন দিনের আলো নিভে আসে ৬৪৭ নক্ষত্রমঙ্গল(১৯৪২-৪৭) ৬৪৭ রাত্রি অনিমেষ ৬৪৮ হে হৃদয়, নীড়

থেকে ঢের দূরে ৬৪৯ শহর-বাজার ছাড়িয়ে ৬৪৯ এখন এ-পৃথিবীতে ৬৫১
কোথায় গিয়েছে ৬৫২ পথের কিনারে ৬৫২ বাইরে হিমের হাওয়া ৬৫২ মানুষের
কবেকার অপলক সরলতা ৬৫৩ নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে ৬৫৩
তবুও মনকে ঘিরে ৬৫৪ শরীরিণীকে ৬৫৪ জল ৬৫৫ যেন তা কল্যাণ সত্য
চায় ৬৫৬ যদিও আজ তোমার চোখে ৬৫৬ আকাশে রাত ৬৫৮ অম্লান রাত ৬৬০
এখানে দিনের– জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই ৬৬১ কে কবিতা লেখে ৬৬২
বর্ষবিদায় ৬৬৩ মনমর্মর ৬৬৩ অনেক মুহূর্ত আমি ৬৬৪ তুমি এই রাতের
বাতাস ৬৬৪ নদী ৬৬৪ কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভ'রে ৬৬৫ এতো দিন
ডাকি নাই ৬৬৬ আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে ৬৬৬ সময়ের কাছ
থেকে ৬৬৬ স্ট্যাঞ্জা তিনেক ৬৬৭ এ ও সে ৬৬৭ শিকার ৬৭১ তোমার সবিতা
ভালোবেসে ৬৮৪ এ কি আলো ! এ কি আঁধার ৬৮৪ শোনো– শোনো– নীলকণ্ঠ
পাখিরা ৬৮৫ আলো দূরে– আরো দূরে ৬৮৫ তোমারে ডেকেছি আমি ৬৮৬
সে-জাহাজ দেখেছে কি কেউ ? ৬৮৬ এখানে মরণশীল হংস নেই আর... ৭০২
স্থির হ'য়ে আছে মন, মনে হয়, তবু– ৭০২ কৃষ্ণাদশমীর রাতে : তোমাকে ৭০২
যারা এই জীবনের স্বাদ ৭০৩ যদিও প্রেমের মৃত্যু হ'য়ে গেছে ৭০৩ ঘুমাও;
কারণ, ঘুমের মাঝে ৭০৪ আমার হাতের কাজ অন্ধকারে ৭০৫ মনে
হ'লো–হয়তো যেতেছি আমি ম'রে,– ৭০৫ শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার
জলের কোলাহলে ৭০৬ এইবার ছুটি পেয়ে ৭০৬ অন্ধকারে খ্যাঁকশিয়ালিরা এসে
খেয়েছে হৃদয় ৭০৭ যখন অনেক স্বপ্ন দ্যাখা শেষ হয়েছে আমার ৭০৭ সেই ফুল
মেখে দেবো আমি তার চুলে ৭০৮ আমরা হতেছি বুড়ো– শাদা হ'তে নষ্ট
হ'তে হয় ৭০৮ পড়িবে না তোমার এ-লেখা এসে মানুষেরা
কোনোদিন ৭০৮ নিজেরে অনেক ভেবে ৭০৯ তুমি চ'লে আসো কাছে, চলে
আসো নিভৃত-নিভৃত ৭০৯ আমি সব ছেড়ে দিয়ে পুরানো গাছের মতো হ'য়ে ৭১০
শীতরাত আসিতেছে নেমে ৭১০ তোমার চোখের নিচে আমি এক মাছের
মতন ৭১০ লেডা ৭১১ মিডিয়া ৭১১ কিছুদিন আগে ইয়াসিন আলি ম'রে
গেছে ৭১২ প্রেমিক ১৩৪৫-৪৬ ৭১২ একদিন মনে হয়েছিলো ৭১৩ ভোরের
মানুষ এক ৭১৪ গফুর ৭১৪ পেলবশীর্ষ ৭১৫ আমি ওই সমুদ্রের
যুবনারীদের ৭১৫ আঁধার থেকে উঠে এসে ৭১৫ কে শরীর কে-বা ছায়া ৭১৬
নিজের পাখার হিমে ৭১৬ তেরোশো তিরিশে ৭১৯ রাত্রির বাতাসে ৭২১
নক্ষত্রের পথে ৭২২

## কবিকৃত ইংরেজি কবিতা

POEMS ৭২৫ CHORUS ৭২৬ I HAVE FELT THE BREATH ৭২৯

## নিজের কবিতার স্বকৃত অনুবাদ

BANALATA SEN ৭৩০ MEDITATIONS ৭৩০ DARKNESS ৭৩১
CAT ৭৩২ SAILOR ৭৩৩

## বর্ষ-আবাহন

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে
দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠলো জেগে
দিব্য পরশ পেয়ে,
নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া
ভুবন ভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ-হৃদয় চেয়ে।
অতীত নিশি গেছে চ'লে
চিরবিদায় বার্তা ব'লে,
কোন্ আঁধারের গভীর তলে
রেখে স্মৃতিলেখা,
এসো-এসো ওগো নবীন,
চ'লে গেছে জীর্ণ মলিন–
আজকে তুমি মৃত্যুবিহীন
মুক্ত সীমারেখা।

## বেদুইন

ধবল কঙ্কাল যেথা দিকে-দিকে রয়েছে ছড়ায়ে
অন্তহীন বালুকা জড়ায়ে
দিবানিশি জ্বলিতেছে লক্ষ চুল্লিশিখা
পথে-পথে দৈন্য যেথা, গ্লানি বিভীষিকা,
নিঃসহায় প্রাণ,
মরুভূ-ঝটিকা গর্জে দিকে-দিকে ক্ষিপ্ত, বহ্নিমান !
কোটি-কোটি বিষতীব্র ভুজঙ্গম ফণার ঘূর্ণনে
মরীচিকা জাগে ক্ষণে-ক্ষণে–
মোহের মাধুরী মাখা মৃত্যুর পাথার !
– শ্যামা বসুন্ধরা ত্যজি সেই পথে তুমি কেন যাও বার-বার
ওগো বেদুইন !
– মোদের নগর পল্লী– আমদের সুসজ্জিত, শান্ত রাত্রি দিন
ঝলমল প্রাসাদ বিপণি,
লীলাকক্ষ, নৃত্যগীত, প্রমোদের ধ্বনি
বিভ্রম, বিলাস,
মনোহরা এ-ধরণী– পুষ্পকুঞ্জ, জ্যোৎস্নানিশি, সুরভিত এই মধুমাস
এ-বিচিত্র গৃহাঙ্গন, এই অন্তঃপুর,

শান্ত সুমধুর,
প্রেয়সীর হাসি-অশ্রু-মাখা;
– যৌবনের এ জয়পতাকা,
মোদের এ বর্ষ, ঋতু, উষা, বিভাবরী
তোমারে করে না মুগ্ধ– কোন্ দূর দিগন্তের দীর্ঘ পথ ধরি,
ধু-ধু-ধু-ধু বালুকার বিজন সংকটে,
চক্রবালতটে
উঠিতেছো আস্ফালিয়া তুমি !
– তোমার চরণতলে নাচিতেছে যোজনান্ত তপ্ত মরুভূমি
উন্মাদ, উত্তাল।
বালুকার পারাবার, আকাশের আরক্ত মশাল
বক্ষে তব আসিতেছে ছুটে !
শ্যেনতীক্ষ্ণ তীব্র রক্ত তোমার ও আঁখির সম্পুটে
পলে-পলে ঘুরে যায় ধূম্রাকাশ গিরি, বালিয়াড়ি।
তন্দ্রাহারা যাত্রী ওগো– শ্রান্তিহীন মরুপথচারী,
হারায়েছো দিশা
অনন্ত নৃত্যের লোভে, অফুরন্ত উল্লাসের তৃষা
চিত্তে তব নিরন্তর উঠিতেছে দহি,
হে দূর-বিরহী !
– মৌন গৃহতলে বসি নিরালা– একাকী,
শতাব্দীর সভ্যতার পিঞ্জরের পাখি
আছি মোরা আর্ত ম্লান আঁখি দুটি তুলে !
– সীমাহারা নীলিমার কূলে
যেতে চাই ছুটে,
অসংখ্য শৃঙ্খলাঘাতে বিদ্রোহীর বক্ষে শুধু রক্ত ওঠে ফুটে !
অন্তে না এ-প্রাচীরের কারা,
জেগে আছে চিরন্তন ব্যর্থ বিধিবিধানের এই মিথ্যা বিরাট পাহারা !
মনে মোর ঘুরে মরে লক্ষ্যহারা, বাধাবন্ধনহীন
মরুভূর কোন্ বেদুইন।

## আঁধারের যাত্রী

চারিদিকে ধু-ধু রাতি– সৃজনের অন্ধকাররাশি,
জোনাকির মতো প্রাণ তার মাঝে চলিছে উদাসী !
পত্রগুচ্ছে যে-টুকু নিশীথ,
যে-খণ্ড আঁধারটুকু, যে-তুষার শীত,
তারি বুকে ঢালি তাপ, জ্বালি আমি শিখা,
অনন্ত শর্বরী দূরে ছড়ায়েছে ব্যথা-বিভীষিকা !

কোন্ দূর অলক্ষ্যের পানে
স্পন্দহীন প্রেতপুরে– শোকের শ্মশানে,
মূক তরুচ্ছায়াতলে, নিঃশব্দ গহ্বরে
কলহীন তটিনীর তরঙ্গের 'পরে
ছুটিয়া যেতেছে মোর সচকিত প্রাণ,
মৌন অভিযান !
আমার এ কম্প্রবক্ষে তৃপ্তিহীন বিচ্ছুরণ জ্বলে;
দূরে-দূরে দিগন্তের তলে
ছুটে যাই দিশাহারা, আকুল, চঞ্চল,
কেঁদে ওঠে বিটপীর ভগ্নশাখা, বনানীর পল্লব-অঞ্চল !
বালুকাসৈকতে বাজে তটিনীর গান
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ !
সৃজন-পুলিনে বসি মায়াবীর বেশে
অন্তহীন ইন্দ্রজাল রচিতেছে কে সে !
কোথা তব গুপ্ত কক্ষ– রহস্যের দ্বার
ওগো অন্ধকার !
হে অচল রুদ্ধ আয়তন,
বিজন গোপন !
তমিস্রার ঊর্মিরাশি– দুশ্চর, দুস্তর,
চিররাত্রি– তার মাঝে আমি নিশাচর !
নিষ্প্রভ এ-চোখে মোর পশে নাকো নক্ষত্রের শিখা,
দীপহীন অমাতটে নাচে একা প্রাণ খদ্যোতিকা !
প্রান্তরের পারে জ্বলে অনেক আলেয়া,
তার মাঝে মোর এই নিশীথের খেয়া
চলে একা ভেসে,
স্বপ্নাবিষ্ট মৌন অভিসারিকার বেশে !

## মোর আঁখিজল

মোর আঁখিজল
কাহাদের লাগি আজি উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে আকুল, চঞ্চল !
জীবনে পায়নি যারা স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা,
যাহাদের মঙ্গলেতে উষাহীন অমা
জাগিতেছে দুশ্চর দুস্তর,
যাহাদের মৌন চোখ– অশ্রু সকাতর
চাহিয়াছে বার-বার আকাশের পানে
তুচ্ছতম আলোর সন্ধানে
– আঁধারের আবর্তের তলে

প্রেতসম যাহাদের প্রাণ ভেসে চলে
শ্মশানের শেষে !
কোন ক্রূর পিশাচের অবিজ্ঞেয় অঙ্গুলিনির্দেশে
যাহারা ঝরিয়া পড়ে পতঙ্গের প্রায়–
লক্ষ-কোটি অন্যায়ের অনলশিখায় !
যাহাদের দ্বারে
প্রেয়সী আসে না কভু স্মিতহাস্যে মাল্যের সম্ভারে;
প্রেমের সন্ধানে
যাহারা ছুটিয়া গেছে প্রেতপুরে, নরকের পানে
– মেটে নাই তৃষা,
অসম্বৃত কামনার কারাগারে বার-বার হারায়েছে দিশা
পৃথিবীর নিঃসহায় শৃঙ্খলিত প্রাণ,
লক্ষ-লক্ষ আর্ত ম্লান পিষ্ট ভগবান,
আজ মোর বুকে কেঁদে ওঠে।
– নিখিলের ব্যথা আজ অশ্রু হ'য়ে মোর চোখে ফোটে !

## হাজার বর্ষ আগে

সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হ'লো না :
কেবল সে দূরের থেকে আমার দিকে একবার তাকালো
আমি বুঝলাম
চকিত হ'য়ে মাথা নোয়ালো সে
কিন্তু তবুও তার তাকাবার প্রয়োজন– সপ্রতিভ হ'য়ে
সাত-দিন আট-দিন ন-দিন দশ-দিন
সপ্রতিভ হ'য়ে– সপ্রতিভ হ'য়ে
সমস্ত চোখ দিয়ে আমাকে নির্দিষ্ট করে
অপেক্ষা করে– অপেক্ষা করে
সেই মেয়েটি এর চেয়ে নিকটতর হ'লো না
কারণ, আমাদের জীবন পাখিদের মতো নয়
যদি হ'তো
সেই মাঘের নীল আকাশে
(আমি তাকে নিয়ে) একবার ধবলাটের সমুদ্রের দিকে চলতাম
পাঙশালিখের মতো আমরা দু-টিতে
আমি কোনো এক পাখির জীবনের জন্যে অপেক্ষা করছি
তুমি কোনো এক পাখির জীবনের জন্যে অপেক্ষা করছো
হয়তো হাজার-হাজার বছর পরে
মাঘের নীল আকাশে
সমুদ্রের দিকে যখন উড়ে যাবো

আমাদের মনে হবে
হাজার-হাজার বছর আগে আমরা এমন উড়ে যেতে চেয়েছিলাম।

## ভারতবর্ষ

জাগিয়াছে শুভ্র উষা– পুণ্য বেদবতী
প্রাচীমঞ্চে, ভারতের উদয়গগনে।
কোন্ এক আদি মহাতপস্যার ক্ষণে
বাজিয়াছে আমাদের মঙ্গল আরতি !
মধুমান্ সূর্য-সোম ঢালিয়াছে জ্যোতি
আমাদের নদী-গিরি-নির্ঝর-কাননে,
অর্পিয়াছে শান্তি-স্বস্তি নিখিলের মনে
আমাদের কাব্যকলা,– মোদের ভারতী !
মৃত্যুর সাগর মন্থি অমৃতের তরে
যুগে-যুগে ছুটে গেছে মোদের সন্তান !
অসুর আবাসে ভস্ম শ্মশানের 'পরে
গেয়েছে তিমিরাতীত আদিত্যের গান
বিতরি প্রেমের চরু সর্ব চরাচরে
মাগিয়াছে পরাবিদ্যা,– চরম কল্যাণ।

## বিজয়ী

নহি আমি উঞ্ছবৃত্তি, উদাসী ভিক্ষুক;
দ্বারে-দ্বারে যাচ্ঞা মাগি বেড়ায় না মন।
মোর তাই নাই শঙ্কা, নাই নিষ্পেষণ;
নম্র নহে শির মোর,– নত নহে বুক।
বিজয়ী সৈনিক আমি, আমার কার্মুক
করিতেছে অহরহ অসত্য খণ্ডন;
টঙ্কারে-টঙ্কারে ভরি ধরার অঙ্গন
ছুটিতেছে চিত্ত মোর উৎসাহী, উৎসুক।

কোথায় চকিত ভীত যাত্রিকের দল ?
নির্জিতা বসুধা কোথা ? নিপীড়িত জীব !
কোথা হিংসা, অত্যাচার, অসুরের বল !
কোথা সিংহাসন জুড়ে জেগে আছে ক্লীব !
আছি আমি সর্বসাচী,– দৃপ্ত, অচঞ্চল,
হস্তে মোর অনিদ্রিত উদ্যত গাণ্ডীব।

## রামদাস

যুগসন্ধিতে ভারত যখন সহসা তিমিরময়—
বীর সন্ন্যাসী গাহিয়া উঠিলে নব আলোকের জয়।
অনাগত এক আশার স্বপ্নে নিমিষে উঠিলে জাগি,
মাতিয়া উঠিলে দশের লাগিয়া, দেশ-দেবতার লাগি।
ওহে সাগ্নিক, প্রাণের অনলে জ্বালালে বিশাল শিখা,
যতো মোহ মায়া ভ্রান্তি বেদনা নিরাশার কুহেলিকা
স্পর্শে তোমার, হে মহাজাতক, নিমেষে হইলো ছাই।
সমাজের বুকে পাতিলে আসন, সংসারে নিলে ঠাঁই;
স্তিমিত ভীতের আড়ষ্ট গৃহ কারা-আয়তন ভেঙে
জাতির মুক্তি, দেশের সেবায় আত্ম-আহুতি মেগে
উর্ধ্বগ-হোম জ্বালালে একাকী নিখিল মারাঠাময়।
জয়ার হৃদয়ে করেছিলে তুমি যৌবন সঞ্চয়
মন্ত্রে তোমার,– সংসারে তুমি আসোনি উদাসী বেশে;
পাপপ্রপঞ্চ পঙ্কিল পথে নিয়তি বিধির ক্লেশে
সাজোনিকো তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসীন;
নিরাশাতিমিরে বসিয়া একাকী অরুণোদয়ের দিন
চেয়েছিলে তুমি, জেগেছিলে তুমি মোহকারাগার ভেঙে
কর্মের জয়ে, ত্যাগের পর্বে, সেবার মহিমা মেগে।
ছত্রপতির হে বিজয়ী গুরু, মারাঠার গৌরব।
চন্দনসম বুকের রক্তে বিতরিলে সৌরভ।
দেশের লাগিয়া ধূপের মতন অনলশিখায় দহি
বেদনা মথিয়া দিকে-দিকে গেলে শান্তির বাণী বহি।
গরল ভখিয়া মৃত্যু মথিয়া জীবনের অবদান
তুমি সঁপে গেলে, হে বীর কর্মী, হে প্রেমিক মহীয়ান।

## নিবেদন

কবিযশ চাহি না মা, তোমার দুয়ারে
আসিয়াছি মুগ্ধ প্রাণে পূজিতে তোমারে।
বিগত শৈশবে কবে অরুণের সনে
ছন্দোময়ী উদেছিলে মোর বাতায়নে।
এসেছিলে চিত্তে মোর পুলক সঞ্চারী
নিখিল কবির কাব্যে ঝঙ্কারি-ঝঙ্কারি
মানসে জ্বালালে মম অপরূপ জ্যোতি।
নিবাকর জিনি– তব গরিমা ভারতী
আমারে নিয়েছে ডেকে, কৃতাঞ্জলিপাণি

তুচ্ছ অর্ঘ্য ল'য়ে আমি ওগো বঙ্গবাণী,
এসেছি তোমার রাঙা চরণসমীপে।
কোটি বরপুত্র যেথা গেছে বর্ণে দীপে
তোমার আঙিনাখানি রেখেছে উজ্জ্বল,
আমি সেথা আনিয়াছি এক ফোঁটা জল,
নিঃস্ব ব্যর্থ হৃদয়ের ব্যথা-উপহার
নেবে কি মা ? মোর তরে খুলিবে কি দ্বার !

## কোহিনূর

তোমারে ঘেরিয়া জাগে কতো স্বপ্ন– স্মৃতির শ্মশান,
ভূলুণ্ঠিত লুব্ধ অভিযান;
সাম্রাজ্যের অশ্রু, রক্ত, সমাধি, পতন
হে হীরক, একে-একে করেছো চুম্বন !
স্পর্শে তব অনাদি অতীত যেন নিরন্তর মর্মে ওঠে ধ্বনি !
মাধবের বক্ষে তুমি ছিলে কি গো স্যমন্তক মণি !
শ্রীহরির বনমালা চুমি
দিব্য গন্ধে অকলঙ্ক অঙ্ক তব ভরেছিলে তুমি
ওগো কোহিনূর !
হৃদে তব আজো বুঝি গাঁথা আছে গোপনীয় বাঁশরির সুর,
যুগান্তের গাঢ় নীল পুলিনের ভাষা,
বাসনা পিপাসা !
অরুণ ময়ূখ স্পর্শে নিশান্তের স্বপ্ন যাও ভুলি !
নব নবীনের লাগি যুগে-যুগে উঠিছো মুকুলি
অভিনব রূপে !
নির্মম কালের অগ্নি-অঙ্গারের স্তূপে
দেহ তব যায় না দহিয়া
হে অটুট বজ্রমণি, কোটি-কোটি প্রেমিকের বরণীয়া প্রিয়া ;
গিয়েছিলে কবে তুমি পাঠানের অন্তঃপুরে পশি
সুলতান-প্রেয়সী !
হারেমের অন্ধকারে লক্ষ বাঁদী বেগমের মাঝে
স্থিরপ্রভা দামিনীর সাজে !
মৌন শিখা স্পর্শে তব করেছিলে ইন্দুনিভা কতো শত রূপসীর বদন পাণ্ডুর
ওগো কোহিনূর !
কতো রতিনিন্দিতার বক্ষে তুমি বাজাইলে বেদনার কেকা
ম্লান করি দিলে কতো আননের সুশ্রী শশীলেখা,
বিচ্ছুরিলে জ্যোতিঃপাত মদগর্ব মোগলের প্রমোদসভাতে
বিভ্রমের লীলাকক্ষে– বিলাসের খুশরোজ রাতে

শাহী বেগমের আঁখি হয়েছিলো অশ্রু ছলছল
তোমার সম্পদস্বপ্নে - অলখিতে ছায়াচ্ছন্ন হয়েছিলো
উল্লাসের সে মোতিমহল।
নিশীথলাঞ্ছন বিভা জ্বলিয়া উঠিলো কবে কাম্য মণি-ময়ূরের চোখে–
কতো দীর্ঘ শতাব্দীর অশ্রু দৈন্য শোকে
ক'রে গেলো জয়শ্রীসম্পাত
উদয়-অরুণসম, তারপর কবে অকস্মাৎ
অস্তগত সাম্রাজ্যের কবর ভাঙিয়া
অভিসারে চ'লে গেলো, প্রিয়া-উদাসিয়া
দূর সিন্ধুপারে
ঐশ্বর্য-তোরণ-তটে তুঙ্গ সিংহদ্বারে !
নব অভিনন্দনের উন্মেষের দেশে,
আমাদের সৌভাগ্যের শোকরক্ত স্তব্ধ বেলাশেষে !

বাসে না সে অশ্রুহিম কুহেলিরে ভালো
মৃত্যুর পিঙ্গল ছায়া প্রেতপুরে কালো
আলেয়ার আলো
করে নাকো বিমুগ্ধ তাহারে !
পিরামিডসম সুপ্ত সমাধির দ্বারে
দাঁড়ায় না নিষ্পলক প্রহরীর বেশে !
– চেয়ে থাকে,
কবে কোন প্রেমাস্পদ এসে
অঙ্কে তার এঁকে দেয় যৌবনের অরুণ-চুম্বন
নিমেষের আঁখিপাতে কেড়ে লয় মন !

## অলকা

(মেঘদূত)

ওগো জলধর, তোমারি মতো সে কাম্য অলকাপুরী,
বিদ্যুৎসম ললিত ললনা শোভে তার বুক জুড়ি !
ইন্দ্রচাপের মতো বিরাজিছে চিত্রসৌধরাশি,
মেঘবারিসম স্বচ্ছ মানিক ওঠে সেথা পরকাশি !
প্রাসাদকক্ষে সংগীতধ্বনি মেঘমৃদঙ্গসম,
আকাশচুম্বী অভ্রেরি মতো সে পুরী তুঙ্গতম !

সেথা, নারীর হস্তে লীলাউৎপল, চিকুরে কুন্দফুল,
কর্ণে তাদের শোভে নিরুপম শিরীষ-কুসুম-দুল !
আনন তাহার করিছে শুভ্র লোধ্ররেণুকা মাখি

মাধবীবনের নব কুরুবকে চূড়াপাশ দেছে ঢাকি !
সিঁথিসীমন্ত সাজায়েছে বালা হেম কদম্ব দিয়া,
প্রিয়ের সঙ্গে বিহার করিছে সেথায় যক্ষপ্রিয়া !

তরুরাজি সদা পুষ্পফুল্ল– মহাবিহ্বল অলি !
মধুগুঞ্জনে নিত্য রহিছে মুখর বনস্থলী,
সেই অলকার সরোরুহে সদা কমল রয়েছে ফুটে,
মেখলার মতো চারুচঞ্চল মরাল যেতেছে ছুটে !
মনোরম সেথা ময়ূরকলাপ– পোষা ময়ূরের কেকা–
তিমিরবিহীন যামিনী জুড়িয়া জ্যোৎস্না দিতেছে দ্যাখা !

অশ্রু সেথায় ক্ষরে আনন্দে, নাহিকো বিষাদভার,
মদনশরের দাহন ব্যতীত পীড়ন নাহি রে আর !
প্রণয়কলহ ব্যতীত সেথায় বিরহ কভু না ঘটে,
সেই সে সুদূর কামনার পুর– কল্পলোকের তটে !
জরার প্রহারে অঙ্গ কখনো জর্জল নাহি হয়–
নরনারী সেথা প্রমোদমুখর– চিরযৌবনময় !

## ঝরা ফসলের গান

আঁধারে শিশির ঝরে
ঘুমোনো মাঠের পানে চেয়ে-চেয়ে চোখদুটো ঘুমে ভরে।
আজিকে বাতাসে ভাসিয়া আসিছে হলুদ পাতার ঘ্রাণ,
কাশের গুচ্ছ ঝ'রে পড়ে হায়, খ'সে প'ড়ে যায় ধান
বিদায় জানাই– গেয়ে যাই আমি ঝরা ফসলের গান–
নিভায়ে ফেলিয়ো দেয়ালি আমার খেয়ালের খেলাঘরে !

ওগো পাখি, ওগো নদী,
এতোকাল ধ'রে দেখেছো আমারে– মোরে চিনে থাকো যদি,
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই–
জেনো আমি এক দুখজাগানিয়া– বেদনা জাগাতে চাই।
পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি, মরণেরে ঘিরে এ মোর সপ্তপদী।

ঝরা ফসলের ভাষা
কে শুনিবে হায় !– হিমের হাওয়ার বিজন গাঁয়ের চাষা
হয়তো তাহার সুরটুকু বুকে গেঁথে, ফিরে যায় ঘরে,
হয়তো সাঁঝের সোনার বরণ গোপন মেঘের তরে

সুরটুকু তার রেখে যায় সব, বুকখানা তবু ভরে
ঘুমের নেশায়, চোখে চুমো খায় স্বপনের ভালোবাসা !

ওগো নদী, ওগো পাখি,
আমি চ'লে গেলে আমারে আবার ফিরিয়া ডাকিবে নাকি !
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই,
জেনো আমি এক দুখজাগানিয়া– বেদনা জাগাতে চাই !
পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি, গাহিতে-গাহিতে ঘুমে বুজে আসে আঁখি !

## পলাতক

কারা অশ্বরোহী কবে উষাকালে এসে
হারয়ে গিয়েছে দূর সাঁঝে– নিরুদ্দেশে
না জানি কিসের খোঁজে কতোকাল ধরি !
যৌবনের রক্ত মোর উঠিছে শিহরি
তাহাদেরি মতো আজ,– তাই পলাতক
আসিয়াছি চুপে-চুপে,– আলোর পলক
নিভে যায় যেইখানে পশ্চিমের মেঘে,
যেইখানে মায়াবীর ইশারার বেগে
এলামেলো ঢেউগুলো হ'য়ে গেছে রাঙা
নারিকেল ছায়া ছুঁয়ে আধো ভাঙা-ভাঙা
বাতাসের ব্যথা যায় বহি,–
দক্ষিণ সমুদ্রপারে আমি অশ্বারোহী
আসিয়াছি আর-এক,– এই পথ কবে
স্বপন-বাউল যুবা-নবীনের রবে
ভরেছিলো কতোবার !– তাহাদের পক্ষিরাজ আসি
দিনশেষে এই পথে দাঁড়াতো উদাসী !
সে কোন্ বন্দিনী যেন– শোনে আজো সিন্ধুর ধীবর
আচম্বিত কান্না তার দূর মধ্যসমুদ্রের 'পর,–
তাহাদের নিয়েছিলো ডাকি !
কোন্ একাকিনী যেন, তারি পানে নির্জন একাকী
ছুটে গিয়েছিলো তারা,– পৃথিবীর পরাজয়-জয়
পিছে ফেলে,– পথে-পথে হারায়ে সঞ্চয় !
আজ তারা কোথা সব জানি না তো কিছু !
আলোয় চিনিয়া পথ– তাহাদের পিছু
আমিও এসেছি এই বালুকার 'পর
আর-এক কবি-যুবা ! কাঁকর, পাথর,

এ-মাটির রুক্ষ পথ– লাগে নাই ভালো,
যাহা-কিছু পাই নাই,– যা-কিছু হারালো
সবি খুঁজে পাবো আমি সন্ধ্যার আঁধারে,–
নট্‌কান্‌-রাঙা মেঘে সমুদ্রের পারে !

## যুবা অশ্বারোহী

যুবা অশ্বারোহী,
রাঙা কঙ্করের পথে কোন্‌ ব্যথা বহি
ফিরিতেছো একা-একা নদীতীরে– সাঁঝে।
তোমারে চিনি না মোরা,– আমাদের মাঝে
তোমারে পাই খুঁজে,– দুপুরের রূঢ় কলরবে
নগরীর পথে মোরা নামিয়াছি যবে,
বন্দরের কোলাহলে– বেসাতির ফাঁদে
আধো হর্ষে– আধেক বিষাদে
বিকিকিনি করিয়াছি শুরু,
তুলিয়াছি স্থবিরের মতো দুটি ভুরু,
সংকোচ সংশয় ভয়ে উঠিয়াছি দহি,–
দূরে– দূরে– কে তুমি বিরহী
ফিরিয়াছো, স্বপ্নালস আঁখি-
দুটি তুলি দিবালোকে একান্ত একাকী
ছুটিয়াছো পাথারের বালুবেলা-পানে !
বনে-বনে যখন অঘ্রাণে
পাতা ঝরে– সবুজ পৃথিবী
যখন হারায়ে ফেলে শ্যাম বাস, কুসুমের নীবী,
ঝাউশাখে পাখিনীর নীড়
ভেঙে যায়,– কুয়াশার ভিড়
পথে-পথে কালো হ'য়ে ওঠে,
অবেলায় নেভে আলো,– সুন্দরীর ঠোঁটে
ডালিম ফুলের রং হ'য়ে যায় নীল,
মোরা ঘরে ফিরে যাই,– কার ঝিল্‌মিল্‌
মায়ার মুকুরে তুমি একা দ্যখো ছবি !
পৃথিবীর যতো গুণী আর যতো কবি
তাহারে চেনে কি তারা ? দিয়েছে কি ধরা
বাউলের বীণাতারে সে কখনো ? – তাহার পসরা
ধরণীর মধুকর-ডিঙাগুলি খুঁজে
পাবো মোরা কোনোদিন !– তাই চোখ বুজে
মাটির বুকের 'পরে মুখখানা রাখি,

অমরা ঘুমায়ে পড়ি;– নির্জন একাকী
পাথরের পথ দিয়া অশ্বারোহী কোন্
চ'লে যায়,– শুনেছি কখন
বিক্ষুব্ধ ক্ষুরের শব্দ,– দেয়ালের গায়
সুর তার বেজে ওঠে,– বিদায় জানায় !

## পলাতকা

পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদুলি মেয়েটি কই !
কতোদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের–
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটতো যাহার খই
কই-কই বালা আজিকে তোমার পাই না কেন গো টের !

তোমার নখের আঁচড় আজিও লুকায়ে যায়নি বুকে,
কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে !
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারি ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে !

কই বালা কই !– প্রণাম দিলে না !– মাথায় নিলে না ধূলি !
– বহুদিন পরে এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে !
কুটিরের পথে ফুটিয়া রয়েছে রাঙা-রাঙা জবাগুলি–
উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে।

## কবি

বীণা হাতে আমি তব সিংহাসনতলে
কালে-কালে আসি কবি– কভু পরি গলে
জয়মালা, কভু হিংস্র নির্দয় বিদ্রূপ
তুলে লই অকুণ্ঠিতে, খুঁজে ফিরি রূপ
সৃজনের ছায়াধূপে, আকাশে আলোকে,
ধরণী ডুকারি ওঠে যে ব্যর্থতা-শোকে,
তারো মাঝে স্বপ্ন খুঁজি, বীণাতারে বুনি
তারো সুর,– আনমনে গান গাই শুনী !
তুলিয়া লয়েছি আমি পতাকা তোমার,
হে সুন্দর, আমি তব দৌবারিক– দক্ষিণের দ্বার
উন্মুক্ত রেখেছি নব নবীনের লাগি !
অন্ধকারে দীপ হাতে আছি আমি জাগি।
আমি হেরিয়াছি– শুভ্র তোমার গৌরব

ঘৃণ্য নগণ্যের মুখে, কালে-কালে করিয়াছে স্তব
বীভৎস কুৎসিত কুণ্ডে, পঙ্কের ভাণ্ডারে
তোমারেই; দেখিয়াছি তুমি আসি দাঁড়ায়েছো দ্বারে
অন্ধকারে– রিক্ততারে করিয়াছো জয়ী
তোমার মঞ্জীর-স্পর্শে চুপে রহি-রহি !
বিকৃত তৃষ্ণার ব্যথা– বন্ধনের রক্তকৃষ্ণ রেখা
বিনাশিয়া অরুণিমা দিয়ে গেছো দ্যাখা
রাত্রির যাত্রীর ভীত নিঃস্পন্দিত চোখে !–
অতি দূর অনাগত স্বপ্নের আলোকে
আগতের ভাবলোকে তুলেছো উৎসব
কবি আমি, যুগে-যুগে করি তব স্তব !
দিবস-নিশার রক্ত– দহনের আলো
জাগায় বিনিদ্র ব্যথা– তবু বাসি ভালো
সুর তার; যা হারালো, পাবো নাকো ফিরে,
তারি খোঁজে নিত্য উষা গোধূলির তীরে
ফিরি আমি– অশ্রুমান, ব্যথার তাপস !
ভালোবাসি বেদনারে, ঐশ্বর্যের যশ
চাহি নাকো– মাগি নাকো প্রসাদ সম্মান
আমি কবি– পথে-পথে গেয়ে যাবো গান;
পদে-পদে মৃত্তিকারে মঞ্জীরের মতো
বাজায়ে চলিবো আমি– আমি অনাহত
আদি মানবের ছন্দে উঠিবো ঝঙ্কারি
নীলিমার জয়গান– শ্যামশষ্প নিঙাড়ি-নিঙাড়ি
ভরি লবো শোণিতের সুরাপাত্রখানা !
যে-ছবি ফোটেনি আজো– যেই রূপ অনামা, অজানা
সিন্ধুতীরে পেতে লবো রৌদ্রের শয়ন;
তাম্রঅঙ্গে শঙ্খচূর্ণ ধূম্র বালু মাখি,
কলরবে পায়ে-চলা পথ যাবো আঁকি
সমুদ্রফেনার মতো; যেই কথা কহে নাই কেউ
যে-গান গায়নি কেহ– তারি সিন্ধুঢেউ
তুলে যাবো কূলে-কূলে– পৃথিবীর প্রথম বয়স
ফিরায়ে আনিবো আমি– আদি উষা– আদিম দিবস,
ঊর্মিস্নাত মানবের অসীম উল্লাস,
প্রকাশ করিবো মোর স্নায়ুর যৌবনে !
আদিম সন্তান আমি– রোম-শিহরণে
গাবো গান; স্বর্ণশীর্ষ নীবারমঞ্জরী–
মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের বুকে আপনারে ছিন্ন করি-করি।

## পরবাসী

যাহাদের পায়ে-পায়ে চ'লে-চ'লে জাগিয়াছে আঁকাবাঁকা চেনা পথগুলি,
দিকে দিকে প'ড়ে আছে যাহাদের দেহমাটি— করোটির ধূলি,
যাহারা ভেসেছে ধান গান গেয়ে— খুঁটেছে পাখির মতো মিঠে খুদকুঁড়া,
যাহাদের কামনার ইশারায় মাটি হ'লো পানপাত্র, শস্প হ'লো সুরা।
ছুঁয়ে ছেনে বার-বার এ-ভাঁড়ার ক'রে গেছে স্যাঁতসেঁতে ম্লান,
আনাচে-কানাচে আজো দুলিতেছে যাহাদের উড়ানি-পিরান,
যাদের দেহের ছায়া পাঁচিলের গায়-গায় মেখে গেছে মায়া,
দেয়ালের শ্যাওলায় নীল হ'য়ে জেগে আছে যাহাদের কায়া,
যারা গেছে বীজ বুনে মাঠে-মাঠে,— চ'ষে গেছে মাটি,
কেটেছে ফসল,— শালি বেঁধে-বেঁধে নেছে আঁটি-আঁটি
তুলিয়াছে গোলাবাড়ি— যতো তিসি ধান-খড় ভরা,
পেঁচা-ইঁদুরের সনে আনমনে জাগিয়াছে যাদের প্রহরা,
পনির নদীর গন্ধে ভরিয়াছে যাহাদের তুষ্ট গৃহস্থালি,
ধুনুচিতে ধূপ ঢেলে,— উঠানে প্রদীপ জ্বালি-জ্বালি
ঘরে-ঘরে ফিরিয়াছে যারা কালো ছায়ার মতন,
চরকায় সুতো কেটে তুলিয়াছে তন্ময় গুঞ্জন,
কহিয়াছে আধো-আধো কতো কথা— নিভায়েছে— জ্বালায়েছে আলো,
দেয়ালে তাদের ছায়া জাগিয়াছে এলোমেলো— কালো,—
না জানি কোথায় তারা,— কতো দূরে,— জানি না তো কিছু।
রাতভোর ঘোর-ঘোর চোখ মোর,— ঘাড়খানা নিচু
তাদের সন্ধানে যেন— যাহাদের রেণুঝরা হিম মরা প্রজাপতি— ডানা
দিকে-দিকে প'ড়ে আছে— মনে হয় কতো চেনা,— কতো তারা জানা।
তাহাদেরি পরীপাখা ওড়ে যেন পউষের নদীটির বুকে!
শিশিরনিবিড় মাঠ-পাথারের মুখে
তারা যেন কথা কয়!— শাঁইঝাড়ে— শালুকের দলে
জোনকির পাখনার তলে যেন তাহাদের দীপ আজো জ্বলে।
সঙ্গোপনে বনে-বনে ফেরে তারা— জ্যোৎস্নারাতে পিয়ালের মৌ
আজো তারা পান করে, আজো তারা গান করে— বাসরের বর আর বউ!
শিশিরের জলে-জলে স্নান করে,— ভিজে-ভিজে বালুচর দিয়া
বুনো হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী প্রিয় আর প্রিয়া।
কোরা-ডাঙকের বুকে কান পেতে শুনে যায় গান,—
তাদের আঙুল ছুঁয়ে চুলবুল ক'রে ওঠে হেমন্তের মাঠভরা ধান।
তাদের দেখেছি আমি গেঁয়ো পথে,— দেখেছে রে ধাঙড়ের বধূ,
মৌচুষকির সনে তারা বনে লুটে খায় কমলার মধু।
সোনার পাতায় তারা মাথা পেতে খায় তাতা ক্ষীর।
বেদের মতন তারা আসে যায়— অবেলায় ভেঙে ফেলে ভিড়।
তাদের দেখেছি আমি শাদা ভোরে— ঘুঘু-ডাকা উদাস দুপুরে।

সাঁঝের নদীর বাটে— ভাঙা ঘাট— ভিজা মাঠ জুড়ে;
পাড়াগাঁর পথে-পথে নিঝুম চাঁদিনীর রাতে
ফিরেছে রে, ঘিরেছে রে কতোবার তারা মোর সাথে !

## আদিম

প্রথম মানুষ কবে
এসেছিলো এই সবুজ মাঠের ফসলের উৎসবে !
দেহ তাহাদের এই শস্যের মতো উঠেছিলো ফলে,
এই পৃথিবীর খেতের কিনারে, সবজির কোলে-কোলে
এসেছিলো তারা ভোরের বেলায় রৌদ্র পোহাবে ব'লে—
এসেছিলো তারা পথ ধ'রে এই জলের গানের রবে !
এই পৃথিবীর ভাষা
ভালোবেসেছিলো, ভালো লেগেছিলো এ-মাটির ভালোবাসা !
ভালো লেগেছিলো এ-বুকের ক্ষুধা, শস্যের মতো সাধ !
এই আলো আর ধুলোর পিপাসা, এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিলো— বুকে তাহাদের জেগেছিলো আহ্লাদ !
প্রথম মানুষ— চোখে তাহাদের প্রথম ভোরের আশা !
এসেছিলো সন্তান—
দেহে তাহাদের নীল সাগরের ঢেউয়ের ফেনার ঘ্রাণ !
শঙ্খের মতো কানে তাহাদের সিন্ধু উঠিতো গেয়ে।
শস্যের মতো তারা ওই নীল আকাশের পানে চেয়ে
গেয়ে গেছে গান ! ধানের গন্ধে পৃথিবীর খেত ছেয়ে
আলোয়-ছায়ায় ফসলের মতো করিয়া গিয়াছে স্নান !
সে কোন প্রথম ভোরে
প্রথম মানুষ আসিলো প্রথম মানুষীর হাত ধ'রে !
ভালো লেগেছিলো এ-দেহের ক্ষুধা, শস্যের মতো সাধ !
এই আলো আর ধুলোর পিপাসা, এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিলো— বুকে তাহাদের জেগেছিলো আহ্লাদ !
নীল আকাশের প্রথম রৌদ্র খেতে পড়েছিলো ঝ'রে !

## আজ

আমার হাতের কাজ আজ রাত্রে গিয়েছে ফুরায়ে—
আমার এ ক্লান্ত পায়ে
নাই আর পথের পিপাসা।
যে-ভালোবাসার ভাষা

মানুষ শুনিতে চায়– যেই প্রেম নিয়া
মানুষ চলিতে চায় পৃথিবীর পথে-পথে প্রিয়া–
তাহার সন্ধানে
তোমারে ডেকেছি আমি বার-বার !
– দূর আলো– দূর এক আঁধারের পানে
তবু তুমি চ'লে গেছো, আসিবে না ফিরে,
হারায়ে গিয়েছো তুমি পৃথিবীর দিন আর রাত্রির ভিড়ে !

## ফসলের দিন

কোনো এক প্রেমিকের তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে;–
কোনো এক প্রণয়ীর কাছে
একদিন দেখেছি তোমারে–
যে ভালোবেসেছে, কতো ভালোবাসা দ্যাখাতে সে পারে
জেনেছি সেদিন !
তারপর ফসল ঝরিয়া গেছে কতোবার–
কতোবার ঝ'রে গেছে তৃণ
মাটির উপরে !
– তবু জানি, কোনো এক প্রেমিকের তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে !
কোনো এক প্রণয়ীর কাছে
একদিন দেখেছি তোমারে,–
যে ভালোবেসেছে, কতো ভালোবাসা দ্যাখাতে সে পারে
জেনেছি সেদিন !

যেতে হবে ব'লে
তুমি গেছো চ'লে
দূরে গেছো স'রে;–
যেতে হবে ! তাই আমি হাতখানা ধ'রে
তোমারে আনিনি ডেকে কাছে !
একদিন, তবু– মনে আছে
তুমি এসেছিলে;
আমারে বাসোনি ভালো সেইদিনো, জানি আমি,
কিন্তু তুমি ভালোবেসেছিলে
তোমার ভিতরে যেই নারী আছে তারে,

জানিয়াছি– কতো ভালোবাসিতে সে পারে !
আমারে বাসোনি তুমি ভালো,
কিন্তু সেই নারী– আজ সেও কি ফুরালো
তোমার অন্তরে !
প্রেমিকের তরে
যেই ভালোবাসা দিতে পারে শুধু প্রণয়ীনি–
পাবো না তা– কিন্তু এক মানুষীরে চিনি;
অকাজ-কাজের মাঝে– মানুষের পাশে
বার-বার আসে !
আমারে বাসোনি তুমি ভালো
কিন্তু সে-মানুষী আজ সেও কি হারালো !

একদিন এসেছিলে নক্ষত্রের তলে,–
পৃথিবীর প্রণয়িনী যেই কথা বলে
প্রেমিকের কানে-কানে,– আকাশ একাকী
শোনে যাহা– বলেছিলে তা কি
সেই রাত্রে– ঢুলে-ঢুলে এসে !
জানি, তুমি ভালোবেসে
সেইদিন আসো নাই,–
আজ তুমি চ'লে আসো যদি,–
ভালোবাসা বুকে ল'য়ে আসিবে না, জানি আমি,–
তবু এই পৃথিবীর নদী,
আর এই নক্ষত্র আকাশ,
অন্ধকার রাত্রির নিশ্বাস
চাহিছে তোমারে !
আমারে বাসোনি ভালো, তবু আজ ফসলের ভারে
নতুন ধানের গন্ধে উঠিয়াছি ফলে
নবীন প্রণয়ী আমি,– পৃথিবীর কোলে !
চেয়ে আছি,– আসিবে কখন !
ঈশানের মেঘের মতন
আসিছে সময় !
– তাহারি গম্ভীর গান শুনি আমি–
তোমার গানের শব্দ নয় !

## আমরা

যেই ঘুম ভাঙে নাকো কোনোদিন ঘুমাতে-ঘুমাতে
সবচেয়ে সুখ আর সবচেয়ে শান্তি আছে তাতে !

আমরা সে-সব জানি; তবুও দু-চোখ মেলে জেগে
আমরা চলিতে আছি আমাদের আকাঙ্ক্ষার পিছে–
নক্ষত্রগ্রহের পিছে নক্ষত্রের ছায়ার মতন
ভাসিয়া চলিতে আছে ঢেউ তুলে আমাদের মন
নদীল জলের মতো– সিন্ধুর স্রোতের মতো বেগে
পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার পার খুঁজে ছুটিয়া চলিছে।

কিংবা তারে খুঁজে কেউ পেয়েছে কি পৃথিবীর পারে !–
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে হৃদয়ের যেই আকাঙ্ক্ষারে
আমরা বেসেছি ভালো; খুঁজে তারে পেয়েছে কি কেউ
পৃথিবীর দিন আর পৃথিবীর রাত্রির আড়ালে !
সকল সাম্রাজ্য ছেড়ে– সকল নিশান ছেড়ে-ছেড়ে
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষারে,– আমাদের এই হৃদয়েরে
আমারা বেসেছি ভালো !– থামে যদি সমুদ্রের ঢেউ,–
আমরা যাবো না থেমে,– যাবো নাকো ডুবে কোনো কালে !

এই পার– ওই পার– কোনো এক পারাপার থেকে
রাত্রিরে ডাকিছে দিন,– দিনেরে যেতেছে রাত্রি ডেকে !
আমরা ডেকেছি তারে আলো-আঁধারের মতো হ'য়ে
আঁধার আলোর খোঁজে; আমরাও তাহার পিছনে
ছুটিতে চেয়েছি সব; আমরাও খুঁজিতেছি তারে
পৃথিবীর পারে গিয়ে; আর ওই নক্ষত্রের পারে
ডাকিতে চেয়েছি তারে;– পুবের হাওয়ার মতো ব'য়ে
মিশিতে চেয়েছি গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের সনে।

পশ্চিম সিন্ধুর মতো অন্ধকারের ফুলে দুলে উঠে
আমরা চলিতে চাই পুবের সিন্ধুর দিকে ছুটে !
মনের আশার মতো হৃদয়ের নিরাশারে খুঁজে,
আমরা আকাশ খুঁজে অন্তরের নিরাশার মতো
আমরা ছুটিতে চাই পৃথিবীর পথ ছেড়ে দিয়ে;–
পিপাসা পিছনে ফেলে তোমারে পিছনে ফেলে প্রিয়ে !
যদিও সকল ভুলে কার্তিকের মাঠে চোখ বুজে
ঘুমায়ে অনেক শান্তি, ছুটিতেছি তবু ইতস্তত !

যদিও অনেক ক্লান্ত হ'য়ে গেছি পথে হেঁটে-হেঁটে
বার-বার জেগে-জেগে অনেক সময় গেছে কেটে–
ঘুম ভালো সবচেয়ে, মৃত্যুর মতন ঘুম ভালো
যদিও সকল শক্তি সার সব ঐশ্বর্যের চেয়ে–
তবুও ঘুমের আগে আকাঙ্ক্ষার অধীরতা এসে
আমাদের সকলেরে চুমো দিয়ে গেছে ভালোবেসে !

আকাশে সূর্যের আলো আর ওই নক্ষত্রের আলো
জ্বলিতেছে আমাদের আকাঙ্ক্ষার কাছে ছন্দ পেয়ে !

কারণ শান্তির চেয়ে অস্থিরতা– বেদনা– বিস্ময়
– আকাঙ্ক্ষার পিছে যেই ব্যথা-অধীরতা জেগে রয়–
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে আমরা বেসেছি ভালো তারে !
যদিও গিয়েছি চিরে, পৃথিবীর বুকের মতন
হৃদয় রয়েছে ভ'রে অন্ধকার গহ্বরে কবরে,
তবুও রয়েছি জেগে রাত্রিদিন জাগিবার পরে!
রাত মুছে যায় দিনে,– দিন ডোবে রাতের আঁধারে;
– তাদের মতন হ'য়ে ভাসিয়া চলিতে আছে মন !

কোথায় সে জেগে আছে ?– ঘুমায়েছে ?– জেগে আছে সে কি !
তোমরা দেখেছো তারে ? আমরা চকিতে যারে দেখি
যাহার ঐশ্বর্য এই পৃথিবীর রাজ্যের মতন
নয়, তবু যে খেলেছে মানুষের ইচ্ছা ক্ষুধা লয়ে '
যার শক্তি বেশি ওই নক্ষত্রের প্রভাবের চেয়ে '–
পৃথিবীর মেয়ে সে কি ? নক্ষত্রের ?– তবে কার মেয়ে !
দেখেছি কোথায় তারে ! তারে আমি দেখেছি কখন !
আমরা ঢেউয়ের মতো তাহার পিছনে চলি ব'য়ে !

তারে খুঁজে ব্যথা শুধু, তারে খুঁজে শুধু বিহ্বলতা।
আবার ফিরিয়া এসে হে প্রিয়া তুমিও কবে কথা–
কিন্তু সে কি কোনোদিন তাকায়েছে আমাদের দিকে ?
পিছনে ফিরেছে সে কি ?– আমরা ছুটেছি তার পিছে !
আমরা ডেকেছি তারে– শুধু ব্যথা– ব্যথা তারে ডেকে '
তবুও পাখির মতো কাঁটার উপরে বুক রেখে
আমরা ডেকেছি তারে– আমাদের কাছে গান শিখে
দিনের রাতের ঢেউ জেগে উঠে তাহারে ডাকিছে !

কোথায় গিয়েছে প্রিয়া ?– কখন পিছনে প'ড়ে গেলে !
আমরা কাহারে খুঁজে তোমারে ভুলেছি অবহেলে !
পৃথিবীর মাঠে পথে মানুষের মতো কাজ ক'রে
যে-আরাম, বীজ বুনে– মানুষের মতো শস্য তুলে
যেই সুখ, ক্লান্ত মানুষের মতো আঁধারে ঘুমায়ে
যেই শান্তি, পাতার মতন ফলে যেই স্বাদ গায়ে–
হিমের হাওয়ার বুকে সহজে পাতার মতো ঝরে
যেই স্বচ্ছলতা– সব– আমরা সকলে গেছি ভুলে

তবু এই পথ ছেড়ে লাঙল-কাস্তে হাতে নিয়ে

আমরা যাবো না হেঁটে পৃথিবীর শস্যখেত দিয়ে।
– যদিও নদীর জলে,– যতোদিন কেটে যায়, দেখি–
আরো বেশি– আমাদের মুখ আরো বেশি ম্লান হয় !
যদিও অনেক ঘুম– আরো ঘুম নেমে আসে চোখে–
রাতের আঁধারে এই– আর এই তারার আলোকে
নিভিয়া গিয়েছে বাতি পৃথিবীতে,– তবু নিভেছে কি
যে-মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে রয় !

সে-মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে রয় !–
যদিও পেয়েছে ঘুম, ঘুমের মতন কিছু নয়–
যদিও সকল সাধ অনুভূতি আস্বাদের চেয়ে
সব পিছে ফেলে রেখে– সবাই ঘুমেরে ভালোবাসে,–
– কারণ, সবাই শান্তি– মৃত্যুর ঘুমের শান্তি চায়–
পথ হেঁটে-হেঁটে তবু চলিতেছি– যা চলিয়া যায়
তারি পিছে-পিছে গিয়ে– ব্যথা পেয়ে– শুধু ব্যথা পেয়ে
জেগে আছি– যদিও আবার ঘুম– চোখে ঘুম আসে !

জ্বলিতেছে যে-মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে !
সমুদ্র দাঁড়াতে পারে– পারি নাকো আমরা দাঁড়াতে !
পৃথিবী ঘুমাতে পারে– আমাদের চোখে ঘুম নাই !
নক্ষত্র নিভিতে পারে,– আমরা যেতেছি তবু জ্ব'লে !
আমরা বাতাস হ'য়ে চলিতেছি দিকে-দিকে ব'য়ে !
সময়ের সাথে-সাথে আমরা সময় হ'য়ে-হ'য়ে
যতোদিন জেগে আছি এমনি জাগিতে শুধু চাই !
আমরা চলিতে চাই আকাশ-বাতাস পায়ে দ'লে !

## আজ

কোথাও রয়েছে মৃত্যু– কোনো এক দূর পারাপারে
পশ্চিম সাগরে এক,– যেইখানে সব শেষ তারা
অবসন্ন হ'য়ে যায়,– ডুবে যায় ভোরের আঁধারে,
আকাশ পায় না আর যেইখানে সমুদ্রের সাড়া;
আমাদের হৃদয়ের সব আশা-হতাশা যেখানে
বরফের মতো কথা কহিতেছে বরফের কানে,–
পরিশ্রান্ত পেগানেরা একদিন চিনেছিলো যারে–
সবচেয়ে অবসাদ সঙ্গে ক'রে এনেছিলো যারা !

সেইখানে আছে মৃত্যু পৃথিবীর আকাশের শেষে

সকল মেঘের পরে– মেঘের রঙের আরো পিছে,
যেইখানে রঙ নাই– রক্ত নাই– সেই এক দেশে
ঘুমন্তের কানে-কানে সেইখানে ঘুম কি কহিছে !
ফুরায়েছে শুনিবার জানিবার সব অবসর–
বরফের হাত শুধু বরফের হাতের উপর !
কুয়াশার ঠোঁট শুধু কুয়াশার ঠোঁটে গিয়ে মেশে;
দিনের পায়ের শব্দ মাথার স্বপ্নের মতো মিছে !

রাতের পাখার পাখি ঝরায় না পালক সেখানে,
ধরায় না বাতি আর নক্ষত্রেরা– ক্লান্ত নক্ষত্রেরা–
অবসন্ন নদী ছোটে নাকো শ্রান্ত সমুদ্রের পানে,
সন্তানের মতো জন্মে পৃথিবীতে জেগে আছে এরা !
ইহারা শিশুর মতো– পৃথিবীর শৈশবের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে তবু, বৈকালো যে হয়েছে মলিন।
সকল-শেষের সুর শোনা যায় সকলের গানে–
জীবনের সব সাধ অগাধ মৃত্যুর ঢেউয়ে ঘেরা !

সিন্ধুর শঙ্খের কানে সমুদ্রের সুরের মতন–
রক্তের গানের মতো আমাদের দেহের ভিতরে
হে মৃত্যু, তোমার গান শুনিতেছে– শুনিতেছে মন !
ঘুমন্ত মাথার মতো কোনো এক বিছানার 'পর
বুজায়ে রাখিতে চাই যা বুঝেছি, যা জেনেছি– সব !
আকাঙ্ক্ষা চাই না আর, আঘাতের চাই না উৎসব !
অনেক জাগার পরে ঘুমাবার করি আয়োজন–
গুহার ছায়ার মতো ছায়ার গুহার মতো ঘরে !

কারণ অনেক জেগে আমরা দেখেছি রোদ, রূপ– !
দেবতা দ্যাখেনি ভয়ে– আমার দেখেছি জেগে-জেগে;
দেখেছি সকল আলো হ'য়ে যায় অঙ্গারের স্তূপ
তোমার পায়ের তলে, মানুষের মতন আবেগে
নক্ষত্রেরা কেঁপে ওঠে তোমার জানুর নিচে এসে;
মোমের মতন গ'লে জ্বলেছি তোমারে ভালোবেসে–
আগুন হয়েছো তুমি, হ'য়ে গেছি আমি তার ধূপ;
বিদ্যুতের মতো তুমি জেগেছো বুকের 'পরে মেঘে !

দেবতা দ্যাখেনি ভয়ে– সময়ের তাই সে দেবতা !
সকল ঐশ্বর্য– রাজ্য– নিশানের আগে তার জয় !
তোমারে সে দ্যাখে নাই, শোনেনি তোমার মুখে কথা
তোমার ঠোঁটের চুমা তাহার ঠোঁটের তরে নয়।

তোমার চুলের কালো সব তার লাগিনি কখনো
পাঁচিল ঘড়ির পরে তার নক্ষত্র সে জ্বলে;
একে-একে সব হয় সকালের সকল ক্ষত—
ফুরায় না কোনোদিন নেবেতার ইঁদুর, সময়!

সব ওই নেবেতার ছেলে এক— কুশ তার বুকে;
সে শুধু জেনেছে ব্যথা— কুশে শুধু যেই ব্যথা আছে।
যেই পথ বেদনার মধ্য তার পড়িয়াছে ঝুঁকে,
সে-ব্যথার রক্ত তার কুশের উপরে ঝরিয়াছে,
পেরেক ছুঁয়িতে না তো সেই ব্যথা; তবুও পেরেক
সবচেয়ে অবসাদে নীল করে দেছে তার প্রথম!
সবচেয়ে বড়ো ব্যথা বিস্মৃত ছিলো তার মুখে,
জানো কিনা, তুমি একদিন ছিলে তার কাছে!

একদিন একবার তার কাছে বসিয়াছে এসে,
একবার— একদিন এসেছে তাহার কাছে তুমি!
সকল ভুলেছি আমি কেবল তোমারে ভালোবেসে,
কুশের মতন যেন তোমার কালো চুল চুমি!
তোমার হাতের পরে একবার এই হাত রেখে!
দুই চোখ দিয়ে আমি নিয়েছি তোমার চোখ দেখে!
জানো তুমি জেগে আছে আমাদের অবসন্ন দেশে,
সবাই ঘুমায়ে পড়ে— তবু তুমি পড়ো নাই ঘুমি।

তিনশো আশিও তুমি মাথা তুলে রহিয়াছ জেগে—
অঘ্রাণে দু-ধারে ধান সাদের কলার মতো চুলে!
ঠোঁটের উপরে ঠোঁট চুমোর মতন আছে লেগে!
কেলার মতন রক্ত দেহে তার উঠিতেছে দুলে!
ঠোঁটের সিঁদুর মতো তার ওই দেহের উত্তাপ
নির্মম ঘুমের মতো চোখে তার সে কি বিবর্ণতা!
হৃদয় ভরিয়া ওঠে অবসাদে— বিষাদে— আবেগে—
বিকালের সমুদ্রের মতো ক্ষুধা উঠিতেছে ফুলে।

তোমার পেলাম রাজা ছেলে গেছে মেয়ের মতন—
তাহার সে-রক্ত ঢেউ পড়ে আছে পৃথিবীর পিছে,
চাঁদ গেছে ঠীক সব— ইঁদুর ঠীকের মতো মন
তোমার মুখের পানে চেয়ে বুকে আবার আসিছে!
কোথা আছে?— আফ্রিকার পৃথিবীর কে তুমি দেবতা?
উদাস তোমার মুখে— আমার এ মুখে বিহ্বলতা?
কালের স্বপ্ন তুমি দাখো, আমি দেখি মুহ্যমান।

তবুও মিথ্যার মতো দেবতার মনে হয় মিছে :

করুণ দু-হাত তুমি রাখ নাই ক্রুশের হাতে:
তোমার দু-হাত শুধু পেরেছিল সেই মানুষের—
তাহার চুলের 'পরে ফুলের মতন অনুদিনে,
দেবতার দুই-হাত এসেছিল নেমে একদিন :
অজিকার পৃথিবীর দেবতার এই শুধু সাধ—
শুধু তৃপ্তি— শুধু তৃপ্তি— সন্তানের ক্ষীত অনুদিনে :
পৃথিবীর ব্যথা ছাড়া আর কেন ব্যথা বুকে বাধে ?
যে ব্যথার কাছে এই পৃথিবীর সব ব্যথা ক্ষীণ :

চোখ মেলে তারে তুমি একবার নেবে নাকি দেখে ?
তোমার দু-চোখ শুধু চেয়ে রবে নক্ষত্রের পানে ?
কিংবা এই মানুষেরা যেইখানে করে এক-এক
তুমি শুধু চ'লে যাবে সেই সব মশানে-মশানে !
তোমার হৃদয় শুধু রাখিবে কি কুৎসিতের হাতে ?
তোমার বুকের রক্ত বরাবে কি ক্রুশের আঘাতে ?
তোমার ক্রুশের চিহ্ন সকল পৃথিবী নেবে ঢেকে ?
এর চেয়ে বেশি কিছু অজিকার দেবতা কি জানে !

দেবতা রয়েছে বেঁচে তাই আজ— মরিবে না আর !
শেষ হবে নাকো আর মেসায়ার মুখ থেকে কথা,
পুরানো রাত্রির মতো আসিবে না নতুন আঁধার,
মুছে দেবে নাকো আর এ নতুন আলোর স্পষ্টতা :
কারণ এ রোদ-আলো শান্ত: শাদা সকাল-বিকাল,
পৃথিবীতে রৌদ্র তবু একদিন ছিলো আরো লাল !
সেই রক্তে আজ আর দেবতার নাই দরকার—
কারণ সে রক্তে জ্বালা আগুনের মতো শুধু ব্যথা !

সকলের মতো চ'লে আমিও হতাম ক্লান্ত যদি
আর এক অবসাদে পরিশ্রান্ত হতাম না আর—
পৃথিবীর অন্ধকারে সবচেয়ে পরিশ্রান্ত নদী
জানে এই পরিশ্রম ?— আর জানে এই অন্ধকার ?
পৃথিবীর অন্ধকারে সবচেয়ে গভীর সাগর
বুঝে যায় আরো গাঢ় কোনো এক গহ্বরের ঘর—
মৃত্যু এসে একদিন দেবে তারে সকল অবধি—
শেষ হবে বুঝিবার জানিবার দরকার তার !

কোথায় রয়েছে মৃত্যু ? কোন্ দিকে ? বুঝি আমি তারে,

কোথাও রয়েছে মৃত্যু— সেইখানে তুমি আর নাই।
যেখানে তারার আলো কিংবা কালো রাতের আঁধারে
তোমারে চিনি না আর— আমি শুধু তোমারে চিনাই!
ঘুমের— চোখের ঘুম মরণের বুকের উপরে;
প্রেমিকের মতো চুমো আমার সে ঠোঁট থেকে ঝরে
মৃত্যুর ঠোঁটের 'পরে; এক শীত-সমুদ্রের পারে
আমার জীবন পুড়ে পৃথিবীতে হ'য়ে গেছে ছাই!

তুমি নাই, চোখের ঘুমের মতো ঘুম হ'য়ে আছি;
বিছানায় মৃত্যু শুয়ে— তার পাশে আমি ঘুম— আমি!
মানুষীর মতো ক'রে তারে আমি ভালোবাসিয়াছি!
বিবাহের খাটের উপরে তার আসিয়াছি নামি!
বাহিরে শীতের রাত— জীবনের শীত আর ব্যথা;
ঘোড়ার খুরের শব্দ— খুরের পথের পিচ্ছিলতা!
এখানে গ্রীষ্মের রাত— আমাদের মুখে ঘাম, মাছি!
ঠোঁটে ঠোঁট, কপালের কালো চুল উঠিতেছে ঘামি!

যে-কথা শিখিনি আমি কোনোদিন পৃথিবীর দেশে
এইখানে তার ভাষা আমাদের মতো মনে হয়।
যেই ভালোবাসা আমি পাই নাই ঢের ভালোবেসে
এইখানে শুরু হয় প্রথম সে প্রেমের সময়!
ওই দূর পৃথিবীর সুস্থ প্রেমিকেরা শুধু জানে
যে-প্রেম চেয়েছি আমি— যে-প্রেম পেয়েছি আমি গানে!
ওইখানে সেই প্রেম মাংস ল'য়ে দাঁড়ায়েছে এসে।
শরীরের রক্তে তার শরীরের রক্ত লেগে রয়!

এই মৃত্যু; একদিন পৃথিবীর পথের জীবনে
বিমর্ষ হয়েছি আমি প্রেমের অনেক গল্প শুনে;
প্রণয়ের ঢের গান বিষ হ'য়ে জেগেছিলো মনে—
মাছির মতন পাখা পুড়ে গেছে প্রেমের আগুনে!
মোমের মতন দেহ, প্রেমের আগুন শুধু সয়!
জীবনের শীত তারে জ্বালায়নি— জ্বলেছে মরণে!
পৃথিবীর শীতে কারা ব'সে থাকে দিন গুনে-গুনে!

আমিও ঘুরেছি ঢের ওই দূর পৃথিবীর শীতে,
ঘোড়ার খুরের শব্দ অনেক শুনেছি আমি কানে,
এক মুখ চিনে আর কিছু আমি চাইনি চিনিতে!
কার ভুরু খুঁজিবে যে একবার তার ভুরু জানে!
কার চোখ দেখিবে যে একবার দেখে তার চোখ!

সব মেয়েমানুষের মাঝে সেই এক মেয়েলোক!
আগুন ধারতে জানে বরফের বুকে ব্যথা দিতে–
বরফ ছড়াতে জানে আগুনের মতো রাঙা প্রাণে!

অন্ধকারে গাঢ় শাদা সমুদ্রের মতো তার হাসি!
ক্ষুধা তার সাগরের ভিতরের গহ্বরের মতো!
আমার পিপাসা তবু তার চেয়ে গভীর পিপাসী–
ফুরায়ে গিয়েছে তবু পিপাসার সেই সমুদ্র তো!
কে ফুরালো! আহা-আহা– কেন তাহা ফুরালো এমন!
জীবনের পারে ব'সে মরণের গন্ধে ভরে মন–
ফুটেছে বিষের ফুল– নাইটশেড– তারে ভালোবাসি!
জীবনেরে কোনোদিন ভালো আমি বেসেছি কি তবে!

সিন্ধুর বুকের থেকে জেগেছিলো জিনাসের মতো
আমার হৃদয়ে সেই সিন্ধু আছে, তার বুক থেকে!
আমার জিনাস্ তুমি– আমি জানি, তুমিও জানো তো!
তোমারে এনেছি আমি গভীর সমুদ্র থেকে ডেকে!
আমার দু-চোখ দিয়ে তোমারে এনেছি ডেকে আমি,
আমারে মায়াবী জেনে আমার নিকটে এসে থামি,
ঢেলেছে চুলের থেকে সাপের ফণার বিষ যতো!
তবুও তোমার চুলে রেখেছি মাথার চুল ঢেকে!

গ্রীষ্মের সিন্ধুর ঘ্রাণ রয়েছে তোমার দেহে লেগে–
সে কোন্ সাগর দূর– কেউ তার জানে নাকো পার–
সেখানে ঘুমায়ে ছিলে পিপাসার আক্ষেপে– আবেগে!–
দরকার হ'লো তাই জাগিবার আর জাগাবার!
পৃথিবীতে এমন জাগেনি আর কোনোদিন কেউ–
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে বানায় সে সমুদ্রের ঢেউ!
দেবতারা ঘুমায়েছে সন্ধ্যার মেঘের মতো মেঘে,
সে তবু জাগিয়া ওঠে– তার চোখে ঘুম নাই আর!

শেষের ঘুমের ঘাম কেবল কপালে লেগে আছে
অবসন্ন হ'য়ে চোখ একদিন ফেলেছিলে বুজে–
নতুন মেসায়া এক তখন আকাশে জাগিয়াছে,
তোমার সাম্রাজ্য তুমি সেইদিন পাও নাই খুঁজে!
তোমার অবশ চোখ সেইদিন হয়েছে মলিন–
তোমার ঘুমের পর সেদিন জেগেছে নেজারিন্!
সেই হ'তে জেগেছে সে– পৃথিবী গিয়েছে তার কাছে,
তাহার বুকের 'পরে সবাই রয়েছে মুখ গুঁজে!

সকল ঘোড়ার খুর গিয়েছে রোমের দিকে ছুটে—
সকল পেগান রোম তাদের পায়ের তলে পিষে
সকল পেগান গ্রীস তবুও ঘুমের থেকে উঠে
আবার ওঠেনি জেগে পুরোনো পেগান সেই গ্রীসে !
করুণ নতুন আলো এনেছে নতুন এক ক্রুশ—
আর কেউ রহিবে না অ্যাপোলোর মতন পেগান
সমুদ্রের পাপ থেকে তুমি আর উঠিবে না ফুটে,
ফুটিবে না তুমি আর হৃদয়ের সাগরের বিষে !

তোমার চোখের পানে চেয়ে লোক হবে না মলিন,
আগুনের জিভে খেয়ে যাবে না মোমের মতো গ'লে !
এই শান্তি হাতে ক'রে আনিয়াছি নিজে নেজারিন,
আগুনের মতো তুমি— সেই সূর্য ওঠে তবু জ্ব'লে !
তোমরা পাথর আজ, তোমরা হয়েছো আজ কাঠ !
রোমের মেসায়া সে যে,— পৃথিবীর সে একা সম্রাট !
আগুনের মতো সে যে, তোমরা তাহার কাছে তৃণ—
তোমরা তৃণের মতো আগুনে-আগুনে শেষ হ'লে !

আমি তবু মেসায়ার হাত ছেড়ে আসিয়াছি চ'লে—
ঘুরায়ে নিয়েছি ঘোড়া রোমের পথের থেকে আমি,
একদিন— একরাত সে যে এসে বসেছিলো কোলে !
তোমার মুখের থেকে সেই বুক আরো গাঢ়, স্বামী !
শুনিয়াছি— মাউন্টের 'পরে তুমি কি কয়েছো কথা—
দেখেছি মেসায়া, আমি তোমার মুখের বিমর্ষতা !
তোমার পথের থেকে তবু আমি পড়িয়াছি স্খলে !
কোথায় চলেছি আমি কোথায় যাবো যে আমি থামি!

যাহারা রোমান ছিলো মার্চ ক'রে তারা আজি যায়
তোমার রাজ্যের দিকে— তোমার ক্রুশের 'পরে সবে—
চুমো দিয়ে চ'লে যায় চুপে-চুপে বেলা-অবেলায়—
আমারো কি সেই ক্রুশে একবার চুমো দিতে হবে ?
যে-ঠোঁটে আগুন আছে— যেই ঠোঁটে নাই কোনো জল
তারে তুমি করিবে কি বরফের মতন শীতল !
আমার পিছনে ও কি ?— নেজারিন, তুমি নাকি হায় !
তোমার বিষণ্ণ চোখ কতোদিন চোখে লেগে রবে !

তুমি শান্তি, আর তুমি আকাশের আশ্বাসের দূত—
আমারে কি শান্তি দেবে ? আনিবে কি সান্ত্বনার ছায়া !
যেখানে শিশুরা আর মাদালিন, মেরী আর রুথ,

সেইখানে চ'লে যাও অবসন্ন অচ্ছন্ন– মেসায়
যেইখানে ক্রুশে বিঁধে কাঁদিতেছে মানুষের শ্বাস,
যেইখানে জন্ম লয় পাইলেট– জুড– ব্যারাব্বাস
ভূতের মতন ভাসে তাহাদের হৃদয়ের ভূত–
সেইখানে দয়া আনো, সেইখানে আনো তুমি মায়া !

তোমার পায়ের পথ ছেড়ে তবু তুমি পলাতক,–
সবাই রেখেছে, তবু রাখি নাই মেসায়ার মন !
আমার পায়ের শব্দ হয়তো বা শুনিছে নরক !
বধির নরক, শোনো, আমি এক অধীর পেগান !
পৃথিবীর পথ খুঁজে পথ আমি পাই নাই কোনো,
ঘুমন্ত হীদেন্ তুমি আমার পায়ের শব্দ শোনো !
এ-হৃদয়ে নাই কোনো ক্রুশকাষ্ঠ ধরিবার শখ,
পাপের হাতের থেকে চাই নাকো কোনো পরিত্রাণ !

ক্লেশে তাপ আছে, তবু, আমি চাই সেই অভিশাপ !
সবচেয়ে পতিতের মতো আমি কহিতেছি কথা,–
সিন্ধুর ফেনার মতো ভাসে যেই বিষ, যেই পাপ–
আমার হৃদয় তার অসুস্থতা; তাহার সুস্থতা !
আমি সমুদ্রের মতো আকাঙ্ক্ষায়, আলোড়নে গাঢ় !
আমারে পৃথক করো, পৃথক করিতে যদি পারো !
শীতল করিতে পারো, ক্রুশ, তুমি আমার উত্তাপ ?
নির্মল করিতে পারো, নেজারিন্, এই আবিলতা ?

নেজারিন্, দেখেছো কি কোনোদিন চোখ তুলে তারে ?
ফলন্ত শস্যের মতো পৃথিবী গিয়েছে ভরে ক্রুশে !
তাদের ছায়ায় নয়,– ভিনাসের চুলের আঁধারে
হৃদেয়র শেষ রক্ত আমি তবু লইতেছি শুষে !
কারণ পতিত আমি, কোনোদিন চাই নাই ত্রাণ,
আমার শরীরে রক্ত গাহিতেছে সমুদ্রের গান !
গাহিবে সে যতোদিন গাঢ় হ'য়ে গাহিতে সে পারে
যতোদিন মানুষীর অভিশাপ চাহিবে মানুষে !

তারে তুমি দেখিবে না, করিয়াছে সে কি অপরাধ ?
শান্তির ঘুঘুর মতো শাদা সে কি ? লিলির মতন ?
ভ্যালির লিলির মতো মাংসের পাপড়িতে স্বাদ ?–
সল্ যারে জেনেছিলো– বুঝেছিলো যারে সলোমন !
সমুদ্রের পারে যেই ফুল ফোটে গ্রীষ্মের বিকালে,
অনেক ফেনার গন্ধ ঘাম ঘ্রাণ যাহার কপালে,
ক্ষুধা যার গরমের সমুদ্রের মতন অগাধ–

আমার ভিনাস্ তাই ! তোমার, সে লিলি কি তেমন !

কে বানালো ?— বুকে তার দিলো এতো সাগরের বিষ !
কে বানালো তারে, আহা, তুমি তাহা জানো না দেবতা !
জেনেছো কাঁটার চুমা— কাঁটায় নাইকো তার কিস্
তাহার ঠোঁটের 'পরে কার ঠোঁট রয়েছে, দ্যাখো তা !
করুণ লিলির গায় এমন থাকে কি লেগে লিলি ?
শীতল লিলির স্বাদ চিনায়েছে তোমারে, গ্যালিলি !
জেনেছি কি, একদিন জেনেছে যা গ্রীক অ্যাডনিস্ ?
পরাজয় করেছে সে পৃথিবীর এই বর্বরতা !

এসেছে নতুন ভোর নুতন দিনের আলো ল'য়ে—
আজ কেউ গ্রীক নয়, খোঁড়া— খর্ব— চায় সব ত্রাণ !
একদিন হয়েছে যা, গেছে তার সব শেষ হ'য়ে !
গোধূলির আলো এসে ঘিরিয়াছে তোমারে পেগান্।
অনেক শীতের রাত নামিতেছে আকাশের থেকে,
দেবতা পেতেছে ব্যথা পৃথিবীর দরিদ্রতা দেখে,
শান্তির নিশ্বাস তার অশান্তির ঢেউয়ে চলে ব'য়ে,
তাহার গ্যাবার্ডিনে লেগে আছে মঙ্গলের ঘ্রাণ !

নেমেছে শুভ্রের দিন— পেগানের গোধূলির আলো
ডুবে গেছে পশ্চিমের পাহাড়ের পিছনে সাগরে !
এই রাতে জানালায় নক্ষত্রের মতো বাতি জ্বালো,
শীতের উঠান ছেড়ে সবাই চলিয়া এসো ঘরে;
পিছনে পড়িয়া থাক যেইসব রবে প'ড়ে পিছে,—
পৃথিবীর বালকের বিস্ময়ের বিহ্বলতা মিছে !
নেমেছে শান্তির দিন, সান্ত্বনারে বাসি সবে ভালো,
মঙ্গলের দেবতার পূজা আজ করি পরস্পরে !

চারদিকে জ্ঞান আছে— পুরানো জ্ঞানের মতো নয়;
চারিদিকে বোধ কোন্ ?— আমি তার পাই নাকো আলো,
যেই সময়েরে আর আনিবে না অসীম সময়,
অগাধ অতীতে যার সমুদ্রের সীমানা হারালো,—
আমি একা ব'সে আছি আজ সেই সাগরের পারে;
সবচেয়ে বেশি আলো সবচেয়ে গভীর আঁধারে
সেইখানে মিশে যায়— সেইখানে সব শেষ হয়—
তারপর, হে জিহোবা, আকাশে তোমার বজ্র জ্বালো।

আবার নতুন মাংসে তোমার পৃথিবী ফেলো ভ'রে,
রক্তের হাড়ের বীজ বিছায়ে দিতেছো তুমি পথে

নতুনের বিধানের ওই শ্রান্ত পথ ধ'রে-ধ'রে
মুশার মতন মাথা দ্যাখা দেবে উষার পর্বতে;
তোমার কমান্ডমেন্ট, সেইসব অবসন্ন শোভা–
আবার দ্যাখাবে তুমি আমাদের, রিক্ত-জিহোবা !
কবরে যদের হাড় আজ আর ওঠে নাকো ন'ড়ে–
সেই মৃতদের তুমি ক্লান্ত হ'য়ে দেবে তো ঘুমোতে !

তাহারা ঘুমাক্– আহা– আমিও তাদের মতো ঢুলে
ঘুমায়ে যেতাম যদি তাদের কিনারে মাথা রেখে !
আজিকার এই জ্ঞান আর এই অজ্ঞানতা ভুলে
অবসন্ন ডান হাত দিয়ে ক্লান্ত কপালেরে ঢেকে
আমিও হতাম যদি অতীতের মতন অগাধ !
সবচেয়ে অবসন্ন ! সবচেয়ে বড়ো অবসাদ !
আজিকার এই শীত পৃথিবীর কোলে থেকে তুলে
আমারে তোমার কোলে তুমি এসে নিতে যদি ডেকে !

আজ এই পৃথিবীরে করিয়াছি আমি অস্বীকার;
আর তার জ্ঞান আমি জানিবো না, শুনিবো না কথা,
দেখিবো না আর তার আলো আমি– তার অন্ধকার;
বুঝিবো না এ-আলোয় আছে কোন্ নতুন স্বচ্ছতা !
জানিবো না এ-নতুন দেবতার কোন্ রূপ আছে।–
তাহারে যে চায় নাই তাদের সে ভালোবাসিয়াছে;
আমারে যে চায় নাই আমি তবু চুমো খাই তার,
যারে আমি পাই নাই তারে খুঁজে চাই আমি ব্যথা।

তারপর শান্তি চাই– তোমার মতন শান্তি নয় !
সেইখানে আলো নাই, দূত নাই, ঈশা, তুমি নাই,
সেইখানে জিহোবার মুখে চেয়ে কাটে না সময়,
সময়ের বুকে শুয়ে সেইখানে সময় কাটাই ?
তোমার ড্রামের শব্দ একদিন উঠিবে কি বেজে !
ডুম্‌স্‌ডে-র ড্রাম-ট্রামপেট তারা ভুলে গিয়েছে যে !
যেই ঘুমে ক্লান্ত কপালের ঘাম ভুলে যেতে হয়,
সেই ঘুম– আমি শুধু পেগানের সেই ঘুম চাই !

## নক্ষত্র, কেমন ক'রে জেগে থাকো তুমি ওই আকাশের শীতে

১

নক্ষত্র, কেমন ক'রে জেগে থাকো তুমি ওই আকাশের শীতে।
যখন সকল বাতি নিভে যায়, নক্ষত্র কেমন ক'রে জ্বলো !

আমাদের দ'লে যায় মৃত্যু এসে অন্ধকারে; তারপর, তারে তুমি দলো;
তোমারে তবুও মৃত্যু আমাদের মতো ক'রে একবার চেয়েছে দলিতে !
হিম হাওয়া অন্ধকারে পৃথিবীর রুগ্ন বিরহীরে ব্যথা দিতে
চ'লে আসে,– সে-বেদনা কোনোদিন বুকে তুমি পেয়েছো কি বলো ?
তুমিও জেনেছো ব্যথা হে নক্ষত্র,– নিঃশব্দে তবুও পথ চলো;
যে-ফসল ঝ'রে যায় তার মতো আমাদের হতেছে ফলিতে !

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে কখন জেগেছে বুকে ভয়;
সবুজ পাতার গন্ধে ফুটে ওঠে হলুদ পাতার মতো প্রাণ
এইখানে;– কাস্তে হাতে চারিদিকে ফিরিতেছে এখানে সময় !
দিনেরে ডাকিছে রাত্রি,– মৃত্যু এসে জীবনেরে করিছে আহ্বান
এইখানে;– কখন ফুরাতে হয়,– কখন থামিয়া যেতে হয়–
এই ভয়ে নক্ষত্র তোমার চোখ কোনোদিন হয়েছে কি ম্লান !

২

ঘুমায়ে পড়িতে হবে একদিন আকাশের নক্ষত্রের তলে
শ্রান্ত হ'য়ে– উত্তর মেরুর শাদা তুষারের সিন্ধুর মতন !
এই রাত্রি,– এই দিন,– এই আলো,– জীবনের এই আয়োজন,–
আকাশের নিচে এসে ভুলে যাবো ইহাদের আমরা সকলে !
একদিন শরীরের স্বাদ আমি জানিয়াছি, সাগরের জলে
দেহ ধুয়ে;– ভালোবেসে বুঝিয়াছি আমাদের হৃদয় কেমন !
একদিন জেগে থেকে দেখিয়াছি আমাদের জীবনের এই আলোড়ন,
আঁধারের কানে আলো– রাত্রি দিনের কানে কতো কথা বলে

শুনিয়াছি;– এই দ্যাখা– জেগে থাকা একদিন তবু সাঙ্গ হবে,–
মাঠের শস্যের মতো আমাদের ফলিবার রয়েছে সময়;
একবার ফ'লে গেলে তারপর ভালো লাগে মরণের হাত,–
ঘুমন্তের মতো ক'রে আমাদের কখন সে বুকে তুলে লবে !–
সেই মৃত্যু কাছে এসে একে-একে সকলেরে বুকে তুলে লয়;–
সময় ফুরায়ে গেলে সবচেয়ে ভালো লাগে তাহার আস্বাদ !–

৩

যতোদিন আলো আছে আমাদের জাগিবার শেষ অবসর
যতোদিন রয়েছে এ পৃথিবীতে,– উচ্ছৃঙ্খল সৃজনের পানে
আমরা তাকায়ে রবো ততোদিন;– যদি কোনো শৃঙ্খলার গানে
আকাশ ভরিতে পারি,– শান্ত ক'রে দিতে পারি পৃথিবীর জ্বর
আমাদের গানে যদি;– হাত ধ'রে আসিয়াছি তাই পরস্পর !
একদিন অন্ধকারে মৃত্যু এসে কথা কবে আমাদের কানে,–
জানি না কি ? আজ তবু আসিয়াছি হে জীবন, তোমার আহ্বানে !

ঘুমের সান্ত্বনা ভুলে জেগে আছি বেদনার গহ্বরের পর !

জেগে আছি ধীর চোখে; – তাহাদের স্থির আলো ল'য়ে
আকাশে নক্ষত্র জাগে শৃঙ্খলায় আকাশের নক্ষত্রের সাথে;
তাহাদের ছন্দ এনে সৃজনের অন্ধকারে যদি স্থির হ'য়ে
আমরা জ্বলিতে পারি; যদি পারি নক্ষত্রের মতন জ্বালাতে
পৃথিবীরে;– আগুনের অসহিষ্ণু স্ফুলিঙ্গের মতো আজ দ'হে
তারার আলোর মতো জ্বলিয়া উঠিতে পারি যদি কালরাতে !

৪

হৃদয়ের ক্লান্তি ভুলে, সারাদিন জীবনের খেতে কাজ ক'রে,
তারপর– ভালো লাগে পৃথিবীর অন্ধকার,– ঘুমের সময়;
বীজ বুনে শস্য কেটে– তারপর আমাদের প্রাণ ক্লান্ত হয়,
লাঙল পড়িয়া থাকে মাঠে-মাঠে,– তারার আলোয় থাকে প'ড়ে
তখন হাতের কাস্তে;– ঘুমন্ত দ্যাখে না সেই তারার আলোরে !
যখন অনেক ঘুম পৃথিবীতে আমাদের বুকে জন্ম লয়;
পৃথিবীর ফসলের খেতে ব'সে অবসাদ জেনেছে হৃদয়
আমাদের দুই চোখ তাই ঘুমে আরো ঘুমে উঠিয়াছে ভ'রে !

পৃথিবী বিদায় ল'য়ে দূরে– দূরে– আরো দূরে– দূরে চ'লে যায়,
তাহার পায়ের শব্দ তারপর থেমে যায় নক্ষত্রের তরে;
তারার আলোর মতো দিনের আলোর কাছে লয়েছি বিদায়,
স্থির নক্ষত্রের মতো ঘুমায়ে রয়েছি ধীর নদীটির জলে;
ঘুমের সান্ত্বনা শান্তি পাবে ব'লে সকলেই ক্লান্ত হ'তে চায়,–
ব্যথা পেতে চায় গিয়ে একবার পৃথিবীর ক্লান্তি– কোলাহলে !

৫

অন্তরে চাই না তাপ,– হৃদয়ে তারার মতো স্থির আলো চাই;
শান্তির বীজের মতো ছড়ায়ে থাকিতে চাই পৃথিবীর পরে !
সকল সাম্রাজ্য রাজ্য সিংহাসন আমাদের মন ক্লান্ত করে,
আকাশের নক্ষত্রের তলে এসে তারপর আমরা দাঁড়াই !
দুই চোখ মেলে জেগে যেই তৃপ্তি পৃথিবীতে কেহ পায় নাই,
যেই শান্তি যে-সান্ত্বনা র'য়ে গেছে মরণের ঘুমের ভিতরে,
তাহার আস্বাদ পেতে চ'লে আসি শান্ত এক আকাশের তরে !–
ধীর নক্ষত্রের তলে জেগে-জেগে আকাঙ্ক্ষা মিটাই;
এই ভালো,– নক্ষত্রের স্থির আলো– পথিকের চোখের ধীরতা;
পৃথিবীর কোলাহলে জাগিবার যতোটুকু রয়েছে সময়–
তাপ নয়,– জ্বালা নয়,– তারা মতন আলো আর নিশ্চয়তা
আকাশের বুক থেকে চেয়ে নিয়ে আমাদের স্থির হ'তে হয় !

অসহিষ্ণু পৃথিবী কি কোনোদিন শুনিতেছে জীবনের কথা ?
উচ্ছৃঙ্খল পৃথিবী কি কোনোদিন ভুলে যায় মরণের ভয় !

৬

নক্ষত্র হারায়ে ফেলে কোনোদিন যদি তার হৃদয়ের জ্যোতি,
সিন্ধুর সুরের ছন্দ অন্ধকারে কোনোদিন যদি স্তব্ধ হয়,
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা যদি এই পৃথিবীর বুকে লেগে রয়,
প্রাণেরে শাসন করে কোনোদিন যদি মৃত্যু– নিরাশা– নিয়তি,
যদি পথ বুজে যায়,– স্তব্ধ হ'য়ে থেমে যায় পথিকের গতি,
ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমাবার অবসর খুঁজে ফেরে যদি এ-হৃদয়,–
তা হ'লে প্রেমেরে সে কি হারায়েছে ?– জীবনের সাথে কথা কয়
যেই প্রেম,– যার দুটি হাত ধ'রে ভুলে যাই পৃথিবীর ক্ষতি;
কোনো দূর আকাশের নক্ষত্রের বুক থেকে পৃথিবীতে তারে
আমরা ডাকিয়া আনি,– সে আসিবে কবে ?– তার অপেক্ষায় থেকে
মানুষ জাগিয়া রয়;– মানুষের মতো আর কে জাগিতে পারে
প্রেমের প্রতীক্ষা ক'রে,– হে প্রেম,– তোমারে ডেকে-ডেকে !
আমাদের সব আলো নিভে যায় আমাদের সব দীপাধারে,–
হৃদয়ের অন্ধকারে তারার মতন আলো ল'য়ে জ্বলিবে কে !

৭

তুমিও মৃত্যুর মতো ওহে সিন্ধু ওই দূর উত্তর মেরুর,–
জীবনের ঘণ্টা নিয়ে কেউ গিয়ে তোলে নাকো কোনো কোলাহল
তোমার বুকের পরে,– মৃত্যুর চুমোর মতো ঘুমন্ত শীতল
তোমার হৃদয় এই;– আকাঙ্ক্ষা নাইকো তার,– কোনো এক দূর
অধীর করে না তারে;– আমাদের অন্তরের অসহিষ্ণু সুর
শোনে না সে,– খোঁজে না সে অবসাদে অন্য-এক আকাশের তল !
তারার আলোর নিচে প'ড়ে আছে শান্ত হিম সমুদ্র ধবল !
জীবনের সব শ্রান্তি শেষ হ'লে মরণের মতন মধুর
যেই অবসর আসে তারার আলোর তলে আমাদের তরে
কোনো এক শীতরাতে পৃথিবীর অন্ধকার ঘুমের জগতে,–
তখন তোমার মতো হে সমুদ্র, আমরা ঘুমাই পরস্পরে !
তখন জানি না আর,– জানিতে চাহি না আর পৃথিবীর পথে
কারা সব জেগে আছে !– জানিতে চাহি না কারা কোলাহল করে !
অথবা ঘুমায় কারা ক্লান্ত হ'য়ে তুষারের সমুদ্রে পর্বতে !–

৮

আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে মুছে ফেলে তুমি যাও চ'লে
হে সময়,– সিন্ধুরেও তুমি এসে একদিন স্তব্ধ ক'রে যাও;
ডুবায়ে নিভায়ে যাও সবি তুমি,– তুমি এসে সকল ফুরাও:

তুমি একা জেগে থাকো হে সময়, সকলের জাগা শেষ হ'লে !
পথে-পথে প'ড়ে যায় পথিকেরা,– তবু তুমি পড়ো নাকো স্খ'লে !
সবারে ভুলায় মৃত্যু;– হে সময়, তুমি নিজে মৃত্যুরে ভুলাও !
হে পথিক, মৃত্যুর সান্ত্বনা ভুলে আর কোন্ শান্তি তুমি চাও ?
কোন্ স্বস্তি জেগে থেকে ? বলো তুমি কোন্ স্বাদ একা জ্ব'লে-জ্ব'লে !

আমরা জেনেছি ক্লান্তি,– তাই ভালোবাসিয়াছি ঘুমের সময়,
আলো আর অন্ধকারে অসংযত সমুদ্রের মতো ঢেউ তুলে
অনেক আকাশ খুঁজে ছুটে-ছুটে তারপর দুই চোখ অবসন্ন হয় !
নক্ষত্র– পৃথিবী– সিন্ধু– ঘুমে তাই একে-একে পড়িতেছে ঢুলে,
তোমার পায়ের পথ প্রতীক্ষায় প্রেমিকের মতো জেগে রয় !
তোমার মতন সে-ও ভুলে গেছে ঘুম, গেছে মরণেরে ভুলে !–

৯

আমি যদি কোনোদিন চ'লে যাই এই আলো অন্ধকার ছেড়ে,
চ'লে যাই যদি আমি অন্য এক অন্ধকার– আলোর আকাশে,
পায়ের অক্ষর যদি মুছে যায় যদি এই ধুলোমাটিঘাসে,
ওগো পথ,– একজন চ'লে যাবে তবে শুধু,– পাবে অনেকেরে
তোমার বুকের কাছে তবু তুমি;– কখন যে ক্লান্তি এসে ঘেরে
আমাদের,– কখন জড়ায়ে পড়ি অবসাদে– সময়ের ফাঁসে !–
কখন পাতার মতো খ'সে যাই ক্ষ'য়ে যাই উত্তর বাতাসে !
কখন মাছির মতো আমাদের মৃত্যু এসে নিয়ে যায় কেড়ে

আমরা জানি না কিছু;– একদিন ওগো পথ,– যাই যদি চ'লে,–
শীতরাতে স্থির নক্ষত্রের তলে আসে যদি ঘুমের সময়,
মনে হয় যদি ওই আকাশের নক্ষত্রের সাথে শেষ হ'লে
মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়– শান্তি তবে হয়,–
সেই কথা কে শুনিবে সেইদিন !– তখন যে ঘুমায়ে সকলে;
আমার পায়ের পথ পৃথিবীর সে কি তবু কান পেতে রয় !

১০

দূর পথে জন্ম নিয়ে রহিতাম যদি আমি– কাফিরের ছেলে !
সবুজ শাখার মত সেইখানে মানুষের হৃদয় সচ্ছল,
অন্তরের অবসরে শান্ত হ'য়ে আছে সেই আকশের তল,–
বুক থেকে আমাদের আজিকার পৃথিবীর ফাঁস খুলে ফেলে
সেইখানে ব'সে যদি রহিতাম বালকের মতো অবহেলে !
সেইখানে কোনোদিন এই চূর্ণ পৃথিবীর কোনো কোলাহল
কেউ গিয়ে শোনে নাকো;– শুদ্ধ হ'য়ে ধরণীর সমুদ্রের জল
যেই সাধ পূর্ণ করে অন্ধকারে আকাশের নক্ষত্রেরে পেলে

আমিও তেমন ক'রে অসহিষ্ণু হৃদয়ের অন্বেষণ ভুলে,
সেই দূর আকাশের আলো আর আঁধারের সাথে এক হ'য়ে
রহিতাম সেইখানে জীবনেরে শিশুর মতন বুকে তুলে !
কাফির ছেলের মতো রহিতাম সে-অনেক অবসর ল'য়ে;
জন্মাতাম যদি আমি দূর পথে সকল শৃঙ্খল খুলে-খুলে,–
প্রভাতের সমুদ্রের শাদা ফেনা– সচ্ছল জলের মতো ব'য়ে !

১১

লাল মানুষের মতো সমুদ্রের শঙ্খ আর ঝিনুক কুড়ায়ে
রবো আমি ওই সমুদ্রের পাশে তাহাদের অবকাশ লয়ে;
সেইসব মানুষের ভিড়ে গিয়ে তাহাদের মতো আমি হ'য়ে
শরীর ভাসায়ে দেবো তাহাদের মতো আমি সাগরের গায়ে !
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ছুটে গিয়ে ল'বো আমি হৃদয়ে জড়ায়ে
সমুদ্রের শাদা ফেনা– আমি সেই সাগরের পারে যাবো র'য়ে
সব ভুলে;– আমি এই এখানের পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষ'য়ে
ঢেউয়ের মতন গিয়ে লুটায়ে পড়িবো সেই পৃথিবীর পায়ে !

সেখানে অনেক আলো জেগে ওঠে পরিচ্ছন্ন ভোরের আকাশে,
হাতের শাঁখের মতো তাহাদের সেইখানে সিন্ধু গায় গান !
তারার আলোয় ভেসে সেইখানে পরিষ্কার রাত্রি চ'লে আসে,
নক্ষত্র সিন্ধুর মতো সেইখানে জেগে আছে মানুষের প্রাণ !
শাদা ফেনা শঙ্খ ল'য়ে ভুলে আছে,– হৃদয়ের সান্ত্বনা আশ্বাসে
ব'সে আছে,– বেঁচে আছে পরিচ্ছন্ন আকাশের রাত্রির সমান !

১২

আবার দেখেছি স্বপ্ন কাল রাতে,– নক্ষত্রের আলোয় শীতল
আকাশ ছড়ায়ে ছিলো শান্ত হ'য়ে,– মৃত্যুর মতন স্তব্ধ হ'য়ে;
পৃথিবীর বুক থেকে কে আমারে নক্ষত্রের কাছে ডেকে ল'য়ে
চ'লে গেলো;– সেখানে আকাশে আর ছিলো নাকো কোনো কোলাহল !

তারে আমি বলিলাম, 'আমিও তো খুঁজেছি এ-আকাশের তল,–
সহিষ্ণু নদীর মতো ঘুম ভুলে সবচেয়ে ক্লান্ত পথ ব'য়ে,
পৃথিবীর অন্ধকার পথে ঘুরে মানুষের মতো ব্যথা স'য়ে
খুঁজেছি তো:– চেয়ে আমি দেখিলাম চোখে তার ভ'রে আছে জল !

চোখ বুজে আমার এ-করতল সে কেবল টেনে নিলো বুকে,
আর কিছু বলিলো না;– বলিবার কি যে ছিলো গেলাম তা ভুলে;
নক্ষত্রের কোলে থেকে পৃথিবীর মানুষের মতন অসুখে
বুক তার ভ'রে আছে !– পৃথিবীর পার থেকে নিলো তাই তুলে
সে আমারে;– যেই বিরহের ব্যথা জেনেছি লাগিয়া আছে মুখে,–
তারি বোধ অনুভূতি জেগে আছে তার চোখে নক্ষত্রের কূলে–!

১৩

অনেক অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছো তুমি এই পৃথিবীর পারে,
নক্ষত্রের কাল শুনে এক হ'য়ে আকাশের নক্ষত্রের সাথে
জেগে আছো, হে মানুষ,– তুমি এই পৃথিবীর অন্ধকার রাতে;
কাহার পায়ের শব্দ শুনেছো কোথায় তুমি !– কবে তুমি কারে
দেখেছো তোমার মতো ব'সে আছে !– দেখিয়াছো কোন দেবতারে
যন্ত্রণার ক্রুশ ল'য়ে স্তব্ধ হ'য়ে চোখ বুজে একাকী– দাঁড়াতে
তোমার মতন এসে !– দেখেছো কি পরস্পরে হাত ধ'রে হাতে
যতোদিন জেগে আছে পৃথিবীর নদী আর পর্বতের ধারে !

আকাশ হতেছে ক্লান্ত,– আকাশের সব তারা অবসন্ন হয়;
আকাশের বুক থেকে পুরাতন দেবতারা পড়িতেছে খ'সে;
মৃত্যু শুধু জেগে আছে,– মৃত্যুর মতন জেগে রয়েছে সময়;
তাহাদের সাথে তুমি সহিষ্ণু মানুষ হ'য়ে রহিয়াছো ব'সে,–
বেদনার পরে শান্তি– হাতাশার শেষে এক আশা জেগে রয়
যখন নিয়তি নিজে একদিন ম'রে যায় নক্ষত্রের দোষে– !

১৪

কোথায় পেয়েছো তুমি হৃদয়ের স্থির আলো পৃথিবীর কবি !
নক্ষত্র ধরেছে হাত ধীর হ'য়ে আকাশের নক্ষত্রের সাথে
যেই শান্তি শৃঙ্খলার গান গেয়ে কোনো এক তুষারের রাতে,–
যখন নিয়তি-ব্যথা অন্ধকার পৃথিবীতে উঠেছে বিক্ষোভি;
ঘুমায়ে পড়েছে প্রেম ক্লেশ পেয়ে মৃত্যুর শীতল চুমা লভি;–
তখন তাদের মতো জেগে আছো হাত রেখে নক্ষত্রের হাতে !
সময় ফুরায়ে যায়,– আকাশের ছন্দ তবু পারে কি ফুরাতে !–
শুদ্ধ পুরোহিতদের মতো ওই নক্ষত্রেরা যায় যারে ভবি

পরিচ্ছন্ন আকাশের পারে এসে ! পৃথিবীর অন্ধকারে ঢেকে
আকাশের নক্ষত্রের তলে এসে হৃদেয়র অবসর নিয়ে
পূজা করে যারে মধ্য সিন্ধু তার পবিত্র জলের অভিষেকে !
পৃথিবীর মানুষের ভগ্ন ভাষা হে কবি, তোমার আলো দিয়ে
গহ্বরের নগ্নতারে পূর্ণ ক'রে নিয়ে তার প্রার্থনা কি শেখে
পৃথিবীর ক্লান্ত মানুষের দল, হে কবি, তোমার কাছে গিয়ে !

১৫

পৃথিবীর সাথে চ'লে ক্লান্ত হ'য়ে খুঁজি নাকো তবু অবসর;
কারণ,– দিনের পরে রাত আসে,– ল'য়ে আসে তার নিশ্চয়তা
জীবনের পরে মৃত্যু;– যতোদিন জেগে আছি নক্ষত্রের প্রথা
কে করিবে বিশৃঙ্খল ?– যতোদিন সমুদ্রের শাসনের স্বর

জেগে আছে,– যতোদিন দিনরাত হাত ধ'রে চলে পরস্পর
চোখ বুজে মেনে নিতে হবে এই পৃথিবীর তীক্ষ্ণতা-খর্বতা
ধীর মানুষের মতো;– সারাদিন পথে চ'লে সকলের কথা
শুনে নিয়ে তারপর অন্ধকারে খুঁজে নেবো আমাদের ঘর;

ঘুমাবার অবসর এর আগে খুঁজিবে কে পৃথিবীর পথে !
যেই বীজ বুনে গেছি তার শস্য একবার নিতে হবে কেটে,
একবার সৃজনের নিয়মের অর্থ বুঝে নেবো ভালোমতে,
তার শৃঙ্খলার সাথে হৃদয়েরে নিতে হবে ভালো ক'রে এঁটে;
জীবনের সাথে-সাথে ফিরে-ফিরে পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
ঢেউয়ের ফেনার মতো তারপর তৃপ্ত হ'য়ে ঘুমাবো সৈকতে !

১৬

এ-হৃদয় শুধু এক সুর জানে,– সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো শুধু এক গান
জানি আমি;– ভুলিয়া গিয়াছি আমি পৃথিবীর– আকাশের আর সব ভাষা;
চিনেছি তোমারে আমি সকলের মাঝখানে,– জেনেছি তোমার ভালোবাসা !
জীবনের কোলাহলে সবচেয়ে আগে গিয়ে তোমারেই করেছি আহ্বান !
দিন নিভে গেলে পরে রহিয়াছে অন্ধকার আকাশের বুকে যেই স্থান
স্থির নক্ষত্রের তরে,– সিন্ধুর ঢেউয়ের বুকে রয়েছে যে-ফেনার পিপাসা,
মানুষের বেদনার গহ্বরের অন্ধকারে আলোর মতন যেই আশা
জেগে থাকে,– হলুদ পাতার বুকে লেগে থাকে যেই মিষ্ট মরণের ঘ্রাণ

কোনো এক শীতরাতে;– আমার হৃদয়ে এসে তুমি জেগে রয়েছো তেমন !
পৃথিবীর শুদ্ধ পুরোহিতদের মতো ওই প্রভাতের সমুদ্রের জল
ওই দূর আকাশের বুক থেকে মুছে ফেলিতেছে সব আঁধার যেমন
তুমিও ফেলেছো ধুয়ে বুক থেকে সব ব্যথা– সব গ্লানি– কলঙ্ক সকল !
তুমি জেগে আছো ব'লে আমি এই পৃথিবীতে জাগিবার করি আয়োজন,
যখন ঘুমায়ে যাবে তোমার বুকের পরে মৃত্যু হ'য়ে ঘুমাবো কেবল !–

১৭

বাহিরের ডাক ছেড়ে একদিন রাত্রির পাখির মতো ঘরের ভিতর
চ'লে গেছিলাম আমি,– সেইদিন ভালো লেগেছিলো শান্তি সান্ত্বনার স্বাদ
তুমি কাছে ছিলে ব'লে;– তাই মনে হয়েছিলো মানুষের হৃদয়ের সাধ
যে ভালোবেসেছে তার ভালোবাসা ল'য়ে শুধু একখানা ঘর
বাঁধিয়া রাখিতে চায়;– নির্ভর করিতে চায় হৃদয়ের প্রেমের উপর !
কারণ, তারার মতো স্থির প্রেম,– বালির মতন এই পৃথিবীর বাঁধ
ধ'সে পড়ে চারিদিকে;– প্রেম যে দিয়েছে তারে মনে-মনে করি আশীর্বাদ
আছো আমি,– ভালোবেসে মনে পড়ে কাটায়েছি রাত আর দিন পরস্পর

আমরা দুজনে;– আজ তুমি চ'লে গেছো– ফ'লে গেছে যে-এক ফসল,–
ঝ'রে গেছে;– চারিদিকে ধোঁয়াধুলো– পৃথিবীর প্রতিহত মানুষের ভিড়,–
আমিও এসেছি আজ তাহাদের মাঝখানে– পূর্ণ ক'রে তাহাদের স্থল;
তবুও আমারে যদি ডেকে নাও পথ থেকে আমি প্রিয়া রবো কি বধির !
সারারাত ঢেউ তুলে ক্লান্ত হ'য়ে নক্ষত্রেরে ডাকে ওই সমুদ্রের জল,–
দূর আকাশের পর তোমার মতন প্রিয়া তবুও নক্ষত্র থাকে স্থির !

১৮

জীবনের যতোদিন কেটে গেছে অন্ধকারে একবার তাহাদের স্মৃতি
ভাসিয়া উঠিলো মনে;– তখন শীতের রাত, গাছের শাখার থেকে ঝরে
শিশির– হলুদ পাতা;– মরণের গন্ধে এই পৃথিবীর নদী মাঠ ভরে,
হৃদয়ের মাঝখানে শূন্য এক গহ্বরের মতন বিকৃতি
জেগে থাকে;– অন্ধকারে প'ড়ে থেকে একাকী শিশুর মতো বুকে জাগে ভীতি !
আমার যে-দিনরাত্রি ফুরায়েছে একবার তাহাদের কথা মনে পড়ে;
প্রেম ল'য়ে যে এসেছে একদিন, তারপর চ'লে গেছে– আমি তার তরে
একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখি চারিদিকে,– আকাশের নক্ষত্রসমিতি

হারায়ে গিয়েছে কোথা ?– চেয়ে দেখি কোনো দিকে কেউ নেই, কিছু নাই আর !
তোমার পায়ের শব্দ কখন থামিয়া গেলো চোখ বুজে একবার তাই
ভেবে দেখি,– চোখ মেলে জেগে দেখি আকাশের বুকে আরো জমেছে আঁধার !
নিঃসাড় মাঠের পর আড়ষ্ট নদীর পর কিছু নাই,– কেউ আর নাই !
মরণের হাতে তাই অবসন্ন হ'য়ে আমি হাত তুলে দিলাম আমার,
চেয়ে দেখি প্রেম তুমি পাশে এসে দাঁড়ায়েছো, মৃত্যু দ'হে হ'য়ে গেছে ছাই !

১৯

একদিন, মনে আছে সে এক বিস্তৃত রাতে জেগে থেকে বলিয়াছি আমি,
'কোন্ দূর নক্ষত্রের ফাঁস খুলে পৃথিবীর পারে নেমে এলে মহীয়সী,
আড়ষ্ট শীতের রাতে আকাশের কোল থেকে বলো কেন পড়িয়াছো খসি
পবিত্র তারার মতো আলো ল'য়ে মানুষের দারিদ্র্যের মাঝখানে নামি' !
– এখানে ফুরায় সব,– শূন্য নয়,– স্তব্ধ হয় সব শক্তি,– যায় সব থামি,
হৃদয় কাতর হ'য়ে তৃপ্তি চায় অন্য নিঃসহায় হৃদয়ের পাশে বসি,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো এইখানে ইচ্ছা শুধু একবার উঠিবে উচ্ছ্বসি,
তারপর, ভেঙে যাবে;– প্রেম নয়,– কিন্তু মৃত্যু আমাদের সকলের স্বামী– !

তোমার নক্ষত্র ছেড়ে কেন তুমি আমাদের মাঝখানে এই পৃথিবীতে
চ'লে এলে ?– কোন্ স্থির নক্ষত্র যে কতোদূরে তোমার আশায় জেগে রয় !
জানে সে কি নামিয়া এসেছো তুমি নষ্ট খেতে আড়ষ্ট মাঠের এই শীতে ;
'হে প্রেম, তোমারে খুঁজে' অনেক নক্ষত্রে গিয়ে তারপর থামিতে যে হয়
তোমার বুকের পরে;– যেইখানে জেগে আছো সেইখানে হয় যে জাগিতে,
যেইখানে ঘুমায়েছো সেইখানে ওগো প্রেম মৃত্যু খুঁজে লয় যে হৃদয় !'

২০

সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর দিন আর রাত্রি শুধু করে কোলাহল,
মাঝে-মাঝে শুধু এক অসম্ভব নিঃশব্দতা পৃথিবীর পথে জন্ম লয় !
কান পেতে শুনি যেন সেই কালে জীবনের খেতে-খেতে যেতেছে সময়
বীজ বুনে;— পৃথিবীর পথে-পথে ব্যস্ত হ'য়ে চলিতেছে তাহার লাঙল !
অনেক নক্ষত্র ল'য়ে সে-সময় ভরপুর হ'য়ে থাকে আকাশের তল,—
মনে হয় কোনোদিকে কোনো ক্ষতি হয়নিকো,— কারু যেন হয় নাই ক্ষয়,—
ছড়ায়ে রয়েছে শুধু চারিদিকে আমাদের জীবনের অনেক বিষয় !
চারিদিকে খুঁজে পাওয়া যায় ঢের আমাদের হৃদয়ের ভরসার স্থল !—

কোনোদিন ঝরে না যা,— স্থির হ'য়ে পরিচ্ছন্ন আকাশের মতো টিকে থাকে,
প্রেম— আশা,— আমাদের তুলে দেই সে-সময় একেবারে তাহাদের হাতে;
সময় অধীর হ'য়ে চ'লে যায়;— জানি,— তবু অন্তরের এই ধীরতাকে
যখন সে শ্রদ্ধা করে কোনো এক শান্ত দিনে,— হেমন্তের কোনো এক রাতে;—
তখন সে রেখে যায় মুখোমুখি হে জীবন, ওগো প্রেম তোমাকে-আমাকে !
সময় না ফুরাবার আগে আর আমরা কি আমাদের পারিবো ফুরাতে !

২১

মৃত্যুরে বেসেছি ভালো সকলের আগে আমি,— মৃত্যুরে তবুও করে ভয়;
কখন অনেক পথ ঘুরে এসে ক্লান্ত হ'য়ে তারপর আর একবার
আমার শীতল হাত খুঁজে তুমি— ভুল ক'রে মরণের কান্তের ধার
হৃদয়ে তুলিয়া লবে;— জেগে আছি তাই আমি,— অন্তরের সকল বিষয়
ছড়ায়ে রেখেছি আজ;— কখন আসিবে তুমি,— কোথায় পায়ের শব্দ হয়,—
অপেক্ষায় ব'সে আছি;— যদিও লেগেছে ভালো মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধার !
ঘুমের সময় তবু সব শেষে,— তার আগে পৃথিবীতে জেগে প্রতীক্ষার
অনেক সময় থাকে,— অনেক আড়ষ্ট রাত তার আগে মাঠে প'ড়ে রয় !

তার আগে আকাশের কাছে ঢের প্রশ্ন থাকে,— নক্ষত্রের সাথে কতো কথা
থেকে যায়,— পৃথিবীর পথে-পথে মিছেমিছি হাঁটিবার কতো অবসর
প'ড়ে থাকে;— তার আগে মৃত্যু নয়,— কেবল মৃত্যুর মতো এক নিঃশব্দতা
আপনার স্থল খুঁজে চেপে থাকে পথিকের হৃদয়ের পর;
যতোদিন জেগে আছি পৃথিবীতে তুমি তবু আসিলে না কেন বলো তো তা—
তুমি বলিলে না কিছু,— প্রশ্ন করি,— আকাশের নক্ষত্রও দিলো না উত্তর !

২২

সমুদ্রের পারে এই নক্ষত্রের তলে যদি আজ আমি শেষ হ'য়ে যাই,—
ঘুমাবার আগে তবু মনে রবে পৃথিবীতে কোথায় আমার ছিলো স্থল;
আমি এখানের নই,— এই তারা, আর এই বিদেশের সমুদ্রের জল,—
তোমাদের কাছে এসে এইখানে যদি আজ অন্তরের সকল হারাই;

যাহাদের ভালোবেসে গেছি আমি একদিন পৃথিবীতে– সেই বোনভাই
জেগে আছে,– জড়ায়ে রয়েছে আজ অন্ধকারে অন্য এক নক্ষত্রের তল,
ঘুমায়েছে,– তারার আলোয় আজ হ'য়ে গেছে তাহাদের হৃদয় শীতল
হয়তো বা;– তারা যাহা জানিয়াছে– বুঝিয়াছে– জানিয়াছি আমিও তাহাই;

আমি সেই বাংলার,– সেইখানে চোখ মেলে একদিন দেখিয়াছি ঘাস
উঠেছে সবুজ হ'য়ে,– হৃদয়ের শান্ত আকাঙ্ক্ষার মতো ঢুলে কাছে এসে
মাঠে পথে ধুলোমাটি সেইখানে একদিন নিজেদের করেছে বিকাশ
আমার বুকের কাছে,– তাহাদের আরো ঢের কথা ছিলো থেমে গিয়ে শেষে !
পরিচ্ছন্ন আলো ল'য়ে ভোরবেলা দ্যাখা দিয়ে গেছে সেই দেশের আকাশ,–
আমি সেই বাংলার,– তাহার মাটির মতো ঘ্রাণ ল'য়ে ফলেছি যে-দেশে– ।

২৩

যেদিন ফুরাবো আমি পৃথিবীতে,– ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘুমাবো আবার,–
তখন হয়তো সেই আকাশের বুক থেকে শেষ রোদ লয়নি বিদায়,–
চোখ মেলে দেখিবো তা;– আমার এ-শরীরের চারিপাশে সবজির গান শোনা যায়
কান পেতে শুনিবো তা;– সেদিনো সবুজ দেহ,– তার 'পরে সবুজ পাতার
ছায়া এসে পড়িয়াছে হয়তো বা;– সেইদিন কোনো এক শাখা এসে তার
হৃদয়ের সবটুকু সচ্ছলতা নুয়ে প'ড়ে একবার আমারে জানায়
হয়তো বা;– ঘাসের উপরে শুয়ে সেইদিন জীবনের শেষ স্বাদ পায়
এ-হৃদয়,– চোখ মেলে রুধিরের সচ্ছলতা বুঝিয়া নিতেছি শেষবার

সেইদিন;– যতোদূর দ্যাখা যায় জেগে আছে বাংলার বিস্তৃত আকাশ,
দিনের সকল শেষ রৌদ্র ল'য়ে আমার চোখের দিকে রয়েছে তাকায়ে,–
চোখ মেলে দেখি যদি;– যদি চোখ বুজে ফেলি তবু এই রহিবে আশ্বাস :
বাংলার মাঠে শুয়ে ঘুমায়েছি,– তাহার দিনের আলো লাগিয়াছে গায়ে,
তাহার সবুজ পাতা শাখা রোদ পাখি এসে শেষ ঘুম গিয়েছে পাড়ায়ে,
ফুরায়ে গিয়েছি তার নক্ষত্রের তলে,– তার ঘাসে আমি হ'য়ে গেছি ঘাস– ।

২৪

পৃথিবীর যেই পারে থাকি আমি এই কথা আমার তবুও মনে রবে :
সেই এক সমুদ্রের ধারে আমি তোমারে এসেছি ফেলে,– আমি এক-জনা
একদিন বিদেশের এই আকাশের তলে আমি ক্লান্ত হ'য়ে আর রহিবো না;
একদিন আমার সে-আকাশের পরিচিত নক্ষত্রের তলে যেতে হবে !
সেখানে শীতল রাত্রি জেগে থেকে পরিষ্কার শিশিরের জলে ধুয়ে লবে
তখন আমারে;– অনেক আকাশে ফিরে হৃদয়ে জাগিয়া গেছে যেই উত্তেজনা
শান্ত ক'রে দেবে সব;– (দেশের সবুজ মাঠ হয়তো তবুও সেই ব্যথা জানিতো না,
বালকের মতো আমি পথ থেকে স'রে গিয়ে সেই ব্যথা শিখেছি যে কবে !–
জানিবো না;)– আলো আর অন্ধকারে আশ্বাসে রয়েছে ভ'রে তবুও হৃদয়,

অনেক ভিড়ের থেকে ফিরে এসে পৃথিবীর পথ থেকে ছুটি ল'য়ে আমি
ফুরায়ে ফেলিবো এক শেষ সাধ,– ক'রে লবো এক শেষ আকাঙ্ক্ষার ক্ষয়;
শীতের নদীর মতো এক শেষ ঢেউ তুলে যাবো আমি থামি
এই বাংলার পথে,– ছড়ায়ে ফেলিবো আমি অন্তরের সকল বিষয়
এইখানে,– যখন সকল পথ দেশের মাঠের পথে এসে শেষ হয়– ।

২৫

যদি আমি গেয়ে থাকি বাংলার পরিষ্কার আকাশের নক্ষত্রের গান,–
সবুজ শাখার গন্ধ– তাহার পাতার ছায়া– এই তার মাঠের আস্বাদ,
তাহার নদীর জল– ফসল শিশিরে ভেজা– কাস্তের মতো তার চাঁদ
হেমন্তের হাত ধ'রে সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিতেছে যখন অঘ্রান
মাঠে-মাঠে,– যখন আঘাত পেয়ে হলুদ পাতার সাথে খ'সে পড়ে ধান
এক খেতে,– তারপর অন্য এক খেতে পেঁচা উড়িতেছে যখন অবাধ,
আমাদের আকাশের এই সব নিঃসঙ্গতা– নিঃশব্দতা– আঘ্রাণের সাধ
সবজির পরিপূর্ণ ভাঁড়ারের মতো আজ ভ'রে ফেলে যদি এই প্রাণ,–

তাহলে লেগেছে ভালো এই মাঠ, এই নদী– এই নিষ্ক্রিয়তার কথা
সবচেয়ে লাগিয়াছে ভালো আজ;– আজ ওই পরিশুদ্ধ আকাশের দিকে
চেয়ে আছি,– পবিত্র শিশির এই– নক্ষত্রের এই বিশুদ্ধতা
হৃদয়ের শান্তি– স্বপ্ন– অবসর, যাহা শুধু বেঁচে থাকে– যাহা থাকে টিকে
তাহাদের ল'য়ে আমি শান্ত হ'য়ে জেগে আছি; এই ভোর-পথের স্তব্ধতা
ইহাদের কাছ থেকে কোনো এক নিশ্চয়তা আজ আমি লইতেছি শিখে– ।

২৬

ডুবারির ছেলেগুলো শঙ্খ ল'য়ে সমুদ্রের ধারে আজ করিতেছে খেলা
যেইখানে,– একদিন– কতো আগে– আমাদের পৃথিবীর স্বচ্ছ এক ভোরে
এই হৃষ্ট শিশুদের মতো এই সাগরের পাশে এসে কোলাহল ক'রে
পৃথিবীর প্রথম মানুষ এক নীল সমুদ্রের সাথে কাটায়েছে বেলা;
প্রথম আকাশ তারে দেখিয়াছে,– হৃদয়ের কাছে তারে পেয়েছে একেলা
প্রথম ঊষার রোদ,– যখন সে এসেছিলো প্রথম বিস্তৃত পথ ধ'রে
আমাদের পৃথিবীর,– সহজ ফেনার মতো যখন সে প্রথম সাগরে
উথলিয়া উঠেছিলো,– হৃদয় সেদিন তার জেনেছিলো এক অবহেলা !

অনায়াস ইচ্ছা কোনো বুকে তার সেইদিন স্ফীত হ'য়ে উঠেছিলো জেগে,
জাগিয়া রহিয়াছিলো সেদিন সে এই তৃণতরুদের সচ্ছলতা ল'য়ে,
আমাদের আজিকার পৃথিবীর কোনো স্রোত– প্রতিরোধ যায় নাই লেগে
সেইদিন বুকে তার;– যেই আলো আর যেই অন্ধকার পড়িতেছে ক্ষ'য়ে
আকাশের বুক থেকে– তাহাদের মতো হ'য়ে– তাহাদের সাথে এক হ'য়ে
সেদিন সে জেগেছিলো সবুজ পৃথিবী– নীল আকাশের মতন আবেগে– ।

২৭

সে-এক বালক আছে কুড়ায় ঝিনুক নুড়ি একাকী সিন্ধুর পারে ব'সে
হাওয়াই দ্বীপের পারে, কিম্বা ফিলিপাইন দ্বীপে,– কিম্বা দূরে আরো !
সেখানে আকাশ নীল,– আকাশের চেয়ে সেই সমুদ্রের নীল আরো গাঢ় !
আকাশের বুকে আজো সেইখানে লেগে আছে পৃথিবীর প্রথম আলো সে !
সেই বালকের বুক ভ'রে আছে মানুষের হৃদয়ের প্রথম সাহসে,
প্রথম সে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আহ্লাদ আজো বুকে জেগে রহিয়াছে তারো !
তেমন সমুদ্র এক রহিতো আমার যদি,– দ্বীপ এক রহিতো আমারো
সাগরের পারে যদি;– আজিকার জীবনের ফাঁস যদি প'ড়ে যেতো ধ'সে

আমিও বালক হ'য়ে তবে সেই দূর দ্বীপে ঢের দূর সমুদ্রের পারে
এখানের পৃথিবীর বুক থেকে স্খ'লে গিয়ে শিখিতাম বিস্ময়ের ভয় !
যখন দিনের আলো আকাশের বুক সাঁতারিয়া মিশে যায় অন্ধকারে,
অথবা নক্ষত্র সব স'রে গেলে যখন হতেছে অন্য আলোর উদয়,
আবিষ্কৃত আকাশের পার ছেড়ে সন্তর্পণে চোখ মেলে দেখিতাম তারে
সাগরের পারে গিয়ে দূর দ্বীপে একবার পথ ভুলে যা দেখিতে হয় !

২৮

শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে,– এক আলো,– রহিয়াছে সে-এক সুন্দর
আকাশে-বাতাসে-জলে-অন্ধকারে আমাদের সব আলোড়ন আয়োজনে
দ্যাখা দেয়;– তাহার ছায়ার মতো আমরা চলিতে চাই তাহার পিছনে !
জল-ধনুকের মতো আকাশের উচ্ছৃঙ্খল মেঘ আর বিদ্যুতের পর
আমরা দেখেছি তারে;– যখন হতাশা সব আমাদের বুকের ভিতর
পুড়ে গেছে– অপেক্ষায় চোখ মেলে– পলাতক বালকের মতো সন্তর্পণে
আমরা দেখেছি তারে;– অধীর বিস্ময় এক জাগিয়াছে আমাদের মনে
তারে দেখে;– পশ্চিম মেঘের দিকে ছুটে যায় বিকালের আলোক যেমন
দিন ক্লান্ত হ'য়ে গেলে,– যেমন নক্ষত্র সব খুঁজে লয় আকাশের তল
পৃথিবীতে রাত্রি এলে;– অশান্ত আকাঙ্ক্ষা ল'য়ে আমরা তেমন
তাহারে খুঁজিয়া পাই;– তখন সরিয়া যায় পৃথিবীর সমুদ্রের জল
স্তব্ধ হ'য়ে;– ভয় পেয়ে চ'লে যায় প্রতিহত অজগর সাপের মতন
পৃথিবীর সব অবসাদ– সাধ,– হৃদয়ের বিহ্বলতা– গহ্বর সকল !

২৯

অনেক শতাব্দী ঝ'রে চ'লে গেছে,– তবু সেই পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
র'য়ে গেছে;– মাথার উপর আজো র'য়ে গেছে সেদিনের বিস্তৃত আকাশ !
যদিও অনেক তৃণ ঝ'রে গেছে,– তবুও মাটির থেকে যে-সবুজ ঘাস
ফ'লে ওঠে তার গন্ধে স্থির হ'য়ে জেগে আছে আজো সেই পুরানো জগৎ !
খুঁজেছি নতুন আলো আমরা আরেক বার,– মনীষার নব-নব মত
খুঁজে দেখিয়াছি সব;– তবু যেন মনে হয় যেই শস্য হ'য়ে গেছে চাষ

তারপর ঝ'রে গেছে,– খেতে মাঠে হইতেছে যেন তার আবার বিকাশ !
তাহার অঙ্কুর ল'য়ে কাজ করিতেছে এই পৃথিবীর সমুদ্র পর্বত–।

সময়ের হাতে তুমি হাত ধ'রে জেগে আছো পৃথিবীর ওগো পুরাতন,
ভবিষ্যৎ বর্তমান স্খ'লে গিয়ে ভ'রে ফেলিতেছে সেই অতীতের স্থল;
যদিও মশাল ল'য়ে আঁধারের আবিষ্কারে চলিতেছে মানুষের মন,
যদিও নতুন দিনে জন্মিয়াছি,– কাঁধে ক'রে আনিয়াছি নতুন লাঙল,
অব্যর্থ অতীত তবু হৃদয়ের পিণ্ডে আজো তুলিতেছে সেই শিহরণ,–
তার ক্রীতদাস হ'য়ে তবু আমাদের অন্তরের রক্ত আজো হ'য়ে যায় জল !

৩০

আলো আর আঁধারের পানে চেয়ে যদিও গাহিতে পারি সে-অনেক গান,
যদিও বীণার তারে বেঁধে নিতে পারি সুর উচ্ছৃঙ্খল মনের মতন,
আজ তবু এক সুর জানি শুধু,– এক গান জানে শুধু মন;
ঢেউয়ের পিছনে ঢেউ ফেনা তুলে ফুলে উঠে করে যে-আহ্বান,
আগুন যে-ক্ষুধা ল'য়ে বুকে তুলে নিতে চায় একবার স্ফুলিঙ্গের ঘ্রাণ,
তোমার পিছনে চ'লে তোমারে বুকের 'পরে তুলে নিতে চেয়েছি তেমন !
তুমি স্খ'লে চ'লে গেছো,– আজ তাই পৃথিবীতে চলিবার করি আয়োজন;
এক পথ চিনি আজ,– এক সত্য– এক আলো– ধ'রে আছি সে-এক নিশান

অনেক পতাকা ছেড়ে;– অনেক আশ্বাস শান্তি সান্ত্বনার পথ থেকে ফিরে
ড্রাগনের দাঁত দিয়ে বীজ বুনে চলিতেছি আজ এই পৃথিবীর পর,
চলিতেছি পথ খুঁজে সে-অনেক বেদনার– সে-অনেক চিলদের ভিড়ে !
তোমার আমার মাঝে অনেক পাহাড় আছে,– রহিয়াছে অনেক সাগর;
বাহির হবে না তুমি যতোদিন তোমারে খুঁজিয়া আমি রহিবো বাহিরে,
যদিও কবরে তুমি প'ড়ে থাকো,– যদিও নক্ষত্রে তুমি বেঁধে থাকো ঘর !

৩১

সমুদ্র

সবুজ মাটির পথে ব'সে আমি দেখিতে চেয়েছি জল,– জলের নিঃশ্বাস
হৃদয়ের রক্তে আমি মিশাতে চেয়েছি এই মাটির ধুলোর পথে ব'সে;
অনেক আকাশ দেখে যেই জল জেগে আছে আকাশের মতন সাহসে,
তাহার হৃদয় থেকে যেই জল খুলে ফেলে গেছে এই পৃথিবীর ফাঁস,
পূর্বের সমুদ্র থেকে যেই জল চলিতেছে পশ্চিমের সমুদ্রের পানে,
উত্তর সিন্ধুর থেকে যেই জল ছুটিতেছে দক্ষিণের সিন্ধুর আহ্বানে,
পৃথিবীর সব শক্তি শেষ হ'লে তবুও হৃদয়ে যার রহিবে ক্ষমতা,
নক্ষত্রে উজ্জ্বল হ'য়ে যেই জন অন্ধকারে নক্ষত্রের সাথে কয় কথা,
আলো আর অন্ধকারে আবিষ্কৃত দ্বীপ-অন্তরীপ ভ'রে গেছে যার গানে !

যেই দ্বীপ দেখি নাই,– যেই অন্তরীপে গিয়ে কোনোদিন পৃথিবীর কেউ

অন্ধ বাতাসের খেদ শোনে নাই সমুদ্রের পারে ভিজা পাহাড়ের পরে,
পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে নাই যেইখানে অন্ধকার ছায়ার গহ্বরে,
সিন্ধুর সাপের মতো ফুলে উঠে সেইখানে তুমি গিয়ে তুলিয়াছো ঢেউ !
বৈকালের অন্ধকারে তীক্ষ্ণ হ'য়ে ফিরিয়াছো তুমি ভিজে বাতাসের সাথে !
মানুষের মতো কাঁদে একা-একা যে-পাহাড় বৈকালের হাওয়ার আঘাতে
তারে তুমি কাঁদায়েছো;– তাহার বুকের পরে ফোঁপায়েছে শিশুর মতন
তোমার বুকের ঢেউ;– একা-একা মানুষের মতো সেই সমুদ্রের মন
নিঃশ্বাসের মতো ভেসে ফিরিয়াছে পাহাড়ের পাশে-পাশে অন্ধকার রাতে–

৩২

সেখানে জন্মেছে ব্যথা,– বুঝেছো তা,– সেইখানে তবু এক জন্মেছে বিস্ময় !
সেই এক দূর দিকে– অন্ধকারে– পৃথিবীর মানুষের অনাহত পথে
এইসব আকাশের পিছে আরো,– অন্য সব নক্ষত্রের সে-এক জগতে
বিস্ময় লয়েছে জন্ম সেইখানে;– সেইখানে জন্মিয়াছে বিস্ময়ের ভয় !
কোনো গ্রীক নাবিকেরা অসময়ে অন্ধকারে সমুদ্রের পথে পথ ভুলে
সেইখানে গিয়েছে কি ? চক্ষুর কোটর থেকে মানুষের মতো চোখ তুলে
অদ্ভুত সমুদ্র এক দেখিয়াছে হয়তো বা পাতালের গহ্বরের পারে !
অবিশ্বাসে চোখ তুলে সেইসব যুবকেরা হয়তো বা দেখেছে তোমারে !
তাহাদের মৃতদেহ ভ'রে গেছে তারপর সমুদ্রের ফুলে– ফেনাফুলে– !

অথবা সিন্ধুর পথে স্বাদ পেয়ে তাহারাও সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
ফিরিয়াছে;– গ্রীক তারা,– সমুদ্রের মতো ঢের ক্ষুধা– ঢের পিপাসার ধার
তাহাদের বুকে ছিলো;– সব নক্ষত্রের শেষে ক'রে গেছে তারা আবিষ্কার
নতুন নক্ষত্র আরো;– পূর্বের সমুদ্র এসে সেইখানে করে আলোড়ন
পশ্চিম সিন্ধুর বুকে,– দক্ষিণ সমুদ্র গিয়ে সেইখানে উত্তর সাগরে
মানুষের মতো ব্যথা-আহ্লাদের আলোড়ন করে,
সেখানে গিয়েছে তারা;– সমুদ্রের যেই জল পৃথিবীর ঘ্রাণ নিতে আসে,
নিঃশ্বাস মিশায় গিয়ে যেই জল আকাশের নক্ষত্রের শীতল নিঃশ্বাসে,
সেখানে গিয়েছে তারা,– তাহাদের সাথে সিন্ধু ভেসে গেছে পশ্চিমে-উত্তরে :–

৩৩

ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো তাহাদের সূর্যের প্রবল আলো,– বিস্তৃত আকাশ
ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো তাহাদের এক পথ হ'তে দূর অন্য এক পথে !
শীতের প্রথম হাওয়া যখন এসেছে ভেসে,– কাঁদিয়াছে প্রথম পর্বতে
যখন শীতের হাওয়া, — যখন শিশির এসে ক'রে গেছে গ্রাস
পাহাড়ের দেবদারু,– কুয়াশার খোঁচা খেয়ে যখন বুজেছে ভিজে শাখা,
সন্ধ্যার পাখির মতো যখন গুটায়ে গেছে অন্ধকার পর্বতের পাখা,–
সিন্ধুর পাখির মতো তখন শুনেছে তারা তাহাদের সমুদ্রের কথা !
রক্তের মতন তাপ যেই ঢেউয়ে,– যেই সমুদ্রের ঢেউয়ে রক্তের তীক্ষ্ণতা,
ঘূর্ণির মতো ক'রে ঘুরায়েছে তারা সেই সমুদ্রের তরঙ্গের চাকা– !

টাইটানের মতো তারা,– প্রথম করেছে এসে সাগরের ফেনার আস্বাদ !
উষ্ণ সমুদ্রের ডাকে দল বেঁধে চ'লে গেছে,– প্রথম ছাড়িয়া গেছে স্থল !
আহত পাখির মতো ব্যথা পেয়ে কেঁদে ওঠে যেইখানে সমুদ্রের জল
ভাঙা পাহাড়ের বুকে; যেইখানে ধ'সে পড়ে পাহাড়ের পাথরের বাঁধ,–
নষ্ট হ'য়ে প'ড়ে যায় পুরাতন দেবতার উপেক্ষিত আসনের মতো;
সমুদ্রের বুকে এসে যেইখানে পৃথিবীর সমুদ্রেরা হতেছে আহত;
বাতাসের বুকে এসে যেইখানে ঝড় তোলে পৃথিবীর সকল বাতাস;
যেখানে সমুদ্র এসে আকাশেরে গ্রাস করে;– যেখানে আকাশ করে গ্রাস
সমুদ্রেরে;– তবুও সমুদ্র জাগে আকাশ সিন্ধুর পিছে জেগে ওঠে যতো !

৩৪

অদ্ভুত সিন্ধুর ঘ্রাণ বুকে ল'য়ে নামিয়া গিয়েছে তারা আশ্চর্য সাগরে,
উপদ্বীপ হ'তে দ্বীপে– এক দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে অন্য এক দূর উপদ্বীপে !–
যেখানে অনেক রৌদ্রে ভরিয়া গিয়েছে দ্বীপ,– যেখানে অনেক অন্তরীপে
সমুদ্র ভরিয়া গেছে;– যেইখানে সিন্ধু শুধু সমুদ্রের বুকে এসে পড়ে,
দৈত্যের হাতের মতো হাত তার তুলে দেয় অন্য এক দানবের হাতে;
যেখানে প্রবল সিন্ধু পরিচ্ছন্ন ভোরবেলা কিংবা এক অন্ধকার রাতে;
জীবন্ত সিন্ধুর ঢেউ মৃত্যুর বিছানা পাতে যেইখানে সমুদ্রের জলে;
নেকড়ের মতো কাঁদে যেইখানে রুষ্ট হাওয়া ব্যথা পেয়ে নক্ষত্রের তলে;
সমুদ্র কেবল চলে,– একদিন চলেছিলো তারা সেই সমুদ্রের সাথে–।

... ...

বিপদ জড়াতে তারা গিয়েছিলো,– বিপদের বুকে যেই রয়েছে বিস্ময়
তাহার আস্বাদ পেতে খুঁজেছিলো দূর মধ্য সমুদ্রের জলের গহ্বর !
যেই নক্ষত্রের খোঁজে সমুদ্র ভাঙিয়া পড়ে অন্য এক সমুদ্রের 'পর;
আকাশের সব নক্ষত্রের শেষে তবু যেই নক্ষত্রের স্থল প'ড়ে রয়;
সবচেয়ে দূর নক্ষত্রের চোখে যেই এক স্বপ্ন ভেসে আসে
আরো দূর নক্ষত্রের;– সব আকাশের শেষে কোনো এক পশ্চিম আকাশে
যে-নক্ষত্র জেগে আছে;– সব সমুদ্রের শেষে কোনো এক পশ্চিম সাগরে
যেখানে দিনের আলো নিভে যায়;– যেখানে সন্ধ্যায় নক্ষত্র স্নান করে
পূর্ব সমুদ্রের মতো তারা ভেসে যেতে চেয়েছিলো সেই দূর পশ্চিমের সমুদ্রের পাশে–।

৩৫

টাইটানের মতো তারা;– টাইটান্ মায়ের মতো হে তুমি সাগর,
প্রথম সে-পৃথিবীর প্রথম সে-আকাশের নক্ষত্রের মাঝখানে এসে
সেইদিন দাঁড়ায়েছে;– টাইটান মায়ের মতো টাইটান সন্তান ভালোবেসে
বিস্তৃত ফেনার জটা এলায়েছে চরে-চরে তাহাদের শরীরের পর !
গ্রীসের পাহাড় সব,– কালো কুয়াশায় ভিজা পর্বতের দেওদার শাখা–
কাঁপিয়া উঠেছে তাই;– পিছনে রয়েছে প'ড়ে তাহাদের এথেন্স-ইথাকা !
পুরোনো বনের গন্ধ– পুরোনো সিন্ধুর গন্ধ ভরা এক মৃত পৃথিবীতে

তোমার জরায়ু থেকে হে সমুদ্র, সেইসব সন্তানের জন্ম তুমি দিতে !
সন্ধ্যার পাখিরে তুমি দিয়েছিলে হে সমুদ্র, সিন্ধুর পাখির মতো পাখা– !

শীতল সমুদ্র ছেড়ে, পাহাড়ের শীত হাওয়া পিছে ফেলে রেখে
এলায়ে দিছিলো ডানা তাই তারা আরো গাঢ় সমুদ্রের দিকে !–
যেখানে সূর্যের আলো স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে সমুদ্রের ফেনার স্ফটিকে,
যেখানে মেঘের ফেনা সমুদ্রের মতো নীল আকাশেরে রাখিতেছে ঢেকে,
আফ্রিকার কাছাকাছি– হয়তো বা সমতল এশিয়ার পারাপারে এসে
দুরন্ত সাগরে দূরে সমুদ্র-চিলের মতো সেদিন গেছিলো তারা ভেসে !
'লেস্‌বিয়ান্‌ প্রোমোন্টরি' পিছে ফেলে,– পিছনের হতাশার– কান্নার স্বর
ভুলে গিয়ে,– অন্য এক সমুদ্রের কুহকের বুকে তারা করেছে নির্ভর
সেইদিন;– সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢুকে কৌতূহলে নামিয়াছে পাতালের দেশে– !

৩৬

চোখের জলের মতো যেখানে সমুদ্র ডাকে অন্ধকার গহ্বরের তলে !
সিন্ধুর ঢেউয়ের শ্বাস সেইখানে মৃতদের নিঃশ্বাসের মতো মনে হয় !
সেখানে সময় নাই,– ফুরায়েছে সেইখানে পৃথিবীর পথের সময় !
এক সুড়ঙ্গের জল মিশিয়া যেতেছে শুধু অন্য এক সুড়ঙ্গের জলে,
বাতাস অন্ধের মতো ফিরে যায় গহ্বরের থেকে আরো দূরের গহ্বরে,
অসুস্থ আগুন শুধু নিভে-নিভে জ্ব'লে ওঠে সেইখানে গন্ধকের 'পরে
মৃতের ইচ্ছার মতো;– সেইখানে,– পৃথিবীর সব মৃত আকাঙ্ক্ষার দেশে
পৃথিবীর সিন্ধু সব পথ ভুলে সেইখানে– পাতালে সমুদ্রে গিয়ে মেশে;
সেই অন্ধকারে তারা নেমেছিলো একদিন হাতে হাত বেঁধে পরস্পরে– ।

সেখানে গোপন ব্যথা গুমরিয়া ফিরে যায়,– তবুও পিপাসা জন্ম লয়
অদ্ভুত জলের পারে;– হৃদয়ের সাধ সব সেইখানে রাত্রি জেগে থাকে,–
সান্ত্বনা আসে না তবু;– নরকের প্রহরীরা ফেরে শুধু গহ্বরের ফাঁকে !–
পৃথিবীতে যেই ধ্বনি বেজে ওঠে সেইখানে শুধু তার প্রতিধ্বনি হয়:
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা তবু সেইখানে বিষের লতার মতো আজো বেঁচে আছে
তাদের বুকের রক্তে;– অদ্ভুত জলের কাছে– অন্ধকার গহ্বরের কাছে
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সকল অঙ্গার– সব পিপাসার বিনষ্ট ফসল
অস্পষ্ট সিন্ধুর জলে সেইখানে একবার খুঁজিতেছে আশ্বাসের স্থল !
ঢেউয়ের ছায়ার মতো সেখানে জলের পরে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে– ।

৩৭

সেই দূর পাতালের সাগরের সুরে এই পৃথিবীর সমুদ্রের বীণা
যেইখানে মিশে যায়,– পথ খুঁজে সেইখানে গিয়েছিলো তারা একবার !
তাদের হৃদির রক্তে মিশে গিয়েছিলো সব সমুদ্রের জোয়ারের ধার:
নরকের অন্ধকারে ব্যথা পেয়ে সেখানে বসেছে 'প্রসারপিনা'–
সবুজ শাখার মতো,– গহ্বরের অন্ধকারে পৃথিবীর নিঃশ্বাসের মতো

জেগে আছে:- বহির নরক তার অন্ধ চোখ দিয়ে তারে করেছে আহত !
সে সব জেনেছে তারা,- নরকের রাত্রে এসে:- উপরের পৃথিবীর পানে
চোখ তুলে তাই তারা- পাতালের সিন্ধু ছেড়ে ফিরে গেছে সূর্যের আহ্বানে !
সিন্ধুর সাপের মতো ছুটে গেছে সমুদ্র সাগের মতো ছুটে গেছে যতো– !

টাইটান্ মায়ের মতো জেগে তুমি হে সমুদ্র,- প্রথম টাইটান্ !
উত্তর আকাশে তুমি বহে নিয়ে চলে যাও দক্ষিণের বায়ুর আহ্লাদ,
পূর্বের বাতাসে তুমি মিলায়ে দিতেছো গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের স্বাদ !
সিন্ধুর জলের গন্ধে মিশায়ে নিতেছো তুমি আকাশের নক্ষত্রের ঘ্রাণ !
বীজের রক্তের মতো শক্তি লয়ে ঝরে পড়িতেছো তুমি পৃথিবীর পথে !
সিন্ধুর বাতাস লয়ে জল-ঈগলের মতো সমুদ্রের পারের পর্বতে
তীক্ষ্ণ হয়ে উঠিতেছো,– তীরের মতন ফলে উঠিতেছো আকাশে-আকাশে !
পৃথিবীর পালকের পাখিদের হৃদয় ভরিয়া ওঠে ত্রাসে,–
সমুদ্রের ঢেউ-পাখা বেজে ওঠে যুদ্ধের রাতের নহবতে– !

৩৮

টাইটান্-মায়ের মতো সিন্ধু তুমি,– সমুদ্রের গর্ভ হ'তে অব্যর্থ সন্তান
জন্মিয়াছি:– পৃথিবীর সকল সমুদ্র-উপসাগরের জলের নিঃশ্বাসে
সিন্ধুর হাওয়ার মতো আমার নিঃশ্বাস গিয়ে ভাসে !
সিন্ধুর শৈলের মতো সমুদ্রের পারে আমি বাছিয়াছি জীবনের স্থান !
সেখানে ভরিবে মাথা রাত্রিদিন সমুদ্রের তরঙ্গের অসংখ্য সঙ্গীতে !
গীতের দেবতা হ'য়ে যে গান গাহিছে সিন্ধু– সময়ের বুকে ছন্দ দিতে,
সিন্ধুর বুকের পরে গানের দেবতা হ'য়ে যেখানে নক্ষত্র গায় গান,–
পৃথিবীর সেই সিন্ধু আর সেই আকাশের নক্ষত্রের ছন্দের আহ্বান
স্ফুলিঙ্গের মতো রক্তে জ্ব'লে-জ্ব'লে কোনোদিন পারিবে কি আঁধারে নিভিতে !

৩৯

সন্ধ্যার প্রথম তারা চিনিয়াছে তারে,–
পশ্চিমের সমুদ্রের পারে
সেই এক দেশ আছে;

যখন দিনের শেষ আলো এসে পড়ে
এক সমুদ্রের বুকে,– তারপর,– আর এক সাগরে
পশ্চিমের আকাশের তলে
যখন একটি তারা– প্রথম এসেছে তার স্থলে;
সেই এক দেশ ওঠে জেগে
সকল মেঘের শেষে পশ্চিমের মেঘে !

সূর্যের অস্তের রঙে ঘেরা,
আকাশের সবচেয়ে দূর নক্ষত্রেরা

দেখিয়াছে তারে;
তখন দিনের আলো শাদা হরিণের মতো গহ্বরের আঁধারের পাশে...
(প্রথম আঁধারে)
মিশিতেছে;
পৃথিবীর সব হাত তখন সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়,
পৃথিবীর সকল হৃদয়
তখন হয়েছে শান্ত;–
দূর সমুদ্রের ঢেউ নিজমনে করে আলোড়ন
মাছিদের গানের মতন !

সেই সুর ভেসে ওঠে তখন আকাশে,
হৃদয়ে তখন ঘুম আসে,
হৃদয়ে তখন স্বপ্ন আসে;

মনে হয়,–
পশ্চিম সিন্ধুর পারে সেই এক দেশ জেগে রয়;–
পৃথিবীর সাথে কবে জন্মেছিলো
নক্ষত্রের মতো হ'য়ে নক্ষত্রের সাথে
জন্মিয়াছে;
সারাদিন কোলাহল ক'রে সিন্ধু– তারপর– চেয়েছে ঘুমাতে
সেইখানে;

অবসন্ন হ'য়ে গেছে যাহাদের মন
পৃথিবীর পথে-পথে সিন্ধুর মতন
ধ্বনি তুলে;–
যাহারা সন্তান হ'য়ে এসেছিলো একদিন
(পৃথিবীর সমুদ্রের কূলে);
ভালোবেসে গেছে যারা,– যাহাদের জন্মেছে সন্তান;
এই পৃথিবীর মাটি– সবুজের ঘ্রাণ
যাহারা পেয়েছে সব;– শরীরের স্বাদ
যাহারা বুঝেছে সব;– পৃথিবীর বেদনা আহ্লাদ
যাহারা জেনেছে সব;

যাহারা দেহের আয়ু ফুরায়েছে ধীরে
ক্রমে-ক্রমে ক্লান্ত ক'রে গেছে যারা এই পৃথিবীরে;
সুস্থির বাতির মতো হ'য়ে
সব তেল শেষ ক'রে উজ্জ্বল আলোর স্বাদ ল'য়ে
যাহারা বুজিয়া গেছে;– পরিচ্ছন্ন জীবনের যশ
যাহারা পেয়েছে সব;– মানুষের সকল বয়স

তৃপ্ত ক'রে গেছে যারা; তাই যাহাদের বুকে ঘুমের মতন
সহজে এসেছে মৃত্যু;--
সকল স্বাদের পরে তাহাদের মন
পশ্চিম মেঘের পারে ওই দূর সমুদ্রের 'পর
খুঁজিয়াছে অবসন্ন মানুষের মতো অবসর;-

তাহাদের মতো এই পৃথিবীতে জেগে থেকে
স্থির-- স্থির হ'য়ে
উল্কার মতন নয়-- নক্ষত্রের মতো আলো ল'য়ে
জাগিয়া থাকিতে হবে এই পথে এই পৃথিবীতে !
সন্তানের মতো জন্মে-- হবে জন্ম দিতে
সন্তানের;

ভালোবাসা বোধ অশ্রু-- বেদনা-- আহ্লাদ,--
পৃথিবীর মাটি-- তার সমুদ্রের স্বাদ
পেতে হবে;

পৃথিবীর অন্ধকার-- আলো-- আলোড়ন
সমুদ্রের সাপের মতন
সময়ের সাগরের 'পরে
নাচিবে অনেক দিন,-- অন্ধকার আলোর গহ্বরে
সরীসৃপদের মতো দুলিবে হৃদয়;

আসিবে যখন ক্ষয়
অনেক দিনের পরে-- তারপর শেষে,
সহজ ঘুমের মতো বুকে মৃত্যু এসে
সব অবসাদ
তখন মুছিয়া লবে;-- পশ্চিম মেঘের সাধ
হৃদয়ে উঠিবে জেগে সেদিন আমার !

সহজ ঘুমের মতো মৃত্যু এসে তার
সব অবসর
দিয়ে যাবে,
নিয়ে যাবে পশ্চিমের সমুদ্রের 'পর।

৪০

সমুদ্র

আমার লেগেছে ভালো তবু ওই সমুদ্রের শ্বাস,
পুরোনো সিন্ধুর গন্ধে যেইখানে ভরেছে বাতাস

এ-নতুন পৃথিবীর;— পাইনের শাখার মতন
যেখানে সিন্ধুর ঘ্রাণ,— যেখানে জলের আলোড়ন
সুস্থ বাতাসের মতো পাহাড়ের-পাইনের বনে;
যেখানে ফেনার ফুলে— যেখানে ফেনার আলোড়নে
অনেক পুরোনো ভিজে পাহাড়ের শিশিরের স্বাদ
জেগে ওঠে;— যেখানে অবাধ
পবিত্র শীতল ঢেউ— পুরোহিত-যুবাদের মতো
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের তলে ইতস্তত
চলিতেছে;— কোনো উৎসবের রাত— বিবাহের গান
তাহাদের ডাকে নাকো;— নীড়ের মতন কোনো স্থান
পৃথিবীর পাখিদের যখন হৃদয়ে তুলে লয়
সব পাহাড়ের শেষে সমুদ্রের পারে জেগে রয়
যে-পাহাড়,— সেইখানে অন্ধকারে যে-শিশির পড়ে
সন্ধ্যার আঁধারে সেই পাহাড়ের শিশিরের তরে
তাহারা চলিয়া যায়; তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, সাহস
খোঁজে নাকো পৃথিবীর মানুষের মতো কোনো যশ,—
ভালোবেসে— মানুষের মতো এক ভালোবাসা চেয়ে;
সন্তানের জন্ম দিয়ে— সন্তানের স্বাদ বুকে পেয়ে;

পৃথিবীর কোলাহলে বেড়ে উঠে,— আয়োজন ক'রে
মউমাছিদের মতো নরম মোমের মধু গ'ড়ে
দিনের আলোর ঢেউয়ে;— কাঁচা শাখা পাতার সবুজে
জেগে থেকে;— মশালের আগুনের থেকে আলো খুঁজে
অন্ধকারে;— পৃথিবীর মানুষের মতন জীবন
বহে নাকো সিন্ধু ওই,— কিন্তু ওই সমুদ্রের মন
ভোরের কুয়াশা খুঁজে— সব দূর তুষারের পথে
পুরোনো বনের গন্ধে ভরা এক জলের জগতে
ঢের দূরে— কোনো এক শীতসুস্থ বাতাসের দেশে
অন্য এক সমুদ্রের আলো-অন্ধকারে গিয়ে মেশে:

কিন্তু ওই সমুদ্রের ফেনা শাদা পাখিদের মতো
সিন্ধু-পাখিদের পিছে পাখা মেলে চলে অবিরত;
তারপর— পাখিদের— মাঝপথে— পিছে ফেলে রেখে
আকাশে মেঘের মতো শাদা হ'য়ে মেশে একে-একে !

পিছের আকাশ ল'য়ে প'ড়ে থাকে পৃথিবীর স্থল,
দূর মধ্য-আকাশের বুক থেকে ঝ'রে পড়ে জল
পরিচ্ছন্ন শিশিরের স্বাদ ল'য়ে সমুদ্রের 'পরে:
পরিষ্কার নক্ষত্রেরা অন্ধকারে এসে স্নান করে

পুরোহিতদের মতো সিন্ধুর পবিত্র জলে নেমে;
পাইনের বনে ঘেরা ভিজে এক পাহাড়ের প্রেমে
বাতাস হয়েছে মুগ্ধ:– বাতাসের পিছনে সাগর
চলিতেছে:– স্নিগ্ধ করিতেছে গিয়ে হৃদয়ের জ্বর
শুদ্ধ শাদা বরফের কোনো এক শীতল পাহাড়ে !

নেক্‌ড়েরা দল বেঁধে নামে না সে-পর্বতের ধারে,
অন্ধকারে শেয়ালেরা সেখানে ওঠে না কেঁদে আর,
তীরের ফলার মতো পৃথিবীর আলো-অন্ধকার
সেইখানে বেঁধে নাকো পাইনের পাতাদের বুক
হিম রাতে !– কিন্তু সেই পাহাড়ের শিশিরের শীতে
ফলেছে সবুজ শাখা– সেইখানে ফলেছে নিভৃতে
কাঁচা পাতা;– জ্বর ছেড়ে গেছে তার;– নক্ষত্র শীতল
সেইখানে;– নক্ষত্রের মতো সুস্থ সমুদ্রের জল– !

## মৃত মাংস

ডানা ভেঙে ঘুরে-ঘুরে প'ড়ে গেলো ঘাসের উপরে;
কে তার ভেঙেছে ডানা জানে না সে; আকাশের ঘরে

কোনোদিন– কোনোদিন আর তার হবে না প্রবেশ ?
জানে না সে; কোনো-এক অন্ধকার হিম নিরুদ্দেশ
ঘনায়ে এসেছে তার ? জানে না সে, আহা,
সে যে আর পাখি নয়– রঙ নয়– খেলা নয়– তাহা

জানে না সে; ঈর্ষা নয়– হিংসা নয়– বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে।
সাধ নয়– স্বপ্ন নয়– একবার দুই ডানা ঝেড়ে

বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায়; রূপালি বৃষ্টির গান, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যায় শুধু তার, মুছে যায় বেদনারে মুছিবার সাধ।

## নদী

বঁইচির ঝোপ শুধু– শাঁইবাবলার ঝাড়– আর জাম হিজলের বন–
কোথাও অর্জুন গাছ– তাহার সমস্ত ছায়া এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে ওই নদী ?– এ নদী কে ?– ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে; যেখানে মানুষ নাই– নদী শুধু [illegible]খানে গিয়ে
শব্দ শুনি তাই আমি– আমি শুনি– দুপুরের জলপিপি [illegible]ছে এমন
এই শব্দ কতোদিন; আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার পথ দিয়ে

হেঁটে যেতে– ব্যথা পেয়ে; দুপুরে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন;
মনে হয় কোন্ শিশু ম'রে গেছে, আমারি হৃদয় যেন ছিলো শিশু সেই;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতোখানি আশা করে– আমিও তেমন

একদিন করিনি কি ? শুধু একদিন তবু ? কারা এসে ব'লে গেলো; 'নেই–
গাছ নেই– রোদ নেই– মেঘ নেই– তারা নেই– আকাশ তোমার তরে নয় !'
হাজার বছর ধ'রে নদী তবু পায় কেন এইসব ? শিশুর প্রাণেই
নদী কেন বেঁচে থাকে ?– একদিন এই নদী শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর; মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়– শেষ হয়।

## ১৯৩৬

সময়ের পথে-পথে ঘুরে ফেরে সারাদিন– তবু– তারপর–
ঘুমের সময় আসে অন্ধকারে নদীদের ঢেউয়ের ভিতর

অনেক মাছের প্রাণে; চারিদিকে চেয়ে থাকে অগণন ঘাস
ধূসর পাখির মতো থেমে থাকে নক্ষত্রের নির্লিপ্ত আকাশ;

বাঁশের বনের পিছে মশার বিন্দুর ভিড়ে জেগে ওঠে চাঁদ।
মনে হয় সমস্ত থামিয়ে দিয়ে যেন এক মায়াবীর ফাঁদ

তারপর র'য়ে গেছে; রূপ প্রেম : সবি অন্ধকার;
সবি দীর্ঘ নিস্তব্ধতা; কঙ্কাল হবার– শূন্যে মিলিয়ে যাবার।

## সমুদ্রচিল

সমুদ্রচিলের সাথে আজ এই রৌদ্রের প্রভাতে
কথা ব'লে দেখিয়াছি আমি:
একবার পাহাড়ের কাছে আসে,
চকিতে সিন্ধুর দিকে যেতেছে সে নামি;
হামাগুড়ি দিয়ে ভাসে ফেনার উপরে
মুছে যায় তরঙ্গের ঝড়ে।
দাঁড়ায়েছি শতাব্দীর ধুলো কাঁচ হাতে ॥

তরঙ্গের তাড়া খেয়ে চ'লে যায় আরো দূর তরঙ্গের পানে–
ফেনার কান্তারে,
সৃষ্টির প্রথম রোদ যেইখানে
তাহার সোনলি ডানা ঝাড়ে;
যেখানে আকাশ নীল কোলাহলময়,
সমুদ্র করিছে দূর সমুদ্র সঞ্চয়,
দিগন্ত হারায়ে যায় দিগন্তের প্রাণে ॥

চঞ্চল ধবল বুকে নাচিতেছে ফেনার আঙুল;
ধানের শিষের মতো দু-পায়ের শিরা
নাচিছে স্পানিশ টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে;
হৃদয় করিছে পান মালাবার হাওয়ার মদিরা;
ট্রম্-ট্রম্ ট্রাম্-ট্রাম্– ড্রামের মতন
শৈলে-শৈলে সমুদ্রের রুক্ষ আন্দোলন;
রৌদ্রে-রৌদ্রে ঝলসায় ঝিনুকের ফুল ॥

বিজ্ঞান কি মস্তিষ্কের বাক্সের মতন একাকী ?
তোমার শরীরে জল– দ্রাক্ষার আঘ্রাণ;
তোমার হৃদয় পেকে ঝরিতেছে রৌদ্রের খেত,
জাগিতেছে নব-নব শস্যের সন্তান;
আমরা বন্দরে ফিরি– জনতায়– ঘূর্ণিস্রোতে কুকুরের মুণ্ডে
লোল আঁখি
পাবে নাকি লেজ তার ? হো-হো– পাবে নাকি !
পাবে নাকি লেজ খুঁজে কুকুরের মতো লোল আঁখি ॥

ছেড়ে দিয়ে উত্তরের বাতাসের প্রাণে
জন্মেছে তোমার ডানা– জেগেছে হৃদয়;
সহস্র শতাব্দী-গিঁট কাটায়েছি পথ আর ঘরের আঘ্রাণে–
আনন্দের পাইনিকো তবু পরিচয়;
জন্মেনি ধবল ডানা বিজ্ঞানের অগ্রসর চিরি;
ভেঙে গেছে আকাশের– নক্ষত্রের সিঁড়ি,
উৎসব খুঁজেছি রাতবিরেতের গানে ॥

পৃথিবীর দিকে-দিকে ছড়ায়েছি মনোবীজ, আহা,
আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্গ সন্তান;
অথবা ঘাসের দেহে শুয়ে-শুয়ে কুয়াশায়
শুনেছি ঝরিতে আছে ধান;
অথবা সন্ধ্যার নীল জানালায়
অদৃশ্য কোকিল এসে গায়

এইসব বেদনার কর্কট-রেডিয়ামে মারে নাকো তাহা ॥

মাঝে-মাঝে একবার ধরা দেই নক্ষত্রের হাতে
চ'লে আসি সমুদ্রের পাশে;
যে-খেত ফুরাতে আছে– ফুরাইয়ে গেছে
তার তৃষ্ণা মিটিছে আকাশে;
চেয়ে দেখি সেই নীল আকাশের ছবি :
সমুদ্রের অজান্তব জানালার গল্পের সুরভি;
রৌদ্রের ডানায় ভেসে সেইখানে পৃথিবী হারাতে
চাই আমি; সমুদ্রচিলের খেলা তুলে নিয়ে হাতে ॥

২

রঙিন বিস্তৃত রৌদ্রে প্রাণ তার করিছে বিলাস;
কোনোদিন ধানখেতে পৃথিবীর কৃষকের প্রাণ
এই রৌদ্র পায় নাই;– জলপাই পল্লবের ফল,
জ্যৈষ্ঠের দুপুরে মাছি যে-উল্লাসে গেয়ে গেছে গান,
কুমারী কোমল ঘাড় নুয়ে চুপে যেই পক্ক রৌদ্রে বেণী করেছে বিন্যাস
নীল হ'য়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকৃপী ঘাস,
তরমুজ খেতে শুয়ে স্বপন দেখেছে চৈত্রমাস,
তার চেয়ে আরো ঘন গাঢ় মদে প্রাণ তার করিছে বিলাস ॥

পৃথিবীতে যেই রূপ কোনোদিন দ্যাখে নাই কেউ :
সিংহলের হীরা রত্ন নারী লুটে নাবিকের দল
ভারত সমুদ্রে নেমে নক্ষত্রের রজনীতে
তারপর ভোরবেলা দেখেছিলো স্ফটিকের মতো যেই জল;
তরঙ্গের পরে ঘন তরঙ্গের মধু আর দুধ,
মেঘের গোলাপি মুখ– রৌদ্রের বুদ্বুদ;
তবু তারা দ্যাখে নাই পুরুভুজ-বিছানায় নূপুর বাজায়ে নাচে ঢেউ
বারুণীর জানালায়; সিন্ধুচিল– মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাকো কেউ ॥

ধ্বনিত ঢেউয়ের অগ্নি বয়ঃসন্ধি-দিবসের স্তন হ'য়ে রক্তে নেমে আসে !
তরঙ্গের উষ্ণ নীল তরমুজ খেতে
আমারে খুঁজিয়া পায় মৃত্যু যেন;
বিস্মৃতির পথে যেতে-যেতে
সমস্ত পৃথিবী যেন মিশে যায় রৌদ্রের সাগরে;
সিন্ধুচিল আর তার বনিতা যেখানে খেলা করে :
মরণ আমারে যেন পায় সেই দারুচিনি হাওয়ার আকাশে ॥

## হঠাৎ-মৃত

অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নার ভিতর
ক'উকে মৃত্যু ফেলে দিলো
নিচে– অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

রূপসী প্রথম প্রেমের আস্বাদ পেতে যাচ্ছিলো :
শোনো– গলার ভিতরে তার মৃত্যুর গোঙরানি;
সে নিজেও মৃত্যু যেন,
বিবেক নেই আর তার।

কবি চোখ মেলে বলেছিলো :
আমার হৃদয়ের ভিতর ইন্দ্রধনুর মতো কতো বুদ্‌বুদ্‌,
হিম মৃত্যু এসে চোখ অন্ধকার ক'রে ফেললো তার।

এইসব হঠাৎ-মৃত্যু
এইসব হঠাৎ-মৃত
আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
বিক্ষুব্ধ বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠছে যেন।
গর্জন ক'রে উঠছে আমার হৃদয়ের অরণ্যে।

রূপ– প্রেম– খ্যাতি– সুপক্ক রৌদ্রের ভিতর
দাঁতের এনামেল ঝিকমিক ক'রে ওঠে
পবিত্র সমুদ্রের মতো–
চিরন্তন।

হায়, সোনলি বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শুয়ারের মাংস
শুয়ারের মাংস শুধু;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

## বিস্ময়

নবতর ভিড় আসে– সহসা বিস্মিত হ'য়ে ভাবি :
এ কি সেই পরিচিত ধূসর উচ্ছ্বাস :
টাকা, কাজ, ক্ষুধা, অন্ন, বিলুপ্তির তরে?
মনের মতন ক'রে একদিন গড়িতে চেয়েছি যেই সময়ের ধূম্র আকৃতিরে ?

– বাতাস যেমন ক'রে চায় গড়িবারে
কোনো ক্লান্ত গরীয়সী গণিকার
বিপন্ন বিস্ময়টিরে– মুহূর্তের;
তারপর গূঢ় তামাশায় যেন চ'লে যায় পাখিদের ডানার পিছনে;
সে জানে বিচ্ছিন্ন বীজ রয়েছে এ শতাব্দীতে–
চারিদিকে মননের অধিপতি সব
তাহাদের জন্ম দিলো :
তাহারা উঠিছে ফুঁড়ে জলের আনন আর বাতাসের প্রতিভারে হেসে– দূরে ঠেলে–
অনেক নিরন্ন বীজ রয়েছে এ শতাব্দীতে– ছিলো আর প্রস্তরের ভিত্তির থেকে,
তাহারা উঠিছে স্ফুরে– তাহারা উঠিছে স্ফুরে– যেন কোনো, বিস্ফোরক তরঙ্গের ধ্বনি
পীবর দেহের গন্ধ যেন কোন্ পীতবর্ণ তটিনীর– যেন কোনো রক্তবর্ণ সমুদ্রের।

নবতর ভিড় আসে– প্রত্যুষের স্ফূর্তির মতন,
বিরাট আকাশ ভরা সমস্ত উষার মতো অদ্ভুত প্রয়াস :
বাতাস যেমন ক'রে চায় ভাঙিবারে নব-নব নাগার্জুন-কীর্তি-কিরীটেরে,
নিরঙ্কুশ অক্লান্তির পীত দেবতারে;
তারপর গূঢ় তামাশায় যেন চ'লে যায় পাখিদের ডানার পিছনে।

## জীবন-সংগীত

স্ট্রেচারের 'পরে শুয়ে কুয়াশা ঘিরিছে বুঝি তোমার দু-চোখ :
ভয় নেই, মৃত্যু নয় কোনো এক অপদার্থ অন্যায় আলোক;
তাহলে কি এতো লোক ম'রে যেতো মশালের লালসায়– মাছির মতন ?
অমৃতের সিঁড়ি ব'লে মানুষেরা গড়িতো কি এতো শাদা শ্লোক

আজ মৃত্যু; এর আগে ম্যাটাডরদের মৃত্যু ছিলো নাকি স্পেনে ?
লড়েছে বীরের মতো, রাঙা রৌদ্রে আপনারে সবচেয়ে হামবড়া জেনে
খেয়েছে আঁধার রাত্রি অকস্মাৎ। তবু এক হরিয়াল : বাংলার পাখি
শিকারির-গুলি-সার-নীলাকাশ ভেবে নেয় মরণকে মেনে।

তবু মোরা দিবালোক উত্থাপন করি রোজ শৌণ্ডিকের মতো;
গেলাস ভরিয়া দেই;– মনে হয় কম্পাস, সিন্ধু, রৌদ্র,– জীবন ফলত
ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। ম'রে গেছে : ভূস্তরের অন্ধকারে চূর্ণ তারা।
কিন্তু আমাদের আয়ু সানস্পট্ গিলে ফেলে সূর্যের মতন ব্যক্তিগত।

## পিতৃলোক

পিতৃলোক, তোমরা কি ভস্ম হ'য়ে গেছো দূরে সিরুলির শ্মশানের পারে ?
অতোখানি অগ্নি আর আলোকের কোথাও রয়েছে যেন নক্ষত্রের মতো ব্যবহার।

মৃত তারকারো থেকে নীহারিকা শূন্য পিঁজে জেগে ওঠে আর-একবার:
আবার প্রসব হয় বৃহস্পতি নক্ষত্রের: শেষ ভাঁড় গল্প ব'লে মিশে গেছে যখন আঁধারে।

আমি জানি তোমরা কোথাও যেন র'য়ে গেছো এই উপসাগরের কাছে;
অথবা জাভার দিকে গভীর মেঘের রাতে চলিতেছে তোমাদের ক্ষোভের তরণী;
বোরোবুদুরের কোনো মন্দিরের সংযমে হয়তো পেঁচারা শোনে তোমাদের ধ্বনি :
আমারি কানের কাছে অবিশ্বাস্য কৃচ্ছ্রকলরবে যেন কাদের সূচনা জেগে আছে।

নির্জন রোমশ হাত তোমাদের আজো যেন দেবদারু কাঠ নিয়ে ছাঁচিতেছে হাঙরের মুখ;
জীবনের ব্যাকরণ জিনে নেবে যেন তারা কিমাকার সমাসকে ছিঁড়ে;
যেন তারা তরমুজ– বই– নারী– আত্মা সব নিয়ে যায় বিরুদ্ধ সমীরে;
গভীর পরানী ছিলো তারা এই জীবনের– অনেক আশ্চর্য শাদা দাড়ির চিবুক

নেপথ্যে নড়িতে আছে; মৃত শতাব্দীর থেকে আরো অন্ধ বধির শতকে
হাস্যের দস্তানা প'রে প্রভাতের রৌদ্রে তারা চলিতেছে সারসের পাল।
তবুও বিমুখ মোরা;– যুদ্ধ, রক্ত, জ্যামিতিক ঈশ্বর, মাকড়সা, মশার জঞ্জাল
আমাদের ঝুলিতে যেন ভ'রে দিলো;– ক্লান্ত ইহুদীর মতো জ্যোতির্ময় চাঁদনীর চকে

চোরাবাজারের থেকে তবু ঠুলি চাই; না হ'লে চোখের শিরা পুড়ে যাবে রঙের বিদ্বেষে
একশো বছর ধ'রে তোমাদের স্মরণ করেছে এই পৃথিবীর শশকেরা, গাঢ় পিতলোক ?
না না। তবু তোমাদের সসম্ভ্রম প্রাণে ছিলো অপার্থিব, অন্যায় আলোক :
আমাদের চোখঠার দিয়ে তারা গৈবী পণ্য নিয়ে যায় অন্য এক সূর্যের উদ্দেশে।

## অগ্নি

আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।
জানো না কি রাত্রি এসে ঘিরিতেছে আরো-এক দীর্ঘতর বৃত্তে রোজ
মানুষের জীবনকে।
যে-সব সৌন্দর্য র'চে গিয়েছিলো একদিন মেধাবীরা
আজ এই রজনীর অবরোধে মনে হয়
তাহাদের জ্যোতি যেন বিস্ফোরক বাষ্প হ'য়ে জ্বলে
সহসা আকাশপথে দিক্‌হস্তিদের মতো– অদ্ভুত– অভীক্ষ্ণ মদকলে;
কোনো আমলকী নাই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে।

এখানে দাঁড়ায়ে থেকে ন্যুব্জ ছবি চোখে পড়ে পৃথিবীর :
বিবর্ণ পাথরে গড়া প্রান্তরের পীঠে এক ধর্মমন্দিরের;
আশি বছরের বুড়ো শীতের কুয়াশা ঠেলে সেইদিকে চলিয়াছে একা :
হয়তো বাজাবে ঘণ্টা, হয়তো সে সারাৎসার বিধাতাকে কাছে পাবে :
আমরা যেমন ক'রে পাই মৃত্তিকাকে, মৃত্যুকে।

পীবর মাটির মতো নিষ্কাশিত হ'য়ে যেন পৃথিবীর জরায়ুর থেকে
মাঠের কিনারে ব'সে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মূল সন্তান;
তারা খাদ্য চায়; তবুও অভুক্ত পেটে তরবার হাতে নেবে
যোদ্ধার মতন নয়; নকল সৈন্যের মতো কলরবে পাঁচালির দেশে।
কৌতুকে– গোলার সব মৃত– পরাহত– ধান থেকে মেড়ে
যদি কেউ অন্যতম আলেয়ার রস এনে দিয়ে যেতো তাহাদের।
কেউ দেবে নাকো আজ এই তুণ্ডসমীচীন পৃথিবীতে
মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক
প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায় আবির্ভূত গম্বুজের দিকে।

সেই পথে আমাদের যাত্রা নেই, হে সন্তান।
বৃত্তের মতন সূর্য– পশ্চিমের–
মৃত প্রলম্বিত– হাঙরের মতো–
মেঘের ওপার থেকে
প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়,
শস্যহীন খেতে,
গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে, কবরে, আমাদের সবের হৃদয়ে।
এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।

## একদিন ভাবিনি কি

একদিন ভাবিনি কি আকাশের অনুরাধা নক্ষত্রেরা বোন হবে– বোন
নক্ষত্রের ভাইয়ের– ধ্রুবতারা শুকতারা কোন্ তারা আছে
ওই দূর হেমন্তের আকাশের কোন্ তারা জেনেছে তেমন শিহরণ
একদিন জেনেছি যা– সোনালি মেঘের ভোরে জীবন যা সব জানিয়াছে
একদিন।

## উদয়াস্ত

সূর্যের উদয় সহসা সমস্ত নদী
চমকিত ক'রে ফেলে– অকস্মাৎ দ্যাখা দিয়ে–
চ'লে যায়; হাড়ের ভিতরে মেঘেদের
অন্ধকার; স্তম্ভিত বন্ধুর মতো ভোর
এইখানে সাধু রাত্রির হাত ধ'রে
তাকে শ্রেয়তর চালানির মূল জেনে
নিখিলের– মৃত মাংসের স্তূপ
চারিদিকে; তার মাঝে ধন্বন্তরি, কালনেমি

কিছু চায় :
দুস্তর চাদর গায়ে অন্ধ বাতাসের।
সূর্য তবু– সূর্য যেন জ্যোতি :
প্রতিবিম্ব রেখে গেছে তরবারে– ভাঁড়ের হৃদয়ে,
ধর্মাশোকের মনে।

করজোড়ে ভাবে তারা :
ঝলিছে সারস শব ঢের
বৈতরণী তরঙ্গের দিকে ভেসে যেতে-যেতে
লোকোত্তর সূর্যের আমোদে।

## সুমেরীয়

ক্রমে ধুলো উড়ে যায় বিকেলের অন্তহীন পাটল আকাশে;
অস্ফুট বৃষ্টির গন্ধ;– প্রকাণ্ড ময়দান জুড়ে একপাল ভেড়া
নিরুত্তর ছবির মতন স্পষ্ট;
সূর্যের তির্যক গতি
কৃষ্ণাভ মেঘের থেকে তাহাদের শরীরের 'পরে
সুমেরীয় বল্লমের মতো যেন প্রাগৈতিহাসিক তর্কে নড়ে।

অদ্ভুত অমল আলো একবার জ্ব'লে ওঠে চারিদিকে
সন্ধ্যা আসিবার আগে।
য়ুনানী যুগের স্তম্ভ– মাঠের বাদামি ঘাস– নদী–
ঢের মজুরের মুখ– মনে হয়– সুমেরীয়।
ইহাদের ইতিহাস শেষ হ'য়ে গেছে তবে বহুদিন।
কপিশ মাটির গর্ভ খুঁড়িলেই অখণ্ড প্রেমিক প্যারাফিন
এরা সব। এই ভৌতিক আলো চাই নাকো– আমি চাই ক্ষেম।
ইহাদের অরুন্তুদ উৎস তবু সুমেরীয় প্রেম।

## মৃত্যু

হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে
মাঘ রাতে– তাহারা দুপুরে ব'সে শহরের গ্রিলে
মৃত্যু অনুভব করে আরো গাঢ়– পীন।
রূপসীও মরণকে চেনে
মুকুরের ওই পিঠে– পারদের মতো যেন
নিরুত্তর হ'য়ে আছে। অথবা উড্ডীন
এক-আধটি দৈত্যাকৃতি দ্যাখা যায়

জনতারে চালাতেছে বিকালের বিরাট সভায়;
নিদারুণ বিশ্বাসের মতো যেন স্থির;
মৃত্যু নাই– জানে তারা;– তবুও তাদের মুখ
চকিত আলোয় পূর্ণ ফটোগ্রাফ থেকে
উঠে এসে ভীত হয়
নিজেদের গ্লানিহীন পরিণতি দেখে।

## আমিষাশী তরবার

স্মৃতিই মৃত্যুর মতো– ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি গম্ভীর আহ্বানে
ভোরের ভিখিরি তাহা সূর্যের দিকে চেয়ে বোঝে।
উঁচু মঞ্চে বিধাতার পরিত্যক্ত সন্তানেরা জানে;
পাণ্ডুলিপি, যব আর সোনার ভিতরে তারা খোঁজে

অবহিত প্রতীককে। কে দিয়েছে স্মৃতি এই বিকীর্ণ হৃদয়ে :
কোনো কিছু অবলুপ্ত পিপাসার অন্ত্যজ ধারণা ?
বৈশালীর থেকে বায়ু জাহাজের মুখে আজো বহে;
প্রাকৃত নাবিকাধমও মাস্তুলের পিঠ ঘেঁষে দুপুরের রৌদ্রে অন্যমনা

চেয়ে থাকে। চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ'সে
কেবলি পড়িতে আছে; সংগীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়;
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয় এইসব গভীর অসূয়া।

জেনেছ বরুণ, অগ্নি, নরনারী : কর্মক্ষম জীবনের শেষে
একপাল ভেড়া ল'য়ে হেমন্তের মাঠে
শান্তি সারাৎসার নয়– আলো জ্বেলে শকুনিমামার সাথে হেসে
নগরীর রাত্রি চলে– আমিষাশী তরবার হ'য়ে তার প্রভাতকে কাটে।

## দানবীয়

মেঘের কিনারে শুয়ে একবার রাতে
আমি এক আত্মা নাকি– প্রেত নাকি শুধু ?

একবার দেখে নিই জনহীন সমুদ্রের জ্যোৎস্নায়
বাতাসের শাদা অস্থি উড়িতেছে বালুকার মতো যেন ধু-ধু;
একবার দেখে নিই প্রান্তরের 'পর
দৈত্য এক দাঁড়ায়েছে;

এ-পৃথিবী যেন তার ক্রীড়ার গহ্বর।

তারপর তারকার থেকে দূর তারকার পানে
মুখ তুলে হৃদয়ের জ্ঞানের অজ্ঞানে
স্তব্ধ হ'য়ে থাকি আমি;–
হেমন্তের কোন্-এক জ্যোৎস্নাশীর্ষ রাতে
শেয়ালেরা খরগোশ শিকারে বেড়াতে
বেড়াতে-বেড়াতে যদি মানুষের মতো খেদ পায়
তাহলে যেমন তারা কেঁপে ওঠে রোমকূপে
চাঁদ আর অরণ্যের অবিকল দানবীয়তায়।

## কালাতিপাত

সমুদ্রের প্রতিধ্বনিময় এক
আঁকাবাঁকা গুহার আঁধারে
প্রবেশ করিতে গিয়ে বোঝা গেলো সুর ভাসে :
এই কুরুবর্ষ– এই কন্যাকুমারিকা
অতীতের কুয়াশার পারে।

প্রকাণ্ড ধীমান এক দেবদারু-বিবরের থেকে
প্রশান্ত বায়ুর শব্দ নড়ে;
'হে মানুষ' ব'লে সে ডাকে না কোনো জনগণদের।
আমি ক্লান্ত প্রাণ আজ প্রলাপপাণ্ডুর পৃথিবীতে;
হৃদয়ের কাছে ঢের যুক্তি ছুঁড়ে
যখন মস্তিষ্ক গেলো জিতে
শরণ নিলাম আমি সূচিমুখ জ্বেলে দিয়ে– স্তব্ধতায়–
বৃশ্চিক-গ্রথিত আঁধারের।

শুনি আমি আরো শব্দ– যতো দূর চ'লে যাই ততো;
ওরা সব আমারি মতন :
দুশ্চর সমুদ্র ঘিরে বধির বদ্বীপ– ইতস্তত–
নিস্পৃহ ভূখণ্ড নিয়ে
এক-এক জন।

আজ এই পৃথিবীর
স্তূপীকৃত– অন্ধ– নির্বান্ধব–
লোহার শকট ভরা আবিষ্ট মানব।
কিংবা আরো অশ্লীল তাহাদের শব :
কতোখানি নেত্র আর নাসিকার তরে,

কতোখানি মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অক্ষুণ্ণ সঞ্চয় :
ভাবিছে প্রতিভূ একা শীর্ণ জাদুঘরে
অদ্ভুত অঙ্গন তার জ্যোৎস্না আর তরুদের সঞ্চারণময়।
অদ্ভুত অঙ্গন তার
জ্যোৎস্না আর রক্ত, বালুকার।
মোরা সব সন্তানের সন্ততি তাহার।
সময় গণনা আর করে নাকো তাহার মিশ্রিত মৃত্যু বুকে নিয়ে
কখন সে আপেক্ষিক তরঙ্গে হারিয়ে
হ'য়ে গেছে প্লিওসিন যুগের পাহাড়।

## হেমন্ত

আজ রাতে মনে হয়
সর্ব কর্মক্লান্তি অবেশেষে কোনো এক অর্থ শুষে গেছে।
আমাদের সব পাপ– যদি জীব কোনো পাপ ক'রে থাকে পরস্পর
কিংবা দূর নক্ষত্রের গুল্ম, গ্যাস, জীবাণুর কাছে–
গিয়েছে ক্ষয়িত হ'য়ে।
বৃত্ত যেন শুদ্ধতায় নিরুত্তর কেন্দ্রে ফিরে এলো
এই শান্ত অঘ্রানের রাতে।

যতোদূর চোখ যায় বিকোষিত প্রান্তরের কুয়াশার ব্যাস
শাদা চাদরের মতো কুয়াশার নিচে শুয়ে।
হরীতকী অরণ্যের থেকে চুপে সঞ্চারিত হ'য়ে
নিশীথের ছায়া যেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে
প্রতিধ্বনিহীন, হিম পৃথিবীর পিঠে।

সুষুপ্ত হরিণ– লোষ্ট্র; মৃত আজ; ব্যঘ্র মৃত; মৃত্যুর ভিতরে অমায়িক।
জলের উপর দিয়ে চ'লে যায় তারা; তবু জল
স্পর্শ করে নাকো, সিংহদুয়ারের মতো জেগে উঠে ইন্দ্রধনু
তাহাদের যেতে দেয়; অদ্ভুত বধির চোখে তবু তারা
অর্ভ্যথনা করে নাকো আজ আর আলোর বর্বর জননীকে।

বাংলার শস্যহীন খেতের শিয়রে
মৃত, বড়ো, গোল চাঁদ;
গভীর অঘ্রান এসে দাঁড়ায়েছে।
অনন্য যোদ্ধার মতো এসেছে সে কতোবার
দিনের ওপারে সন্ধ্যা– ঋতুর ভিতরে প্লাবী হেমন্তকে
দৃষ্ট প্রত্যঙ্গের মতো এই স্ফীত পৃথিবীতে

ছুরির ফলার মতো টেনে নিয়ে।
বেবিলন থেকে বিলম্বিত এস্‌প্লানেডে
বিদীর্ণ চীনের থেকে এই শীর্ণ এককড়িপুরে
মানুষের অরুন্তুদ চেষ্টার ভিতরে।

## নিঃসরণ

দুর্গের গৌরবে বসে প্রাংশু আত্মা ভাবিতেছে ঢের পূর্বপুরুষের কথা :
যারা তারে জন্মা দিলো,– তবু আজ তরবার পরিত্যাগ করার ক্ষমতা
যারা দিলো;– প্রাচীন পাথর তারা এনেছিলো পর্বতের থেকে
স্থির কিছু গড়িবার প্রয়োজনে; তারপর ধূসর কাপড়ে মুখ ঢেকে
চ'লে গেছে;– পিছল পেঁচা যে ওড়ে জ্যোৎস্নায়– সেইখানে তাদের মমতা

ঘুরিতেছে– ঘুরিতেছে– শুক্র মঙ্গলের মতো;– আমার এ শাদা শার্টিনের
শেমিজও পেতেছে সেই মনস্বিনী শৃঙ্খলাকে টের।
এই দুর্গ আজো তাই– ক্রিয়াবান সপ্তমীর চাঁদের শিঙের নিচে হিম
লোল– বক্র– নিরুত্তর; আজি রাতে আমার মৃত্যুর পর নতুন রক্তিম
সূর্য এসে প্রয়োজন মেগে নেবে এইখানে লোকশ্রুত ভূমিকম্পের।

পূর্বসূরিদের ইচ্ছা অনুশাসনের মতো করিতেছে কাজ।
প্রাচীন লেখের থেকে অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ সমাজ
করতালি দিয়ে হাসে; দূরবীনে দ্যাখা যায় যেইসব জ্যোতির্ময় কণা
অনন্ত মোমের তেজ নিয়ে নাচে– সেইসব উচ্চতর রসিক দ্যোতনা
মৃত্যুকে বামনের করতলে হরীতকী অন্তত ক'রে দিক আজ।

## উদয়াস্ত

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে যখন হয়েছে পূর্ণ সময়ের অভিপ্রায়–
আগাগোড়া জীবনের দিক চেয়ে কে আবার আয়ু চায় ?
যদিও চোখের ঘুম ভুলে গিয়ে মননের অহঙ্কারে চর্বি জ্বালায়

অপ্রেমিক; কোনো কিছু শেষ সত্য জিনে নেবে বিষয়ের থেকে।
তবু কোনো জাদুকর পুরানো স্ফটিক তার যায় নাই রেখে।
সময় কাটাতে হয় ব্যবহৃত হস্তাক্ষরে চীবরের ছায়াপাত দেখে।

অথবা উদ্রিক্ত যারা হয় নাকো– চিরকাল থাকে সমীচীন,–
তাহাদের মুণ্ড যেন কালো হাঁড়ি– মাচার উপরে সমাসীন;
মৃত্যু নাই তাহাদের,– জানে সব দেবী, পরী, জিন।

আর যারা বহুদিন পৃথিবীতে মেধে- মনে- ছিলো কর্মক্ষম;
তারপর বুড়ো হ'য়ে স্মরণ করিতে চায় অবলুপ্ত মলয়াচলম :
তাদের হৃদয়ে ঢের মেঘ আছে- নাই কোনো শুভ্রাণ গম।

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে যখন হয়েছে পূর্ণ সময়ের অভিপ্রায়-
আগাগোড়া জীবনের দিকে চেয়ে কে আবার আয়ু চায় ?
কন্যা তুলা কর্কটের বৃশ্চিকের আবার ঘটুক সমবায়।

## অনুভব

নিঃশব্দ পাখার আছে প্রাণ,
রয়েছে প্রবাদ।
আমি স্পর্শ করিতেই
হ'লো তার উড়িবার সাধ।

তবে সে ধূসর প্রজাপতি :
এতোক্ষণ রয়েছিলো পাথরের কোলে;
ঘাসের তরঙ্গ বেয়ে হয়তো পাথরি ধীরে
মাঠের ওপারে গেলো চ'লে।

এমন ঘুমের মতো তারা
এমন অনন্য জগতের,
পাঁথর কি প্রজাপতি
মরণেও পাবো না তা টের।

## মৃত মানুষ

সমস্ত শরীর তার জড়ানো রয়েছে ফিট যুদ্ধের শোভায়;
যেন কেউ ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরিমায়
তাহার প্রত্যঙ্গে আছে পরিপূর্ণ হ'য়ে;
সঞ্চারণ করিলেই উঠিবে সে জেগে।

নীল আকাশের নিচে অনন্ত জলের নদী- প্রণয়ের চেয়ে
দায়িত্ব বিশিষ্টতর ছিলো তার ?
বিলোল বায়ুর চেয়ে ছিলো ঢের কৃতী শৃঙ্খলার :
বহু শতাব্দীর পরে মানুষের মতো স্বর পেয়ে ?
এইসব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার।
এখন গিয়েছে সব অস্ফুট বায়ুর মতো হ'য়ে।

## সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন

কোথায় সূর্যের যেন নব-নব জন্ম ঘিরে
মরণ উড়িতে আছে শ্বেত পারাবত;
কোথাও নক্ষত্রহীন নিরাবিল রাত্রি নিয়ে
জীবন কি বৈতরণী-তরীর নাবিক ?
পারাবত, পারাবত, তোমার হৃদয়ে শুধু রক্তবর্ণ ক্ষুধা !
যেইখানে বর্ণহীন নিস্তব্ধতা, তরঙ্গের প্রাণে কোনো অঙ্কুরের সুধা
ক্ষরিবে না কোনোদিন– সব প্রীত ভ্রমণকে শান্তি দিয়ে
চিত্ত যার শুদ্ধ অশ্রুহীনতায় সৎ,
আমাদের জীবনের নব-নব সূর্যগুলো কপোতকে দান ক'রে
আমরাও স্থির মেরু-নিশীথের নাবিকের মতন মহৎ
সততার দ্যাখা পাবো,– সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন।

## শান্তি

জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর :
কূট ব্যবসায়ী নীল পার্শ্বচরগুলো তার মৃত্যুর উৎসব ?
মানুষের তরে তবে কোন্ পথ :
কোন্ অন্তরীক্ষে তারে নিয়ে যাবে আসন্ন সময় ?
সেইখানে বালুঘড়ি, বলো, তবে স্তব্ধতার মতো :
একদিন বাতাসের সাথে ঢের ধ্বনিবিনিময়
করেছিলো;– তারপর হ'য়ে গেছে আঁখিহীন– চুপ।
প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে যে সবুজ বাতাসের আশা
একদিন বলেছিলো 'আবার করিবো আমি অমৃত সঞ্চয়'–
শত-শত মেষশাবকের আঁখিতারকাও পেলো যেন ভয়
শান্তি, শান্তি,–
উত্তেজিত শপথের উৎসারণ প্লীহা ঘিরে থাকে না সতত,
বালুঘড়ি, হ'য়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মতো।

## হে হৃদয়

হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী;
পারপারহীন এক মোহনায় তরণীর ভিজে কাঠ
খুঁজিতেছে অন্ধকার স্তব্ধ মহোদধি।
তোমার নির্জন পাল থেকে যদি মরণের জন্ম হয়,
হে তরণী,

কোনো দূর পীত পৃথিবীর বুকে ফাল্গুনিক তবে
ঝরনার জল আজো ঢালুক নীরবে;
বিশীর্ণেরা আঁজলায় ভরে নিক সলিলের মুক্তা আর মণি;
অন্ধকার সাগরের মরণকে নিষ্ঠা দিয়ে– উষালোকে মাইক্রোফোনের মতো রবে।

## আমি হাত প্রসারিত ক'রে দেই

আমি হাত প্রসারিত ক'রে দেই বায়ুর ভিতরে,
অনেক জীবাণু এসে রোমকূপে জমে–
এই এক আলোড়ন র'য়ে গেছে পৃথিবীতে;
মানুষের অন্তরেও এ-রকম;
কোনো এক রমণীকে দেখে প্রীতি,
কোনো জননায়কের অবয়ব দেখে বিস্ময়,
কোনো এক বিষয়ীর জানুর উপরে হাত রেখে দিয়ে আশা।

এইসব অনুভব তবু আজ কীলক লিপির 'পরে ভোরের আলোয়
অতীত রাত্রির পরিভাষা।
কেন না মানুষ– বায়ু, রোমকূপ, জীবাণুর মতো নয়!
ইহাদের সরলতা শিশুর মতন
মানুষ অনেক দিন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে
ক্রমশই হ'য়ে যায় বিশদ অতল।

এইসব ইতিহাস-পরম্পরা বুঝে
আমার হৃদয় থেকে বিচূর্ণ কাচের খণ্ড খুঁজে
বুজে গেছি মরণ কি। অথবা জীবন কেন অধিক বিশদ নিয়ন্ত্রণ।

সকল রঙের শিখা একসাথে মিলে গিয়ে হ'য়ে যায় শাদা।
একটি জমাট ঢিলে বহুতর বিরোধের বাধা
অনেক আবহ তার বুকের ভিতরে ধ'রে রেখে
মানুষ ও ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু নির্মীল বাতাসে
লাঙ্গুল ঘুরায়ে অগ্নির অক্ষরে ফেলে এঁকে।

## ১৩৩৬-৩৮ স্মরণে

অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন
এখানে গঠন ক'রে যেতেছিলো কয়েকটি স্থির সমীচীন
যুবা এসে:– কোথাও বিদ্যুৎ নেই– তবুও আগুন যেন ধীরে

জ্বলেছিলো এই হরীতকীকুঞ্জে মাঘের তিমিরে:
ভোর এলো:– ভারুই পাখির মতো কেউ তবু হয়নিকো আকাশে উড্ডীন।

উড়িবার কাজ সব আগন্তুক বৃহৎ চিলের তরে রেখে
অনেক আশ্চর্য শ্লোক খোঁজা হ'লো ভারতীয় মনীষার থেকে;
যেন সব অমেয় সুদূর বৃক্ষে বাতাসের সংগীতের মতো :
আমাদের সচেতন তাড়নায় প্রাণ পেয়ে জেগেছে ফলত;–
চোখ ক্লান্ত হয় তবু নখের ভিতরে হিম, নিরুত্তর দর্পণকে দেখে।

তবু সেই অপার্থিব সুর কেউ ভুলে যেতে পারে ?
দুই কানে মোম ঢেলে শুনিতে চাইনি যাহা মধ্যসমুদ্রের অন্ধকারে
আমাদের কাছে ছিলো সেদিন তা জাঞ্জিবার সমুদ্রের ওই পারে– কাম;
তাহারে এড়াতে গিয়ে করেছি অদ্ভুত প্রাণায়াম;–
যেমন প্রবীণ তার যৌবনের প্রেম ঢেকে রাখে চোখঠারে।

এখানে হলুদ ঘাসে– কাঁকরের রাস্তায়– নোনাধরা দেয়ালের ঘরে
হৃদয়ে গঞ্জনা এক জেগেছিলো বৃশ্চিকের মতন কামড়ে
এ-পৃথিবী পাক খায়,– তবু কেউ কনুয়ের 'পরে রাখে ভর
যেন স্পষ্ট সৌরজগতের এক সুশৃঙ্খল কেন্দ্রের ভিতর
রয়েছে সে;– অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সন্ধ্যার হাঁসের মতো ফিরে আসে ঘরে।

ঘরের হরিণ পারে অনায়াসে চ'লে যেতে গৃহস্থের গোধূম মাড়িয়ে।
সেই পথ থেকে তবু স'রে গিয়ে অন্য-এক অহংকার নিয়ে
কয়েকটি যুবা, নারী– সমাহৃত হ'য়ে গিয়ে ছুরির ফলায়
এখানে বাটের দিকে চেয়েছিলো;– কার যেন স্থির মুষ্ঠি টের পাওয়া যায় :
যেন সব নাসপাতি পৃষ্ঠব্রণ হয় তার নিটোল ব্লেডের মুখে গিয়ে।

আজ জানি সমবায়ে উদয়ন, নাগার্জুন, পুষ্পসেনী ছাড়া
কি রয়েছে এইসব নাম ছাড়া ?– সুনপিণ ভাবনার ধারা
কে বুঝেছে সব নয় ?– জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়– সেবা চায়; তাই ভেঙে ধ'সে গেলো অমোঘ সমিতি;–
অন্বীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া ?

আকাশরেখার পারে তবুও যাহারা এই পথে এসে আবার দাঁড়াবে–
প্রকম্পিত কম্পাসের সূচিমুখ খানিক স্থিরতা যেন পাবে
তাদের ছোঁয়াচে এসে; যদিও পাথরগুলো হ'য়ে গেছে আবার প্রাচীন
নিওলিথ পৃথিবীর,– এইসব ঘাস, হরীতকী, সূর্য মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড় প'ড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

## এই ঘর অবিকল

এই ঘর অবিকল পারম্পর্য বুজে ল'য়ে তবু
স্তব্ধ হ'য়ে পড়েছিলো সারাদিন আজ
তারপর রাত্রি এলো হেমন্তের নিস্তব্ধতা নিয়ে
আমিও এলাম চ'লে– ধূলিধূসরিত কোনো মিউজিয়মের
দরোয়ান যখন লাগাবে তালা– ক্লিক শব্দ হয়
অথবা হবার আগে যখন পিছল তালা ন'ড়ে ওঠে
শিশিরে উজ্জ্বল কোনো অমায়িক পাখির মতন
আমি আসি; আমারে আসিতে হয় রোজ
টালিগঞ্জ থেকে ট্রাম– অথবা ট্রামের
রাঙা-নীল-আলো-ঈপ্সা
    রাত এগারোটা এলে শহরের
নিরুত্তর– নিবিড়– বিদেশি মুখ
প'ড়ে পাওয়া পথগুলো– খড়ির স্বাক্ষরহীন
সুদীর্ঘ জানালা সব– (কোনো ক্রুশচিহ্নহীন)
নিরুদ্ধ দরজাগুলো– (অনুনমেয়ের মতো)
অন্ধকার গলি–
    গ্যাসের স্বর্গীয় আলো
(অননুভূতের মতো)– আমারে তোমার দিকে ডাকে :

প্রায়ই দ্যাখা হয়– তবু মনে হয়
বহুদিন মরেছিলে তুমি
এই দেশ থেকে দূরে– উত্তর-পশ্চিম দিকে
যেইখানে জুতো আঁটা পায়ের মতন নেমে– ভূমধ্যসাগরে
কোনো এক দেশ ছিলো হয়তো বা–
    আজো তার ল্যাম্পের কাছে
ভৌগোলিক বালকেরা অক্ষুণ্ন কৌতুকে চেয়ে
    টের পায় নিমীল আলোয়
মানচিত্র ভেসে গেছে বেগুনি রঙের এক সমুদ্রের রোলে
সেই দেশে– কোনো এক নিচু আকাশের খোপে
আরো ক্ষুদ্রতর স্রোতে অদ্ভুত অসুস্থ এক মিউনিসিপালিটির
জন্মেছিলো কয়েকটি ধূসর দেয়াল– রাত্রি– দরিদ্রতা
প্যারাফিন আলো– রুক্ষ ভাজা মাছ– ছবি– ঘাস– তুমি
অন্ধকার তাকে ছিলো আরক ও বৃশ্চিকের মৃতদেহে মেলানো শিশির
    সমধিক নীরবতা–
তবুও জানালা দিয়ে আকাশের তুষ্ট কুকরীকে
দ্যাখা যেতো ব্রহ্মহৃদয়– বলা যেতো ওই বৃষ– ওই মৃগশিরা–
আর্দ্রা– অগি– সরমা– রোহিণী– বানরাজা–

শহরের মেয়রের চেয়ে কিছু বড়ো ওরা হয়তো বা
ন'ড়ে যায় টি-পার্টিতে– কিংবা অন্য চিক্কণ চিপ্‌টেনে
ময়দানের সমুজ্জ্বল বিমুক্তিতে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ ক্লবে
(মুখোমুখি পুরুষ-নারীর নীল নিট্ ক্লোজ-অপে)
এসে যেতো হিম হাওয়া। অস্পষ্ট দৈত্যের মতো একা
তিন বার তিন ধনু দূর থেকে পাহাড়ের চূড়া
থেমে যেতো– থেমেছে হঠাৎ যেন: বরাবরি থেমে রবে ব'লে।

আমরাও থেমে গেছি– ডালমুট খেতে গিয়ে
হিম পকেটের থেকে হঠাৎ কমলালেবু
আধেক তুলিতে গিয়ে–
আমি যে শিশুর পিতা– আরো ঢের দূরে
ছোটো হেতু হেঁয়ালির মধ্য-নরকের ফাঁকে– হেত্বাভাসে থাকি
অনেক বীজাণু ধুলো কৃকলাসদের মতো এসে বিছানার 'পরে
আগাগোড়া খেয়ে ফেলে তবু যেই শিশুর মায়ের
হৃদয়যন্ত্রকে ফেলে রেখে গেছে সময়ঘড়ির মুখে, ভুলে–
তাকে নিয়ে ঘর করি–
নির্জন শীতের রাতে দম্পতির বিছানায় তাই
অনুকম্পা পা গলিয়ে ব'লে যায় : 'খেলনার রঙিন দোকানে
সেলুলয়েডের মতো প্রেম হ'তো; তবু– তোমাদের–
রুধিরে জন্তুরো লিপ্সা নেই–'

সেইসব জানো তুমি? সেদিনো জানিতে তুমি ? তুমি
কি ক'রে জন্ম নিলে– কি ক'রে জন্ম দেয় জীবনকে নারী
সেইসব প্রণালীর থেকে ঢের দূরে স'রে একা
তবুও রাত্রি এলে নেউলের শরীরের মতন ধূসর
বিছানা রাখিবে পেতে– আঞ্জির শাখার মতো অন্ধকারে তুমি।
(আগাগোড়া নগরীর ভাঁড় আর মাতালের সংঘকে
মোলায়েম ক'রে দিতে ভাঁড়ারের পনিরের মতো।)
দুই-জন যুবকের জন্যে শুধু। 'তুমি একজন' ?
তাই মৃত্যু হ'লো তার হাতে (সেই) তুষের রঙের মতো ম্লান
বিছানার। গাটাপার্চা পুতলের হে চিকুর জননী, তোমার–
তোমার সে বৃশ্চিক– দেয়াল– লেবু– মাছ– প্যারাফিন–
থুতনিতে হিম হাওয়া– বিকেলের কুয়াশায়
অকস্মাৎ আগন্তুক জেঠিমার মতো সেই পাহাড়ের
শেষ হ'লো।
(রোজি দ্যাখা যায়– তবু মনে হয়
ঢের দিন বিদেশের অন্ধকারে ম'রে ছিলে তুমি।)

সমুদ্রের ওই পারে নদী আছে– নদীর ওপারে
বাটা মাছ ভাজে তারা জলপাই তেলে
সেই ঘ্রাণ নিয়ে রাত্রি যেখানে উঠেছে জেগে
চেয়ারম্যানের মুখ– দরিদ্রতা– গোল শহরের
ম্লান আলো– ধূসর দেয়াল–
ক্বাথ– কুজ্ঝটিকা– অন্ধকার ঘিরে
তবুও তুমিও ছিলে সেইখানে– মৃত্যু হ'লো সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তবু,
অপারগ ধাত্রীর হাতে। অথবা কি ক'রে তার মৃত্যু হ'লো–
ধোঁয়াটে কাহিনী এক– আজ রাতে মনে নেই কিছু:
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কারু কিছু মনে নেই।

## গতিবিধি

সর্বদাই প্রবেশের পথ র'য়ে গেছে:
এবং প্রবেশ ক'রে পুনরায় বাহির হবার;–
অরণ্যের অন্ধকার থেকে এক প্রান্তরের আলোকের পথে:
প্রান্তরের আলো থেকে পুনরায় রাত্রির আঁধারে;
অথবা গৃহের তৃপ্তি ছেড়ে দিয়ে নারী, ভাঁড়, মক্ষিকার বারে।

এইসব শরীরের বিচরণ।
ঘুমায়ে সে যেতে পারে।
(সচেতন যাত্রার পথ তবু আরো প্রসারিত।
আলো অন্ধকার তার কাছে কিছু নয়।)
উটপাখি সারাদিন দিবারৌদ্রে ফিরে
বালির ভিতরে মাথা রেখে দিয়ে আপনার অন্ধ পরিচয়
হয়তো বা নিয়ে যায়,– হয়তো বা পাখির বিনয়।

কোনো এক রমণীকে ভালোবেসে,
কোনো এক মড়কের দেশে গিয়ে জোর পেয়ে,
কোনো এক গ্রন্থ প'ড়ে প্রিয় সত্য পেয়ে গেছি ভেবে,
অথবা আরেক সত্য সকলকে দিতে গিয়ে অভিভূত হ'য়ে,
শরতের পরিষ্কার রাত পেয়ে সবচেয়ে পোশাকি, উজ্জ্বল–
অথবা সবের চেয়ে দূরতম নক্ষত্রকে অকৃত্রিম বুঝে
চিন্তা তবু বর্ষারাতে দ্বার থেকে দ্বারে
ভিজে কুকুরের মতো গাত্রদাহ ঝাড়ে।

সমাধির ঢের নিচে– নদীর নিকটে সব উঁচু-উঁচু গাছের শিকড় গিয়ে নড়ে।
সেইখানে দার্শনিকদের দাঁত ক্বাথ পান করে

পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরামাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে; -
জেনে নিয়ে আমরা প্রস্তুত ক'রে নেই নিজেদের;
কেননা ভূমিকা ঢের র'য়ে গেছে,-
বোঝা যাবে (কিছুটা বিনয় যদি থেকে থাকে চোখে) -
সুশ্র ময়ূরেরা কেন উটপাখি সৃষ্টি করেছিলো
টানাপোড়েনের সুরে– সূর্যের সপ্তকে।

## নির্দেশ

জীর্ণ-শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে
তামাসা চালাচ্ছে আছে পুনরায় সময় একাকী।
তবুও সে ভোরবেলা হরিয়াল পাখি
ধূসর চিতলমাছে– নির্ঝরের ফাঁসে
খেলা ক'রে কাকে দিয়েছিলো তবে ফাঁকি ?
বসন্তবউরী দুটো এই ব'লে হা-হা ক'রে হাসে।
সেই হাসি জ্ব'লে ওঠে নির্ঝরের 'পরে;
গড়ায়ে-গড়ায়ে গোল নুড়ি
উজ্জ্বল মাছের সাথে ভোরের নির্ঝরে
সময়ের মাকুটাকে ক'রে দিলো উড়ু খুড়ু খুড়ি।
বিরক্ত সময় তাই খুঁজে নিতে গেলো কোনো বিষয়ান্তরে
নিজের নিয়মাধীন হৃদয়ের জুড়ি।

আলো যদি নিভে যায় সময়ের ফুঁয়ে
তাহলে কাহার ক্ষতি– তাহলে কাহার ক্ষতি হবে।
এই কথা ভেবে যায় কালো পাথরের 'পরে নুয়ে
মৈত্রেয়ী– নাগার্জুন– কৌটিল্য নীরবে।
তিন হয়, চার হয়, পাঁচ হয় তবুও তো দুয়ে আর দুয়ে।
হেঁয়ালি ও নিরসন নির্ঝরের নিক্কণের মতো বেঁচে রবে।

## প্যারাডিম

সময়ের সুতো নিয়ে কেটে গেছে ঢের দিন
এক-আধবার শুধু নিশিত ক্ষমতা
এসেছিলো,– তারপর নিভে– মিশে গেছে;
হৃদয় কাটালো কাল।
বালুঘড়ি ব'লে গেলো : সময় রয়েছে ঢের
সেই সুর দূর এক আশ্চর্য যক্ষের

চোখের ভিতরে গিয়ে স্বর্ণ দীনারের
অমোঘ বৃত্তের মতো রূপ নিয়ে নড়ে।
বালুঘড়ি ব'লে যায় : সময় রয়েছে ঢের
সময় রয়েছে ঢের উল্লাসের উল্লাসের;
সমুদ্রের বালি আর আকাশের তারার ভিতরে
চলেছে গাধার পিঠে সিংহ, মেষ, বিদূষক,
মূর্খ আর রূপসীর বিবাহে কটক,
ক্রীতদাস কাফ্রিরা তেল ব'য়ে আনে।
সময় রয়েছে ঢের— সময় রয়েছে ঢের
সরবরাহের সব অগণন গণিকারা জানে।

চারিদিকে মৃগয়ার কলরব— সময়ের বীজ।
অনেক শিকারি আজ নেমেছে আলোকে।
আমিও সূর্যের তেজ দেখে গেছি বহুক্ষণ
ভারুই পাখির মতো চোখে;
ঘুরুনো আলোয় ঘুরে সংস্কারে;— উড়িবার হেতু
যদিও নেইকো কিছু ক্ষিতিজ রেখার পথে আর।
বহু আগে রণ ক'রে গিয়েছিলো বুদ্ধ আর মার;
অগ্নির অক্ষরে তবু গঠিত হতেছে আজো সেতু।
ব্রহ্মার ডিমের মাঝে একসাথে জন্মেছিলো যারা অলোবেসে
সেই স্বর্গ নরককে আবার স্কালন ক'রে— প্রামাণিক দেশে
তারাই তো রেখে দেবে,— মাঝখানে যদিও রয়েছে আজ বিরক্ত সাগর,
বিশ্ববাসীরা চোখ বুজে ব'য়ে নেয় মুণ্ড আর কঙ্কালের কেতু।

সম্রাটের সৈনিকেরা পথে-পথে চ'রে
খুঁজে ফেরে কোনো এক শুভলাঞ্ছন;
সফেন কাজের ঢেউয়ে মৃত্যু আছে— জানে;
তারো আগে র'য়ে গেছে জীবন-মৃত্যুর অমিলন;
যেন কোনো নরকের কার্নিশের থেকে ধীরে উঠে
কোনো এক নিম্নতর আঁধারের ময়ূরের মতন পোশাক,—
সৈকতে বালির কণা নক্ষত্রের রোলে যদি একসাথে জুটে
আবছায়া, অগ্নিভয়, অন্ধকার— সময়ের হাতে ঠেলে ফেলে
অনাবিল অন্তঃসার নিতে দেয় খুঁটে।

সৈনিকেরা সম্রাটেরা স্থিরতর— তবু;
চারিদিকে মাতালের সাবলীল কাজ শেষ হ'লে
প্রতিধ্বনিও আর থাকে নাকো যখন আকাশে
জলের উপরে হেঁটে মায়াবীর মতো যায় চ'লে।
(পতীর সৌকর্য দেখে মানবীয় আত্মা জাগে অন্তরের ভিড়ে :)

অবিস্মরণীয় সব ইতিহাসপর্যায়ের দিকে
চেয়ে দ্যাখে সর্বদাই পৃথিবীর প্রবীণ জ্ঞানীকে
ডেকে আনে তারা নিত্য নতুন তিমিরে;
'নিপুণ ছেলের হাতে লাটিমের মতো ঘোরে' দ্বৈপায়ন বলে
ঘুরায়ে নিবিড় সেই প্যারিডমটিরে।

'যখন চিনির দাম বেড়ে গেছে ভয়ঙ্কর
তারা খায় স্বেচ্ছায় নুনের পরিজ।
সমস্ত তণ্ডুল হ'য়ে গেলে সব পৃথিবীর,
মসৃণ টেবিলে ব'সে খেলে যায় ব্রিজ।
জীবনকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের মতো মেনে নিয়ে
মঞ্চে বক্তৃতা দেয় কর শুনে– কুকুর ক্ষেপিয়ে।'
ব'লে গেলো অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

'সমস্ত সভার মাঝে তারপর
দম আর থাকে নাকো কোনো কুকুরের;
একটি মাছিও আর বসে নাকো বক্তার নাকে
একটি মশাও তাকে পায় নাকো টের;
এবং পায়ের নিচে পৃথিবীরো মাটি আর নেই
তবু সবি পাওয়া যাবে চালানির মাল ছাড়লেই।'
ব'লে গেলো অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

'আমরা সকলে জানি বানরাজা নক্ষত্রের থেকে
সে-জাহাজ এসে গেছে মৃগশিরা তারকার দিকে;
হয়তো সরমা তাকে তুলে ধ'রে সারমেয়দের
নিকটে পাঠায়ে দেবে নির্জন তারিখে।
সম্প্রতি রুটিন তবে শেষ করে– ঘুমাবার পরে
আবার সে দ্যাখা দেবে আমাদের স্বাভাবিক সুবিধার তরে।'
ব'লে গেলো অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

## রাত্রি

এইখানে কিছু আগে– বিরাট প্রাসাদে– এক কোণে
জ্ব'লে যেতেছিলো ধীরে একসটেনশন লেকচারের আলো।
এখন দেয়ালে রাত– তেমন ততোটা কিছু নয়;

পথে-পথে গ্যাসলাইটে রয়েছে ঝাঁঝালো
এখনো সূর্যের তেজ উপসংহারের মতো জেগে।
এখনো টঙ্গে চ'ড়ে উপরের শেলফের থেকে
বই কি বিবর্ণ কীট– ধুলো– মাকড়সা বার হবে
দোকানের সেলসম্যান চুপে ভেবে দ্যাখে।
এখনো নামেনি সেই নির্জন রিকশগুলো– নিয়ন্তার মতো,
সমূহ ভিড়ের চাপে রয়েছে হারায়ে।
অজস্র গলির পথে একটি মানুষ
যুগপৎ রয়েছে দাঁড়ায়ে;
পৃথিবীর সকলের হৃদয়ের প্রতীকের মতো;
এই রাত থেকে আরো অধিক গভীরতর রাতে
কলুটোলা– পাথুরিয়াঘাটা– মির্জাপুরে
এস্‌প্লানেডের ফুটপাতে
মালাঙ্গা লেনের পথে– ক্রিক রো-তে
কক্‌বার্ন লেনের ভিতর
একজোড়া শিং যদি দ্যাখা দেয় লোকটার টাকে–
পরচুলা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে তবে জাদুকর।
এখানে রাত্রির পারে তোমার নিকট থেকে আমি
চ'লে গেলে
চ'লে যাবো;–
পৃথিবীর কাছ থেকে নয়;–
রাত্রি এই সারারাত জীবনের সকল বিষয়
হ'য়ে আছে।
তিত্তিরাজ গাছ থেকে শিশির নীরবে
ঝ'রে যায়;–
ডানার আঘাত যায় কাকদম্পতির :
হলুদ খড়ের 'পরে ঝ'রে পড়ে আবার শিশির
হাওয়ার গুঁড়ির মতো।
কোথায় হারায়ে তুমি গিয়েছো কখন।
মাথার উপরে সব নক্ষত্রেরা ছুরির মতন বিচক্ষণ
সময়ের সুতো কেটে– অবিরাম সময়ের সুতো কটে ফেলে:
আমার চোখের 'পরে রাত্রির প্রাঞ্জলতা ঢেলে:
কোথাও বাতাবি উষ্ণ হ'য়ে ওঠে– ঘুরে যায় মাকড়সা পোকার লাটিম;
ভাঁড় হাসে– সম্রাজ্ঞীর অবয়ব হ'য়ে থামে হিম:
নদীরা শিশুর মতো– শিশুরা নদীর-মতো দূর;
স্বর্গের কিনারে গিয়ে ভিড় আর ভিখিরির নীল আলো করে টিমটিম।
শিশুর কপাল থেকে বেজে ওঠে নরকের বিচিত্র ডিণ্ডিম।

অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি, অবশেষে কোনো এক বলাকিত পথে
মানুষের হৃদয়ের গীতির মতন এক নিভা
দেখেছি রাত্রির বুকে নিভাসিত হ'য়ে থেকে আপনার আলোর পাতিভা
বিচ্ছুরিত ক'রে দেয়া সংগীতের মতো কণ্ঠস্বরে।
হৃদয়ে নিখিল হ'য়ে অনুধ্যান ক'রে
মহাদানবের দ্বীপ ভেঙে ফেলে স্বপ্নালসুগের পরিমাণকে।
চিন্তার তরঙ্গ তুলে যখন তাহাকে
ডেকে যায় আমাদের রাত্রির উপরে
পাঙ্গল উজ্জিত এক ভেসে ওঠে নেপথ্যের অন্ধকারে। আলো ভূত আরেক মানব
আরেক শরীর তনু অধিক গভীরতরভালে এক শব।

নিজের কেন্দ্রক তলে সঞ্চারিত হ'য়ে উঠে আপনার নিরালোকে থেকে
আচ্ছন্ন কুহক, ছায়া, কুজ্ঝটিকা আলো চিনে আপনার আদু চিনে নিতে
ফুরাতেছে দাঁড়াতেছে। তুমি তাকে স্থির প্রেমিকের মতো অবসান দিতে
সেই ক্লীন বিস্তৃতিকে ডেকে গেলে নিরাময় অদিতির ক্রোড়ে।
অনন্ত আকাশবোধে ভ'রে গেলে কালের দু-মুঠি মরুভূমি।
অবহিত আগুনের থেকে উঠে যখন দেখেছো সিংহ, মেষ, কন্যা, মীন
নদিনে জড়ানো মণি মণি দিয়ে জড়ানো নদিন,
প্রকৃতির পরিবেদনার চেয়ে বেশি প্রামাণিক তুমি
সামান্য পাখি ও পাতা ফুল
মর্মরিত ক'রে তোলে ভয়াবহভালে সৎ অর্থসংকুল।

যে-সব বিস্তৃত অগ্নি লেলিহান হ'য়ে ওঠে উনুনের অতলের থেকে
নরকের আগুনের দেয়ালকে গড়ে,
তারাও মহৎ হ'য়ে অবশেষে শতাব্দীর মনের ভিতরে
দেয়ালে অঙ্গার, রক্ত, এক্যায়ামেরিন আলো এঁকে
নিজেদের সংগঠিত প্রাচীরকে ধূলিসাৎ ক'রে
আরেক শবের মতো স্থির;
তবুও শবের চেয়ে বিশেষ অধীর।
প্রসারিত হ'তে চায় ব্রহ্মাণ্ডের ভোরে;
সেইসব মোটা আলা, ফিকে রঙ, উত্তর ফালুস,
শ্রীবৎসলোর দিকে যুগে-যুগে সাদের পাঠালো দরাযুস।

সে-সবের বুক থেকে নিরুত্তেজ শব্দ নেমে গিয়ে
প্রশ্ন ক'রে যেতেছিলো সে-সময়ে নাবিকের কাছে।
সিন্ধু ভেঙে কতো দূর নরকের সিঁড়ি নেমে আছে?
তাতোপুর সোপানের মতো তুমি পাতালের প্রতিভা সেঁদিয়ে

অপারিতভাবে পাখা পাখির মতন সেই মুকুলো আমারে
নিজে লমাণিত হ'য়ে অনুভব করেছিলে পোচনার সীমা
মানুষের আত্মিকের জীবন প্রালিমা,
বৃহস্পতি ব্যাপ্ত তব হোমরের ছায়রান হাতে
নিযুক্ত হয় না তবু কি ক'রে নিযুক্ত তবু হয়,
জেনে তার শুভ্র আত্ম হ'লো অনুরক্ত পূর্ণময়।

অতঃপর আমি আর জলেয়র জনপরিজন দূরে মিলে
লোকালয় জাহাজের কালকাটা টিকিটের রেলে
রক্তাক্ত পয়ুদ পাড়ি দিয়ে এই আকাশের বেলে
প্রবেশ করেছি তার জগতের তিনি দূরে তিনে।
এখানে উজ্জ্বল মাঠে ভ'রে আছে নদী ও সাগর।
দীরক্ত মানুষদের উদরোদিত করে সব অপরূপ পাখি,
কেউ কাকে দূরে ফেলে রয় না একাকী।
যে-সব কৌটিলা, কূট, সাপার্ঝুল কোথাও পাওনি সদুত্তর
এইখানে সেইসব কৃতদার, গ্লাস দার্শনিক
ব্রহ্মাণ্ডের গোল কারুকার্য আজ কপালি, সোনালি মোজায়িক।

একদার মানুষের শরীরের কাঁস থেকে যার হ'য়ে তুমি ;
(সে-শরীর ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম পরীয়ান)
যে-কোনো খঞ্জর থেকে পেতেছে সস্মিত সম্মান,
যে-কোনো সোনার বর্ণ সিংহেদস্পতির মকরাক্ষি,
অথবা ভারতী শিল্পী একদিন যেই নিরাময়
গরুড় পাখির মূর্তি গড়েছিলো রাত্রির পুসরতর পাতে,
অথবা যে মহীয়সী মহিলারা তাকাতে তাকাতে
নীলিমার পরিমার থেকে এক শুকতর ভয়
ভেঙে ফেলে দীর্ণ ডানা ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে
কবিতার পাঠ এনামেল আজ সেইসব জ্যোতির ভিতরে।

## পরিমা

সহসা ঝড়ের দিনে লুণ্ঠনের ঊর্ধ্বে উঠে ছিল
আমারি এ-হৃদয়ের মতো
হয়তো বা নীলিমাকে চায়।
তবুও সৈন্যের কাছে প্রেমিকেরা হয়ে পরাহত,
পরিহাস ক'রে যায় বিরক্ত নির্বিকল ?

কখন সে প'ড়ে গেছে আমাদের পায়ের নিকটে
সোনালি, প্রবীণ এক পাখি।

জীবনকে আকুতির মতো বড়ো মনে করেছিলো;
তবুও আজ আকাশের মতো আরো বৃহৎ একাকী
মৃত; মৃত্যু প্রিয় আজ আমি তার হাতে আঁকা পটে।

চারিদিকে অবিকল বিকেলের রাঙা সূর্য জ্বলে;
নদীর জলের সুর সন্তর্পণে কান পেতে প্রবাহিত হয়;
আমার হৃদয়ে যেই সুশৃঙ্খলা হয় না গ্রথিত
আকাশ বাতাস নদী তাই নিয়ে তবুও তন্ময়।
এইসব অভিজ্ঞান র'য়ে যাবে দু-একটি গরিমার মতো।
অথবা গরিমালোক এই শতাব্দীর হাওয়া একগাল
পান ক'রে শেষ হ'য়ে গেলে
ফট্‌কাবাজার সব– সেয়ানে-সেয়ানে এসে মেলে।

## আবছায়া

ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ
বিকেলবেলায়ো আজ একটি কঠিন
বিষণ্নতা লেগে আছে পৃথিবীর বুকে।
একটি কৃষাণ এসে দুয়ে-দুয়ে যোগ ক'রে তিন
লিখে যায় সারাদিন মাঠের ভিতরে।
কোথাও ফলন নেই তার।
ঠাণ্ডা কঙ্কালের কাছে সারারাত গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকে;
কিছুই করে না অস্বীকার।

২

নির্মীল জলের ঢেউয়ে নদী চ'লে যায়।
জল ছাড়া কিছু নেই তার।
কখন সকালবেলা বিকেল হয়েছে
আমাদের চেনা শতাব্দীও চ'লে গেছে।
চলেছে সে জলপায়রার নীড় খুঁজে।
নদীর কিনারে
বাদামি মাটির 'পরে ঝ'রে পড়ে পাতা।
এইসব শাদা সাধারণ বিশ্বস্ততা।

আমারো আঙুলে প'ড়ে থেমে থাকে– যতোদিন আছে–
একটি হলুদ পাতা। নিকটের গাছে
কোথাও কোকিল হিম শূন্যতার পানে গান গায়,
পাখিটির ভয়াবহ একাগ্রতার তুলনায়

কেবলি সময়ান্তর এসে পড়ে সভ্য পৃথিবীতে :
বার-বার অপরাহ্ণের মৃত্যু হয়।
জানে না কি বস্তু নিয়ে তৃপ্ত হ'তে হবে
পুরাতন খসড়ায়-- অথবা বিপ্লবে।

## কুহুলিন

এইখানে অন্ধকার রচনা করেছে তার সপ্রতিভ মুখের পৃথিবী :
এইখানে শীতের বাতাস
মৃদু উষ্ণতার সাথে মিশে কামিনী ফুলের মতো যেন বারো-মাস।
মৃত নারীদের সব সমাধিতে– কিছুই লুণ্ঠিত হবে নাকো আর– এমন আভাস।
এখানে শিশির ঝরে দূরবীন-অগোচর কুহুলিন নক্ষত্রের থেকে।
কোথাও নেইকো কোনো পাখি।
মিরুনি নদীর জলে বৃহস্পতি, মঙ্গল, মৃগশিরা ভেসে গেলে বাকি
ইতস্তত তারাগুলো চেয়ে থাকে মৃতদার সারসের মতন একাকী :

সহসা নদীর জলে সূচিমুখ ন'ড়ে ওঠে ব'লে মনে হয়;
চেয়ে দেখি নির্জন হাত
আমার চোখের চাওয়া তারকায় না জেগে হয়েছে ধূলিসাৎ :
মেধাবীর ভূয়োদর্শনের মতো রাসভের নিকটে হঠাৎ।

এখানে শিশির ঝরে সময়বিন্দুর মতো কুহুলিন নক্ষত্রের থেকে :
এদেশ মালয়, বালি, শ্যাম, ইন্দোচীন
সমুত্তীর্ণ হ'য়ে তবু স্বর্গ-নরকের চোখে চিরকাল সমভাবে বিবেচনাধীন;
লঘুগুরু কুয়াশার আবরণ থেকে চেয়ে দেখেছে অনপনেয় কুহুলিন :

## ঘাস

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেলো নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেলো দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল ক'রে নিতে গেলো নিজের সঞ্চয়ে।
উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
ক'রে নিতে গেলো– তবু– সময়ের ঋণ
ধীরে-ধীরে ডেকে নিয়ে গেলো তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়।
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীন দুয়ার
খুলে দিতে গেলো দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেলো ঘাসের মতন তার হাড় :

সেই থেকে হাসায় এ-পৃথিবীকে ঘাস
ছ-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয়-মাস।

## সমিতিতে

ওইখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক।
উঠেছে বক্তা এক– ষড়যন্ত্রহীনভাবে– দ্যাখে
দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক
সহসা দেখেছে কেউ– যদিও অনেকে
আশীর্বাদ করে ওর সূত্র উষ্ণ হোক;
আরো অবারিত সুর বার হোক মাইক্রোফোন থেকে।

আরো বিস্তারিত সুর বার হোক– বার হয় যদি।
কেননা যুগের গালে কালি আর চুন।
আমাদের জলের গেলাস তবু হ'তে পারে নদী;
গোলকধাঁধার পথ– আকাশে বেলুন।
তাহলে বলুন এই শতাব্দীর সমাপ্তি অবধি–
কি ক'রে একটি চোর সাতজন প্রেমিককে করেছিলো খুন।

## রবীন্দ্রনাথ

দেয়ালচিত্রের শীর্ষে পৃথিবীর কোনো এক আশ্চর্য প্রাসাদে
একটি গভীর ছবি মানুষে দেখেছে চিরকাল।
কেউ তাকে সূর্য ব'লে মনে করেছিলো;
কেউ তাকে ভেবেছিলো গরুড়ের উড্ডীন কপাল :
যখন সে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে
উদয় ও অস্তকে এক ক'রে দিতে ভালোবাসে;
শাদা রাজবিহঙ্গের প্রতিভায় বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে যায়,
হয়তো বা আমাদের মর্তপৃথিবীতে ফিরে আসে।
তাকাতে-তাকাতে সেই প্রাসাদের মেধাবী দেয়ালে
আমাদের ইহলোক ব'লে মনে হয়– তবু সৃষ্টির অনন্ত পরকাল।

তোমার বিভূতি, বাক্-বেদনার থেকে উঠে নীলিমা-সংগীতি
আমাদের গরিমার বিকীরণে ডুবে, গ'ড়ে গেছে সব মানুষের প্রাণ :
কি ক'রে কল্যাণকৃৎ অর্থের তরঙ্গে জেগে (মোম নিভে গেলে)
স্বাতী, শুক্রতারকার মতন ধীমান
মহা অবয়বদের থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠে আভা দিতে পারে :
শেয়াল শকুন শনি বানরের সমাজ ও রাষ্ট্রের 'পরে;

সৃজনের আদি অন্তিমের রাঙা আগুনের মতো গোলাকার
ব্যাপ্ত এক সংগীতের বৃত্তের ভিতরে
পেয়ে যেতে পারে তার তিসি-তিলে বিম্বিত ব্রহ্মাণ্ডের মানে;
সে-সুর নিমীল হ'য়ে, লেলিহান হ'য়ে, নির্মীলিত হ'তে জানে,

মহান, তোমার গানে; এইসব বলয়িত ক'রে চিরদিন–
অথবা যখন তুমি আমাদের দেশে সৃষ্টি শেষ ক'রে ফেলে
প্রকৃতির আগুনের উৎস থেকে উঠে একদিন
নিঃস্বার্থ আগুনে ফিরে গেলে,
পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওরিজেন, হোমরের মতো
দাঁড়ায়ে রয়েছো তুমি একটি পৃথিবী ভাঙা-গড়া শেষ ক'রে দিয়ে, কবি,–
দানবীয় চিত্রদের অন্তরালে আপনার ভাস্বরতা নিয়ে;
নিকটে দাঁড়ায়ে আছে নিবিড় দানবী।
অথবা ছবির মতো মনে হয় আমার অন্নপানদোষে ম্লান চোখে :
অল্প আলোকের থেকে পুরাণ-পুরুষ সব
চ'লে যায় অনুমেয়, অজ্ঞেয় আলোকে।

## কোরাস

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জানো না কি চমৎকার !
বলিলো মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

হে চিল, চিলের গান জ্যৈষ্ঠের দুপুরে,
হে মাছি, মাছির গান,
সমুদ্রের পারে এক শব্দহীন মূর্তির বিরাম;
আর সব শাদা পাখি সূর্যের সন্তান।
জানো না কি চমৎকার !
বলিলো মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

আলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে চ'লে যাবার কৌশল
কেবলি আয়ত্ত ক'রে নিতে চায় পৃথিবীর উৎকণ্ঠিত ভিড়।
সৈকতে পাখিদের বরফের মতো শাদা ডানা
সূর্যের পাকস্থলীর !

জানো না কি চমৎকার !
বলিলো মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

কেবলি পায়ের নিচে বালির ভিতরে
উঠে আসে পারাপার-প্রত্যাখ্যাত হাড়:
কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত, অব্যক্ত হাত–
তাদের দ্যাখায় কিমাকার।

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জানো না কি চমৎকার !
বলিলো মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

## রবীন্দ্রনাথ

আজ এই পৃথিবীতে অনেকেই কথা ভাবে।
তবুও অনেক বেশি লোক আজ শতাব্দী-সন্ধির অসময়ে
পাপী ও তাপীর শববহনের কাজে উচাটন
হ'য়ে অমৃত হবে সাগরের বালি, পাতালের কালি ক্ষয়ে ?

কোথাও প্রান্তরে পথে ফুল পাখি ঘাসের ভিতরে
সময় নিজেকে ফাঁকি না দিয়ে হয়তো নিখিল চালাতেছে;
আড়াই চালের মতো রক্তের চঞ্চল তাল
সেখানে দু-এক মোড় খুলে, স্বাভাবকি হ'য়ে গেছে।

নিমিষে আহ্নিকগতি উতরোল হ'য়ে উঠে ম্যামথের পরে– মানুষের ।
কবি ও নিকট লোকের মতো, বড়ো এক প্রিয়–
অন্ধ মরুতে কবে ফা-হিয়ান সূর্যের সোনা দেখেছিলো–
বিশদ প্রসঙ্গে আজ ততোধিকভাবে স্মরণীয়।

## বাতাসের শব্দ এসে

বাতাসের শব্দ এসে কিছুক্ষণ হরীতকী গাছের শাখায়
মিথিরিত হ'য়ে থেমে যায়, তার মৃত্যু হ'লো ব'লে।
এক-পা দুই-পা ক'রে দুই-চার মাইল

প্রান্তরের সাথে আরো পরিচিত হ'লে
এমনি প্রান্তর থাকে রৌদ্রময়, শব্দবিহীন,
যতোক্ষণ অপরাহ্ণ বুকের উপরে প'ড়ে থাকে
তার; শালিখ পাখিকে আমি নাম ধ'রে ডাকি;
ছায়া বা অনলোজ্জ্বল পাখিনীকে ডাকে
তবুও সে; মানুষের অন্তঃসার অবহেলা ক'রে
বিহঙ্গের নিয়মে নির্জন।
উনিশশো-চল্লিশের কতো গ্রাম, নগর গিয়েছে;
সে-সবের জনসাধারণ
উনিশশো বেয়াল্লিশ খ্রীস্টাব্দের অপরাহ্ণে নেই।
উনিশশো অনন্তের ভূখণ্ডে, আকাশ
মাঝে-মাঝে অনুভব ক'রে নিতে চাই;
শান্তি নেই; নীললোহিতের প্রতি শেষ অবিশ্বাস
আছে কি না আছে ভেবে চেয়ে দেখি : পাখি, রৌদ্র, ঘাস।

## অনুভব

আমরা আশ্চর্য পথে যাবো না কি আর ?
কোথাও দ্যাখার মতো র'য়ে গেছে কিছু।
আত্রেয়ীর থেকে বঙ্গসাগরের সীমানা বিপুল;
ভোরবেলা পশ্চিমের থেকে যাত্রা ক'রে :
সায়াহ্নের বাংলার বদ্বীপের মতো উপকূল;
লবণসমুদ্র তাকে যেমন উজ্জ্বল করে– সূর্য যা সব
রৌদ্র দিয়ে সৃষ্টি করে–
তা ছাড়া নীরব।

বাংলার মাঠের শিয়রে বড়ো চাঁদ
ধীরে এসে থেমে দাঁড়াতেই–
প্রকৃতি নিজের মনে যা দেয় তা ছাড়া
কোথাও বাড়ন্ত জ্যোৎস্না নেই।
মৃতদার হ'য়ে গেলে তবু তার ছায়ার মতন
এইসব এইখানে মানুষের মন
অধিকার ক'রে থাকে।

এই দেশ সূর্যের, সাগরের আলো থেকে সেঁচা;
তাম্রকায় মানুষের কাছে কিনে বেচা সব– মূল্যহীন ভাঁড়ারের পেঁচা
না জেনে জ্যোৎস্নায় ওড়ে কি রকম বিভাতির মতো
আজ কিছু শান্তি নয়– সুখ নয়,
ব্যথা নয়– তবে

ভেদাভেদ লোপ ক'রে দিতে গিয়ে অন্তহীন বিভেদ জেগেছে,
ফুরাতেছে– এরকম শ্রেণীস্বার্থহীন অনুভবে।

## আলোসাগরের গান

মানুষের ঘনবসতির ঢেউ নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে
ছড়ায়ে রয়েছে প্রাচী, অবাচীর, উদীচীর দিকে।
তাদের ওপারে সূর্য উনিশশো-বেয়াল্লিশ সালে
আজ এই বিকেলের আলোর নিরিখে

চুপে-চুপে ডুবে যায় :– উত্তরার ভ্রূণ নষ্ট হ'লে,
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কোনো একদিন–
লেনিনের লুপ্তি হ'লে– এরকম ডুবে যেতেছিলো।
বাংলার সাগরের আলাপ উড্ডীন

কয়েকটি হরিয়াল পথ খুঁজে পশ্চিমের পানে
কমলালেবুর মতো রঙিয়ান মেঘে
ডুবে গেলে মানুষের আজকের চিন্তার উদ্যম
'অল ক্লিয়ারে'র মতো অস্পষ্ট আবেগে

তিমির রাত্রির ক্রেংকার।
বাংলার হরিয়াল ! পশ্চিমের জাফরান মেঘ !
আমরা মানুষ– আজো– জীবিত ও মৃত– সাগরের,
আলোয় ভুলেছি ডোডো পাখিদের বিলীন বিবেক।

## দোয়েল

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে
ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে।
লাঙল ও বলদের একগাল স্থির ছায়া খেয়ে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।

নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয়।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে।
লাশকাটা ঘরের ছাদের 'পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে

শিস তুলে বিভোর হয়েছে।

কার লাশ ? কেটেছিলো কারা ?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন ?
সে-সব কোরাসে একতারা।

অপরাহ্ণের চাষা ভুল বুঝে হেঁটে যায় উচ্ছলিত রোদে।
নেই, তবু প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে নারী।
মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিসে মিটে গেলে
আদিম দোয়েল এলে– অনুভব ক'রে নিতে পারি।

## পৃথিবীলোক

দূরে-কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রামপতনের শব্দ হয়;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরর মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

## নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান

আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার।
আমাদের অন্ধকার আলো
এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।
এমন অনেক দিন কেটেছে এমনভাবে,– তবে
আবার অনেক দিন তবুও কাটাতে চাই এরকমি
হেমন্তে আশ্চর্য শাস ফ'লে গেছে কালো জলে, পানিফলে, জাউয়ের ভিতরে;
অথবা ফলেনি কিছু:
ভাসুর পীড়িত হ'য়ে অতএব ভদ্রবৌকে দেখে বকে;
চোখ মেলে, চোখ বুজে দেখেছি অনেকবার সে রকম রুগ্ন দুর্ভিক্ষকে;
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে অবশেষে ঘরে

চ'লে গেছি;– হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু;–
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়
বিচ্ছেদ, মরণ, ভয় কলের চাকার মতো তেমনি ঘুরাবে
আমাদের সকলকে– আমাদের সকলকে নিয়ে;
তেমনি নীরবে;
শাদাসিদে ভাবে।
আমরা জলুশ, জোর, কুকুর বা সিংহের সুরে
বাধা পাই;
পেঁচা যে খড়ের চালে নেমে আসে পৌষের রাত্রির দুপুরে
সেই সুরে শান্তি আছে– শেষ আছে– মৃত্যু আছে জানি,
তবু সেই সুর ভালো।
উনিশতিরিশ থেকে উনিশচল্লিশ সাল তবু ভালো ছিলো;
আজ একচল্লিশে পৌষ মাসে কেমন অসাধ যেন।

মশা মেরে, ধান ভেনে, ইঁদুর তাড়িয়ে
মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে– ঋণ খেয়ে– ঋণ ভুলে গিয়ে,
হাতুড়ের কাছে গিয়ে শিশিরের মতো শাদা শিশি–
যা সবের কাছে যা নেবার আছে– নিয়ে যাবো;
যা সবের কাছে যা দেবার আছে দিয়ে যাবো;
ক্রমাগত পায়ে হেঁটে আমাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে পৃথিবী হাঁটাবো।

সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হত্তেল ঘুঘুদের ঘরে
অথবা ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে–
সেইখানে অসংসর্গ অনুভব ক'রে যাবো;– হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু।
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়–
বিচ্ছেদ মরণ ভয় কলের চাকার মতো তেমন ঘুরাবে
আমাদের সকলকে– আমাদের সকলকে নিয়ে।

এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
ক্রমাগত মানুষের মরণ হয়েছে।
গরিব, বেচারা, বুড়ো, বিকলাঙ্গ,মহৎ পার্ষদ সব
কি ক'রে কেবলি খ'সে ধুলোসাৎ হ'য়ে যায়
দেখেছি উদাস, ক্লান্ত– অন্তরঙ্গভাবে;
দেখে-দেখে ঘরে ফিরে অন্ধকারে বিকল হতাম,–
যদি না রাত্রির শেষে ভোর, সূর্য, সময়ের পরিস্রুত হাত
মুছে ফেলে দিয়ে যেতো সব।
এইসব ছাড়া

এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
সমুদ্রের বুদ্বুদের মতো অগণন সমুচ্ছ্বাস
তেমনি প্রবল কিছু চেয়ে গেছে,– পেয়ে গেছে ?– রাতে
ফিরেছে বিবিক্তভাবে সুত-মিত-রমণীর সমাজ জুড়োতে;
ফেরেনি কি ?
আমরাও ঘুরে গেছি : আমাদের হৃদয়ের রুচি
আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে
ঘাইহরিণীর মতো যে-রকম সৃষ্টির জ্যোৎস্নায়
যেমন সহিষ্ণুভাবে ডেকে গেছে,
যেমন নিবিড়ভাবে ডাকে,–
সেই সুরে সাড়া দিয়ে।
কখনো নদীর জলে অদলবদল ক'রে ভেসে গেছে মেঘ, রাজহাঁস
পুনরপি মেঘগুলো– জলগুলো– আশ্বিনের মাস;
ডুবে গিয়েছিলো সব,– নেই ব'লে মনে হয়েছিলো :
সুরের ছোঁয়াচে সুর যে-রকম হ'য়ে যেতে চায় অর্থহীনভাবে অনুপ্রাস।
কখনো ধানের খেতে ধান নেই।
কখনো ধানের খেতে কৃষাণের হাসি কোলাহল;
গোলায়-গোলায় গঞ্জে ইঁদুরের বৌকাঁটকীর মতো কলরব;
বন্দর বেতার তার টের পায় সব।
কখনো পাটের খেত লকলক ক'রে ওঠে বাসুকির মতো;
আল-কেউটেরা সব কৃষককে কাটে ইতস্তত
কখনো পাটের জমি চিত্রগুপ্ত বুঝে নিয়ে গেছে:
একটি মূলেও কোনো ভুল নেই, আহা
তবুও চড়কপূজা, ভাদুপূজা– কতো না গাজন এলো গেলো;
কতো চাঁদ বড় হ'য়ে চালার পিছনে রাতে তারপর ছোট হ'য়ে এলো;
গৃহস্থ, কৃষাণ মিলে ধোঁয়াটে জলের শ্যাম পানফল–
পোষলার পিঠে আর মিঠে তাড়ি খেলো।
এসব উৎসব তবু মৃত ইতিহাস;
এসব উৎসব কিছু নয়
সর্বদা উৎকণ্ঠা এক জেগে আছে সকল ঘনায়মান পার্বণের মাঝে,
মৃত্যুর উদ্বেগ ছেপে– আরো বেশি কূট:
যে যার নিজের স্থানে উঠে চলে বসে
কেবলি জীবন, যৌন, নিরাশা, হিংসা, অর্থ, দশ কথা ভেবে
তবুও একটি কথা ভাবে তারপর
নিজের মনের মুদ্রাদোষে।
প্রৌঢ়েরা এখন আরো বুড়ো,
যুবকেরা প্রৌঢ় হ'য়ে গেছে,
বালকেরা এখন যুবক:
নারীর দেশের থেকে ঢের নারী হারায়ে যেতেছে:

সকলি ভৃত্যের দেশ।
এইসব স্বাভাবিকভাবে– সাধারণ কথা;
এখন মানুষ তবু স্বাভাকিভাবে কথা ভেবে নিতে গিয়ে
কোথায় পেয়েছে সফলতা ?
আজ এই চতুঃসীমানার মুখে আমাদের প্রাণে যদি আত্মপ্রত্যয় থেকে থাকে
ঘাইহরিণীর মতো জীবনের হরিণকে তবে সে জ্যোৎস্নার পানে–
প্রেতজ্যোৎস্নার পানে ডাকে।
ডাকে না কি?
নিতান্তই কোনো কিছু ভয়াবহ ভয় যদি আমাদের দিকে
ক্রমে-ক্রমে চ'লে আসে আজ,
তবুও তা ভয় ব'লে মনে হতে দেরি–
যতোদিন দেরি হয় - ততোদিন ভালো।
আমরা সকালবেলা পেয়ে গেছি সূর্যের আলো,
আমরা রাত্রিবেলা পেয়ে গেছি বাতি;
গণেশ যে-সব কূট শ্লোক নিয়ে একদিন বিবেচনা ক'রে গিয়েছিলো,
সহজ স্ফূর্তির মতো সে-সব তোমার প্রাণে জন্মেছিলো, ব্যাস,
স্বভাব সুখের মতো রাত্রির ফুটপাতে একদিন অগনি গ্যাস
জ্বলেছিলো– মনে হয়েছিলো;–
আমরা সকলে
যে যার নিবিষ্ট জন্ম, প্রসন্নতা, মরণের কাজে
অজানিতে ঘুরে গেছি; কথা
ব'লে-ব'লে হয়রান মলিন জনতা
হ'য়ে গেছি;
কেউ তবু হাড়ে-হাড়ে আমদের অল্পপ্রাণতাকে
চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করেনি।
কি এক সম্পূর্ণ ঈর্ষা কেবলি নিকটে নেমে আসে তবু আজ;
কখনো ধানের খেতে– কখনো নদীর ভুয়ো জলে
নিরন্ন বছর নামে;–
বর্গাদার– মহাজন– প্রজার মহলে
হুলুস্থূল প'ড়ে যায়;
এখানে ভাগচাষ– শহরের হুন্ডি– ঠিকাদার
ভূশণ্ডির মাঠ– ঘাঁটি– বারভূঞাদের ভূত– ব্যবচ্ছেদাগার– শব–
হাতুড়ে ডাক্তার–
ফিসফিস ষড়যন্ত্র – রাস্তার কানাচ,–
এইসব সূর্যের চেয়েও বেশি-বালুকার-আঁচ;
এরা সব হুলুস্থূল ক'রে যায়।
কোনো-কোনো প্রৌঢ় এসে অত্যাচার করে;
অগণন যুবকের ভিড়ে কোনো কাজ নেই,– চিন্তার কুশল র'য়ে গেছে;
চারিদিকে সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা;

জনমানবের মুখে নিজ-নিজ শোকাবহ গোপনীয় কথা;
নিজেরি ঘরের জন্যে ঘরন্তী শক্তির নির্মমতা;
মূর্খ দেশ, মেয়ে দেশ, প্রভু দেশ, ভৃত্য দেশ, পাগলের দেশ র'য়ে গেছে,
রয়েছে বালির দেশ;
দার্শনিকদের দ্বিধা– মনীষীর হৃদয়ের প্রেম
সে-সব বালির 'পরে দাগ কেটে অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে;
হৃদয়বিহীন ভাবে ধূর্ত সমুদ্রের কাছে,
প্লোভারের, পায়রার বিষ্ঠার ভিতরে।
সবেরি স্বতন্ত্র বেদনা র'য়ে গেছে।
এক বেদনার মাইল-মাইল জুড়ে তিল
ধারণের স্থান আছে– আছে কিনা অপর ব্যথার ?
আমাদের সকলের বেদনা কি মিলেমিশে যেতে চেয়েছিলো–
অথবা যে যার প্রাণে চেয়েছে কি– পেয়েছে কি ভীষণ স্বাধীন অন্ধকার ?
দেখি না– জানি না– তবু অনুভব ক'রে কোনো সূর্যালোকে অতিমৃত্যু পেলে
পুনরায় উষালোক হয়তো বা জীবনে পেতাম;
আমরা পেতাম না কি ?
তবুও অনেক উষা এসে গেছে ইতিহাসে,– উষা সব নয়;
জনসাধারণভাবে আজ আমাদের একাকী হৃদয়
অনেক জেনেছে,– তবু অমেয় বিপ্লব শুরু শেষ হ'য়ে গেলে
রুটিনের সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয়
মানবজাতির কাছ থেকে চেয়ে নিখিলের মানবেরা পাবে;
না হ'লে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞা ও সন্দেহের দিব্যতায় কোথায় দাঁড়াবে।

## মানুষ চারিয়ে

এবার তৃতীয়বার চ'লে যাবো বিদেশভ্রমণে;
এবার তৃতীয়বার হবে।
– স্ট্র্যান্ডের পথে ফিরে হাতুড়ে কামিন
এরকমভাবে অনুভবে
বিদেশভ্রমণে ক্রমে অগ্রসর হয়;
চোখে তার সাধারণ নিপীড়িত মানুষের মতন বিনয়।

মৌসুমী মেঘের দিকে মুখ রেখে জাহাজের চোঙা
লবেজান অনেক জাহাজ
যদিও জীবিত, যুক্ত, পরিদৃশ্যমান
পৃথিবীর মতো জাঁহাবাজ–
হাভাতে বিড়াল এক ধোঁয়াটে রঙের এক শিকে
চিরদিন খেলা ক'রে জন্ম দিয়েছিল তবু শ্রমজীবীটিকে।

তাই সে বিড়ালটাকে অবশেষে লেজে ধ'রে নিয়ে
লটকায়ে শিকের মতন
দেখেছে নিচের শিকে থাবার উপরে ওৎ পেতে
বিড়ালর মতো মোতায়েন।
তবু এক দূর— আরো দূর দেশে আমদানি-রপ্তানি চলে
গাধার গড়ানে পিঠে বিড়াল ও শিকের বদলে।

সেইখানে সারেঙের মাসি, আর খালাসির কানামামা, খোঁড়া লস্কর—
তিনজনে ঝানু কামিনের সাথে মিলে
সকলেই যে যাহার জামিনে খালাস থেকে-থেকে
সমুদ্রের পারে ব'সে একটি পাতিলে
মাছের সালুন খায় কোণ ঠেসে— কড়া পাকে জ্বাল;
কেঁপে ওঠে বমারের কলরবে সারাদিন সমুদ্রের পারে বংশাল।

•

কোনো এক ভিখিরিকে শেষ রাতে হাওয়া এসে ডাক দিয়ে গেলো
কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে;
কৃকলাস কৃশ হ'য়ে গিয়ে তবু ফুরোবার আগে
গেঁটে বাত, সন্ধি বাত, অবশেষে ভিখিরির বাতে
ধরা প'ড়ে গিয়েছিলো লোকটার আগাপাছতলা ভরা গায়ে;
যখন ভিখিরি তবু জেগে গেলো ভোরবেলা চোখ রগড়ায়ে,
পা ছড়ায়ে ব'সে আছে তখন ভীষণ রোদে ভিখিরিনী— দুই গালে আব,
'যেখানে পুরুষ থাকে সেইখানে মেয়েদের ঘেঁষার স্বভাব'—
ব'লে গেলো কলেজ স্ট্রিটের 'পরে ফুটপাতে একটি ভিখিরি।

এক ঝুড়ি ছাই এনে এক এক ফিকিরে
পাল্লায় মেপে নিতেছিলো সেই ভিখিরির দাড়ি;
তবুও ভুষির চেয়ে বুড়ো ইয়ারের
মিয়োনো মুড়ির মতো লোমগুলো ভারী।
হারামি ছোকরাদের এইসব সাউখুড়ি— সব—
লুটে গেলে পরে তবু জাঁদরেল পাথরের মতন নীরব
পা ছড়ায়ে ব'সে আছে তখন ভীষণ রোদে ভিখিরিনী— দুই গালে আব,
'যেখানে পুরুষ থাকে সেইখানে মেয়েদের ঘেঁষার স্বভাব'—
ব'লে গেলো কলেজ স্ট্রিটের 'পরে ফুটপাতে একটি ভিখিরি।

•

'হাজার বছর গেলো নিজের মনের ছকে মানুষ চারিয়ে
গাছের পাতার ফাঁকে উড়ে গেছে বলা যেতো যদি,

জ্যোৎস্নার প্রান্তরে তারা ঘোড়ার মতন যদি অনেক শিশির, ঘাস খেতো
পরীর চুলের মতো লেজ দিয়ে মাছি মশা এঁটিলি তাড়িয়ে,
তবে এই শতাব্দীর অগণন সূর্য অস্ত গেলে
গণিকা, অধ্যক্ষ, ভাঁড়, ব্যাঙ্কার চুঁইয়ে যে ডিভিডেন্ট পেতো,
সে-সব আঙুলে গুনে চুমো দিয়ে ঢেলে দেওয়া যেতো।'
ভিখিরিরা মিশে গেলো অন্ধকারে এই কথা ব'লে।

## এই শতাব্দী সন্ধিতে মৃত্যু

(অগণন সাধারণের)

সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিলো
ততোধিক অসুস্থ সময়ে
আমাদের মৃত্যু হ'য়ে যায়।
দূরে কাছে শাদা উঁচু দেয়ালের ছায়া দেখে ভয়ে
মনে ক'রে গেছি তাকে– ভালোভাবে মনে ক'রে নিলে–
এইখানে জ্ঞান হ'তে বেদনার শুরু–
অথবা জ্ঞানের থেকে ছুটি নিয়ে সান্ত্বনার হিম হ্রদে একাকী লুকালে
নির্জন স্ফটিকস্তম্ভ খুলে ফেলে মানুষের অভিভূত উরু
ভেঙে যাবে কোনো এক রম্য যোদ্ধা এসে।
নরকেও মৃত্যু নেই– প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে;
মর্তে সেই স্বর্গ-নরকের প্রতি সৎ অবিশ্বাস
নিস্তেজ প্রতীতি নিয়ে মনীষীরা প্রচারিত করে।

## শতাব্দী শেষ

সূর্যগরিমার নিচে মানুষের উচ্ছ্রিত জীবন
শুরু হ'লো– যখন সে শিশুর মতন;
নদীর জলের মতো আশা দিয়ে উচ্চারিত হ'য়ে–
তবুও সে মানুষের মন।
রঙিন খেলনা, ঘোড়া, জাপানি লাটিম,
আরব্যোপন্যাসের সেই পরী জিন উড্ডীন বক
নিয়ে খেলে বিবেচনা ক'রে হ'য়ে যায়
ক্রমেই নিঃস্বার্থ বিবেচক;

অপরাবিদ্যার দিন ছাত্রের,
কলেজিয়ানের পুরস্কার,
অধ্যয়নবিলাসীর

দু-চারটে পেপারকাটার

প'ড়ে থাকে তারপর মলিন টেবিলে:
মানুষ নিজেকে নিজে চিনে
চ'লে যায় জীবনের চেয়ে আরো বড়ো
বাজেটের কমিটি মিটিঙে–

ভুলের ভিতর থেকে ভুলে–
গরিমার থেকে আরো গরিমার পানে,–
যেখানে আসন্ন কাল চিরকাল আগামীপ্রসবা :
আজো যা হয়নি সেই চরিত্রের পানে !

## কার্তিকের ভোর ১৩৫০

চারিদিকে ভাঙনের বড়ো শব্দ,
পৃথিবী ভাঙার কোলাহল;
তবুও তাকালে সূর্য পশ্চিমের দিকে
অস্ত গেলে... চাঁদের ফসল
পুবের আকাশে
হৃদয়বিহীনভাবে আন্তরিকতা ভালোবাসে।

তেরোশো পঞ্চাশ সালে কার্তিকের ভোর;
সূর্যালোকিত সব স্থান
যদিও লঙ্গরখানা,
যদিও শ্মশান,
তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে
সূর্যালোকিত হ'য়ে আছে।

## শীতের রাতের কবিতা

গভীর শীতের রাত এইসব, তবু
চারিদিকে যুবাদের হৃদয়ের জীবনের কথা
মৃত্যুর উপর দিয়ে সাঁকোর মতন
চেয়ে দ্যাখে মরণের অপ্রমেয়তা
সেতুর ছবির মতো মিলে গিয়ে জলের ভিতরে
জীবনের জয়–
আর মরণের স্তব্ধতাকে অনুভব করে।

অনুভব করে এই জীবনি মহৎ,
মরণের চেয়ে বড়ো জীবনের সুর;
যদিও অন্ন আজ ভূমা নয়– তবুও মৈত্রেয়ী
অন্নলোভাতুর;
হৃদয়বিহীনভাবে– দশ বিশ শত কোটি টন
চলে আজ পঙ্গপাল,– নিজেকে উজাড় করে:– জেনে
জীবন হতাশ নয় ব'লেই জীবন।

## শ্রুতি-স্মৃতি

আলোর চেয়েও তার সহোদরা আঁধারের পথে বার-বার জন্ম নিয়ে
যোদ্ধা জয়ী অবক্ষয়ী কলঙ্কী হয়েছি।
কোনো কিছু শুভ্র আভা– কোনো ভালোবাসার আকাশ পেতে গিয়ে
আয়ু ফুরাবার আগে ম'রে গেছি।

ইতিহাসে শেষে হ'য়ে গিয়ে তবু অজর অনড় চোখ মেলে দেখে গেছি
আমাদের হৃদয়ের আশা
নদীর জলের মতো মিশরের, দিল্লির, মাদ্রিদের, লন্ডনের পথে নেই ব'লে
নেই-নেই– মেটেনি পিপাসা।

তবুও প্রাণের আলোড়নে এসে নবতর নবীনেরা বার-বার ক্লান্ত শতাব্দীকে বলে গেছে :
মৃত সূর্য-তপতী কি তুমি !
তাদের আশার ভোর তবুও সূর্যের চেয়ে বালির উত্তেজে বড়ো হ'য়ে
হয়েছে হত্তেল মরুভূমি–

অগণন অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ গান, সার্চলাইট ঘুরায়ে-ঘুরায়ে দ্যাখা যায়।
বুদ্ধ, খৃস্ট, এঞ্জেলোর মোম
মহৎ বস্তুর মতো, নিভে, তবু ব্যপ্ত হ'য়ে আছে:– সব জেনে– আধো জেনে
চুংকিং, কলকাতা, দিল্লি, মস্কৌ, রোম

অধিক প্রাণের দিকে চ'লে যায়:– নিপট, কপট, শঠ, কর্মী, মর্মগ্রাহী
মানব নিঃশেষ হবে জেনে তবু ভালো
মানবিক কলরবে অন্নপূর্ণা মরীচিকা খোঁজ ক'রে চলেছে– চলেছে:–
হে কঠিন, সহজাত সূর্যের আলো।

## সমুদ্রপায়রা

কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারাদিন সমুদ্রপাখির :
যতো দূর চোখ যায় সাগরের গাঢ় নীলিমায়

নিজেকে উজোতে গিয়ে চোখের নিমেষে
সকালবেলার রোদ পাখি হ'য়ে যায়।

কোথায় আফ্রিকা আলুলায়িত শ্বেতাঙ্গ-নীল চোখে--
এ-পৃথিবী কবলিত হয়--
কোথায় চড়ুই দেখে বিড়ালের নির্জন চোখের
নীলিমা কি জীবন-- কি মৃত্যুর বিস্ময়,--

অনুভব ক'রে প্রিয় মনে হয় জীবনি গভীর,--
মদির মৃত্যুর সাথে ঐতিহাসিক কাল খেলে;
সৈকতে বাজারে মৃত পম্‌ফ্রেটের অমাযামিনীর
নক্ষত্রে সূর্যের মতো পাখি তুমি এলে।

## অনিবার

যেখানে রয়েছে আলো পাহাড় জলের সমবায়--
তবুও সেখানে যদি আবিষ্কার করি প্যারাফিন
অনেক মাটির নিচে,-- অথবা সেখানে যদি সংগ্রামবিহীন
অজস্র অস্পষ্ট মুণ্ড অনুকম্পা হৃদয়ে জাগায়,
তাহলে প্রভাত এলে মুনিয়া পাখির পিছে কি ক'রে বালক
ভেসে যাবে উজ্জ্বল জলবিম্বের মতো হেসে ?
কি ক'রে বা নাগরিক নিজের নারীকে ভালোবেসে
জেনে নেবে হেমন্তের সন্ধ্যার আলোক
গ্যাস আর নক্ষত্রের লিপ্সা থেকে জেগে
যারা চায় তাহাদের কাছে তবু স্মিত সমন্বয় ?
মৃতদের উপেক্ষিত পীত দেহ-- বলো,-- ক্ষমাময়।
বৃত্তের মতন-- এসো, ঘুরি মোরা বঙ্কিম আবেগে।

## সোনালি অগ্নির মতো

সোনালি অগ্নির মতো আকাশ জ্বলছে স্থির নীল পিলসুজে;
পৃথিবীর শেষ রৌদ্র খুঁজে
কেউ কি পেয়েছে কিছু কোনো দিকে ? পায়নি তো কেউ।
তারপর বাদুড়ের কালো-কালো ঢেউ
উড়ায়ে শঙ্খচিল কোথায় ডুবলো চোখ বুজে।

অনেক রক্তাক্ত সোনা লুফে নিয়ে চ'লে গেছে নগরীর পানে

মানুষেরা রক্তের সন্ধানে।
বাদুড়েরা তারপর ছক কেটে আঁধার আকাশে
জীবনের অন্য-এক মানে ভালোবাসে :
হয়তো বা সূর্যের ওপিঠের মানে।

চিন্তার ইচ্ছার শান্তি চারদিকে নামছে নীরবে :
যতো কাল লাল সূর্য পিছু ফিরে রবে।
বাদুড় যেখানে দূর– আরো দূর আকাশ-কালোয় গিয়ে মেশে।
সে গাহনে একদিন মানুষো নিঃশেষে
নিভে গেলে বুঝি তার শেষ হিরোশিমা শান্ত হবে।

## সৌরচেতনা

এইখানে অন্ধকার সমুদ্রের জলে
একটি আলোকস্তম্ভ আছে;
তবুও তা আলো ব'লে বোধ হয় যদি
ঝঞ্ঝায় শংকিত সব নাবিকের কাছে
অন্ধ প্রহরী তার ঘরে
আপনার অন্ধকার নিয়ে খেলা করে।

মৃত পিতৃপুরুষের বিবর্ণ দেয়ালে
অধিক বিবর্ণতর তরবার দেখে
প্রয়োগ-পটুয়াদের সাধ জেগে গেলো
হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে;
মদির উল্লাসে তারা আত্মকর্মক্ষম
চেয়েছে কি ঠিকি এ-রকম।

কণ্ঠস্থ গ্রন্থের শব্দ উচ্চারণ ক'রে
মোমের নিকট ব'সে মানুষের চোখ
হারায়ে ফেলেছে গ্রন্থ,
হারায়েছে মোমের আলোক,
হারায়ে ফেলেছে এই শতাব্দীকে আজ
গোধূলির সুত মিত রমণী সমাজ।

এই জীবনের পথে জিনিসের মতো
অপরের সমীচীন দৃষ্টির নির্দেশে
অচেতন জলের লোহের থেকে জলে
চলেছি বিম্বের মতো ভেসে।

শুনেছি কোথাও এক শতাব্দীর মিতব্যয়ী মন
জানে নাকো অপ্রস্তুত হ'তে;
শুনেছি চলেছি লোক-পরিচিত প্রমাণের বলে।
জনমত,— অন্ধকার লোক মতামতে
চলেছি দৈবের দিকে ?

যে-আকাশ জনতার নিরাশায় পিছে
প'ড়ে আছে অথবা মৃত্যুর পরে যেখানে শান্তিতে বসবাস
করা যায়,- অথবা যাদের আমি
প্রতিহত ক'রে যাই আজ,
অথবা যেসব জ্ঞান জ্ঞানময় ব'লে মনে হয়
অথবা যেসব আশা, আশা ব'লে মনে হয় আজ
সকলি তন্দ্রার মতো।
জ্ঞানপাপী হ'য়ে তবু যাকে আমি বধ করি আজ
যাকে আমি ভালোবাসি ব'লে মনে হয়,
যাকে আমি অবহেলা করি,
সকলি রিরংসালীন পেংগুইন।
তবুও সত্যের পরিচয়
নিজের নিপট গুণে ভেদ করে যদি এই মোহান্ধতাকে,
তবে সে তা ক'রে যায়। বিনয়ের অবসান হ'লে
তবুও বিনয়ী হ'য়ে ওরা কাল ভোরবেলা হয়তো বা
পেয়ে যাবে তাকে।

## অন্তর বাহির

ভোরের প্রথম রোদ প্রান্তরের দু-চারটে শালিখের মতো
পৃথিবীতে এতো দিন যতো লোক ম'রে গেছে— সব
এমন আকাশ পেলে তারাও নীলিমা হ'য়ে যেতো;
তবুও কোথাও তারা নেই ব'লে এমন নীরব ?

সে-কবে ভোরের রোদ মেয়েটির মুখে প'ড়ে তবু
দেয়ালে সিঁড়িতে মাঠে পড়েছিলো ব'লে
সমস্ত পৃথিবী মেঘ জ্যোতির্ময় সাগরের মতো মনে হয়
এখনো কখনো ভোর হ'লে।

সেই নারী হয়তো বা একদিন দূরে যেতে পারে,
জীবনের থেকে স'রে যাবে এই ভয়ে—
নারীকে না পেয়ে আজ— পেয়ে আজ— বহিরাশ্রিতা
অফুরন্ত রৌদ্রে ভোর হয়েছে হৃদয়ে।

## অনির্বাণ

সর্বদাই এরকম নয়, তবু
মাঝে-মাঝে মনে হয় কোনো দূর
উত্তর সাগরে কোনো ঢেউ
নেই;
তুমি আর আমি ছাড়া কেউ
সেখানে ঢোকার পথ হারায়ে ফেলেছে।

নেই
নীলকণ্ঠ পাখিদের ডানা-গুঞ্জরণ
ভালোবেসে আমাদের পৃথিবীর এই রৌদ্র;
কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দ্যাখা দেয় মিলাবার আগে
এইখানে সে-আকাশ নেই;
রাতে নক্ষত্রেরা সে-রকম
আলোর গুঁড়ির মতো অন্ধকার অন্তহীন নয়।

তবুও আকাশ আছে :
অনেক দূরের থেকে নির্নিমেষ হ'য়ে
নক্ষত্র দু-একজন চেয়ে থাকে;
চেয়ে থাকে আমাদের দিকে—
যেন টের পায়
পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা— সব কথা বলা
ডাভেন্ট্রিডোমেই টাসে স্টেফানিতে
যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির—
মরুভূমি সৃষ্টি ক'রে গেছে;
— কোনো কথা, কোনো গান
কাউকেই বলে নাই;
কোনো গান
পাখিরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা স্তব্ধতার দেশে
তুমি আর আমি দুই বিভিন্ন রাত্রির দিক থেকে
যাত্রা ক'রে উত্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে
এখন মিশেছি।

এখানে বাতাস নেই– তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মতো সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারাদিন
হংসের আলোর কণ্ঠ র'য়ে গেছে,
কোনো রানী নেই– তবু হংসীর আশার কণ্ঠ
এইখানে সাগরের রৌদ্রে সারাদিন।

## 'ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ ইন্‌ ট্রপিক্‌স্‌' প'ড়ে

নক্ষত্র আকাশ নদী পাহাড়ের বধির গরিমা
দূরে যায়, কাছে এসে ক'রে যায় ভাব;
নিজেকে শত্রুর মতো মনে ক'রে চিরদিন যদি
নষ্ট ক'রে দেওয়া যেতো তাহাদের মিথ্যা প্রভাব;
নিজেকে বন্ধুর মতো মনে ক'রে যদি অপলক
অনুভব করা যেতো তাহাদের অবহিত মন–
অনেক চতুরানন ম'রে গেছে এইসব ভেবে
জেনে হো-হো করে হাসে একজন চতুর আনন।

## হেমন্ত-কুয়াশায়

সকাল-সন্ধ্যাবেলা আমি সেই নারীকে দেখেছি
জেনেছি অনেক দিন– তারপর তবুও ভেবেছি।
তারপর ঢের দিন পৃথিবীর সেই শাদা সাধারণ কথা
ছোটো বড়ো জিনিসের বিস্মরণে ক্রমে ভুলে গেছি।
আকাশ আমাকে বলে : 'সে না তুমি আত্মসমাহিতি ?'
পৃথিবী আমাকে দেখে ভেবে যায় : 'এর প্রাণে, আহা,
লাখেরাজ হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে সততা;'
যে-নারীকে নদীর কিনারে জল ভালোবেসেছিলো
সময়ের সুবাতাস মুখ ছুঁয়ে চ'লে গেলে যদি তার কথা
ভুরু কোঁচকায়ে ভেবে নিতে হয়, মানবহৃদয় তবে সে কোন্‌ রকম।
হেমন্তের কুয়াশায় বেড়াতে-বেড়াতে কারু দাবি
অমল ঋণের মতো গ্রহণ করেছি আমি নিতে ভুলে গিয়ে;
তার ভালোবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সৎ হ'য়ে আছি– ভাবি।

## চেতনা-লিখন

শতাব্দীর এই ধূসর পথে এরা ওরা যে যার প্রতিহারী।
আলো-অন্ধকারের ক্ষণে যে যার মনে সময়সাগরের
ক্লান্তিবিহীন শব্দ শোনে;--
অথবা তা নাড়ীর রক্তস্রোতের মতন ধ্বনি
না শুনে শোনা যায়।

সময়গতির শব্দময়তাকে তবু ধীরে-ধীরে যথাস্থানে রেখে
ট্রামের রোলে আরেক ভোরের সাড়া পেয়ে কেউ বা এখন শিশু,
কেউ বা যুবা, নটী, নাগর, দক্ষকন্যা, অজের মুণ্ড, অখল পোলিটিশ্যান্।
এদের হাতেই দিনের আলো নিজের সার্থকতা
খুঁজে বেড়ায়।

চারদিকেতে শিশুরা সব অন্ধ এঁদো গলির অপার পরলোকে আজ
জগৎশিশুর প্রাণের আকাশ ভেবে
জানে না কবে নীলিমাকে হারিয়ে ফেলেছে।
শিশু-অমঙ্গলের সকল জনিতারা এই পৃথিবীর সকল নগরীর
আবছায়াতে ক্লান্তি-কলকাকলিময় প্রেতের পরিভাষা
ছড়িয়ে কবে ফুরিয়ে আবার সহজ মানবকণ্ঠে কথা কবে ?
আকাশমর্তে মহাজাতক সূর্যগ্রহণ ছাড়া
কোথাও কোনো তিলেক বেশি আলো
রয়েছে জানে না কি ?
তবুও সবাই তারা
অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে-ক্রমে বার হ'য়ে কি আসছে আরো
বিশাল আলোতে ?

কোথায় ট্রাম উধাও হ'য়ে চলেছে আলোকে।
কয়লা গ্যাসের নিরেস ঘ্রাণ ছড়িয়ে আলোকে
কোথায় এতো বিমূঢ় প্রাণজন্তু নিয়ে অনন্ত বাস্-কার্
এমন দ্রুত আবেগে চলেছে।

কোথায় দূরে দেবতাত্মা পাহাড় রয়েছে কি ?
ইতিহাসের ধারণাতীত সাগরনীলিমা ?
চেনা জানা নকল আলোর আকাশ ছেড়ে সহজ সূর্য আছে।
নব নবীন নগর মেশিন প্রাণের বন্দর–
জলের বীথি আকাশি নীল রৌদ্রকণ্ঠী পাখি ?
সেখানে প্রেমের বিচারসহ চোখের আলোয় গোলকধাঁধার থেকে
মুক্ত মানুষ নতুন সূর্য-তারার পথের জ্যোতির্ধূলি-ধূসর হাসি দেখে

কি দীন, সহৃদয় ?
জ্ঞান সেখানে অফুরন্ত পাগলামিকে ক্লান্তিহীন শব্দযোজনায়
কিছুই নেই সমাধান ক'রে শূন্যতাকে কুড়ায় নাকো তলে ?

পরস্পরের দাবির কাছে অন্তরঙ্গ আত্মনিবেদনে
নবীন ক'রে পরিচিত হওয়ার পরে নতুন পৃথিবী
রয়েছে জেনে আজকে ওরা চলার পথে ইতিহাসের চরম চেতনা,
মানব নামের কঠিন হিসাব হয়তো মেলাতেছে,
কি এক নতুন জ্যোতির্দেশী সমাজ সময় শান্তি গড়ার নীল সাগরের তীরে

চোখে যাদের চলতে দেখি তারা অনেক দেরি ক'রে অনাথ মরুসাগর ঘুরে চলে;
মনের প্রমাণ মোড় ঘুরে কি দেখেছে সরণি
সাহস আলো প্রাণ যেখানে সবার তরে শুভ
এই পৃথিবী ধরনী।

## জার্মানির রাত্রিপথে : ১৯৪৫

সে-এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে
সাগরগামী নদীর মতো স্বরে
আমার মনের ঘুঘুমরালপ্রংসী ঝাউয়ের বনে
আধো আলোছায়াচ্ছন্ন ভাবে মনে পড়ে
টিউটনের গল্পে ছড়ায় সাগায় সূর্যালোকে
থেকে-থেকে আভাস দিয়ে যেতো;—
গ্রিমের থেকে হীগেল শিলার সানুজ দানবীয়
গ্যেটের সে-দেশ সূর্য অনিকেত ?

মাঝে-মাঝে আমার দেশের শিপ্রা, পদ্মা, রেবা, ঝিলম, জলঙ্গীকে আমি
সর্পীবোনের মতন কোথাও পাহাড় অবধি
অথবা নীল ভূকল্লোলে সাগর সুভাষিত
করতে গিয়ে শুনেছিলাম রাইনের মতো নদী
কি এক গভীর হ্বাইমারী মেঘ সূর্য বাতাস নিয়ে
নর-নারী নগর গ্রামীণতায় ব্যাপ্ত রীতি
লক্ষ্য ক'রেই সবিতাসাধ জানিয়েছিলো;— তিন দশকের পরে
এ-সব স্বপ্নমিশেল কি এক শূন্য অনুমিতি।

যদিও আমি আজো বেশি সূর্য ভালোবাসি
তবুও যারা মনের নীহারিকার পথে ঠাণ্ডা অমল দিন
জাগিয়ে সূর্যপ্রতিম আকাশ সমাজ নিয়ে যাত্রা করেছিলো

সে সব হৃদয়গ্রাহী গোলাপ বিলকে গোলাবালিন
সবংশে কি হারিয়ে গেছে রাষ্ট্রশরীরের থেকে ?
ব্যক্তিস্বাধীনতায় ঘুরে অনাথ মানবতার লেনাদেনা
শুধতে ভুলে গিয়ে কি ভয় রক্ত গ্লানি বিরসতা গুপায়ে
রেখে গেছে অমোঘ বর্বরতার বেলজেন ?

বর্বরতা কোথায় তবু নেই ? তবু এই প্রশ্ন আত্মর মনে
গভীরতর হৃদয়ব্যাপির সংসৎ সমাধান
আজকে ভীষণ নিরুদ্দেশের অন্ধকারে রয়েছে টিউটন ?
রোমকে চিনি, ইউরোপের হৃদয়ে রাষ্ট্রনযান
সহোদরার মতন রৌদ্র আকাশ মাটি যব গোধূমের পাশে
যুগে-যুগে উত্তরণের লক্ষ্যে সংকেত ক'রে
এসেছিলো কান্ট ফাখিন্ড্রাল দেবতাদের উন্মাদ্রদোষ অখল ভাপসেরের
অভিনিবেশ-বলায়িত গোটের সূর্যকরে।

যদিও তা ব্যক্তিকতার মায়ার মৃগতৃষ্ণাতীত, - তবু,
চমৎকৃত হয়েছিলো ইউরোপের ভাবনাধূসর মন:
সৌরকরক্রমে উনবিংশ শতকীরা
হয়তো তাকে ঘরের বহিরাশ্রয়িত দিব্য বাতায়ন-
বাতায়নের বাইরে মেঘের সূর্য ভেবেছিলো:
আমরা আজো অনেক জেনে এর বেশি কি ভাবি ?
ইতিহাসের ভূমায় সীমাস্বল্পতাকে যাচাই করার রীতি
গোটের ছিলো; - তবুও সীমার কি ভয়ঙ্কর বৈনাশিকী দাবি !

সেই তো পায়ের নিচে রাখে পরমপ্রসাদগভীর তনিমাকে
সময়পুরুষ বলে : 'তুমি নিজের কালের ভার
ব'য়েছিলে লীলায়িত সৌরতেজে; - এ যুগ তবু অন্য সকলের:
আরেক রকম ব্যতিক্রমের, - হে কবি, হ্যাইমার !'
সময় এখন জ্যোতির্ময়ী অমেয়তার প্রবাস থেকে ফিরে
নিরিখ পেয়ে গেছে নিজের নিঃশ্রেয়সের পথে :
সেইখানে কাল লোকাতীত হ'তে গিয়ে কোথাও থেমে যায়
ক্রান্তি আলোর বয়স বেড়ে গেলে কঠিন রীতির জগতে

নবজাতক অর্থনীতি সমাজনীতি কলের কণ্ঠে কি প্রাণবন্ধকালি ?
এই পৃথিবীর আদিগন্ত ব্যক্তিশবের শেষে
দ্যাখা দেবে হয়তো নতুন সুপরিসর নাগর সভ্যতায়
মানবতার নামে নবীন ব্যক্তিহীনতাকে ভালোবেসে:
হয়ত নগর রাষ্ট্র সফল হ'য়ে গেলে নাগরিকের মন
হৃদয়প্রেমিক হ'য়ে যাবে সবার তরে - উচিত অনুপাতে:

জড়-রীতির– অর্থনীতির সনির্বচন মেসিনে ভেনে এসব যদি হয়
তা হ'লে তা অমিয় হোক আন্তরিকতাতে।

## আজ বিকেলের ধূসর আলোয়

আজ বিকেলের ধূসর আলোয়
তোমার সাথে দ্যাখা
এতোটা দিন পথ চলেছি– শেষে
কালো মেঘের কেয়াবনের জলহিজলের দেশে
আমি তোমার পাতা শিশির
হাতের তুলির রেখা

বেতের ফলের মতন আমার স্নান
চোখে তুমি হাজার বছর র'য়ে গেছো, আহা
সময় তোমার হাড়ের স্রোতে লেখা
সকল দায়-সুতের শিয়র ছেড়ে আমি একা

আকাশ আলো পাহাড় শিশির
সে কতো পৃথিবীর
তোমাকে শেখা সে কতো রমণীর
সে কতো রজনীর
[illegible] অতন থেকে শেখা।

## [illegible]রে নীল নীরব সাগরে

[illegible] নীল নীরব সাগরে
[illegible] জলহীন বলয়ে আকাশে
[illegible] জাহাজের মতো
[illegible]
[illegible] সে আসে।
[illegible] করে ভুল তারকায়
[illegible] জলকাকলিতে
[illegible]ের অনৃতে
[illegible] আভাসে
[illegible]নীর,
[illegible], তবু

জেনেছো কি তুমি আছো
শুনেছো কি সাগরের ঢেউ
শঙ্খরেখায় ঘুরে আঁধারে-আঁধারে
দূর দিকমাধুরীর পারে
আরো আশা আলো ভালোবাসে।

## সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম

সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম, আলো
এই জীবনের ইতিহাসে আমি আগে
তোমাকে কখনো দেখিনি, তবুও দেখেছি
সূর্যে যখন আকাশি গ্রহণ লাগে
পৃথিবী মলিন হয়
হৃদয়ে গ্রহণ নয়
আলোর অশোক ঝর্নার মতো কাঁপে
সব মুখে সব শোকে সব পরিতাপে
তোমার শরীর সমাসূর্যের ধারা
আঙিনা ছড়ানো ম্লান পায়রারা
আলো হ'য়ে ওঠে ঘুম–
ঘুমনগরীর রাজার কুমারী জাগে।

## পৃথিবীতে যতো ইতিহাসে যতো ক্ষয়

পৃথিবীতে যতো ইতিহাসে যতো ক্ষয়
মানবের সাথে মানবের প্রাণবিনিময়ে অবিনয়
যতো গ্লানি ব্যথা ধূসরতা ভুল ভয়
সকল সরায়ে ঘুমোনো নগরী
ঘুমনগরীর রাজকুমারী কি জাগে।
নিখিলের শাদা চাতকের মতো প্রাণ
তোমার আমার হৃদয়ে করে কি গান
(করে আহ্বান, করে-করে আহ্বান)
অপার অসীম সূর্যশালিনী
মহাপৃথিবীর অনুরাগে।

## অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে

অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে
দূর আকাশের তারা,
নীল নিখিলের নীরবতা
নেই কিছু এ-ছাড়া,
অকূল অলখ থেকে হাওয়া
কোন্ দিকে তার চ'লে যাওয়া
মৃত্যু-স্বাতীর থেকে এসে
কি মৃত্যু-ফোয়ারা !

একটি জাহাজ, একটি সাগর, একটি অনিমেষ,
আগুন আলো জ্যোতিষ্কদের দেশ,
ঘুমের মাঝে তবুও যেন অপর বন্দিনী
আরেক আলোক জানালা দিয়ে দিয়েছিলো সাড়া।
এই জীবনের দিক্-শরণের গভীর রাতে আমি
তোমায় ছেড়ে দিক্-অচেনা ক্রান্তিসাগরগামী,
সৃষ্টি কি নীলকণ্ঠ পাখির অধরা আকাশে
উড়ে যাওয়ার অপরিসীম সাগরধ্বনিধারা।

## আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো

আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো
চকোর ঘুঘুর ঝলকানিতে অপার নীলিমা
আলোয়– গভীর আলোয় মিশে গিয়ে
উড়ো গাঁয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে
নগরীদের মিনার জ্বালালো।
ভাঙা খিলান মৃত দেয়াল
অন্ধকারের খাত–
নরনারীর চোখে অকূল রাত,
অন্তবিহীন প্রেম-বেদনায়
নিষ্ফলতার কালো।

এসে, অফুরন্ত সূর্য
আলোর ঈগল
জ্যোতির্ময়ী ফণা,
ইতিহাসের চেয়ে মানবইতিহাসের
আলোর প্রার্থনা,

সকল বিরাট নৃপতিদের ধূলির চেয়ে ভালো
এসো আলো–

## আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে

আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে
নগরী দিনের মতন কলরবে
এই জীবনের পথে চ'লে তবু
জানি শুধু এখনো যেতে হবে
তবুও দেখি সকলি ঘুমে ঘেরা
সাগরতীরে শঙ্খবালকেরা
সে উতরোল রোদের ধু-ধু নীল
দেখেছে কিনু– জেবেছে কিনু
খেলেছে ঝিলমিল
(আলোর জিব্রাইল)

শাদা আলোর, শাদা পাখির মতো
সহজ ঘুমে ডুবেছে নীরবে

ঘুমের ভিতর যে ঘুম আছে
সে দিক পানে চ'লে
ঘুমিয়ে জেগে আছি
অসীমারি ওপরে তুমি সাথী
জেবেছি প্রতিপদের চাঁদখানি
চিত্রাতারার মতন (তবু তুমিও) জেগে রবে

## ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো

ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো
ঘুমের দেশের প্রেম (কি তোমার নাম ?)
ওইখানেতে শঙ্খনদীর তীরে তুমি দাঁড়িয়েছিলে বাকি
আজিও এলায়।

আমায় তুমি মেঘের পরীর থেকে জেবেছিলে
এখনো সেই মেঘ
তোমায় আমায় জড়িয়ে আছে, তবু
এই কি জীবন ? জেগে ওঠা ?

ভোর ? হৃদয়াবেগ ?
এই কি তোমার শরীরতীরে পেলাম।

গভীর ঘুমে হৃদয় ছেয়ে আসে
মিনার বাড়ি নগরী রোল যুদ্ধ জনগণ
পাথর ধোঁয়া ধুলো খড়ের মতো
এখন অচেতন
এই কি জীবন ? জেগে থাকা ?
অমৃতেরি হাওয়া ?
জ্যোতিষ্কদের ঘুম ভাঙানো ?
নারীর দ্যাখা পাওয়া ?

## দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে

দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে আজ এ পৃথিবীর
এই নগরীর হৃদয় দেখা যায়
পথে-ঘাটে মেঘে মনের বর্তিকাতে
সেই কি মিলালো
সব পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া আলো ?

যে সব নারী নগরীরা চ'লে গেছে
পুনরুদ্‌যাপনের তারায় জ্ব'লে গেছে,
যারা স্ফীত অবহিত ছায়ার মায়ায় অকথিত
সকলে আজ নতুন ক'রে জেগে।
জলের কলরোলে রাত্রি-সংক্রান্তি হাওয়ায়
অপার ব্যথা অসীম প্রয়াস আশা ভালোবাসা
অশোক সাধনায়
নতুন সময় সৃষ্টি যন্ত্রগিরি জ্বালালো কি ?
মৃত সূর্য অমর ক'রে জ্বালিয়ে নিতে চায় ?

ভাঙা দেয়াল বস্তি ব্যথা ধূসর মিনার
নিভে যাওয়া ইতিহাসের ঊষর কিনার
নিভে গেছে– নিভে গেছে–
ভোরের চাতক চিলের সাগর একক এখন
ইতিহাসের জ্যোতির কল্পনায়।

## কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি

কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি
তবুও ভালোবাসা,
দুপুরবেলার সূর্যে ভোরের
শিশির নেমে আসা,
ভোরের দিকে হৃদয় ফেরাই
যাই চ'লে যাই–
নীল সকালে যাই চ'লে যাই–
একটি নদী একটি অরুণ
শিউলি শিশির পাখি–
'আমরা মায়ার মনের জিনিস
মায়াবিনীর বেলায় শুধু জাগি'
বলছে সে কোন্ ত্রিকোণ থেকে
ছায়ার পরিভাষা।
কাউকে ভালোবেসেছিলাম, জানি,
তবুও ভালোবাসা।
সে কোন্ সুদূর মরুর মনে চ'লে গেছো
হায়, যাযাবর তুমি,
সেইখানে কি মিলবে বনহংসী বাঁধা বাসা !

হায় বলিভুক্, কখন ভেবেছিলে
মাটি ছেড়ে দূর আকাশের নীলে
ধূসর ডানার অগ্নি ছেড়ে দিলে
মিটে যাবে মায়াময়ী মাটির পিপাসা।

## তোমার সাথে আমার ভালোবাসা

(তোমার সাথে আমার ভালোবাসা
চলো কেবল সুমুখপানে চলো
সূর্যডানায়– ঈগল পুরুষ জ্বলো
সময়সাগর শুকিয়ে গেলে সেই সোনালি বালির
মরুভূমির সঙ্গে কথা বলো।)

তোমার সাথে এই তো ভালোবাসা
নরনারীর অঙ্গ প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদলে আমার প্রেম
হে মীনকেতন, তোমার নারী ভালো– ভালো
দিকের থেকে দিগন্তরে এই তো আমি এলাম

হে প্রেম, তুমি গৃহবলিভুকের শান্ত কাতর ডানা ধ'রে
মহান যাযাবরের নিজের সূর্যে ফিরে আসা
হে মীনকেতন, তোমার নারী অমর জানি (আমি),
অমরতর (তবুও) আরো বলয় আকাশ আরো
আলোর পিপাসা–

## ভোরের বেলায় তুমি আমি–

ভোরের বেলায় তুমি আমি–
নীল আকাশের ভরতপাখির গানে
কবে যে এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে
প্রথম দেখেছিলাম
কেন এসেছিলাম এ-সব আলোর অভিযানে
আজকে আবার সকাল এলে সেই কথা কি তুমি
পাখির গানের আলোর সিঁড়ি-সূর্যে উঠে ভাবো
(এই সৃষ্টির) অলখ আলোর থেকে এসেছিলাম
আবার কবে আলোয় মিশে যাবো
অন্ধকারের এ ছাড়া কি নেইকো কোনো মানে ?
ইতিহাসে ভায়ের-বুকে-ভাই
গল্প ছবি প্রেম– কি শুধু জ্বলন্ত মিথ্যাই
সকলি ছাই ক'রে দিয়ে আঁধার সসম্মানে
বসেছে কি তোমার আমার–
ভোরের সাগরকণ্ঠী পাখির গানে ?

হয়তো বা তাই হবে– তবু আজকে আলোয় আমি
এই পৃথিবীর প্রথম ভোরের
সূর্য পাখি নারী
দেখে কি তার আদিম আঁধার ভেবে নিতে পারি
যদিও গহিন থেকে এলাম– গহন আমায় টানে।

## ধ্বনিপাখির আলোনদীর স্মরণে

ধ্বনিপাখির আলোনদীর স্মরণে এসেছি
আবার তুমি আমি
ভেবেছিলাম আমরা দুজন
মিশরীয় মামি
ঘুমিয়ে আছি সকাল বিকাল

ভারের হাওয়া সবুজ পাতার নড়া
আমলকীডাল শাল
রুপালি বৃষ্টি পড়া
হ'য়ে গিয়েছিলাম তুমি আমি।

আমরা কতো নগরী হাটে জলে
রক্ত আগুন আবছা অবক্ষয়ে
অসময়ের অন্ধকারে মরেছি বার-বার
তবুও আলো সাহস প্রাণ চেয়েছি হৃদয়ে
দূর ইতিহাসযানী।

কোথাও নীড় বেঁধেছিলাম
ভেঙে গেলে কেঁদেছিলাম
ফেনার শীর্ষে হেসেছিলাম
জীবন ভালোবেসেছিলাম
আলো– আরো আলোর প্রয়াণী

আজকে মানুষ চ'লে গেলে তবু
মানব র'য়ে যাবে,
পাতা শিশির ইতিহাসের বেলা
হ'য়ে যাবে গভীরতরভাবে
নরনারীর নিজের রাজধানী।

## মকরসংক্রান্তি প্রাণে

মকরসংক্রান্তি প্রাণে
তুমি আমার মনে এলে।
বালুঘড়ি বিকল রাতের বেলা।
থেকে-থেকে পড়ছে মনে
সে কোন্ ধূসর বেবিলনে
কবের গ্রীসের অলিভবনে
তোমার সাথে সূর্যতীরে।
হয়েছিলো খেলা।

জানি সবি ফুরিয়ে গেলো অতল সনাতনে
থেকে-থেকে তাঁবা নদীর জলের উৎসারণে
জলদেবীর মতন জেগে জানিয়ে গেছো তুমি
চম্পা কনকবতী এখন সুধার মরুভূমি

মরুভূমি– মরীচিকা– মায়ামৃগের মেলা।

তবুও আবার সূর্য নিয়ে এলো রজনী
আমার– তোমার– আধুনিকের
শতঘ্নী আঘাত
জননটের মতন নেচে– কবে
কি হারালো সে কার মনে রবে
তোমার– আমার–
সে কার অবহেলা।

## মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা

মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা
তুমি ছিলে আমার ক্রীতদাসী,
রাতের মিনার শুকতারকায় জ্যোৎস্নামলিন ছিলো
দিনের প্রাসাদ পায়রা ঘেরা– সুনীল আকাশি
ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেলো কবে,
তোমার সাথে আবার দ্যাখা হবে
তবুও আমার জানা ছিলো– কালের কুহর থেকে
হাজার-হাজার বছর তোমায় ডেকে
শুনেছি তুমি বলেছো, 'আসি– আসি–'।

আজকে আবার গৃহবলিভুকের সকাল এলে
তাকিয়ে দেখি মিশর-নীলিমায়
সে-সব চেনা দুধের মতো শাদা
পাখিরা উড়ে যায়–
আমি আমার মনকে বলি, 'আমি ভালোবাসি'।

হাজার-হাজার বছর আগে হারিয়েছিলাম যাকে
এখন সে তার প্রতীক নিয়ে হেতুর পারাবারে
খেলা করে ফেনার শীষে কেঁপে ওঠে শুনি,
আমি আমার নির্বলতায় বেবিলনের বাঁশি
বাজিয়ে তাকে নীল অতিবেল অন্ধকারের থেকে
আলো– আরো আলোর পানে
আসছি না কি ডেকে।
এ-সব কারা মহিলারা আমার পাশাপাশি
চোখে চুলে হাতের নির্জনতার স্রোতে এসে
আধেক মনে পড়িয়ে হারায় কোথায় অনিমেষে

(হারায় রাতে) হঠাৎ জাগা শিশুর মতো :
ঘুমের পিয়াসী।

## এই কি সিন্ধুর হাওয়া

এই কি সিন্ধুর হাওয়া ?– রোদ আলো বনানীর বুকের বাতাস
কোথায় গভীর থেকে আসে !
অগণন পাখি উড়ে চ'লে গেলে তবু নীলাকাশ
কথা বলে নিজের বাতাসে।

রাঙা মেঘ– আদি সূর্য– স্বাভাবিক সামাজিক ব্যবহার সব
ফুরিয়ে গিয়েছে কতো দূরে।
সে-অনেক মানবীয় কাল ভেঙে এখন বিপ্লব
নতুন মানব-উৎস কোথাও রয়েছে এই সুরে

যাযাবর ইতিহাসসহ পথ চিনে নিতে চায়।
অনেক ফ্যাক্টরি ফোর্ট ব্যাঙ্কারেরো আত্মস্থ মনের
আমার ভিতরে অমা রজনীর ভূকম্পনে কথা বলে যায় :
আলো নেই তবু তার অভিগমনের।

## নবপ্রস্থান

শীতের কুয়াশা মাঠে; অন্ধকারে এইখানে আমি।
আগত ও অনাগত দিন যেন নক্ষত্রবিশাল শূন্যতার
এই দিক– অথবা অপর দিক; দুয়েরি প্রাণের
বিচিত্র বিষয়জ্ঞানে মিলে গেছে:– তবুও প্রেমের
অমর সম্মতিক্রমে। পৃথিবীর যে কোনো মানব
দেশকাল যে কোনো অপর দেশ সময় ও মানুষের তরে
সেবা জ্ঞান শৃঙ্খলার অবতার হ'য়ে সব বাধাব্যথাহারা
নবীন ভূগোললোকে মিশে গেছে; – দিকভ্রান্তিহীন
সারসের মতো,– নীল আকাশকে ঈষৎ ক্রেংকারে
খুলে ফেলে। যা হয়েছে যা হয়নি সবি ওই নক্ষত্রবীথির
একজন অথবা অপরজন;– নিজেদের হৃদয়যন্ত্রের
নিকটে সত্যের মতো প্রতিভাত হ'য়ে উঠে তারা
অনন্ত অমার পটভূমির ভিতরে
অনিমেষ সময়ের মতো জ্বলে;– মনে হয় আশা
অথবা নিরাশা যদি শতাব্দীর জীবনকে খেয়ে শেষ করে

পবিত্রতায় তবু দিক ও সময় মিশে একজন অমলিন তারা
অমিলের উর্ণা ধোঁয়া ছায়া কেটে মিলনের পথে
জ্বলে যায়; যায় না কি ? নিভু-নিভু হ'য়ে শীতকালের দেয়ালে
ফুটে ওঠে; কথায় কারণে কামে অগণন ক্লেদে কনফারেন্সে
বাতির অভাব হ'লে পৃথিবীর মানচিত্রে অন্ধকারে পথ
দ্যাখাবার মতো কোনো কাউকে না পেলে ওই তারাবলি তারা
প্রাণের ভিতরে জড় মূল্যের অধিক ব্যাপ্তি;- চারিদিকে এই
অবিচ্ছিন্ন পাতা ছায়া শিশিরের নগরের হৃদয়কম্পনে ব'সে আমি
তোমাকে জাগায়ে দিয়ে, প্রিয়, সব কালীন জনীন
মানুষের এক জাতি এক দেশ মৃত্যু একটি জীবন এক
গহন আলোকে দেখি না কি ? প্রেতের রোলের ভিতরে বাঙালির
ঘর ভেঙে ঝ'রে গেলে জেনিভার অমেয় প্রাসাদ
ম'রে যায়;– ফ্ল্যান্ডাস, ভাডুন, ভিমি রিজ, উক্রেইন
হোয়াংহো নীপার রাইন চিনদুইনের পারে সব শব
কলকাতা হাওড়া মেদিনীপুর ডায়মনহারবারে বাংলায়
অগণন মানবের মৃতদেহ প্রমাণিত হ'য়ে
কিরকম শুক্র সৌভ্রাত্রের মতো, চেয়ে দ্যাখো, ছড়ায়ে রয়েছে।
নতুন মৃত্যুর বীজ নয়– ওরা নতুন নেশন–
বীজ– নতুন বঞ্চনা-ধ্বংস-মৃগতৃষ্ণাবীজ নয়; নব-নব প্রাণনের
সংযমে পৃথিবী গ'ড়ে সফলতা পাবে মনে হয়–
মানুষের ইতিহাসভণিতার দিন শেষ ক'রে তার স্থির
প্রকৃতিস্থ আত্মার আলোর বাতায়নে।

আমার ব্যাহত ঘরে এ-ছাড়া অপর কোনো বাতি
নেই আর, আমার হৃদয়ে নেই, এইখানে মৃত পোল্যান্ডের
সীমানা রাইনের রোলে মিশে গিয়ে মরণকর্কশ জার্মেনির
হৃদয়ের পরে হিমধূমোজ্জ্বল অলিভ-বনের
আন্দোলনে এম্পিডোক্লেসের স্মৃতি বার-বার জয় করে নিয়ে
নবীন লক্ষ্যের গ্রীস্ নতুন প্রাণের চীন আফ্রিক্ ভারত প্যালেস্টাইন।
পৃথিবীর ভয়াবহ রাষ্ট্রকূট অন্ধকারে অন্তহীন বিদ্যুৎ-বৃষ্টির
জ্যোতির্ময় ব্রেজিল পাথরে আমি নবীন ভূগোল
এরকম মানবীয় হ'য়ে যেতে দেখি;– ইতিহাস
মানবিক হ'য়ে ওঠে;– যাযাবর শ্রীজ্ঞানের মতো
এখন অকুতোভয় উদাত্ত আবেগে
সঞ্চারিত হ'য়ে যাওয়া অর্বাচীন জেনে নিয়ে তবু
নতুন প্রাণের নব উদ্দেশের অভিসারী হ'তে
চায় না কি– চায় না কি জনসাধারণ পৃথিবীর ?
দেয়ালে ট্রামের পথে নর্দমায় ট্রাকের বিঘোরে হনিতের
অস্ফুট সিংহের শব্দে সবিস্ময় উত্তরচরিত্রে

ক্রমেই উজ্জ্বল হ'য়ে যেতে পারে বাংলার লোকশ্রুত বিবর্ণ চরিত।
আমার চোখের পথে আবর্তিত পৃথিবীর আঁকাবাঁকা রেখা
যতোদূর চ'লে গেছে : কলকাতা নতুন দিল্লি ইয়াংকি আফ্রিক
দান্তের ইটালি শেকস্‌পীরিয় ইংল্যান্ড মেঘ-পাতাল মর্ত্যের গল্পের
বিভিন্ন পর্বের থেকে উঠে এসে রবীন্দ্র লেনিন মার্কস ফ্রয়েড রোলাঁয়
আলোকিত হ'য়ে ওঠে; মুমুক্ষার অবতার বুদ্ধের চেয়েও
সমুৎসুক চোখ মেলে আপামর মানবীয় ঋণ--
রিরংসা– অন্যায়-- মৃত্যু– আঁধারে উজ্জ্বল
পথিকৃত সাঁকোর মতন সব শতকের ভগ্নাংশকে শেষ
ক'রে দিয়ে পবিত্র সময় পথে মিশে গেছে;-- সব অতীতের
মথিত বিষের মতো শুদ্ধ হ'য়ে সহজ কঠিন দক্ষিণ-ভবিষ্যতে
মিলে গিয়ে মানবের হৃদয়ের গভীর অশোক
ধ্বনিময়তার মতো তুমি হে জীবন, আজ রাতে অন্ধকারে আনন্দসূর্যের
আলোড়নে আলোকিত ব'লেই তো মানব চলেছে।

## দাও-দাও সূর্যকে জাগিয়ে দাও

দাও-দাও সূর্যকে জাগিয়ে দাও :
হে দিন, জ্বালাও তুমি আলো।
যখন নির্বাণ ছিলো– কোনো দিকে জ্যোতিষ্ক ছিলো না,
যখন শূন্যের সাথে শূন্যের চুম্বনে গাঢ় নীল
নীহারিকা শিখা, সাধ জেগে উঠেছিলো,
যখন উদ্দেশ্যহীন আর্ত অন্ধ রোদসীকে চোখে রেখে তবু
অগ্নির বর্ণের মতো আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হলো,–
সে-আবেগ সেইদিন সে-আলোকে জেগে
কি যেন অনবতুল আভা চেয়েছিলো;
বহে চলা– সূর্যকণ্ঠে কথা বলা– প্রাণ
জন্ম দেওয়া
চেয়েছিলো।

আজ এক কোটি শতাব্দীর পরে অনন্তের কারুকার্যে লীন
মানুষের সংকল্পের সংঘর্ষে সুন্দর
রাত্রি হ'য়ে যাক সূর্য; মৈত্রী হোক সফল নির্মল;
নক্ষত্র মৃত্তিকা হোক; প্রেমের প্রতিভা হোক উজ্জ্বল, বিনত–
ব্রহ্মাণ্ড রচনা হ'লে তার ঘাসে এক ফোঁটা শিশিরের মতো।

## পটভূমিবিসার

কবের সে বেবিলন থেকে আজ শতাব্দীর পরমায়ু শেষ
কি এক নিমেষ শুধু মানুষের অন্তহীন সহিষ্ণুতায় ?–
নক্ষত্রের একরাত্রি– একটি ধানের গুচ্ছ– একবেলা সূর্যের মতো ?
কেবলি মুষলপর্ব শেষ ক'রে নব শান্তিবাচনের পথে
মানবের অভিজ্ঞতা বেড়ে মানুষেরি দোষে হতাহত

কলঙ্কিনী-সংখ্যা বাড়ে : অতীতের স্মরণীয় ইতিহাস থেকে
যা কিছু জানার আছে, না জানার আছে যতো শ্লোক
সবাকে দ্যাখ'তে গিয়ে বার-বার অন্ধকার বেশি ক'রে দ্যাখে।
তবু এই স্বভাবের প্রতিশোধে আগামীর সমাজ অশোক

হয়তো বা হ'তে পারে : হে তুমি গভীর ইতিহাস
আমরা মধ্যম পথে: তোমাকে সকল ক'রে দিতে
ব্যক্তি বিসর্জন দিয়ে মানবের প্রাণনের সাগরে চলেছি;
মহানির্বাণের দিকে কিসাগোতমীর অজানিতে

আমরা চলেছি নাকি ? তা নয়তো। আজকের চেয়ে বেশি ভালো
প্রাণসূর্য উদয় হয়েছে কবে ? এ রকম অশোক গভীর
শিশিরে উজ্জ্বল দেখে ভুল ব'লে প্রকৃতিকে আজো মনে হ'লে
মনের বিজ্ঞানে তবে শুভ্র হোক মানবীয় নিখিল ও নীড়।

## মৃত্যু, সূর্য, সংকল্প

সর্বদাই অন্ধকারে মৃত্যু এক চিন্তার মতন :
আমাদের এই শতাব্দীর সাধ, স্বপ্ন, কাজ, প্রাণ
আচ্ছাদন ক'রে দিতে আসে।
ভোরের নিশ্চিন্ত মন কেমন সাহসে অনায়াসে
আলো হয়– সূর্য হয়– দ্যাখো;
নদী– মেঘ– দিগন্তের পাহাড়ের নীল
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে কেমন নিঃশব্দ অনাবিল।
আমরা প্রেমের কথা– জ্ঞান মুক্তি প্রগতির দিন
ঢের আগে শুরু ক'রে এখনো ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্লীন
সুরের ভিতরে সুর-অগ্নি হ'তে গিয়ে
বার-বার অঙ্গারের অন্ধকারে সমাজ নিভিয়ে
মানুষের ইতিহাস-উর্ণা হ'য়ে আছি।
হে আকাশ, হে প্রতিভা, হে বিচিত্র উচ্ছ্রিত সূর্যের উজ্জ্বলন,
আমাদের রোগ, পাপ, বয়সের রূঢ় মরুভূমি

শেষ ক'রে সৃজনের অনাদির দীপ্তিকে আদিম
চুম্বনে বিজ্ঞান, প্রেম, প্রেমাগ্নি-উড্ডীন করো তুমি

## রাত্রি ও ভোর

শীতের রাতের এই সীমাহীন নিস্পন্দ গহ্বরে
জীবন কি বেঁচে আছে তবে !
ডানা-ভাঙা নক্ষত্রের মতন উৎসবে
আঁধারের ভিতরে কি ঝরে

কেবলি স্ফুলিঙ্গ অন্ধ সংক্রান্তির মতো ?
বহুদিন ক্ষমাহীন সময়ের ভিতরে সে অনেক জ্বলেছে ;
আছে, তবু তুমি নেই, তাই তো দাহন ভেঙে গেছে
মৃত নক্ষত্রের গন্ধ ক্রমেই হতেছে পরিণত

অন্ধকার সনাতনে– সৃষ্টির প্রথম উৎসারিত পটভূমি
তারি অন্তিমের কথা ? অন্তহীন মোজেইকে আলোকের গোলকধাঁধায়
কেউ প্রিয়া– কেউ তার অনির্বাণ প্রিয় হ'তে চায়:
ঝ'রে যায়– দূর মৃগতৃষ্ণিকার মতো দীপ্ত তুমি।

এখন ভোরের বেলা মনে হয় তুমি শাদা যূথিকার মতো
তেমনি পবিত্র স্বাদ তোমার শরীর শিখা ঘিরে
কোথাও বিষয় খুঁজে তোমাকে দেখেছি রৌদ্রে লুকানো শিশিরে:
সৃষ্টির প্রথম ভোর থেকে অবশেষে আজ এই পরিণত

শেষ ভোর, শেষ রোদ, শেষ ফুল, অন্তিম শিশির
মীনকেতনের দিন জন্মান্তরে কেটে গেছে,– আজ প্রতিসারী
আরেক প্রয়াণে উৎস;– একটি মেঘের মতো চ'লে এসে তারি
নীলিমায় মিশে যেতে-যেতে– থেমে– শুনেছি, বলেছো তুমি, 'স্থির

মেঘশান্তি প্রকৃতির– মানুষ তা হারায়ে ফেলেছে।'
চারিদিকে সময়ের সকল বিশাল মরুভূমি
বলয়িত নগরীর সমাজের সভ্যতার কলঙ্কসুন্দর
মৃগতৃষ্ণায় লয় পেয়ে গেলে স্থির তুমি– স্থিরতর তুমি

## এই পথ দিয়ে

এই পথ দিয়ে কেউ চ'লে যেতো জানি
এই ঘাস
নীলাকাশ–
এ সব শালিখ সোনালি ধান নরনারীদের
ছায়া-কাটাকুটি কালো রোদে
সে তার নিজের ছায়া ফেলে উবে যেতো;
আসন্ন রাত্রির দিকে সহসা দিনের আলো নষ্ট হ'য়ে গেলে
কোথাও নতুন ভোর র'য়ে গেছে জেনে
সে তার নিজের সাধ রৌদ্র স্বর্ণ সৃষ্টি করেছিলো।

তবুও রাত্রির দিকে চোখ তার পড়েছিলো ব'লে
হে আকাশ, হে সময়, তোমার আলোকবর্ষব্যাপ্তি শেষ হ'লে
যখন আমার মৃত্যু হবে
সময়ের বঞ্চনায় বিরচিত সে-এক নারীর
অবোলা রাত্রির মতো চোখ মনে রবে।

## কার্তিক-অঘ্রান ১৯৪৬

পাহাড়, আকাশ, জল, অনন্ত প্রান্তর :
সৃজনের কি ভীষণ উৎস থেকে জেগে
কেমন নীরব হ'য়ে রয়েছে আবেগে;
যেন বজ্রবাতাসের ঝড়
ছবির ভিতরে স্থির– ছবির ভিতর আরো স্থির।
কোথাও উজ্জ্বল সূর্য আসে;
জ্যোতিষ্কেরা জ্ব'লে ওঠে সপ্রতিভ রাতে
আদি ধাতু অনাদির ধাতুর আঘাতে
নারীশিখা হতো যদি পুরুষের পাশে :
আকাশ প্রান্তর নীল পাহাড়ের মতো
নক্ষত্র সূর্যের মতো বিশ্ব-অন্তর্লীন;
উজ্জ্বল শান্তির মতো আমাদের রাত্রি আর দিন
হবে না কি ব্রহ্মাণ্ডের লীন কারুকার্যে পরিণত।

## ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২

কোথাও বাইরে গিয়ে চেয়ে দেখি দু-চারটে পাখি।
ঘাসের উপরে রোদে শিশির শুকায়।

নিজেদের খেতে ধানে– চার-পাঁচজন লোক
মানবের মতন একাকী।
মাটিরও তরঙ্গ স্বর্গীয় জ্যামিতির প্রত্যাশায়
মিশে গেছে অতীত ও আজকের সমস্ত আকাশে।

দিগন্তে কি ধর্মঘট ?– চিমনি... পাখির মতন অনায়াসে
নীলিমায় ছড়ায়েছে। এখানে নদীর স্থির কাকচক্ষু জলে
ঘুরুনো সিঁড়ির মতো আকাশ পর্যন্ত মেঘ সব
উঠে গেছে– অনুভব ক'রে প্রকৃতির সাথে মিলিত হতেই,

অমিলনের সূর্যরোলে জ্যোতির্ময় এলুমিনিয়ম অনুভব
ক'রে আমি দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি এরোপ্লেন শুনে
নীলিমা দ্যাখার ছলে শতাব্দীর প্রেতাত্মাকে দেখেছি অরুণে

## পৃথিবী ও সময়

সময়ের উপকণ্ঠে রাত্রি প্রায় হ'য়ে এলে আজ
সূর্যকে পশ্চিমে দেখি সারা শতাব্দীর
অক্লান্ত রক্তের বোঝা গুছায়ে একাকী
তবুও আশার মতো মেঘে-মেঘে বলয়িত হ'য়ে
শেষ আলো ঢেলে যায়; জ্যোতিঃপ্রাণধর্মী সূর্য ওই:
একদিন অ্যামিবার উৎসারণ এনেছিলো;
জীবনের ফেনশীর্ষ সিন্ধুর কল্লোলে একদিন
মানুষকে পেয়েছিলো;– না-ধর্মী মানুষ সেইদিন
ভয় পেতো, গুহায় লুকাতো, তবু সূর্যকরোজ্জ্বল
সোনালি মানবী তাকে 'হাঁ' বলালো– নীল
আকাশ নগরীরেখা দ্যাখা দিলো; শঙ্খ আমলকী
সাগর অলিভবন চেনা গেলো রৌদ্রের ভিতরে:
শ্বেতাশ্বতর-প্লেটো-আলোকিত পৃথিবীর রূপ
অনাদির দায়ভাগে উৎসারিত রক্তের নদীর
শিয়রে আশার মতো জেগে উৎসাহিত সূর্যকরে
সহসা নতুন হিংসা রক্ত গ্লানিমার কাছে প্রতিহত হ'য়ে
ধীরে-ধীরে নিঃশেষে ফুরায়ে গেলো তবু।

ভাই-বোন-স্মৃতি-শান্তি হননের ঘোরে উদ্বেলিত
বহতা নদীর মতো আজো এই পৃথিবী চলেছে।
তবুও তো সেই উদ্‌ঘাতিনী
নদীরমণীর শব্দ কানে নিয়ে– প্রাণে

আকাশে জ্যোতিষ্ক জ্বলে হস্তা অভিজিৎ,
অনুরাধা শতভিষা লুব্ধক স্বাতী;
পৃথিবীতে— হৃদয়েরো গতিপথে বর্ণালির আভা
সম্পূর্ণ দীপ্তির মতো আলোকিত— ক্রমে আলোকিত হ'তে চায়।

লন্ডন রুশিয়া গ্রীসদ্বীপপুঞ্জ কলকাতা চীন,
অগণন কনফারেন্সে বিকীর্ণ য়ুরোপা,
আমেরিকা— যেন বীতবর্ষণের কৃষ্ণমেঘ নক্ষত্রের পথে;
ক্ষণিক উজ্জ্বল হ'য়ে ক্লান্তি ক্লেদ ভয় অন্ধকার হ'তে চায়
এখুনি আবার তবু। প্রকৃতিতে সূর্য আসে, অস্তের আকাশে
চ'লে যায়; অস্তগতিহীন শুভ্র জনহৃদয়ের
সূর্যনগরীর দিকে যেতে হবে চেতনায় মানুষের সময় চলেছে।

## অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে

তারা সব মৃত;
ইতিহাসে তবুও তাদের
কেবলি বাঁচার প্রয়োজন ব'লে
তাদের উত্তর-অধিকার
কোনো-কোনো মানবের হাতে আসে।
তারা ম'রে গেছে।
সবারি জীবনে আলো প্রয়োজন জেনে
সকলের জন্য স্পষ্ট পরিমিত সূর্য পেতে গিয়ে
তবুও বিলোল অন্ধকারে—
তারা আজ পৃথিবীর নিয়মে নীরব।

এই ওই ব্যক্তির জীবনে
সুসময় শুভ অর্থ পরিচ্ছন্নতার
প্রয়োজন র'য়ে গেছে জেনে নিয়ে তারা,
তবুও ব্যক্তির চেয়ে ঢের বেশি গহন স্বভাবে উৎসারিত
জীবনবিসারী ক্ষুব্ধ জনতাসমুদ্র দেখেছিলো।
সেইখানে একদিন মানুষের কাহিনী জন্মেছে;
বেড়ে গেছে;
কাহিনীর মৃত্যু হয় নাই;
কাহিনী ক্রমেই ইতিহাস।
জীবনধারণে— জানি— তবু—
জীবনকে ভালো ক'রে অর্থময় ক'রে নিতে গিয়ে
ইতিহাস কেবলি আয়ত হ'য়ে আলো পেতে চায়।

নিজেদের আবছা ব্যক্তির মতো মনে করে তারা,
ইতিহাস স্পষ্ট করে দিতে গিয়ে তবু,
আজ এই শতকের শূন্য হাতে শূন্যতার চেয়ে বেশি দান
দিয়েছিলো হয়তো বা।
দেয়নি কি ?
আজ এই হেমন্তের অন্ধকার রাতে
আমরা বিহ্বল ব্যক্তি,– তুমি– আমি– আরো ঢের লোক;
মানুষসমুদ্রে ঠেকে অন্ধকার বিম্বের মতন
তবুও সবার আগে নিজের আকাশ
নিজের সাহস স্বপ্ন মকরকেতন
আপনার মননশীলতা
গণনার প্রিয় জিনিসের মতো মনে ভেবে নিয়ে
অন্য সকলের কথা ভুলে যাই।

সকলের জীবনের শুভ উদ্‌যাপনের চেষ্টায়
সূর্যের সুনাম আরো বড়ো ক'রে দিতে গিয়ে তারা
নিজেদের বিষণ্ন সূর্যের কথা ভুলে গিয়েছিলো।
মানবের কথা বিরচিত হ'য়ে চলে–
সেইসব দূর আতুর ভঙ্গুর সুমেরীয় দিন থেকে আজ
জেনিভায়– মস্কৌ– ইংল্যান্ড– আত্‌লান্তিক চার্টারে,
ইউ.এন.ওয়ের ক্লান্ত প্রৌঢ়তায়– সতর্কতায়,
চীন– ভারতের– সব শীত-পৃথিবীর
নিরাশ্রয় মানবের আত্মার ধিক্কার– অন্তর্দানে।

হেমন্তের রাত আজ ক্ষুব্ধতায়– জনতায়– নর্দমায়– ক্লেদে
লোভাতুর ক্রূর রাষ্ট্রসমাজের রতির নৈরাজ্যে
অসম্ভব অন্ধ মৃত্যুতে
ফুরোনো ধানের খেতে তবু
মৃত পঙ্গপালদের ভিড়ে
নরকের নিরাশার প্রয়োজন র'য়ে গেছে জেনে, তবু বলে :
'গভীর– গভীরতর তবুও জীবন–
নিজেদের দীনাত্মা ব্যক্তির মতো মনে করে ওরা
সকলের জন্যে সময়ের
সুন্দর সীমিত আলো সঞ্চারিত ক'রে দিতে গিয়ে
প্রাণ দিয়েছিলো।

জীবনধারণে, তবু জীবনের আরো বর্ণনীয়
ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে আরো সুস্থ– আরো প্রিয়তর
ধারণায় ইতিহাস,– ইঙ্গিতের আরো স্পষ্টতায়;

মাঝে-মাঝে একজন অবিস্মরণীয়
কল্যাণকৃতের জন্ম হয়;
অমর সে নয়– কোনো অন্তহীন অমেয় সময়
তার হাতে নেই;– তবু মৃত্যু এসে চোখে
চুম্বন দেবার আগে সবচেয়ে সাত্ত্বিক আলোকে
আমাদের এই অন্ধ ক্লান্ত শতাব্দীকে
স্নিগ্ধ ক'রে চ'লে গেছে সেই যুবা প্রৌঢ় ও স্থবির;
বলেছে : মানুষ সত্য, তবু সত্য মানুষের চেয়েও গভীর।

## পৃথিবীগ্রহবাসী

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়
কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলা রঙের আলোয়
জ্ব'লে উঠে ঝ'রে গেলো অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি, স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো:
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হ'য়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল করে !
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হ'য়ে গেলে, তবু আরেক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হ'য়ে
পথে-পথে– সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানালো যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন ক'রে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে
ভাবছে একা-একা বসে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে :
ফ্রয়ড মার্ক্স গান্ধী লেনিন আইনস্টাইনের ক্রন্দসীতে আজ
যে দোর কঠিন; নেই মনে হয়– সে দ্বার খুলে তবে
মানব, তোমায় সত্য, সুজন পৃথিবীগ্রহবাসী হ'তে হবে।

## চেতনা-সবিতা

সূর্য কখন পশ্চিমে ঢলে মশালের মতো ভেঙে
লাল হ'য়ে উঠে সমুদ্দুরের ভিতরে নিভছে গিয়ে:

সে যে রোজ নেভে সকলেই জানে, তবু
আজো ডুবে যায় সময়মতন সকলের অজানিতে।
নারী সাপ যখ বণিক ভিখিরি পিশাচ সকলে মিলে
ভোরবেলা থেকে মনের সূর্যনগরীর আলো খুঁজে
পথের প্রমাণ সূর্যের ধ্বকে রক্তে ঘুরেছে কি যে।
শিশুর মতন বানানের ভুলে মহাজীবনের ভাষা
আধো শিখে আধো শেখার প্রয়াসে পরস্পরকে তারা
দেখেছে কঠিন সিঁড়িকাটা পথে– নরকের থেকে সিঁড়ি
এঁকেবেঁকে ঘুরে বীতবর্ষণ কৃষ্ণ মেঘের মতো
নীলিমায় দূরে কোথায় মিশেছে। মানবহৃদয় তাকে
পেতে চায় প্রেমে আর অনুমানে; ধুলো হাড় ঊর্ণায়
ডাঙা বন্দরে চোরা নগরের রক্তনদীর ঢেউয়ে
জেনে নিতে চায় কি সে ইতিহাসঠাসা বেদনার থেকে
এ সিঁড়ি জেগেছে– কোথায় গিয়েছে– এতো কঙ্কাল খুলি
এতো আবছায়া ফেনিল সাগর– জ্ঞান প্রেম প্রাণ একে
ঘিরে আছে কেন; নরনারীদের নিরাশাসূচক মুখে
কেন তবু আসে ভালো প্রভাতের মতন বিচ্ছুরণ ?
মুখে ভুল ভাষা পুরুষ নারীর; হৃদয়ের কোলাহলে
কি কাম কারণ কর্দম ? তবু আলোনদী হ'তে চায়।
বোনভাইদের হননে তবুও নদীর রক্ত জল।
সময় এখন মরুভূমি; সীমা : মৃগতৃষ্ণার মতো,
পান্থ বানালো মানুষ তোমাকে– তোমার সাধনা গতি প্রাণনার ঢের
হাড়গোড় ভেঙে প'ড়ে থাকে, তবু, মানবেতিহাস মানে
আরো আলোকিত চেতনার স্বাদ– মনের সূর্যনগরী জ্ঞানের কাছে
প্রেমের নিজের নিবেদন– তাই মহা অঘটনে কালো
ইতিহাসরাত গ্রহণমুক্ত সূর্যের মতো আলো।

## এই চেতনা

হলুদ কমলা ধূসর, মেঘের ফাঁক দিয়ে
কিরণের সব বর্শাফলক দীর্ঘ ছন্দে উঠে
উপরের নীল আকাশের দিকে নির্জনতার মতো
চ'লে গেছে;– আর বাকি সব শাদা সূর্যরশ্মি পৃথিবীর
চোরাগলি ভাঙা দরদালানের দিকে
শুভ্র সুসমাচারের মতন– পৃথিবীর নরনারী নগরীর
নিরুদ্দেশের সীমানায় ঠেকে স্থির হ'য়ে আছে– দ্যাখো।
এখন বিকেল– গাঁ শহর নটী বণিক ভিখিরি পলিটিশ্যানরা সব
ক্রমেই অধিক স্তিমিত সুরের ধূসর পৃথিবী বেয়ে

নিভু-নিভু শেষ রোদের কিনারে ত্রস্ত মাছির মতো
দ্যাখে আলো নেই;– জীবমৃত্যুর তবে অন্তিমযুগ ?
(চেয়ে দ্যাখে আলো নিভে যায় যেন হেমন্ত-ব্ল্যাকআউটে)
প্রান্তর থেকে নগরের থেকে জীবনের থেকে সবি
ঢের দিনকার অনাদায়ী তহশিলের মতন শূন্যে কেঁপে
সূর্যের সাথে হারিয়ে যেতেছে কোথায় কামাতলান্তে।
আরো একদিন কেটে গেলো তবে অনুপম মৃগতৃষ্ণার
মতন সূর্যকিরণ জ্বালায়ে সমাজ-জাতির চোখে।
দিনভোর সব বড়ো বেবিলন আমাদের সিঁড়ি বেয়ে
নক্‌শি উল্কি নারী ভালোবেসে, আত্মবিচারে ধীরে
অলিভের বনে আথেন্স দেখেছে;– সূর্যের আগে অণু–
সূর্যের মতো উপনিষদের শীত আলো
ভালো করে পেতে-না-পেতেই রোম– দ্বিতীয় সূর্য নিজে
শাসন করেছে যুদ্ধ করেছে;– আমরা যুদ্ধ করি,
সুশাসন করি গণনাবিহীন রক্তনদীর পারে
নকল সূর্যে শুক্র সুপথে পতিত অন্ধকারে।
জানি না প্রাণের সূর্য কোথায়।
আজকে এখন দিন, শতাব্দী পৃথিবী সৃষ্টি চুপে
বিকালের আলো নেভাতেছে; শত নগরীর ভবনের
সিঁড়ির অপার গোলকধাঁধায় মৃত-জীবিতেরা মিলে
প্রকৃতি প্রণয় সমাজ পৃথিবী জীবনের মানে খুঁজে
খাঁচার ভিতরে অনেক রঙিন পাখির মতন– কেমন সন্দীপনী !
যার-যার দ্বৈপ আত্মা মুক্ত ক'রে দিয়ে
আত্মঘাতী নেলনের ক্লান্তি লয় ক'রে
দিতে চায়; প্রেম ও হৃদয় জ্ঞান বিনিময় রয়েছে তাদের:
আলো চায়– অনাদি অনন্ত সূর্য খোঁজে।

## বিপাশা

অনেক বছর হলো সে কোথায় পৃথিবীর মনে মিশে আছে।
জেগে থেকে কথা বলে অন্য নারীমুখ দেখে কেউ কোনোমতে
কেবলি কঠিন ঋণ দীর্ঘকাল আপামর পৃথিবীর কাছে
চেয়ে নিয়ে তারপর পাশ কেটে, মেয়েটির ঘুমের জগতে
দেনা শোধ ক'রে দিতে ভালোবাসে, আহা।

আকাশে রৌদ্রের রোল, নদী, মাঠ, পথের বাতাস
সেই স্বার্থ বুকে নিয়ে নিরুপম উজ্জ্বলতা হলো:
শূন্যের সংঘর্ষ থেকে অনুপম হলো নীলাকাশ:

তবুও স্বাতীর আলো শিশিরের মতো তার অপরূপ চোখ
নিজের শরীর মন পাখাশাঙ্খী আর
না জাগায়ে প্রেমিকের ঋতু পরিবর্তনের মতো।
নারী আজ সময়ের নিজের আধার।

## আলোকপত্র

হে নদী আকাশ মেঘ পাহাড় বনানী,
সৃজনের অন্ধকার অনির্দেশ উৎসের মতন
আজ এই পৃথিবীতে মানুষের মন
মনে হয় অধঃপতিত এক প্রাণী।

প্রেম তার সবচেয়ে ছায়া, নিরাধার
নিঃস্বতায় অকৃত্রিম আগুনের মতো
নিজেকে না চিনে আজ রক্তে পরিণত
হে আগুন, কবে পাবো জ্যোতিঃদীপাধার।

মানুষের জ্ঞানালোক সীমাহীন শক্তিপরিধির
ভিতরে নিঃসীম;
ক্ষমতায় লালসায় অহেতুক বস্তুপুঞ্জে হিম;
সূর্য নয়— তারা নয়— ধোঁয়ার শরীর

এ অঙ্গার অগ্নি হোক, এই অগ্নি ধ্যানালোক হোক
জ্ঞান হোক প্রেম— প্রেম শোকাবহ জ্ঞান
হৃদয়ে ধারণ ক'রে সমাজের প্রাণ
অধিক উজ্জ্বল অর্থে করেনিকো অশোক আলোক।

## স্বাতীতারা

স্বাতীতারা, কবে তোমায় দেখেছিলাম কলকাতাতে আমি
দশ-পনেরো বছর আগে;— সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের মতন লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের;— জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ : চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল।
কোথাও কোনো বেলাভূমের নিয়ন্তা নেই— গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে।

তারা যুবা, তারা মৃত; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবুও, তোমার মুখের পথে

আজো তাকে পাশিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছো, নারি
তয়াতো তোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারি
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারিদিকে অলীক সাগর জ্যাসন বার্ডাসমুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো দর্শালোকের নিজের তো নয়, আর্পাহত কাল
আমরা আজো বচন করে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ অর্চনা... প্রেম নিভিয়ে দিলাম প্রিয়।

## আলোকপাত

আকাশ দিয়ে উড়ে গেলো শাদা চাঁদের ছিঁড়।
এইখানেতে আজ পৃথিবীর অনেক মলিন অন্তেবাসী ভাবে;
দূর উপরের নীল আকাশের রোদের বিচ্ছুরণে
ও সব পাখি রূপশালি ধান? কোথায় উড়ে যাবে?
হৃদয় থেকে বাহির হ'য়ে প্রেম বলেছে: এই
নীলাকাশের আজি-কাজিডাঙায় যে-সব চোরাগলি থাকে
যে-সব বাতাস দেয়ালা ছায়া নখ পাখনাটি পাপের থেকে আসে
তারি ভিতর মৃত্যুফেনশীর্ষে ওরা পরস্পরকে ডাকে।
ওরা জানে; সব কুয়াশা পেরুলো এক অব্যর্থ নির্দেশ
ওদের বুকে;– শুধু ডানার পিসটনে তা নয়;
প্রেমই ওদের দিক চিনিয়ে সাগরবলয় কল্লোলে পৌঁছায়।
হৃদয়, এ সব স্বপ্ন-পরিভাষা মনে হয়।
তবুও ঠিক। আমিও যুগের অকূল কিনারা ভেঙে
অনেক দিনের অনুষঙ্গে চেনা সে-এক অমেয় নারীর পানে
যেতে-যেতে আসতে এসে-যাওয়া যুগের অবসাদে ওই পাখিদের প্রেম–
স্বীকার করি; আমাদেরো প্রেমে কিছু আলোকপাত আনে।

## দিনরাত্রি

সমস্ত দিন
সমস্ত পৃথিবীই যেন আকাশ।
চারিদিকে রৌদ্রের ভিতর র'য়ে গেছে নির্মল জলের অনুভূতি;
জল আকাশ ও আগুনের থেকে এইসব রাত্রির জন্ম হয়;
অন্তহীন শুভ্র বিবেকী নক্ষত্রের;
এইসব স্থায়ী জিনিস চল-বিশ্বলোকের;
মানবজীবনের; এদের অনবচ্ছিন্ন উজ্জ্বল প্রবাহে ধৌত হ'য়ে
সমস্ত গৃহযুদ্ধের গৃহবলিভুকদের রক্তের
শেষ বিন্দুও খুঁজে পাবে না কোথাও,

কোথাও থাকবে না আন্তর্জাতিক অন্যায়ের ছায়া আর।

দ্যাখা যাবে দিন সূর্যশরীরী;
যাযাবর হাঁসকে নিয়ে চলেছে মেঘের
ফেনা-ওড়ানো দূরতর নীলিমায়;
জেগে উঠবে বিকেলের শিয়রে
সাগরের বাতাস যেন– দূর ময়দানের;
অন্তহীন নক্ষত্রের চলাফেরার দেশে পাওয়া যায় তাকে;
ওই ঝাউ-গাছের আঁধারের ভিতরেও;
বন্দরে-নগরে
মানুষের হিংস্র বিড়ালের মতো গর্জনকে বিনমিত ক'রে
করুণার রাত্রিঋতুর মতো
পাওয়া যায় তাকে– পাওয়া যায় তাকে।

আজকের মলিনতা রক্ত কোথায় লীন হ'য়ে যাচ্ছে
সময়ের মনে– নিরবচ্ছিন্ন বিসরণে–
দিন ও রাত্রির অন্তহীন
জলঝর্নার শুশ্রূষার শব্দের ভিতর।

## সূর্যকরোজ্জ্বলা

আমরা কিছু চেয়েছিলাম প্রিয়;
নক্ষত্র মেঘ আশা আলোর ঘরে
ওই পৃথিবীর সূর্যসাগরে
দেখেছিলাম ফেনশীর্ষ আলোড়নের পথে
মানুষ তাহার ছায়ান্ধকার নিজের জগতে
জন্ম নিলো– এগিয়ে গেলো;–
কতো আগুন কতো তুষার যুগ
শেষ করে সে-আলোর লক্ষ্যে চলার কোনো শেষ
হবে না আর জেনে নিয়ে নির্মল নির্দেশ
পেয়ে যাবে গভীর জ্ঞানের,– ভেবেছিলাম,
পেয়ে যাবে প্রেমের স্পষ্ট গতি
সত্য সূর্যালোকের মতন;– ব'লে গেলো মৃত
অন্ধকারের জীবিতদের প্রতি।

জীবিত, মানে আজ সময়ের পথে
বালি শিশির ধুলোর মতো কণা
মিলিয়ে তাদের প্রাণের প্রেরণা

ক্রমেই চরিতার্থ হ'তে চায়।
চারদিকে নীল অপার্থিবতায়
সোনার মতন চিলের ডানায় কোনো
খাদ মেশানো নেই, তবু তার প্রাণে
কোটি বছর পরে কোনো মানে
বার করেছে মন কি প্রকৃতির ?
মানুষ তবু পাখির চেয়ে ঢের
অমৃতলোক হাতের কাছে পেয়ে
তবু কি অমৃতের ?

মানুষ আমি,– মানুষ আমার পাশে;
হৃদয়ে তার হৃদয় মেশালেও
ব্যক্তি আমি, ব্যক্তিপুরুষ সে-ও;
দ্বীপের মতন একা আমি তুমি;
অনন্ত সব পৃথক দ্বীপের একক মরুভূমি :
যে যার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে
র'য়ে গেছে;– সেখানে থেকে ব্যাজস্তুতি, কপট প্রণয় ভয়
দ্যাখো কেমন উৎসারিত হয়;
প্রাণের প্রয়াস রয়েছে তবু, তাই
দেখেছি মানুষ অনর্গল অন্ধকারে ম'রে
মানবকে তার প্রতিনিধি রেখে গেছে–
হয়তো এক দিন
সফলতা গেয়ে যাবে ইতিহাসের ভোরে।

চারদিকেতে সব মানুষের ব্যথা মধুরতা
নির্মলতার সাগরসূর্যে ঝরে।
বন্ধু আমার ভোরে এলে দেয়ালে ছায়া পড়ে
তবুও কি আজ ম্যামথ-পৃথিবীর ?
সে-কোন যুগের সরীসৃপের অব্যক্ত শরীর
কামনা ভুল কুজ্‌ঝটিকায় যে-সব অসংগতি
এনেছিলো– তাদের তুমি সহিষ্ণুতায় শুদ্ধ ক'রে নিয়ে
ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলছো আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে;
হয়তো মানুষ নিজেই স্বাধীন, অথবা তার দায়ভাগিনী তুমি;
ওরা আসে, লীন হ'য়ে যায়; হে মহাপৃথিবী,
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার ভূমি।

## আশা-ভরসা

ইতিহাসপথ বেয়ে অবশেষে এই
শতাব্দীতে মানুষের কাজ
আশায় আলোয় শুরু হয়েছিলো বুঝি– শুভ্র কথা
বলা হতেছিলো;– রৌদ্রে জলে ভালো লেগেছিলো
শরীরকে– জীবনকে।

কিন্তু তবু সবি প্রিয় মানুষের হাতে
অপ্রিয় প্রহার হ'য়ে মূল্যহীন মানুষের গায়ে
আশ্চর্য মৃত্যুর মতো মূল্য হয়– হিম হয়।
মানুষের সভ্যতার বয়ঃসন্ধিদোষ
হয়তো কাটেনি আজো, তাই
এইরকমি হ'তে হবে আরো রাত্রি দিন;–
নক্ষত্র সূর্যের সাথে সঞ্চালিত হ'য়ে তবু আলোকের পথে

মৃত ম্যামথের কাছে কুহেলির ঋণ
শেষ ক'রে মানুষ সফল হ'তে পারে
উৎসাহ সংকল্প প্রেমে মূল্যের অক্ষুণ্ন সংস্কারে;
আশা করা যাক।

সুধীরাও সেই কথা ভাবে,
আপ্রাণ নির্দেশ দান করে।
ইতিহাসে ঘুরপথ ভুলপথ গ্লানি হিংসা অন্ধকার ভয়
আরো ঢের আছে, তবু মানুষকে সেতু থেকে সেতুলোক পার হ'তে হয়।

## ক্রান্তিবলয়

মৃত্যু আর সূর্যকরোজ্জ্বল এই পৃথিবীর বুকের ভিতরে
সময়ের মহাসমুদ্রের পারে বালির কণার মতো ঘরে
নক্ষত্রের প্রতিশ্রুতি– দিনমান প্রামাণিক মৃত্তিকার ধুলো
গ'ড়ে গেছে মানুষের জীবনের চলোচ্ছল বাসনার– এই শিশু বৎসরগুলো।
কোথাও পৌঁছুতে হবে মনে মেনে নিয়ে
চলেছে সে;
দেখেছে ভূস্তরে মহাসরীসৃপ অচেতনভাবে ব্যথা দিয়ে
অচেতন প্রকৃতিকে অন্ধকারে গিয়েছে হারিয়ে।
তবুও প্রকৃতি তার মূল্যের নির্ণয় নিয়ে দিনরাত্রি সহিষ্ণু, অশোক;
চারিদিকে শীত রাত্রি অগ্নির বলয় বড়ো ব্রহ্মাণ্ডের কারুশিল্পলোক

মানুষের পৃথিবীর অণুকণিকার মতো পরিসর ঘিরে।

ফেনা রৌদ্র সাগরের কল্লোলে কুয়াশায় পতঙ্গে শিশিরে
নিজেকে উজ্জ্বলভাবে চরিতার্থ মনে ক'রে নিয়ে
মানুষের রাত্রিদিন শুরু হয়েছিলো;
তারপর কবে–
শেষ হ'য়ে গেলে শ্যাম পৃথিবী ও নীলিমার বলয়ে জিজ্ঞাসা হ'য়ে রবে:
রবে বুঝি,
গ্লানি ব্যথা রক্তের অক্ষর আজো শিশুসূর্যের মতো হাসে
অপ্রেমের রঙে কৃষ্ণ মানুষের জ্ঞান ও গতির ইতিহাসে।
এতোদিন ধ'রে তবু মানুষ চিনেছে
অন্তরঙ্গভাবে তার সময়কে– এ পৃথিবীটিকে
ভূগর্ভের অশ্ম থেকে ভিন্ন হ'য়ে অন্য এক আলোকের দিকে
যেতে হবে জানে;
নীলকণ্ঠ পাখি রৌদ্রে উড়ে এলে যাযাবর সময়ের মানে
ধরা পড়ে যেন স্থাণু কণিকার কাছে।
মানুষের কাহিনীতে আরো কতো ক্লান্তি রক্ত–
তবু প্রেম ক্ষেম প্রেমক্ষেমহীন রাত্রির উৎসারণ আছে;
তবু এই শতকের সময়ের লোভ ভয় মৃত্যু রণ আত্মসমাহিতি ছেড়ে দিয়ে
আরো স্পষ্ট আকাশের পদার্থের আলোকের মৃত্যু-অমৃতের অনুভবে
মানুষকে শুভ স্থির স্থিরতর বিষয়ের দিকে যেতে হবে:
যদিও সে-স্থিরতার ধারণায় কিংবা তার হিসেবের দোষে
সত্যকে আচ্ছন্ন ব'লে মনে হয়– যেতে হবে আরো দূর– দূরতর কূলে
তা হ'লে সমাজ সীমা সময়ের সত্যের সূর্যের মর্মমূলে।

## আজ

অন্ধ সাগরের বেগে উৎসারিত রাত্রির মতন
আলোড়নে মানুষের প্রিয়তর দিকনির্ণয়ের
পথ আজ প্রতিহত; তবুও কোথাও
নির্মল সন্ততি দেশ সময়ের নব-নব তীর–
    পেতে পারে হয়তো বা মানবহৃদয়;
মহাপতনের দিনে আজ অবহিত হ'য়ে নিতে হয়।
যদিও অধীর লক্ষ্যে অন্ধকারে মানুষ চলেছে
ধ্বংস আশা বেদনায়
বন্য মরালের মতো চেতনার নীল কুয়াশায়–
কুহেলি সরিয়ে তবু মানুষের কাহিনীর পথে
ভাস্বরতা এসে পড়ে মাঝে-মাঝে–
    স্বচ্ছ ক্রান্তিবলয়ের মতন জগতে।

মনে হয় মহানিশীথের স্তন্যপায়ী
মানুষ তবুও শিশুসূর্যের সন্তান,
স্থিরতর বিষয়ী সে–
যদিও হৃদয়ে রক্তে আজো ভুল অকূলের গান।

## পৃথিবী আজ

প্রকৃতি থেকে ফসল জল নীলকণ্ঠ এলো :
সময়পাপচক্র থেকে বাহির হলো ব্যথিত নিঃসহায়।
সবের পথে শতাব্দীর এই রাত্রি ব্যাপকতা
প্রশান্তি নয়– ক্রমেই বেশি স্পষ্টতা জাগায়।

সময় এখন চারদিকেতে ঘনান্ধকার দেখে
বলছে : 'নগর নরক ব্যাধি সন্ধি ফলাফল
জীবনের এই ত্যক্ত সন্ততিদের প্রলাপ আলাপে পরিণত
হ'লো কি প্রায় ?– নক্ষত্র নির্মল ?'

হয়তো হলো :– অন্তত আজ রাত্রি একা অল্প সময়ের
ভিতরে শুভ অনুধ্যায়ী সময়দেবীর মতো
প্রাণের প্রয়াস দ্যাখাতে গিয়ে চলতি ছেদে ব্যর্থতায়
হয়নি নিহত ?

নদী পাখি প্রহরী জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা সব
প্রেমিক ? তবু সারাটা রাত অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি
শব কুড়িয়ে ফিরছে অন্ধকারে;
চন্দ্রে সূর্যে রক্ত তরবারি ?

মানব কেমন স্বভাবত
এই কথা কি ঠিক
দেশ-সময়ের মানুষমনের সহজ প্রকাশে
করুণা স্বাভাবিক ?

আমার চোখে ভেসে ওঠে করুণা এক নারী :
হাত দুটো তার ঠাণ্ডা শাদা– তবুও উষ্ণতা
প্রিয়ের মতন। কাম তবু আজ প্রিয়তর নিরিখ পৃথিবীর :
স্থূল প্রগলভ বিষয় ব্যবহার ও কথা

সবের চেয়ে সুখের বিষয় ভেবে
রক্তে কাণে উন্মাদনায় পুরুষার্থ লভি;
জীবনে আরেক গভীরতরভাবে

ঢুকেও তো আজ তা অ-প্রেমই স্বভাব।

পিরামিড ও অ্যাটম আগুন অধীর প্রাণনার
উৎসারিত রাষ্ট্র সমাজ শক্তি রচনায়
প্ল্যান কমিশন কনফারেন্সের বৃহৎ প্রাসাদে
হঠাৎ মহাসরীসৃপকে দ্যাখা যায়।

## রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী

এ অন্ধকার জলের মতো; এই পৃথিবীর সকল কিনার ঘিরে
নরক নগর তাপী পাপীর শান্ত শুশ্রূষায়
কোথার থেকে এসে কোথায় লক্ষ্যে চ'লে যায়;
সকল উত্তেজনায় আসে স্নিগ্ধ শরীরে।

কে ব্যাহত পাখির মতো প্রাণাকাশে ওড়ার পথে সমরশাস্ত্রকে;
কারা কোথায় আলোককণার মতন, সূর্য হতে
জন্ম পেয়েই হারিয়ে গেছে অন্ধ রক্তস্রোতে;
বুদ্ধিজীবী নষ্ট হলো কোথায় মনের গোলকধাঁধার ছকে;—

সবের কাছে নিরভিমান রাত্রি এসে নমিত হ'তে বলে;
কথা ভাবায়; কথা ভাবার সর্বনাশে শান্তি কোথায় আছে ?
তবুও এসে অনেক কাজের 'পরে অন্তরাশ্রয়িতার কাছে;
মৃত্যু ঘুমের অতীত ব্যথা ক্ষয় পাবে কি সহজ সরলে ?

এখানে কোনো আকাশসারী ইন্দ্রজাল নেই;
এখানে কালের সিঁড়ির 'পরে মধ্যপথে অগম সিঁড়ির দিকে
তাকিয়ে বিষয় ভেবে নিতে হয়েছে নতুন যানের প্রতীকে;
মৃত্যু নেই, মায়া নেই, ইতিহাস অমোঘ তবু ঠিক এ-কারণেই

ক্লান্তি নেই; মনোনদীর দু-পার ঘিরে ছাউনি পড়েছে :
এপারে এরা জীবনপ্রেমিক : ঘোষণা ক'রে বলে;
ওপারে ওরা এই পৃথিবীর নিষ্পেষিত নরনারীর দলে;
সিদ্ধি চায় : গণনাহীন মৃত্যুসেনা হাজির করেছে।

অনেক বিনাশ সাঙ্গ হ'লে অন্ধকারের নতুন জাতক, চল
তবুও অনেক প্রাণের প্রয়াস করনা প্রেম সহিষ্ণুতা আলো
দেখেছে আবার নবনবীন নৈরাশ্যে হারালো :
নাবিক ক্লান্ত : নদী কি নিষ্ফল ?

অন্ধকারে হৃদয় এখন নিজের কাছে থেমে

আশা আলো হারিয়ে যতোই শ্লেষ পরিহাস শক্তিতে কঠিন
হ'য়ে সন্ততিদের কাছে পিতৃলোকের ঋণ
আঁধার জলাঞ্জলি ভাবে- ততোই নদী জনমানব প্রেমে

নিহিত হ'য়ে নতুন জলকণিকারাশি বানিয়ে নিতে চায়।
আবার কি তা রক্তকণা হ'য়ে গেলো ? ক্ষালন ক'রে অন্ধকারে জ্ঞানী
হ'য়ে সে দেখছে ইতিহাসের বিরাট হয়রানি
নবীন বীজের মতো আজো মানবতার বিবর্ণ আত্মায়।

## আশা, অনুমিতি

সূর্যের আকাশের মতো মানুষেরা অনুভাবনায় স্থির
এক আশ্বাস র'য়ে গেছে পৃথিবীতে,
র'য়ে গেছে আমাদের হৃদয়ে যে এই
ইতিহাস পৃথিবীর রক্তাক্ত নদীর কেবলি আয়ত
উৎসারণ অন্ধকারে নিজেকে প্রচুর ক'রে তবু
স্তিমিত হ'য়ে পড়ে;
নতুন নির্মল জলকণিকারা আসে
নক্ষত্রের সূর্যের নীলিমার মানবহৃদয়ের
আশ্চর্য রেবার হিল্লোলের মতো।

সময় যা আচ্ছন্ন করেছিলো তাকে সময়সংক্রান্তির পারে
মৃত্যু যা নিশ্চিহ্ন করেছিলো তাকে উজ্জ্বল বস্তুপুঞ্জে
জাগিয়ে তুলবার জন্যে দ্যাখো
সচেতন হ'য়ে জেগে উঠে মানব :
চারিদিকে উন্মুক্ত সূর্যের
অন্তরালে সূর্যের
আলোর নক্ষত্রের রাত্রির নগরীর জ্ঞানের
অন্তহীন পরিচ্ছন্ন পবিত্রের ভিতর।

## মহাগ্রহণ

অনেক সংকল্প আশা নিভে মুছে গেলো;
হয়তো এমনি শুধু হবে।
আজকের অবস্থান ফুরিয়ে যাবে কি।
নতুন ব্যাপ্তির অনুভবে ?
মানুষ এ-পৃথিবীতে ঢের দিন আছে;
সময়ের পথে ছায়া লীন

হয়নি এখনো তার, তবুও সে মরুর ভিতরে
একটি বৃক্ষের মতো যেন যুক্তিহীন;

সফলতা অন্বেষণ ক'রে
হারিয়ে ফেলেছে প্রাণ, নিকেতন, জল;
প্রেম নেই, শূন্যলোকে সত্য লাভ তার
অর্ধসত্য অসত্যের মতন নিষ্ফল।
ভুলের ভিতর থেকে ভুলে
গ্লানির ভিতর থেকে গ্লানির ভিতরে
মানুষ যে-গ্রহণের সূর্যে চলেছে
তা তবে শাশ্বত গ্রহণ সৃষ্টি করে !

## অন্ধকারে

অন্ধকারে থেকে-থেকে হাওয়ার আঘাত মাঠের উপর দিয়ে
স্মরণ করায় আজকে কারা মৃত;
তাদের স্মৃতিবার্ষিকী আজ নদী পাথর ঘাস পৃথিবীর মনে
ধীরে-ধীরে হতেছে বিবৃত।
এ-সুর ভালো;– পৃথিবীতে তবুও এক প্রেম রয়েছে তার
সুসমাচার ছায়াপথের নক্ষত্রদের মতো,
নারী ও তার পুরুষ নিয়ে,– ইতিহাসের রাত্রি নিভিয়ে,
আকাশআশার শীর্ষে ওরা হয় না আহত।

তবুও আঁধার চুপে-চুপে সকলি গ্রাস ক'রে ফেলে, নারি,
সে-শীত শুধু সেন্টিগ্রেডের নয়;
সে-অস্তিমতা সে-শূন্যতা কে জানে কোন্ অর্থপ্রবীণ সময়প্রকৃতির :
তুমি জানো, তোমার মুখে তাকিয়ে মনে হয়।
প্রকৃতি তখন তোমার নাভির ভিতরে আমি লীন
হ'য়ে আছি দেখে
অন্তবিহীন অন্ধকারের জন্মদান করে
অমৃতযোগ অন্ধকারের থেকে।

সূর্যে অনেক কাজ হয়েছে সারাটা দিন; অনেক প্রেম-জীবনজয় আলোর প্রেরণা
বধ করেছি। সুদীর্ঘকাল জেগে
অনেক শনি শেয়াল শকুন জ্যোতির্ময় ঘোষণা করা গেছে।
আবার সকল মুছে ফেলে বিঘূর্ণনের বেগে
যযাতিকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়ে গেছে জীবনরাজ্য থেকে।
অসূয়া অসারতা দ্বিধা ঘুচিয়ে নতুন দিন
জাগাতে চেয়ে নানা স্কুলের গণনাহীন ক্যাম্প খুলেছে যারা–

তাদের হ'য়ে ত্রিশঙ্কুকে বিঁধিয়েছি বড়্‌কিন্‌।

দেখে গেছি শতাব্দীময় রক্তনদীরাশির দুরত্যয়
আত্মপ্রসাদ ভেঙে নিতে প্রাণের নদী এসে
পড়ি-পড়ি ক'রে নিখিল আত্মীয়তায় পড়ল ঝ'রে প্রায়;
দেখে গেছি করুণ ইতিহাসকে ভালোবাসে
আসি-আসি করে প্রাণের সাহস সূর্য সকাল এলো প্রায়;
কিছুই তবু এলো নাকো;– সময়কে যা দেবার সবি দিয়ে
কোটি আলোকবর্ষ পরে আকাশ, তোমার মনের কথা আজ
পেয়েছি অনাথ আমায় সুদর্শনাকে বুকে নিয়ে।

## অমৃতযোগ

জন্মেছিলো– চেয়েছিলো– ভালোবেসেছিলো
কম বেশি প্রাণকল্যাণে
মানুষ এ পৃথিবীর মানুষকে; তবু
মৃত্যুরি পূর্ণতর মানে।

তাহলে সময় আজ তুমি।
সময়সিন্ধুর মতো রূপে
এখানে শিশির থেমে আছে
ঘাসের বুকের 'পরে চুপে।

আমিও অনেক শূন্য অনুশীলনের
ধাঁধার ভিতর থেকে উঠে
হংসের ডানার মতো আজ
নীড়ের হংসীর পক্ষপুটে।

এখানে মরণশীল হংস নেই আর;
আর পাখপাখালির নীড় নেই গাছে;
এখানে পৃথিবী নেই, সৃষ্টি নেই, তুমি
আমি আর অনন্ত রাত্রির বৃক্ষ আছে।

## তিমির সূর্যে

বাহিরের থেকে ফিরে এসো
তবুও বাহিরে থেকে যাও;

হৃদয়ের ভিতরে ঢুকেও
তবুও দাঁড়াও
সেইখানে নগরীর শূন্যে সূর্য এসে
মানুষকে প্রত্যহের উপাদান নিতে
ডেকে নেয় সম্ভাবনার পৃথিবীতে
তিমির সূর্যের মতো রোজ।

ঢের পথ চ'লে গেছে মনে হয়েছিলো
হিসেবে সঠিক মূল স্বর্গের পানে;
অতীতের কুয়াশায় এরকম বোধ হতো, তবু
আজকে ভাবছি এই মরুভূমি প্রাণকল্যাণে
স্নিগ্ধ হবে ? হে শতাব্দী, হে নিবিড় মরুবৃক্ষ, জেগে ওঠো তুমি
শরীরের সময়ের শেষ নিরন্তর অগ্রসরে;
ফিরে এসো প্রেম-যুক্তিপ্রেমের ভিতরে;
স্বপ্নের ভিতরে যাও : বস্তুর ভিতরে।

## মহাপতনের ভোরে

কেবলি স্বপ্নের ক্ষয় হয়;
তার কোনো ক্ষয় নেই, চারিদিকে চলেছে সময় :
বন্দরের কুয়াশায় কোলাহলে,
পৃথিবীর কোল থেকে অবিরাম উৎসারিত জলে,
এরিয়েলে ধ্বনির প্রবাহে,
অন্ধকারে অন্তহীন মানুষ বা মাছির পতনে,
কন্‌ফারেন্স প্ল্যান কমিশনে।
নগরীর শক্তি নষ্ট হ'য়ে যায় চারিদিকে,–
কেবলি গ্রামের ধ্বংস হয়;
ফুটপাথে-পাটাতনে ছোটো বড়ো মাঝারি অগণ্য পরিসরে
সৃষ্টির ও পৃথিবীর ভয়াবহ শূন্যের ভিতরে
প্রেম আছে, ভাবে ওরা, বুঝি সব অপ্রেমের বীজ নষ্ট করে !
কিন্তু তবু কোথাও এখনো শেষ যতি
ছেদ ক'রে মন্তব্যে মননে স্থির গতিপ্রেম আছে ?
মানুষের ইচ্ছা চিন্তা সংকল্পের আঁধার আলোর সেতু ঘিরে
ক্লান্তি ব্যথা কুজ্‌ঝটিকা ঢের
সত্যের ও মৃতসত্যের;
ইতিহাসে পর্ব শেষ হ'য়ে গেলে সেই মহা দায়ভাগ প্রাণে
নিয়ে ছোটো আকাশের মতো বড়ো নীলিমা সন্ধানে
চ'লে যায় মানুষেরা ইতস্তত বলয়ের দিকে;
অসত্যের থেকে সত্যে ?–
আশার স্পন্দন ঘিরে রেখেছে এখনো পৃথিবীকে !

## পৃথিবী, জীবন, সময়

কোথায় সে যে রয়েছিলাম;–

আজকে মনে হয়
সাগর দেখে আরো বৃহৎ আলো
দেখেছিলাম,– ঠিক তা সাগর নয়।

প্রশান্ত না কৃষ্ণ বেরিং ভূমধ্যলীন ভারত মেরুসাগর তাকে বলে
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে
একটি ঘোড়া সূর্য হ'য়ে জ্বলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিলো;
মনে পড়ে মাছের ঝাঁকে গহন সাগরজল,
ফেনার হাওয়ায় ফসকে শাদা পাখিগুলো দুরন্ত উজ্জ্বল
নীল কি রৌদ্র ? রৌদ্র কি নীল জলের কোলাহল !
গভীর স্বনন; কান পেতে সেই সুর
মনে হ'তো এই পৃথিবীর অনেক পরের যেন
জাতক পৃথিবীটির মতন দূর;–
আজকে তোমার ইচ্ছা চিন্তা শপথ আর-এক রকম সুদর্শনা,
ধুলোকণা এখন আমি– কালের জলকল্লোলে জলকণা।

মনে পড়ে সেই কবেকার গভীর সাগর কি এক নিখিল বৃক্ষ থেকে ঝরে,
অন্ধকে চোখ দান করে রোদ ক্রন্দসীতে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে;
দুপুরবেলা সূর্যালোকের থেকে নেমে অতিথিদের মতো
অসংখ্য সব শাদা পাখি সহসা ঘুম ভেঙে
দিয়েছে ব'লে মনে হতো;–
সাগর আলো পাখি নিরব চারিদিকে– বৃক্ষ নির্জনতা;
কে যেন ডেকে নিতো আমায়
কে যেন ডেকে নিতো তোমার কাছে,
সে যেন ডানা টিউব-ট্রেন রাডার-প্লেন টেলিপ্যাথির গতি
ছাড়িয়ে নীল আকাশে এসে নীল আকাশের নিজের পরিণতি।

মাঝে-মাঝে পাখির মতন
শিশির ঝরার শব্দ– বিকেল;
আলোও নিজে কেমন যেন অন্ধকারের মতো।
সময় এসে আমার কাছে একটি কথা জানতে চেয়েছিলো,
তোমার কাছে একটি কথার মানে;
আমরা দুজন দু-দৃষ্টিকোণ দিতাম তাকে হেসে
একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে।

এসব অনেক আগের কথা-- অনেক চিত্র চিন্তা রীতির ক্ষয়
হ'য়ে গেছে তারপরেতে– মানুষকে সব বুঝে নিতে হয় :
কোথায় এখন সে সব আকাশ নক্ষত্র রোদ সত্য উজ্জ্বলতা :
পাখির সাথে মহাপ্রাণের বৃক্ষে পাখির কথা !

এসো জাগো হৃদয়, তুমি বিষয় জেনেছিলে;
গিয়েছিলে অনেক দূরে স্থির বিষয়ের দিকে;
সে-সব আলোয় গ্রহণ করো আরেকরকম ব্যবহারের মানবপৃথিবীকে।

## নিজেকে নিয়মে ক্ষয়

নিজেকে নিয়মে ক্ষয় ক'রে ফেলে রোজি
চলেছে সময়;
তবুও স্থিরতা এক র'য়ে গেছে,
সময় ক্ষয়ের মতো নয়।

অঘ্রানের সকালের আবছা আভার
মতন অসংখ্য কুয়াশায়,
আশ্বিনে আকাশ রোদ মাঠের ভিতরে,
নদীর বিস্তীর্ণ জলে, অথবা ঝড়ের বড়ো ভোরে,
শীতকালে সুস্থির বিকেলে,
মনে হয় আজ
পৃথিবী অনেক মূল্য, সত্য ভুলে গেছে;
সত্যে স্থির হ'য়ে আছে টের পাই তবু :
তোমার আমার নীড় প্রকৃতির পর্দার থেকে ভেসে চোখে
একটি অমেয় মূল্যে যতোদিন আলো ক্ষয় হতেছে আলোকে।

## জীবনবেদ

অনেক বছর কেটে গেছে,
আরো কিছু দিন চ'লে যাবে;
ফুরিয়ে ফেলেছি নীড় শিশির অনেক,
আরো রৌদ্র আকাশ ফুরাবে,
অনেক চিহ্নিত গাছ মাঠ স্তব্ধ জনতা বন্দর
আছে, তবু কাছে নেই আর;
মনন-আভার মতো ঘিরে
রেখেছে সে-সব অন্ধকার।

শরীরের থেকে শক্তি ক্ষয়ে

গলিত মোমের মতো যাবে
ক্রমে আরো ক্ষমাহীন অগ্নির ভিতরে;
বিষয়ের থেকে দূর বিষয়ে হারাবে
মানুষের ক্ষুধাতুর মন;
প্রেমের বিষয়ে তবু স্থির
হ'য়ে থেকে ভয়াবহ ইতিহাস কিছু স্নিগ্ধ ক'রে
নিভে যাবে মনন শরীর।

## শত শতাব্দীর

মানুষ অনেক দূর চ'লে যায়– চ'লে যেতে চায়
নক্ষত্রের আকাশ-অগ্নির মতো জ্বলে;
তবু কেউ অভিজিৎ ধ্রুব স্বাতী লুব্ধক নয়;
মানুষের সেইসব সাধ শান্ত হলে
ঘিরে থাকে সঙ্গী দায়ভাগিনী পৃথিবী;
কিছু তার বরফের গন্ধে স্নিগ্ধ হয়,
কিছু সূর্যকরোজ্জ্বল ক্রান্তিবলয়,
সমুদ্রের ফেনশীর্ষ নীল কল্লোল।

ইতিহাস কতো প্রাণবত্তার কথা
ভেবেছিলো; সময়ের অন্ধকারে আজো রোজ ভাবে।
সৃষ্টির প্রাণের উৎস যেন
র'য়ে গেছে মানুষের সহজ স্বভাবে :
কখনো এঞ্জিন ডাইনামো প্রপেলারের উদ্রেকে মনে হয়।
তবু চোখ খুলে রেখে আশ্চর্য সংজ্ঞানে
ভয় থেকে আরো ভয় ভুল থেকে ভুলে
ছিন্ন বন্যমরালের মতন সে উড়ছে অকূলে।

মনে হয় মানুষের তবু এই শেষ
পরিণতি হয়তো বা নয়;
যদিও ধর্ম ত্যাগ করেছে অনেক দিন আগে
তার সেই অতীতের মুদ্রার অভয়,
সমাজ স্বতোৎসার হারিয়ে নতুন
অনুশীলনের শক্তি ক্ষয় ক'রে ফেলে
অন্ধ তৎপরতার শূন্য লাভ করে আজ
লক্ষ্যহীন ব্যক্তি আর জাতির সমাজ।

চারিদিকে মানুষ চলেছে সব গ্লানি
অন্ধকার তাপ ভয় দুঃখের আকাশে;

সময় ও বিষয়ের সহিত সংঘর্ষে
মরণ ও জীবনের যে দ্বয় মূর্তি ইতিহাসে
জাগে তারা মানুষকে জেনে নিতে বলে;
আত্মসমাহিত হ'য়ে নিতে;
কোথাও স্বর্গে নয়– এ নিরভিমান পৃথিবীতে;
যেতে বলে গতি ও জ্ঞানের মর্মস্থলে।

## সমস্ত দিন অন্ধকারে

সমস্ত দিন অন্ধকারে রৌদ্র ঢেলে ওই
পশ্চিমে নীল হলদে মেঘে সূর্য এখন জ্যোতি,
ম্লান হ'য়ে যায়; নদী অবোধ, তবুও অনেক দ্যোতনা তার মর্মস্পর্শী ঠিক;
পাখিও ঠিক তেমন অবুঝ আন্তরিকতায়;
এখন তারা শেষ সোনালি রোদের বিচ্ছুরণে
কিছুই তেমন বলে নাকো– শুধু বলে : 'অধঃপতিত
মানবতা আজকে, তার আত্মবিচার তবু কি সচেতন ?
আমরা সবাই পটভূমির ছবির মতো, আধেক বুঝেছি তার মন।'

## চারিদিকে নীল হ'য়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে

চারিদিকে নীল হ'য়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে দেখে
সাগর ও অরণ্যের সুর শুনে-শুনে
মানুষের জন্ম হয়েছিলো প্রসবিনী পৃথিবীর
অন্ধকার নিরক্ষর প্রাণের আগুনে
বিহ্বল শীতের রাতে কবে।
তারপর কতো দিনরাত্রির ক্ষয়
হ'য়ে গেলো; অপ্রসর হৃদয়ের অপ্রসর নয়
প্রেম-অপ্রেমের মতো, আমাদের জ্ঞানরুচিহীন।

## মনবিহঙ্গম

ঢের যুগ নিষ্ফল হয়েছে;
এরকম কেবলি কি হবে ?
ইতিহাস কেবলি কি অন্ধ পরীক্ষার
অন্ধকারের অনুভবে ?
আশার সঞ্চারে সূর্য আলো,

আকাশের পারাপার নীল
হ'লেও অজ্ঞান নিয়মের
চাকায় কি ঘুরছে নিখিল ?

শাদা আর কালো রঙে মাখা পৃথিবীর
কোলে আজ মানুষের স্থান
পুড়ে কি ছাইয়ের মতো কালিমা হয়েছে ?
কোথায় প্রাণের বৃক্ষ তবু, আহা, মরুকল্যাণ ?
ধূসরতা স্নিগ্ধ করে জল ?
সময় ও সময়ের আত্মা চাতক
সূর্যের অনলে বাষ্পে ক্ষয়
পেলে কি অমিয় হবে অগ্নিবলয়।

কারা কবে কথা বলেছিলো,
ভালোবেসে এসেছিলো কাছে;
তারা নেই, তাদের প্রতীক হ'য়ে তবু
কয়েকটি পুরোনো গাছ আছে;
নক্ষত্রেরা র'য়ে গেছে নদীর ওপারে;
চারিদিকে প্রান্তর ও ঘাস,
দু-চারটে ঘর বাড়ি নীড় ও শিশির,
কূলে-কূলে একলা আকাশ।
যারা ছিলো তারা কেউ নেই;
জীবন তবুও এক শান্ত বিপ্লবী,
স্থির আগুনের মতো অবিরল আলোক দিতেছে;
সে-আগুনে আলো ছাড়া দহে যায় সবি।

নিশ্চিত মৃত্যুর শূন্য আঁধারের আগে
হে নিঃসঙ্গ বৃক্ষে মনবিহঙ্গম তুমি,
দেখেছিলে জেনেছিলে ভালোবেসেছিলে
দ্রুত পরিবর্তনের মতো পটভূমি
পৃথিবীতে মানুষের আসাযাওয়া তবু;
শীগগিরি এ মাটির নিজের স্বভাবে
মিশে সব লোভপ্রেমযুক্তিহীন ধুলো হ'য়ে যাবে
প্রকৃতির কতো শত অনন্ত অমিয়ে।

## নিবিড়তর

হৃদয়ে যে-স্রোত আছে অন্ধকারে লীন
হ'য়ে আছে ভেবে মন উড়ে যায় যেন নভোহাঁস;

দেখেছি মানবদের বিবরণে বার-বার হয়।

মনে হয় যেন মানুষের মন তবু
দুই কালো বালুতীর ভেদ ক'রে ফেলে
চলেছে নদীর মতো–
চারিদিকে জনতার সকাতর কোলাহল, ঘর বাড়ি সাঁকো
জন্তুর ও মানুষের করুণ পায়ের চিহ্ন প্রশ্নের চিহ্ন সব
পরিতৃপ্ত ক'রে দিতে গিয়ে রূঢ় ইতিহাসধারাকে করেছে অনুভব।
চলতির চোরাবালি ভেদ ক'রে পাতালের সূর্যালোকে মানুষের মন
আলো ভালোবাসা চেয়ে ভুল ক'রে ঘোরে কি এখন ?–
পাখির সঙ্গীত এক মুক্ত সমুদ্রের শব্দ দীপ্ত সূর্য কাছে
আছে তবু সে-নদীর যতো দিন না থেমে চলার শক্তি আছে।

## রশ্মি এসে পড়ে

রশ্মি এসে পড়ে– ভোর হয়,
ঝেঁজে ওঠে পাপীতাপীদের গালাগালি;
চারিদিকে মানুষের মৃত্যু হয় মাছির মতন;
মনে হয় অন্তরীক্ষে সৃষ্টির মরালী
হ'য়ে যেতে– তুমি যদি সে-রকম আশ্বাসের দেশে

র'য়ে যেতে; কিন্তু তুমি আমি
আজকের চেতনার ইতিহাসবহনের পথে
রক্তাক্ত নদীর অনুগামী
নদীর ভেতরে অন্য স্বচ্ছতার যে-অনুশীলন
মাঝে-মাঝে দেখেছি তা ইতিহাসে প্রেমিকের মন।

## যাত্রা

কতোদিন হ'য়ে গেলো–
কতোবার কাঁচা ধান কার্তিকের সূর্যে গেলো পেকে;
পউষের চাঁদে প'ড়ে ঝ'রে গেলো,
খড় শুধু পৃথিবীর মুখখানা ঢেকে
র'য়ে গেলো; আবার খড়ের দিন এলো;
অঘ্রান চাঁদের শাদা ঠাণ্ডা শরীর
আবার দাঁড়ালো এসে এই পৃথিবীর
শূন্য প্রান্তরের পাশে।

চোখ না চাইতে বিশ-পঁচিশ বছর
হ'য়ে গেলো; মহান বলয় নেই, নেই বলয়ান্তর;
কিছু নেই; কতো পাখি ছেড়ে গেছে এই শিশু জামরুল বন;
আজকের ঘুঘু ফিঙে নীলকণ্ঠ পাখি-- তবু সেইসব অন্তর্হিত পাখির মতন
তাদের ভিতরে যেন কবেকার আলোকের দৌত্য আর নেই;
কোথায় হারালো সব-- মননের মুহূর্তের বাতি নেভাতেই
পঁচিশ বছর আগে পৃথিবীতে;
প্রতিশ্রুতি একদিন ছিলো। তবু চারিদিকে অন্য সূচনার
অস্পষ্ট গ্লানির শব্দ শোনা যায় আজ;
নির্বিচারে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ফেলে তবুও আবার ইটপাথরের ঢিবি
গড়ে ওরা বন্দরের নগরের;
একদিন ধানখেত মাঠ চাঁদ এঞ্জিন ডাইনামো প্রপেলারের পৃথিবী
আরেক রকম যেন পরিণতি চেয়েছিলো এই :
চিল হরিয়াল ভোররাত্রির যাত্রীর এয়ারোপ্লেন মেঘে
ঘর বাড়ি সাঁকো স্তম্ভ মানুষের আসাযাওয়া সারাদিন জেগে
কাজ ক'রে গেলে ব্যাপ্ত সময়কে সব
নীরবে গোছাতে দিয়ে তবু যা সত্য হ'য়ে ফলে
হৃদয়ে জ্ঞানের দেশে-- সে-প্রতিভা আভা প্রেম আশা;
নষ্ট হয়েছে; আছে যাত্রা-- যাত্রা-- এখনো যাত্রার ভালোবাসা।

## সূর্য নিভে গেলে

সূর্য, মাছরাঙা, আমি

উত্তীর্ণ হয়েছে পাখি নদী সূর্যে অন্ধ আবেগের
দু-মুহূর্ত আনন্দের পরীক্ষায় বুঝি।
তারপর লাল নীল কমলা পালকের পরে ঠিকরিয়ে রোদ
নিভে গেছে; আমি কেন তবু সূর্য খুঁজি।

তুমি

জানি না কোথায় তুমি-- সূর্য নিভে গেছে;
তোমার মননে আজ স্থির
সন্ধ্যার কুমোর পোকা-- বাঁশের ছ্যাঁদায় ঘুণ--
শাদা বেতফলের শিশির।

আছে

'নেই-- নেই--' মনে হয়েছিলো কবে-- চারিদিকে উঁচু-উঁচু গাছে,
বাতাস ? না সময় বলছে; 'আছে, আছে।'

## অঘ্রান রাত

অনেক-অনেক দিনের পরে আজ
অন্ধকারে সময়পরিক্রমা
করতে গিয়ে আবছা স্মৃতির বইয়ের
পাতার থেকে জমা–
খরচ সবি মুছে ফেলে দিয়ে
দানের আয়োজনে নেমে এলো,
চেয়ে দেখি নারী কেমন নিখুঁতভাবে কৃতি;
ডানা নড়ে, শিশির শব্দ করে
বাহিরে ওই অঘ্রান রাত থেকে;
এ-সব ঋতু আমার হৃদয়ে
কি এক নিমেষনিহত সমাহিতি
নিয়ে আসে; ভিতরে আরো প্রবেশ ক'রে প্রাণ
একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি
লীন দেখেছে, গভীর পাখির গভীর বৃক্ষ তুমি।

## যাত্রী

মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ
হ'য়ে গেলে র'য়ে যায় চারিদিক ঘিরে এই দেশ;
নদীমাঠ পাখিদের ওড়াউড়ি গাছের শিয়রে
কমলা রঙের ঢেউয়ে এসে কিছুক্ষণ খেলা করে।

মনে হয় কোথাও চিহ্নিত এই রৌদ্র ছিলো কবে;
মানুষ সার্থক নয়– তবুও সার্থকতর হবে :
মনে হতো কাজ করে কথা বলে গ্রন্থ মিলিয়ে,
মননের তীর থেকে আরো দূর তীরতটে গিয়ে।

সময় নিজেই তবু সবচেয়ে গভীর বিপ্লবী
ফুরিয়ে ফেলেছে সেই দিনরাত্রি সেরা সত্য উদ্‌ঘাটন সবি,
সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তেজিত রক্ত স্থির
ক'রে [illegible] অন্য সব কলেবরে গড়েছে শরীর।
বাহিরে [illegible] লীন হ'য়ে থাকে মন,
শান্ত– [illegible] হয় অন্তঃকরণ;
[illegible] চারটে পশ্চিমের আঁধারের কাছে;
সব [illegible] যাত্রা– যাত্রা-যাত্রা-যাত্রা আছে।

## হৃদয় তুমি

হৃদয় তুমি সেই নারীকে ভালোবাসো তাই
আকাশের ওই অগ্নিবলয় ভোরের বেলা এসে
প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে অমেয় কাল হৃদয়সূর্য হবে
তোমার চেয়েও বেশি সেই নারীকে ভালোবেসে।
বাসুক– তবু সবের চেয়ে আলোর কথা এই :
আমি তাকে সময়পরিক্রমার পথে আবছায়াতে দেখে
নিজের মূল্যে র'য়ে গেছে ব'লেই ভালোবাসি।
শরীর ঘেঁষে ভালোবাসে তবু তো অনেকে।

কাজ-অকাজের ঠাসবুনোনির ফাঁকের থেকে আমি
দেখেছি আমায়, দেখেছি যেন বিকেলবেলার জলে
থমকে ভাসা মেঘের মতো নীলাকাশের পথে
থেমে আছে; অথবা থেমে চলে
জানি না মেঘ; ভালোবেসে অথবা কুতূহলে
জানি না নারীসূর্য আমায় আলোকিত ক'রে
নিজের অন্তকক্ষে নেমে সূর্যপ্রক্রিয়ায়
চ'লে গেছে কাদের ভিতরে।

যে যার নিজের বিহিত কাজে। সকলি ঠিক– এইরকমভাবে
সারাটি দিন আমার হৃদয় ব্যাপ্ত ক'রে রাখে।
স্বতই আমি যে-গাল-তিল যে-হাত ভালোবাসি
রাত্রি হ'লে সে-হাত– সেই সুদূর হাত এখনো আমাকে
জানি না বিশ্বশৃঙ্খলাকে আঘাত ক'রে ভালোবাসে কিনা:
সীমা সময় প্রকৃতি তাতে চূর্ণ হ'য়ে যেতো;
সকলি তবু স্থির রয়েছে– এই স্থিরতা তবু
তোমার আমার অজাত সব শিশুরো অভিপ্রেত

## এই পৃথিবীর

এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে:
অঘ্রান মাস রাত্রি হ'লে অনেক বিষয়বিষের সমাধান
মাঠে জলে পাখির নীড়ে নক্ষত্রেতে থাকে:
অমেয় গোলকধাঁধায় ঘুরে প্রাণ
চেষ্টা করে সমাজ জাতি সময় সৃষ্টি সঠিক বুঝে নিতে।
সকল প্রয়াণ সফল হবে গ্লাশিয়ারের দীপ্তি আসার আগে:
এখন রৌদ্রে আজন্মকাল অনুষ্ঠানের দিন:
সফল হ'তে ইতিহাসের অনেক দিন লাগে।

আকাঙ্ক্ষার সে-সব আবেশ
নেই আজ; বললে, 'কাঁকররাঙা পথ এই– এই পথ গেছে কতো দূর ?
শুকনো জামপাতাগুলো প'ড়ে আছে– এইসব পাতা আমি ভালোবাসি,
অঘ্রান মাসের গন্ধ লেগে আছে এসব পাতায়
মাটি আর সূর্যের।– বাসনায় শুধু ক্লান্তি– আজ মনে হয়–।'
হাত তার মনে হলো ভিজে-হিম এক-আধ মুহূর্তের ছোঁয়ার ভিতর:
উষ্ণতা নেইকো চোখে– শান্ত আলো– দু-একটা ঝরা পাতা আধো-খসা বিনুনির 'পর
প'ড়ে আছে;–
আমাকে সে : 'চলো ওই ভরা ঘাসে ওইখানে প্রান্তরের পথে;
কমলা রঙের মেঘে নরম আলোর ওই নিজের জগতে':
আকাশের থেকে যেন ধীরে-ধীরে শান্তি ঝরে– পৃথিবীর বুকে যেন ধীরে;–
দেখলাম শাদা হাত– কেমন সম্পন্ন হিম– স্নিগ্ধ সব রোমকূপ– নিখুঁত শরীরে
স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে ফেলে রক্তের ইঙ্গিত মুখে গালে
নেই আজ; হৃদয় শান্ত স্থির;– পৃথিবীতে যেন কোনো কালে
রাত্রি ও ভোরের স্বচ্ছ সত্য যাতায়াত ছাড়া নেই আর কিছু;
দুজনে মাঠের পথে নেমেছি– হাঁটছি– চেয়ে দেখলাম মুখখানা নিচু;
দেখছে পথের দূর্বা ধুলো টিবি পাতা ঝাউফল;
তাকাতেই মৃদু হেসে ঘাসের কোলের থেকে লুটোনো আঁচল
তুলে শিশিরের জলে চললো মুছে ধীরে
প্রকৃতির পূর্ণ দানশীলতার মতো তার গভীর শরীরে
পাশাপাশি হাঁটছিলো।– তখন নক্ষত্র ঢের এসেছে আকাশে।
আমার হৃদয়ে প্রেম– ধীরে-ধীরে বাসনার নিশ্চয়তা আসে।
হয়তো তা বুঝেছে সে– তবু তার দিক থেকে যে-চেতনা সাড়া
পেলে অর্থ পেয়ে যেতো মানুষ মৃত্যুর অর্থ ছাড়া
সে-প্রেম শরীর থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে আজ তার;
গেছে যে জানে না তা সে;– এই মাঠ রাত্রি প্রকৃতির স্নিগ্ধতার
চেয়ে কোনো অন্য অপরূপ মূল্যে আলো
বেশি যদি থেকে থাকে তার চেয়ে ভালো
সেই জ্ঞান আমার এ-হৃদয়ের নিজের অমতে
তবু মুছে পাশাপাশি হেঁটে চলা নক্ষত্র ও শিশিরের পথে।

## মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে
চারিদিকে রক্ত ঋণ গ্লানি ধ্বংসকীট নড়ে-চড়ে।
তবুও শিশির সূর্য নক্ষত্র নিবিড় ঘাস নদী নারী আছে;
হারিয়ে যেতেছে প্রায় আজ।
মানুষের সাথে মানুষের প্রিয়তর পরিচয়

নেই-নেই আর:
আলো আছে তবুও আলোয় ভ'রে রয়েছে অনন্ত অন্ধকার।

## কে এসে যেন

কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিলো বাতি,
বললে, 'আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী
তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে:
তবুও দূরে স'রে গিয়ে তুমি
হারিয়ে যেতে চাও কি আত্মপ্রশ্নে ঘুরে-ফিরে ?
অথবা জনগণসেবার ভিতরে শিশিরে
লুপ্ত ক'রে দেবে কি জ্ঞানকামীর মরুভূমি ?
সবের উপর সত্য আগুন– অমেয় মোম শুধু,
আর সকলি শূন্য আশা, অন্ধ অনুমিতির মতন ধু-ধু।'

## নদী নক্ষত্র মানুষ

'এখানে জলের পাশে বসবে কি ? জলঝিরি এ নদীর নাম;
অপরূপ; আমি তবু ঝাউবনী বলি একে'– আস্তে বললাম।
নদীর দুপারে ঢের উঁচু-উঁচু ঝাউবন, নীড়–
চুপচাপ ঘাসের উপরে ব'সে কিছুক্ষণ তারপরে আমরা দুজনে
কোনো কথা খুঁজে তবু পেলাম না আর যেন–
নদী যেন ঢের দূরে– আমাদের মনে
এ-মুহূর্ত এ-আকাশ নেই আর আজ;
বিষণ্ণতা : তাও নেই– পাতা ঝরবার
স্বর শুনি, ঢেউ নড়বার শব্দ পাই;
এই পৃথিবীতে যেন কিছু নেই আর।

একদিন– জানি আমি– সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিলো আমাদের মনে;
'নক্ষত্রের নিচে শিশিরের গল্প শোনায়েছি শুনেছি দুজনে
চোখাচোখি ব'সে থেকে; হাতে হাত নিশ্বাসে নিশ্বাস
না জানতে মিশে গেছে– যেমন মাটির গন্ধ হৃদয়ে ফোটাতে চায় ঘাস,
ধান খই দূর্বাঘাসে যেমন মাটির ইচ্ছা নিজেকে রাখতে চায় ঢেকে
একদিন পৃথিবীর বিলোড়ন রৌদ্র রক্ত আহ্বানের থেকে
দূরে স'রে প্রেম আর আকাঙ্ক্ষার ঘরে ব'সে আমাদের ব্যাপৃত হৃদয়
আকাশ ও এ-মাটিকে পেয়েছিলো এক তিলে–' বললাম; আস্তে তখন
সে বললে– 'শেষ সত্য নদী নয়,– মন–'

তবুও মাটি মাটির মুখে অমৃতঘাস আছে
জলে মানুষ নিজেরই হাত রেখেছে সজল;
ভাবনা ভাষা আবেগ কথা কাজ
নতুন নতুন চেতনা ও সংজ্ঞা হৃদয়মন

দাগ রেখেছে দিন রজনীর কুরুক্ষেত্র ক্রীস;
মহাইয়োরোপের আমেরিকার ক্রান্তি গ'ড়ে
ইতিহাসের অনেক পর্ব ছুঁয়ে গেলো, তবু
এখনো সে মরুভূমির তোরে

দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ একখানা মেঘ চায়;
হৃদয়ে তার ভালোবাসার মেঘ কি তবু আছে ?
মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো ধার-ধার
তপ্ত হ'য়ে জাগছে হরিৎ নব হরিৎ গাছে।

## দেশ কাল সন্ততি

চারিদিকে আছে ধাত্ত নদীদের ক্ষণ
হৃদয়ের আত্মীয় নারীর মতন;
পক্ষীটিল উড়ে যায় ঘরে ফিরে আসে;
ডানার ছায়ার শব্দ ঘাসে।
এক পৃথিবীর ধর্ম নষ্ট হ'য়ে গেছে,
অন্য পৃথিবীর বুদ্ধি অন্নের সন্ধানে;
ইতিহাস কোনোদিনি নির্দোষ নয়;
কাজ ক'রে চলেছে সন্ধানে।
তবু সেই ভয়াবহ সময়ের থেকে
ক্লান্ত ধার্থ পৃথিবীর ব্যক্তিদের ডেকে
জীবনের জন্য কোনো স্নিগ্ধ, কোনো স্থিরতর স্থল
পেতে হ'লে অবেধণ হবে কি নিষ্ফল ?

জলের কথায় রৌদ্রে আকাশের মহাসমাতনে
নক্ষত্রে মিলিয়ে দিয়ে চেতনার অন্তঃশীল আলো
হয়তো বেদনা রক্তে জন্মাধীন মানুষের নষ্ট ইতিহাস
হ'তে পারে- মাঝে-মাঝে হ'তে পারে ভালো।

## দুটি তুরজম

আকাশে সমস্ত দিন আলো;
পাতায় পাতায় রোদ ঝিকমিক করে;

জলগুলো চ'লে গেছে চেনা পথ ধ'রে
অবিরল আরো দূর জলের ভিতরে।

যদিও গভীরভাবে সময়ের সাগর উজ্জ্বল
কি এক নিঃশব্দ নিবিড় আবেগে তাকে কালো
দুটি তুরঙ্গম যেন অনন্তের দিকে টেনে নেয়;
নিরন্তর এ-রকম অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া ভালো।

অনেক আঁধার আলো দেখেছি, তবুও
আরো এক ঘড়ো আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীরভাবে বোধ করে মন
আকাশে প্রান্তর পথ নক্ষত্রলোকের দিকে দিয়ে।

সারাদিন এঁকেবেঁকে নদীটির ঢেউ
মিশে যায় শাদা কালো রঙের মাঝারে;
সারাদিন মেঘ পাখি উঁচু-উঁচু গাছ
যেন প্রায় সূর্য স্পর্শ করে।

মৌমাছি রৌদ্র নারী শরীর ও মন
মুহূর্ত ও মহাকাল দুজনের কাছে
বার-বার ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিপরিধির
ভিতরে নিবিড় অগ্নিশিখা হ'য়ে আছে।

সব শেষ হ'য়ে গেলে তারপর থাকে
এতোদিন যা জেনেছি তার চেয়ে ভালো
সমস্ত দিনের সূর্য... আর সেই সূর্যের বিদায়,
আঁধারের রঙে মাখা নক্ষত্রের আলো।

দগ্ধ বন্দর দিক জলতার পথে
অতি রক্ত ভালোবাসা বাধা জ্ঞান দাও
ভালো, তবু সেইসব স্থিরতর ক'রে নিতে হয়;
প্রকৃতি মানুষ আর সময়ের নিজের খতাব,

জেনে নিতে হয় নদী প্রান্তরের ঘাসে;
এ-ছাড়া আর কি সত্য ইতিহাস জানে?
কিছু গ্রন্থ রীতি চিন্তা... দু-একটি নক্ষত্র নারীর
দিকে চেয়ে বোঝা যায় জীবন ও মৃত্যুর মানে।

## নব-নব সূর্যে

মানুষ সার্থক হয় মাঝে-মাঝে, তবু
কতো তার নিষ্ফলতারাশি
এখনো উজ্জ্বলতর ব'লে মনে হয়
মৃত ম্যামথের পাশাপাশি
মানবকে, তবুও নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তির জীবন
চারিদিকে ক্ষয় হ'য়ে আসে;
সকালের সম্ভাবনা মানুষকে সচকিত করে;
আলো ঠিকরালে তবু চোখে এসে পড়ে
শেষ শূন্য– কিছু নেই, বিকেল নিভছে।
যারা আশা করেছিলো, কিংবা যারা আশা
করে নাই, যারা প্রাণে ভালোবাসবার
জ্ঞানী পরিভাষা
আয়ত্ত না ক'রে তবু প্রেম
চেয়েছিলো প্রিয় নরনারীদের কাছে
যারা শুধু বাঁচবার পথ চেয়েছিলো...
শিশিরে নিঃশব্দ হ'য়ে আছে।

সাধনায় হয়তো বা সত্য শুভ লাভ
হ'তে পারে– এরা কেউ-কেউ
সেই আভা দেখেছিলো, তবু
অন্ধ অন্নসমস্যার ঢেউ
এসে সব মুছে ফেলে গেছে
ঘর বাড়ি সাঁকো মাঠ পথ
একদিন আধ দিন ভাঙাগড়া হ'তে-না-হ'তেই
চিহ্ন নেই– সে-সব মানুষ কেউ নেই।

জীবনের ঢের কাজ হ'য়ে গেলে তবু
ভাঙনের নদী এসে সমাজের দুই পার ক্ষয়
ক'রে তার অন্ধকার সমুদ্রের দিকে
ভেসে চ'লে গেছে মনে হয়।

তবু গঠনের কাজে ফিরে এসে মানুষের মন
আগেকার গ্লানিমায় যে-নিষ্ফালন
বার-বার শেষ ক'রে দিতে চায় তার
সূচনায় আলো তবু ভিতরে গভীর অন্ধকার ?

অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে ভুলে বিলোড়িত হ'য়ে

রাত্রিদিন কাজ ক'রে চলেছে লোকের ইতিহাস;
মানুষ সমাজ দেশ ধ্বংস ক'রে তবু
জ্ঞান শান্তি বাস্তবতা প্রেমের আভাস

মাঝে-মাঝে পাওয়া যায় যেন তার বিদ্যুতের কাছে;
যদিও আঁধার বড়ো– ইতিহাসে শোকাবহ অন্ধ বেগ আছে;
সংকল্প প্রেরণা মূল্য উদাসীন শক্তির মতন
ভেঙে– নব-নব সূর্যে আলোকিত ক'রে তোলে মন।

## একটি নক্ষত্র আসে

একটি নক্ষত্র আসে; তারপর একা পায়ে চ'লে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারা ভরা রাতে
সে আসবে মনে হয়; আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে !
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বর তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হ'তে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয়;
শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহের আলোড়নে
অঘ্রানের রাত্রি হয়;
এ-রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড়;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

## শতাব্দীর মানবকে

চারিদিকে কঠিন পটভূমি,
তার ভিতরে চলেছো আজো তুমি;
দু-হাত দিয়ে মরণনদীর জল
সরিয়ে তুমি দেখেছো তার ফল
আবার আদি মরণে গিয়ে মেশে।

তবু সে বিনাশ এখনো দূরে আছে,
ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসে কাছে,
যেটুকু সময় রয়েছে তার ফাঁকে
এ-দানবীয় অপপ্রতিভাকে
মানুষ ছাড়া ঘোচাবে কে আর এসে।

এরিয়েলের মতন আলোর-কালোর কিনার দিয়ে
কেবলি আশা— গভীর আশার বার্তা জাগিয়ে
নতুন আলো নতুন আকাশভাষা
মহাইতিহাসের ভালোবাসা
আনবে না তার রক্তক্ষয়ের শেষে ?

কালের আলোয় দাঁড়িয়ে আছো ঘুমের চোখেই;
ইতিহাস বলেনি : ঘুম নেই ?
বিষয় আর হৃদয় শাদা-কালোর সাগরের
অসীম শাদা ? অসীম কালো ? পেলে না কিছু টের;
চলেছো তাই সকল প্রশ্ন-নির্বাপণের দেশে।

চিহ্ন শেষ করার আগে তবুও একবার
ফুরিয়ে দাও আজ পৃথিবীর মৃত্যুশীলতার
পণ্য গ্লানি নিষ্ফলতা মনে :
মানুষি সত্য বিশালতর আলোর প্রয়োজনে
চারিদিকের অন্ধ নদীর অসীম উন্মেষে।

## পটভূমি

আকাশ ভ'রে যেন নিখিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা
জেগে আছে কূলের থেকে কূলে;
মানবজাতির দু-মুহূর্তের সময়-পরিসর
অধীর অবুঝ শিশুর শব্দ তুলে
চেয়ে দ্যাখে পারাপারের ব্যাপ্ত নক্ষত্রেরা
আগুন নিয়ে বিষম, তবু অক্ষত স্থির জীবনে আলোকিত।
ওদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন হ'য়ে তবু
মানুষ আজো স্বাধীনতার মূল্য শেখেনি তো।

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিলো
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা
আমাদের আজ এসেছে যেই বিষম ইতিহাসে—

সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে পরস্পর
রয়েছে ব'লে কখনো পরিবর্তনীয় নয় ?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হ'তে ;
অনেক দীর্ঘ অসময়  অনেক দুঃসময় .

চারিদিকে সৈন্য বণিক কর্মী সুধী নটীর মিছিল ঘোরে;
তাদের সবের সহগামীর মতো
ইতিহাসের প্রথম উৎস থেকে
দেখেছি মানুষ কেবলি ব্যাহত
হ'য়েও তবু ভবিষ্যতের চক্রবালের দিকে
কোথাও সত্য আছে ভেবে চলেছে আগ্রাণ :
পটভূমির থেকে নদীর রক্ত মুছে-মুছে
বিলীন হয় যেমন সেসব পটভূমির স্থান।

## জর্নাল : ১৩৪৬

আজকে অনেকদিন পরে আমি বিকেলবেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে;
শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে– নেভে;
এখন অব্যক্ত ঘুমে ভ'রে যায় কাচপোকা মাছির হৃদয়;
নদীর পাড়ের ভিজে মাটি চুপে ক্ষয়
হ'য়ে যায় অক্লান্ত ঢেউয়ের বুকে;

ঘাসে ঘুমে শান্ত হ'য়ে আসে ঘুঘু শালিকের গতি;
নিবিড় ছায়ার বুকে ক্রমে-ক্রমে পায় অব্যাহতি
মাঠের সমস্ত রেখা;
ঝাউফল ঝরে ঘাসে– সান্ত্বনার মতো এসে বাতাসের হাত
অশ্বত্থের বুক থেকে নিভিয়ে ফেলছে খাড়া সূর্যের আঘাত;
এখুনি সে স'রে যাবে পশ্চিমের মেঘে।
গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠো পথে জামরুলছায়ার নিচে নদীর সুমুখে
কতোক্ষণ থেমে আছে; চেয়ে দ্যাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া:
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধ'রে সেও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে;

এইসব নিস্তব্ধতা শান্তির ভিতর
তোমাকে পেয়েছি আজ এতোদিন পরে এই পৃথিবীর 'পর।

দুজনে হাঁটছি ভরা প্রান্তরের কোল থেকে আরো দূর প্রান্তরের ঘাসে;
উস্‌খুস্‌ খোঁপা থেকে পায়ের নখটি আজ বিকেলের উৎসাহী বাতাসে
সচেতন হ'য়ে উঠে আবার নতুন ক'রে চিনে নিতে থাকে
এই ব্যাপ্ত পটভূমি: মহানিমে কোরালির ডাকে
হঠাৎ বুকের কাছে সব খুঁজে পেয়ে।
'তোমার পায়ের শব্দ', বললে সে, 'যেদিন শুনিনি
মনে হতো ব্রহ্মাণ্ডের পরিশ্রম ধুলোর কণার কাছে তবু
কিছু ঋণী; ঋণী নয় ?
সময় তা বুঝে নেবে...
সেইসব বাসনার দিনগুলো, ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেইদিন:
মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কি যে :
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।'

স্পষ্ট চোখ তুলে সে সন্ধ্যার দিকে : 'কতোদিন অপেক্ষার পরে
আকাশের থেকে আজ শান্তি ঝ'রে অবসাদ নেই আর শূন্যের ভিতরে।'
রাত্রি হ'য়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতন
কি-এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হ'য়ে আছে এই মহিলার মন।
হেঁটে চলি তার পাশে, আমিও বলি না কিছু, কিছুই বলে না;
প্রেম ও উদ্‌বেগ ছাড়া অন্য-এক স্থির আলোচনা
তার মনে– আমরা অনেক দূর চ'লে গেছি প্রান্তরের ঘাসে,
দ্রোণ ফুল লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার– নিম-আমলকীপাতা হালকা বাতাসে
চুলের উপরে উড়ে-উড়ে পড়ে– মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভরে,
কঠিন এ সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে করে।

অন্ধকার থেকে খুঁজে কখন আমার হাত একবার কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখে দিলো তার : 'রোগা হ'য়ে গেছো এতো– চাপা প'ড়ে গেছো যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি–' ব'লে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে;
শান্ত মুখে– সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই– হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হ'য়ে গেছে কবে তার;
নক্ষত্রেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।

## মৃত্যুসাগর সরিয়ে সূর্যে বেঁচে আছি

মৃত্যুসাগর সরিয়ে শূন্যে বেঁচে আছি, তোমায় ধন্যবাদ।
হে হেমন্ত, মাছি ফড়িং রোদের ভিতর দেয়ালি পোকা উড়িয়ে দিয়ে তুমি
এ-ওড়া যে আবছা ক্ষণিক, মানুষের সেই কথা ভাবিয়েছো।

ইতিহাসের অনেক স্তরেই মৃত্যু মরুভূমি
র'য়ে গেলেও মানুষ বিশাল বয়ঃপ্রাপ্ত অন্ধকারে আজ,
নিজের প্রাণশক্তি সর্বস্বান্ত ক'রে আলো
যেমন চাইছে সময়– মানবমনে সূর্য কেবলি ক্ষয় হ'য়ে
তবুও নিখিল প্রাণের বৃক্ষ স্নিগ্ধ করে আলো
পাখি পতঙ্গ জল
খেলছে যে যার সেইসবেরি অবোধ অসীম কালো

## রবীন্দ্রনাথ

'মানুষের মনে দীপ্তি আছে
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর–'
এ-রকম কথা যেন শোনা যেতো কোনো একদিন,
আজ সেই বক্তা ঢের দূর

চ'লে গেছে মনে হয় তবু;
আমাদের আজকের ইতিহাস হিমে
নিমজ্জিত হ'য়ে আছে ব'লে
ওরা ভাবে লীন হ'য়ে গিয়েছে অন্তিমে

সৃষ্টির প্রথম নাদ– শিব ও সৌন্দর্যের;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসে।

## কখনো নক্ষত্রহীন

কখনো নক্ষত্রহীন কুয়াশার রাতে
বাইরের ঝড়ের ঝাপসা আলোড়নের
অন্ধকার থেকে পাখি বাতির আলোয় উজ্জ্বল
ঘরের ভিতর ঢুকে দু-মুহূর্ত ব্যথা চিন্তা ভালোবাসা-ভরা
মেঝেয় লক্ষ্মীর আলপনা মেয়েদের
দেয়ালে ফ্রেস্কোর মূল্য বুঝে নিতে চেয়ে
ধুকধুকে বুকের অনন্ত শূন্যে তার
টের পায়– টের পায় যদি
একটি বিদ্যুৎ শুধু মানুষের মতো চেতনার
দ্যাখা দিয়ে মিলোবার আগে

হাত ধ'রে যত দূর পারিনি যাইনি সে যাবে;
অনিও অনেকদিন পরে আজ তোমার সন্ধানে;
তোমার-আমার... এই পৃথিবীর কারণের নিচে চেয়ে আছি;
জল নয়— কোনো নিরালা নয়— দু-জনের খুব কাছাকাছি
জলে নয়,— শুধু সময়ের পাতা-কারণের সাথানে
জল যেন ক্রমে শূন্য অন্ধ হ'য়ে যায় :
তোমাকে-আমাকে স্থির নিষ্পলক করে :

## মরুতৃণোজ্জ্বলা

তোমাকে বোঝে না কিছু মনে;
হৃদয় রয়েছে ব'লে জীবনের মতন আবেগ
হৃদয়ের সত্য উজ্জ্বল কথা নয়,—
যদিও তোমাতে আছে জলজ্বলাতে কেবলে বোধ;
হে প্রেমিক, আত্মবিস্মৃতির কি তুমি ?
বোধ : বোধ, হৃদয় : আর মরুভূমি শুধু মরুভূমি।

এ-বিশ্বের এই শুধু ধূর্ত সমাধান;
বাকি সব অমিমাংসা, শূন্য, অন্ধকার;
তবু এই সমাধানে তোমাতে কি এ নাই !
নিশ্চিতের পাশাপাশি দ্বিতীয় আকার
অন্য-এক নিশ্চিতের— অন্য-এক নিশ্চিতের তুমি;
বোধ : বোধ, হৃদয় : হৃদয়, আর মরুতৃণোজ্জ্বল মরুভূমি।

## জলতারকা

মাথার উপর দিয়ে ভেসে যায় দিন—
তুলনে আমার উপরে বয়ে নীল,
সমস্ত আকাশ
আমার পায়ের নিচে পৃথিবীর ঘাস,

আমার চোখের পথে অনন্ত রোদ্দুর
মনে হয় যেন সময়ের অন্তপুর
ছড়িয়ে তোমাতে তার সব কটি মাস,
হ'য়ে আছে অসীম সকাল।

আমার বুকের কাছে নদী

[illegible]

[illegible]

## সে

অকারণে সে [illegible] :
বলেছিলো : 'হে নদীর জল
তোমার স্রোতের মতো সুর তোলো;
সব কুটিল [illegible] স্রোত
[illegible] পড়ুক
এই নদী কুটিল '

'এর নাম [illegible] বুঝি ?
মাছরাঙাদের কলরব;
পটের মেয়েটি এর [illegible] নয় ;
আজো আমি মেয়েটিকে খুঁজি;
জলের অপর [illegible]
কোথায় সে চ'লে গেছে মেয়ে

সময়ের অবিরল শব্দ আর কাল
বুলেটের ক্ষত [illegible] এর
মাছ আর মন আর মাছরাঙাদের আনাগোনা
চের আগে নদী এক— তবু [illegible]
ভালোবেসে [illegible] আর [illegible]
না হ'য়ে বরং হ'তে [illegible] নদী ;

## মহাইতিহাস

জীবনে কখনো প্রেম [illegible] বুঝি;
দূরে কাছে মানুষের সঙ্গে সঙ্গম
[illegible] এক [illegible],
মন স্থির ক'রে কিছু জ্ঞান সত্য লাভ
সেসব [illegible] দিন আজ

গ্রাস ক'রে সংসার সমাজ
বিকেলের অন্ধকারে ক্ষয়
পায়– তবু হৃদয় উন্মুখ মনে হয়।

সেসব মানুষ নারী নদী চিহ্ন সুর
এখন কোথাও নেই আর;
চারিদিকে কোলাহল ভেদ ক'রে ম্লান স্তম্ভ এক
দাঁড়িয়ে রয়েছে শূন্যতার।
আমিও এ-নৈষ্ফল্যের অন্ধ একজন
নির্মতার দূষণীয় শক্তির মতন
এ-যুগের পরিণাম বহনের পথে
সত্য পাবো ভাবি খণ্ড সত্যের জগতে।

আঁধার দেখেছি, তবু আছে অন্য বড়ো অন্ধকার;
মৃত্যু জেনেছি, তবু অন্য সম্মুখীন মৃত্যু আছে;
পেছনের আগাগোড়া ইতিহাস র'য়ে গেছে, তবু
যেই মহাইতিহাস এখনো আসেনি– তার কাছে
কাহিনীর অন্য অর্থ, সমুদ্রের অন্য সুর, অন্য আলোড়ন
হৃদয় ও বিষয়ের; মন এক অন্য দীপ্ত মন।

## লক্ষ্য

এখানে অর্জুন ঝাউয়ে যদিও সন্ধ্যার চিল ফিরে আসে ঘরে
যেতে আর সাধ নেই পৃথিবীর ঘরের ভিতরে।
একে-একে নক্ষত্রেরা দ্যাখা দেয়– লিচু গাছে পেঁচা নেমে আসে;
গোরুর গাড়ির ঘুন্টি সাড়া দিয়ে চ'লে যায় সন্ধ্যার বাতাসে;
আস্তে যাচ্ছে গাড়ি আকাশ প্রান্তর ভেঙে মৃদু বাতি নিয়ে–
চুপে-চুপে কুয়াশায় যাচ্ছে মিলিয়ে;
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে তার– মুখে তার শান্ত অন্ধকার;
ভালো: তবু আরো কিছু চাই আজ পৃথিবীর দুঃসহ ভার
বইবার প্রয়োজনে; তবুও মানবজাতি রক্তস্রোতে বার-বার শক্তিশালী নদী
না হ'য়ে এ-স্নিগ্ধ রাত্রি– শান্তপথ হ'য়ে যেতো যদি।

## রাত্রিদিন

একদিন এ-পৃথিবী জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষায় বুঝি স্পষ্ট ছিলো, আহা;
কোনো এক উন্মুখ পাহাড়ে
মেঘ আর রৌদ্রের ধারে

ছিলাম গাছের মতো ডানা মেলে– পাশে তুমি রয়েছিলে ছায়া।

একদিন এ-জীবন সত্য ছিলো শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম– তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেলো হায়!

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
ক'রে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে-অনন্ত নিয়ে নয়।
তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ-হৃদয়।

## তোমাকে

ভেবেছিলাম এ-কথা স্থির মেনে নিতে পারি :
নিউট্রন্ ও ইলেকট্রনের অন্ধ সাগরে
ওদেরি জাদুবলে তুমি হয়েছো আজ নারী;
ওদেরি দয়ার ফলে আমি প্রেমিক তোমার তরে।

তবুও এ-ভুল হৃদয়ঙ্গম– মহাসৃষ্টির মানে
হয়তো ঠিক এমনভাবে উৎসারিত নয়।
তা যদি হতো তবে যেদিন নিজেরি পরামর্শে সজ্ঞানে
আমাকে তুমি দিয়েছিলে অব্যর্থ হৃদয়
সে-স্বাদ হ'য়ে যেতো কি আজ হেমন্তে আবার ক্ষয়।
শীতের পড়ি-পড়ি বেলায় ফসল কেটে নিচ্ছে চাষা ঘরে:
নদীর বুকে প্রকৃতি জল রেখেছে, তবু রক্তের উদয়
এসে সবি আচ্ছাদিত করে।

আজ শতকে মানুষ নারী শূন্য হ'তে এসে
চলেছে শূন্যে– আঁধার থেকে অপরিসীম আরো
অন্ধকারের ভেতরে গিয়ে মেশে।
এছাড়া কোনো সত্য নেই– উপায় নেই কারো।

এরি ভেতর অন্য এক গভীরতর নিরুপায়তা আছে:
মানুষ ও তার চিরস্থায়ী মানবছায়া ছাড়া

জানে না কেউ: প্রলম্বিত নীল আকাশের কাছে
কোনোদিনো পৌঁছোবে না সাড়া।

তবু সবি ঠিক হয়েছে; কবের আদি পৃথিবী থেকে তুমি
কতো গ্লানি রক্ত আঁধার বিহ্বলতার থেকে
চলেছো আজো তিলধারণের মতন পটভূমি
দান না ক'রে– নিজেরি গালে সে তিলবিন্দু রেখে।

## কোনো এক নারীকে : যে আমাকে আ-ইতিহাস দ্যাখাতে চায়

কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
বঙ্গোপসাগরের কালো বাতাসের কোলাহলকে কেটে ফেলতে পারলো না আর
পাহাড়ের মতো কালো নীল মেঘের শিঙে গুঁড়ো হ'য়ে
নক্ষত্রের ঝর্নার মতো ঝ'রে পড়লো
মৌসুমী সমুদ্রের জমকালো আনন্দের ভিতর
এক-মুহূর্তের শৈশব সৃষ্টি করলো সে
তারপর ডুবে গেলো কোথায়
আমার প্রেম সাহস স্বপ্ন সমারূঢ় কাস্তে চাঁদ
ইতিহাসের হু-হু-হু-হু অন্ধকারের মুখে দাঁড়িয়ে।

## মানুষ যেদিন

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিলো–
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা
আমাদের আজ এনেছে যেই বিষম ইতিহাসে;
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা;
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে গরমিল
রয়েছে ব'লে কখনো পরিবর্তনীয় নয় ?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হ'তে :
এক নিমেষে আলোকবর্ষে ব্যাপৃত সময়।

## জর্নাল : ১৩৪২

হিজল-ঝাউয়ের ডাল জ্বলছে সূর্যের আলোড়নে,
মেঘের পৃথিবী থেকে ছুটি পেয়ে বয়স্কা রূপসী,
আশ্বিন এসেছে নীলকণ্ঠের পালকে শাড়ি ঘ'ষে,

পদ্মের স্তনে– আর ব্যথাতুর মনে।
মাছি রোদ শেফালি মিষ্টি ধান পায়রার ভিড়
সঙ্গে তার– পশ্চিমে মেঘের পিছে সূর্যের হৃদয়
নদী কাশ চোখা বাঁশপাতা থেকে রৌদ্রের ক্ষয়
করলে শাপলার বনে জেগে ওঠে জ্যোৎস্নার শরীর।
চারিদিকে বাড়ি সাঁকো গাছে নীড় উলুঘাসে ঢেউ;
নদীটির চলাফেরা মানবীর মতো;
মনে হয় সৃষ্টির ভেতরে প্রথমত
এ-সব জিনিস ছাড়া ছিলো নাকো কেউ।
এইখানে চিরদিন র'য়ে যাবে সব।
নীলচে ডানার কাক আশ্বিনকে কাছে ডেকে আনে;
তির-চার মাইল খেতে হরিণের প্রাণে
এসেছে অপার ব্যাপ্তির অনুভব।
শূন্য চারিদিকে নীল আকাশের মতো হ'য়ে আসে;
ক্রমেই গভীর নীল ব'লে মনে হয় :
অন্ধ ইলেকট্রন্– তবু অনিশ্চয়তার পরিচয়
নেই তার সনাতন নির্জন প্রকাশে।

## কার্তিক ভোরে : ১৩৪০

কার্তিকের ভোরবেলা কবে
চোখে মুখে চুলের উপরে
যে-শিশির ঝরলো তা
শালিখ ঝরালো ব'লে ঝরে

আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিখ
কার্তিকের রোদে আর জলে
আমারি হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন:
সূর্য ? না কি সূর্যের চপ্পলে

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়
এ-জীবনে ঢের শালিখ দেখেছি
তবু সেই তিনজন শালিখ কোথায়।

## তোমাকে ভালোবেসে

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্মপাতার জল;

তবুও এ-জল কোথার থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চ'লে যায়;
বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।

আমার মনে অনেক জন্ম ধ'রে ছিলো ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছো পদ্মপাতা;
হয়েছো তুমি রাতের শিশির–
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার 'পর;
তবুও পদ্মপত্রে এ-জল আটকে রাখা দায়।

নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল,
তোমার আলোয় আলো হলাম,
তোমার গুণে গুণ;
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ
জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়।

এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল :
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে;
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার– জল নিয়ে তার নড়ে;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

## মহাজিজ্ঞাসা

ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নিচে;
সৃষ্টির মনের কথা সেইখানে আবছায় কবে
প্রথম রচিত হ'তে চেয়েছিলো যেন।
সে-ভার বহন ক'রে চ'লে
আজ কাল অনন্ত সময়
সেকেন্ডে মিনিটে পলে বার-বার ক্ষয়
পেয়েছে; তবুও এই সময়ের অহরহ ক্ষমাহীন গতি
থামিয়ে এ-পৃথিবীতে স্থির কিছু এনেছে কি ?–
যে-স্থিরতা বার-বার দিয়ে যায় রাত্রির নিয়তি,
পৃথিবীর দিন যে' দাহন দেয়,– সেইসব ছাড়া

আরো বড়ো মানে এক– মহাপ্রাণসাগরের সাড়া ?

নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খ'সে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি;
যতোদূর যেতে চাই এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে–
চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে
ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসহীনতার দিকে–
মনে হয় এই আধ-কণা জল দিয়ে দ্রুত রক্ত নদীটিকে
সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি।

মানুষের কতো দেশ কাল
চিন্তা ব্যথা প্রয়াণের ধূসর হলুদ ফেনা ঘিরে
সংখ্যাহীন শৈবাল জঞ্জাল
সে নদীর আঘাটার জলে
তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের অন্ধ মর্মস্থলে
অন্ধকারে ভাসে।
তবু তারা নীলিমার তপনের অমৃতত্ব বুকের আকাশে
ধ'রে নিতে চেয়েছিলো বুঝি;–
সাহস সাধনা প্রেম আনন্দের দিক লক্ষ্য ক'রে
আমরাও সূর্য খুঁজে নিতে গিয়ে গ্রহণের সূর্য কি খুঁজি ?

এঁকেবেঁকে প্রজাপতি রৌদ্রে উড়ে যায়–
আলোর সাগর ডানে– আনন্দসমুদ্র তার বাঁয়ে;
মহাশূন্যে মাছরাঙা আগুনের মতো এসে জ্বলে;
যেই এই ব্রহ্মাণ্ডের শোকাবহ রক্তে অনলে
মানে খুঁজে পেয়েছে সে অন্তহীন সূর্যের ঋতুর :
জ্ঞানের অগম্য এক অহেতুক উৎসবের সুর
জাগিয়ে বুদ্ধির ধাঁধা দু-মুহূর্ত দীপ্ত ক'রে পাখি
মানুষকে ফেলে গেলো তবু তার চেতনার ভিতরে একাকী।
শূন্যকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে শেষে
কোথায় সে চ'লে গেলো তবে।

কিছু শীত কিছু বায়ু আবছা কিছু আলোর আঘাতে
ক্ষয় পেয়ে চারিদিকে শূন্যের হাতে
নীল নিখিলের কেন্দ্রভার
দান ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে যেতে হয় ?

শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস;–

যদি না মানব এসে তিন ফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম ক'রে রেখে দিয়ে যায় :
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।

## অনেক রাত্রিদিন

অনেক রাত্রিদিন ক্ষয় ক'রে ফেলে
এখন এসেছি এক উৎসের ভিতরে;
মাঠের উপরে ক্রমে ছায়া নেমে আসে,
দু-চারটে উঁচু গাছ রোদে খেলা করে।
পৃথিবীতে রক্তপাত অশান্তি এখন;
অর্থময়তা তবু পেতে পারে মন।

কেউ নেই– শুধু এই মননের সহায়তা আছে;
যা-কিছু বুঝেছি অনেক দিন সে-সবের নীতি
দু-চারটে বই ঠাণ্ডা সলতের আলো
নক্ষত্র ও সূর্যে আধো উজ্জ্বল প্রকৃতি
আছে তবে; পৃথিবীতে হৃদয় যা চেয়েছিলো তার
শূন্যতাকে স্নিগ্ধ ক'রে রয়েছে যুক্তির অন্তঃসার।

শরীর নির্বল হ'য়ে যেতেছে কেবলি;
ক্রমে আরো ক্ষমাহীন কঠিন সময়
মনকে নিস্তার দিলে দিতে পেরে তবু
শরীরকে ক'রে যাবে ক্ষয়;
ক্ষয়িত এ-শরীরের সঙ্গে মিলন
ভুলে মন হতে চায় সনাতন মন।

## প্রেমিক

সময় অনেক চিহ্ন লক্ষ্য ভেঙে ফেলে;
ছুটেছে দুরন্ত অশ্বখুর;
একে-একে সকলকে নষ্ট ক'রে দেবে–
সময়ের হাতে সবি বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুর

হ'য়ে যায়– জেনেছি অনেক দিন আমি।
তবুও সময় তার ধ্বংসের পটভূমি
দিয়ে আচ্ছাদিত করে অপ্রেম ও প্রেমকে, তবুও
দেখেছে [illegible] হে প্রেমিক, তুমি।

## অবিনশ্বর

তার সাথে আজ সাত-আট বছর পরে– অঘ্রানে
কলকাতার এই টিউব আলো নিয়নদীপের রাতে
দু-চার মিনিট দ্যাখা হ'লো– কথা বলা হ'লো :
ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।

স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাবকথা
বলা হ'লে ভাবছি ভালো হ'তো;
কথা আরো গভীরভাবে চেতন হ'তো যদি;
শব্দ কথা ভাষা– সবি সেই নারীকে লক্ষ্য ক'রে বলে
সফল হওয়া সহজ– তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবধি।

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেতো; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র কাশ হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর;

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লন্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
অটুট নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছো কোন্ পাশার দান হাতে :
কি কাজ খুঁজে; সকল অনুশীলন ভালো নয়;
গভীরভাবে জেনেছি যে-সব মনীষী ভাঁড় প্রেমিক পাপীদের
তারি ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হ'য়ে রয়।

ক্রমেই বয়স বাড়ে– সবি ছড়িয়ে পড়ে নশ্বরতার দেশে।
বৃষ্টি বাতাস হলুদ পাতা ছাতকুড়ো ঘুণ মাকড়সাজাল এসে
বলছে : 'আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে
আমরা এলাম; কোথাও কিছুই নেই;
একটি শুধু মূর্খ আছে মানব ইতিহাসে
চঙ্গে চ'ড়ে চেয়েছে নীল আকাশ ধরবেই;
সারাটা দিন শিমুলতুলোর মতন শত সূর্যে উড়ে তুমি
একটি বীজচিহ্ন নিয়ে মাটিই ক্রীড়াভূমি।'

বললাম আমি : 'শিশির আলো নক্ষত্র জল মনের উদ্দীপন
অন্ধকারের দিকে টানে ইতিহাস ও দার্শনিকের মন,

দেখেছি আমি : তবুও স্বাদ অনেকরকম– দেখেছি মানুষ অসীম রগড়ে
উত্তেজিত হ'য়ে অপার গোলকধাঁধায় ঘোরে।
তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূলসীমা আলোর মতো;– হয় তো সত্য আলো।'

## আলোপৃথিবী

ঢের দিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবীভরা আলো
তবুও গভীর গ্লানি ছিলো কুরুবর্ষে রোমে ট্রয়ে;
উত্তরাধিকারে ইতিহাসের হৃদয়ে
বেশি পাপ ক্রমেই ঘনালো।

সে গরল মানুষ ও মনীষীরা এসে
হয়তো বা একদিন ক'রে দেবে ক্ষয়;
আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়
স্পষ্ট হ'তে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।

কোথাও রয়েছে যেন অবিনশ্বর আলোড়ন :
কোনো এক অন্য পথে– কোন্ পথে নেই পরিচয়;
এ-মাটির কোলে ছাড়া অন্য স্থানে নয়;
সেখানে মৃত্যুর আগে হয় না মরণ।

আমাদের পৃথিবীর বনঝিরি জলঝিরি নদী
হিজল বাতাবি নিম বাবলায় সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
ফেনিল বুদ্ধির দৌড়;– আজকের মানবের নিঃসঙ্গতা যদি

সে-সব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে
হ'তে চায় অন্য কোনো আলো কোনো মর্মের সন্ধানী,
মানুষের মন থেকে কাটবে না তাহলে যদিও সব গ্লানি
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

আমাদের পৃথিবীর পাখালি ও নীল-ডানা নদী
আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন;– হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি;– শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি

নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে–

অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড-খণ্ড গ্লানি
তা হ'লেও রবে;– তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নব-নব জলধারা– উজ্জ্বল জগতে।

## আজ

কেবলি আরেক পথ খোঁজো তুমি; আমি আজ খুঁজি নাকো আর;
পেয়েছি অপার শূন্যে ধরবার মতো কিছু শেষে
আমারি হৃদয়ে মনে : বাংলার ত্রস্ত নীলিমার
নিচে ছোটো খোড়ো ঘর– বনঝিরি নদী চলে ভেসে

তার পাশে; ঘোলা ফর্সা ঘূর্ণি জল অবিরল চেনা পরিজনের মতন;
কখনো বা হ'য়ে আসে স্থির;
মাঠ ধান পানবন মাছরাঙাদের আলোড়ন
আলিঙ্গন ক'রে বিছিয়েছে তার নারীর শরীর।

ঘরে কোনো লোক নেই– কয়েকটি গ্রন্থ তবু আছে;
রয়েছে পরম ছবি– চারজন-পাঁচজন একান্ত শিল্পীর :
ফ্রান্সের ইটালির বাংলার কাঙড়ার;– নিম জাম নাগেশ্বর গাছে
রয়েছে অগণ্য সব পাখিদের নীড়।

তবুও মনকে ঘিরে মহাজাগতিক আলোড়ন
আর এই পৃথিবীর অন্তহীন দ্বিধা দ্বেষ প্রেম সংগ্রাম
আমাদেরো রক্ত দিয়ে আদি রক্তবীজের নিধন
চেয়েছে,– মিটিয়ে দেবে ষোলো আনা দাম।

এই শতকের দিন ক্ষয় হ'য়ে এলো প্রায় আজ;
নবীন আশার বার্তা নীল নিরালম্ব শূন্যে ভেসে
মানুষ যা চেয়েছিলো সেই নারী সেই সূর্য আর সে সমাজ
দেবে– তার আত্মঘাতী রণাঙ্গন একদিন স্তব্ধ হ'লে শেষে।

## বৃক্ষ

মৃগতৃষ্ণার পিছে ধাবমান হাওয়া নয় আর;
ইন্দ্রধনু ধরবার মতো মূঢ় মন;
বিহ্বল আলোর পরে আসে যেই পতিত আঁধার;
কেবলি অন্ন গ্রাস– শাশ্বত গ্রাসাচ্ছাদন;–
আস্তে সরিয়ে রেখে, মুখ থেকে রক্তের ফেনা,
পায়ের নিচের থেকে ক্ষমতা-যশের মরুভূমি

ফেলে দিয়ে হে হৃদয়, কখন বসবে
কয়েক মুহূর্ত নীল শ্যামল বৃক্ষের নিচে তুমি ?
চারিদিকে ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বল আতপ :
অগ্নির অমৃতভাণ্ড ব'লে মনে হয়;
অকূল আগুনে ম্লান ক'রে বৃক্ষ শান্ত স্নিগ্ধ সিদ্ধার্থ পল্লব :
হরিৎ সোনালি নীল সৌম্য তন্ময়।
আকাশকে নিরালম্ব ক'রে দিয়ে বোমারু বিমান
উড়ে যায়– পুনরায় প্রাণসাগরের শত ভাষা
মর্মরিত হ'য়ে ওঠে;– কোনো কথা বলে দূর নীল ?
আর এই হরিতের কি মহাজিজ্ঞাসা।

রক্তাক্ত নদীর তীরে কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো;
সনাতন শূন্যের অন্বেষণে দিন-অনুদিন
যে-সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো–
অনুভব ক'রে সব মানুষ তবুও
মৃত্তিকায় মূল রেখে লক্ষ্য আদি নীলিমায়
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে
অথবা নশ্বর প্রেম ভালোবেসে বসবে ছায়ায় ?
চারিদিকে দ্রুত অন্ধ সাগরের ঝকঝকে হাসি;
অনন্ত প্রবহমান রক্তক্ষরা জল;
জীবনের জয়গান– মরণের যে লাবণ্যরাশি
দুলে ওঠে আকন্যাকুমারী হিমাচল :
সে-সব অসত্য নয়, সত্য নয়, ফল নয়, নৈষ্ফল্য নয়;
যতোদিন র'য়ে গেছে মানুষ ও মানুষের মন–
নিমিত্তের ভাগী হবে মানবের রক্তাক্ত হৃদয়:
হরিতের কাছে এসে শুনবে অক্ষয় গুঞ্জরণ।

## কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন হ'য়ে

কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন হ'য়ে থাকে কি যে !
ঘুচিয়ে দিয়ে দিক্‌নিরূপক সূর্য আসে নিজে,
যা হয়েছে : হয়েছে; সেই পৃথিবীকে অন্ধকারে পিছন দিকে ফেলে
মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইয়েতে জ্বেলে
এসেছে সে আরেক ভোরের পটভূমির দিকে।
সারাটা দিন মাছরাঙা আর জলের ঝিলিকে
সূর্য আছে টের পেয়েছি– সংকল্প সুর তাই
গভীর হ'লো;

নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরণে সর্বদাই
মহাদেবের কণ্ঠজ্বালা ফুরিয়ে গেছে তবে
ভেবেছিলাম;
কতো অশোকস্তম্ভ বুদ্ধ আনলো আলো– কতো না ইয়োরোপের বিপ্লবে
মানব-আশা ক্ষণিক জেগে বিনিপাতের শ্লেষে
ফুরিয়ে গেলো, তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে
পৃথিবী তার নতুন-নতুন ক্ষয় ব্যথা ভুল ভাগে
পিছন থেকে সারাটাদিন ডোডো পাখির টানে
শূন্য হ'য়ে যেতে-যেতে তবুও সকল সাধারণের তরে
আবার নতুন আশাজনক সমাজ আকাশ গড়ে;
জেনেছিলাম।
তোমাকে আমি দেখেছিলাম বেবিলনের ছাদে
না-দাঁড়াতেই ইন্দ্রপ্রস্থে ভোরের সূর্যস্বাদে
আমার পানে তাকিয়ে আছো।
অনেক দিনের মানবইতিহাসের পটভূমি
শেষ ক'রে এক নিকটতর ভোরের আলোয় তুমি
এখুনি ছিলে;
নিমেষে তবু নীল আকাশে পালকে পাখি আলোক ঠিকরিয়ে
কখন হঠাৎ চ'লে গেছে সূর্য সঙ্গে নিয়ে
জানি না কোন নিকেতনের দিকে
অন্ধকারে ফেলে গেছে মানবপৃথিবীকে।
ইতিহাসের নতুনতর এ-আঁধারে অকূল মরুভূমি
তেমনি আজো ছড়িয়ে আছে– শববহন তেমনি অপার– তুমি
তেমনি অসীম শবের প্রাবরণী খুলে ধীরে
অন্তবিহীন মৃত্যুকে আজ বারে-বারে ঢাকছো শিশিরে,
করুণাময় শান্ত মৃত্তিকায়।
মৃত্যু ছাড়া কি আর আসে যায়,
কি আর আছে অপরিসীম শববহন ছাড়া
অন্ধকারে অনন্তকাল অনুগমন ক'রে গেছে যারা
মৃতের জগৎ– জীবন পাবে ব'লে,
রাতের আকাশ– আলোর অন্বেষণে,
আমরা সে-সব প্রবহমান ইতিহাসের মনে
প্রথম সূত্রপাতে জন্মে তবুও চিরদিন
দেখেছি প্রেমিক গণিকাদের নিকট থেকে ঋণ
খাচ্ছে শুধু, অনেক মহৎ মর্ম রীতি প্রতিক্রতিক্ষয়
হাত দেখে বুঝেছি তবু সত্য আছে অন্য অর্থময়;
আশার– ভালোবাসার– সেবার– জানার;
এ-বেদ ছেড়ে ভালো জীবনবেদে– অন্য আলোর স্পন্দনে
চ'লে যাবার অপার সেতু আছে মানবমনে।

## এক অন্ধকার থেকে এসে

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য এক আঁধারের দিকে
মুখ ফেরাবার আগে
কয়েক মুহূর্ত কথা কাজ চিন্তা রয়েছে এ-জীবনের
দেখেছি সূর্যের আলো, নিয়নবর্ণের বিস্ফুরণ,
অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ শেল,
ক্লান্তিহীন ক্রেন এরিয়েল,
(নীলিমায় এরোপ্লেন হেলিকোপ্টারের
এঞ্জিনের
অনুরণনের
আর-এক রকম সুর;)
হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণসাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের
রাশি-রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু,
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
— দেখেছি জেনেছি অনেকদিন।
মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলনের কঠিন রহস্যসূত্রে নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে
ধীরে-ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের ইতিহাসে বার-বার হয়
মনে হয় যেন মানুষের মন তবু কোথাকার
দুই কালো বালুতীর ভেদ ক'রে ফেলে
চলেছে নদী মতো—
চারিদিকে জনতার সকাতর কোলাহল—
ঘর বাড়ি সাঁকো।
পাখির ও মানুষের করুণ পায়ের চিহ্ন
পায়ের কৃচ্ছ্রের চিহ্ন সব—
মুছে ফেলে বুঝি অনাদির শাদা-কালো
নির্দোষ আলো আর অন্ধকার আবার সঞ্চয় করে মন
জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে হ'তে চায় বৃদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের মতন

## তোমায় আমি দেখেছিলাম

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
শাদা কালো রঙের সাগরের

## এক অন্ধকার থেকে এসে

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য এক আঁধারের দিকে
মুখ ফেরাবার আগে—
কয়েক মুহূর্ত কথা কাজ চিন্তা রয়েছে এ-জীবনের
দেখেছি সূর্যের আলো, নিয়নবাতির বিচ্ছুরণ,
অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ শেল,
ক্লান্তিহীন ক্রেন্ এরিয়েল,
(নীলিমায় এরোপ্লেন হেলিকোপটারের
এঞ্জিনের
অনুরণনের
আর-এক রকম সুর;)
হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণসাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের
রাশি-রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু,
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
— দেখেছি জেনেছি অনেকদিন—
মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলনের কঠিন রহস্যসুতো নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে
ধীরে-ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের ইতিহাসে বার-বার হয়।
মনে হয় যেন মানুষের মন তবু কোথাকার
দুই কালো বালুতীর ভেদ ক'রে ফেলে
চলেছে নদী মতো—
চারিদিকে জনতার সকাতর কোলাহল—
ঘর বাড়ি সাঁকো।
পাখির ও মানুষের করুণ পায়ের চিহ্ন
পায়ের কৃচ্ছ্রের চিহ্ন সব—
মুছে ফেলে বুঝি অনাদির শাদা-কালো
নির্দোষ আলো আর অন্ধকার আবার সঞ্চয় করে মন
জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে হ'তে চায় স্নিগ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের মতন।

## তোমায় আমি দেখেছিলাম

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
শাদা কালো রঙের সাগরের

কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে– দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
সাতটি সাগর তেরো নদীর পার
যেখানে আছে পাঁচটি মরুভূমি
তার ওপারে গেছো কি চ'লে তুমি
ঘাসের শান্তি শিশির ভালোবেসে !

বটের পাতায় কে কার নাম লিখে
(গভীরভাবে) ভালোবেসেছিলো সে-নামটিকে
হরির নাম নয় সে আমি জানি,
জল ভাসে আর সময় ভাসে– বটের পাতাখানি
আর সে-নারী কোথায় গেছে ভেসে।

## ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দু-জনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চ'লে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে।

## অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

## দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ

দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো,
যে-নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর– সে এসে মনকে নীল– রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো।
ভুলে গেছি পটভূমি– ভুলে গেছি কে যে সেই নারী–

আজকে হারিয়ে গেছে সব;
চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়েছিলো কি সব গভীর পল্লব
যখনি আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হ'য়ে ওঠে– মনে হয় যেন কোন হরিতের– নব হরিতের
সঙ্গীতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মানুষের ভাষা
হৃদয়ের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তরে মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোর
ভালোবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হ'তে চায়।
আমি সেই মহাতরু– লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
জাগিয়েছো তুমি অনাদির সূর্যনীলিমায়
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ ক'রে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

## রক্তনদীর তীরে

রক্তনদীর তীরে কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো
সনাতন শূন্যের অন্বেষণে দিন অনুদিন
মানুষের যে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো
অনুভব করে সব মানুষ...
মৃত্তিকায় মূল রেখে– লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
সহজ গাছের স্থির প্রতিচ্ছবি হবে–
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে
অথবা নশ্বর ধর্ম ভালোবেসে বসবে ছায়ায় ?
চারিদিকে অন্ধ দ্রুত সাগরের উজ্জ্বল হাসি
অনন্ত প্রবহমান রক্ত আর জল
জীবনের জয়গান– মরণের যে-লাবণ্যরাশি
দুলে ওঠে আকন্যাকুমারীহিমাচল
সে-সব অসত্য নয় সত্য নয়– ফল নয় নৈষ্কল্য নয়–
যতোদিন রয়ে গেছে মানব ও মানবের মন
নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়
হরিতের কাছে এসে শিখবে অক্ষয় গুঞ্জরণ।

## কেন মিছে নক্ষত্রেরা

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর ? কেন মিছে জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে : সোনার ময়ূরপঙ্খী অশ্বত্থের শাখার পিছনে ?

কেন ধূসর পাঙ্গু হ'য়ে ওঠে শিশিরের চুমো খেয়ে– গুচ্ছে-গুচ্ছে ফুটে ওঠে কাশ ?
খঞ্জনরা কেন নাচে ? কুলবুলি দুপ্‌টুনটুনি কেন ওড়াউড়ি করে বনে-বনে ?
আমরা যে রুমঝুম নীরে বাস– ঘণ্টি বাঁধি– ভালোবাসি নগর ও বন্দরের শ্বাস–
হাস যে বুকের নিচে হাস শুধু– আর কিছু নয় আহা– মাটির যে সবচেয়ে বড়ো এই মনস্বীবনে–
খঞ্জনরা নাচে কেন তবে আজ– কিংবা কুলবুলি কেন ওড়াউড়ি করে বনে-বনে ?

## উপলব্ধি

যা পেয়েছি সে-সবের চেয়ে অবের স্থির দিন পৃথিবীতে আসে:
আসে না কি ?
চারিদিকে হিংসা দ্বেষ কলহ রয়েছে:
সময়ের হাত এসে সে-সবের অমলিন, মলিন প্রেরণা
তবুও তো মুছে দিয়ে যেতে পারে,– অবি :
সেই আদি কাল থেকে আজকের মুহূর্ত অবধি
মানুষের কাহিনীর যতোদূর অগ্রসর হ'য়ে গেছে তাতে
প্রায়ই ঠেকে দেখেছি কেবলি :
মলিন বালির দল নিয়ে তার মরুভূমি সূর্যের কিরণে দাঁড়াতে
শিখেছে অনেক দিন:
শিখেছিলো–দেখেছিলো অনাদির সরীসৃপদের রণ
কেলি কাম বিচরণ,–
যুগে-যুগে ক্ষুধা লোভ লালসার হানাহানি অপমৃত্যু, অন্ধকার সা'রে
মাঝে-মাঝে দিগন্তের অন্নপূর্ণা মরীচিকা হ'য়ে
জলের লেখার মতো বুদবুদে হারাতে শিখেছিলো–
তবুও তো
মানুষের কাছে মানুষের দাবি র'য়ে গেছে মনে ভেবে হৃদয়ে কুয়াশা
করুণ প্রশ্নের মতো খেলা ক'রে গেছে ঢের দিন।
আমাদের পায়ে চলা পথ ঘিরে অব্যক্ত ব্যথার
কবেকার নচিকেতা– আজকের মানুষের হাড়
প্রলয়ের সমুদ্রে সুরে ফেনশীর্ষ ঢেউয়ের উপরে
সূর্যের দিগন্তে দেশে আমাদের তুলে নিতে চায়:
নিরুপায় ডুবুরির মতো ডুবে মরে:
সমুদ্রপাখির শব্দ, বিরহীর মতন ডানায়
সেই শূন্য অন্ধকার দিকের ভিতরে
আমাদের ইতিহাস পিরামিড ভেঙে ফেলে:–
লন্ডন– ক্রেমলিন পড়ে।

কেবলি আশঙ্কা, ব্যথা নিরাশার সমুদ্রের ঢেউ
মানুষের মরণের সমুদ্রের ঢেউ

রূপান্তরিত ক'রে নিতে চেয়ে মানুষের জীবনের সুর
জেনেছে কোথাও ভয় নেই– নেই– নেই
তবুও কোথাও ধর্মমন্দিরের অভ্রভেদী সফলতা
আবার চেয়ের সূর্যের সম্মুখে হবে না কোনোদিন
কবের প্রথম অবগাহনের জেগে
সাদা পাতা খুলেছিলো যারা,
গান লিখে গিয়েছিলো চের,
আদি রৌদ্র দেখেছিলো,
সিন্ধুর কল্লোল শুনে গিয়েছিলো চের, দিয়ে গিয়েছিলো,
আকাশের মুখোমুখি অন্য এক আকাশের মতো যারা নীল হ'য়ে
রাত্রি হ'য়ে নক্ষত্রের মতো হ'য়ে মিশে গিয়েছিলো :
তারা আর তাদের মরণ আজ আমাদের
পায়ের পথের নিচে যতোদূর ভুল
তাহাদের অস্তসূর্য ততোদূর আমাদের উদয়ের মতন অরুণ;
শ্বেতাশ্বতর থেকে দীপঙ্কর অবধি সবি সাদা স্বাভাবিক
মনে হয় ব'লে মৃত স্বভাবের মতন করুণ
বিকেলের ঘরের ভিতরে এসে আজ তবে আমাদের দিন
অনিবার ইতিহাস অসারের প্রতিভাকে সফলের মতো মনে ভেবে
মরণকে যে দেবার– জীবনকে যা দেবার সব
কঠিন উৎসবে– দীন অন্তঃকরণে দিয়ে দেবে।

## সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে,
সময়ের হাত
সৌন্দর্যকে করে না আঘাত।
মানুষের মনে
যে-সৌন্দর্য জন্ম লয়– শুকনো পাতার মতো ঝরে নাকো বনে,
ঝরে নাকো বনে।
নক্ষত্রও মুছে যায়– মুছে যায়– পৃথিবীর পুরাতন পথ
শেষ হয়– কমলার ফুল, বন, বনের পর্বত;
মানুষের মনে
যে-সৌন্দর্য জন্ম লয়– শুকনো পাতার মতো ঝরে নাকো বনে,
ঝরে নাকো বনে।

## ওইখানে সারাদিন

ওইখানে সারাদিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে
হলদে সবুজ নীল রং তার বুকে :

পাখি মেঘ রৌদ্রের:
তবু আজো হৃদয়ের গভীর অসুখে

মানবেরা প'ড়ে আছে কেন।
আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার
ভিতরে আলোর খোঁজে যদি চ'লে যায়
তবুও শাশ্বত হ'য়ে থাকে অন্ধকার।

নতুন যুগের জন্য তবুও প্রয়াণ করা ভালো।
চিতল হরিণ ওই শিং তুলে ফিকে জ্যোৎস্নায়
হরিণীকে খুঁজে তবু পাবে না কখনো;
ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়।

## এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–

এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–
পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিশের দিকে এলোমেলো।
এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–
ছেলেদের খেলা মাঠে মুহূর্তেই সাঙ্গ হ'য়ে গেলো–
এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–
ছিপ ফেলে বাথানের দিকে ওই চ'লে যায় কেলো–
এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–
'জল ধ'রে গেলে মাসি, তারপর কাঁথাগুলো মেলো–'
এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–
'গেলো গেলো আমসত্ত্ব– পোড়ামুখো বৃষ্টি সব খেলো–'
এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–
'হরির মা কতোগুলো ডাঁটো আম পেলো ?'
এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো–
(তবু সে ঘুমায় মাঠে) সমাধির 'পরে তার খড়কুটো ওড়ে এলোমেলো–

## জানি না কোথায় তুমি

জানি না কোথায় তুমি– শরের ভিতরে সন্ধ্যা যেই আসে– নদীটি যখন শান্ত হয়,
যখন কাঁদে না আর শঙ্খচিল– (একা চুপে উড়ে যায়)– ঝিঁঝিঁগুলো চুপ ক'রে রয়,
তখন তোমার মুখ– তোমার মুখের রূপ– আমার হৃদয়ে এসে ভিজে গন্ধে চাঁপার মতন
ফুটে থাকে; শঙ্খচিল তালবনে ডুবে গেছে– নরম সন্ধ্যার রঙে নীল হ'য়ে আছে শরবন।

## মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে

মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে–
তবুও রয়েছে মহাসমরের তিমির
আমাদের আকাশ আলো সমাজ আত্মা আচ্ছন্ন ক'রে।
প্রতিনিয়তই অনুভব ক'রে নিতে হয় আলো : অন্ধকার,
আকাশ : শূন্যতা, সমাজ : অঙ্গার,
জীবন : মৃত্যু, প্রেম : রক্তঝর্না;– জ্ঞান
এই সবের অপরিমেয় শববাহন শুধু, নিজেকেও বহন করছে।

এসো রাত্রি, আলোর সহোদরা তুমি,
মুমূর্ষু আলোর ভীষণতাকে তোমার শান্তি-নিঃশব্দতার ভিতর গ্রহণ করবার জন্য
শোনো পৃথিবী, এই রাত্রির শীত, সফল বিসরণ;
এসো মৃত্যু, রাত্রির সহোদরা তুমি,
সময়ের এই অসৎ স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে নিঃশেষ করবার জন্যে।
যে আদি আচ্ছন্নতার থেকে এসেছিলো–
মিশে যাক সে অনাদির বাষ্পলোকে;
যে জীবন নয় সে মৃত্যুর নিস্তব্ধ অন্ধকারে
নির্মম পবিত্রতায় লীন হোক, নিত্য হোক, অনিমেষ হ'য়ে উঠুক;
হে জীবন, এইসব ভীষণতা অনুভব ক'রে
সূর্য নক্ষত্র কল্যাণে উৎসারিত জলস্ফুলিঙ্গ হ'য়ে ওঠো তুমি;
উপরের সেতু হও,
সেতুলোকে মানব–
সাহস, আলোক, প্রেমপ্রতিভা, প্রাণ।

## পরস্পর

**নারী : পুরুষকে**

এ-আলো নিভে যাবে,
এখুনি রোদ মৌমাছি নীল আকাশ ফুরাবে।
মাছরাঙাদের অবাক ঝিলিমিলি
খুঁজবে কাকে কতোক্ষণ আর নদীর জলের মাছে,
মুখের কথা না ফুরতেই মাছরাঙা নেই
সমস্ত দিন শূন্য হ'য়ে আছে।

**পুরুষ : নারীকে**

রাতের আলো দিনের আলো– এ-আলো ফুরাবে।
ভালো মানুষ খারাপ মানুষ– সকলি ম'রে যাবে।

সে-ঘুম এলে খারাপ-ভালো কে আর কাকে বাছে।
নারি, তোমার চোখে তো সেই ঘুম জড়িয়ে আছে।

## কারা কবে

কারা কবে কথা বলেছিলো :
ভালোবেসে এসেছিলো কাছে,
তারা নেই, তাদের প্রতীক হ'য়ে তবু
প্রাচীন কয়েকটি গাছ আছে:

নক্ষত্ররা র'য়ে গেছে নদীর উপরে
চারিদিকে প্রান্তর ও ঘাস,
দু-চারটে ঘরবাড়ি নীড় ও শিশির
কূলে-কূলে একলা আকাশ।

তারা ছিলো, তারা কেউ নেই:
মনে ক'রে জীবন তবুও তার নিবিড় বিনয়ে
নিজেকে আগুনে ক্ষয় ক'রে জেগে থাকে
স্থির, আরো স্থির আলোকের মতো হ'য়ে।

## শান্তি ভালো

গুলি খেয়ে শূন্যে মৃত্যু হবার আগে পাখি
যেমন তাহার সুস্থ দেহের পাখিনীকে দেখে
কামের পরিতৃপ্তি খুঁজে আকাশে উড়ে যায়
অন্ধকারে পাখি-শরীর ছেড়ে দিতে শেখে
অবাধগতি ঢিলের মতন ঘাস-পাথরের পানে;
তেমনি আলো-অন্ধকারের মরণ-জীবনের
মোহানা থেকে তোমাকে ভালোবেসে
শান্তি ভালো : শান্তি ভালো, উড়েছি আমি ঢের।

অনেক পথ চলা হলো– তবুও আমি আজো
পেয়েছি যা, চেয়েছি সেই চক্রবলের রেখা ?
সাত-আট বছর পরে আবার বনচ্ছবির সাথে
শীত সামাজিক রাত্তিরে আজ দ্যাখা।
জীবন আমার সমাহিত অনেক দিনের থেকে;
নদী মাঠে ঘাসে শিশিরবিন্দুতে উৎসুক
হ'য়ে হৃদয়ে সফলতায় দিন বা রাত্রি এলে
বলেছে : এই স্পষ্ট শান্ত প্রবাহ আসুক।

নারীরা আসে হারিয়ে যায়– ধীর জগতের সাথে
জেগে থেকে পেয়েছি আমি বিষয়স্থিরতা
কিছু ভাষা পৃথিবীকে দেবার– বাকি সবি
নিহিত হ'য়ে ব'সে থেকে গ্রহণ করার কথা
নদী শিশির সূর্য বৃক্ষ থেকে,
চারিদিকে আকাশ ভ'রে হয়েছে উদয়
সকল কালের বার্তাসহ নক্ষত্রদের আভা
ব্যর্থ হ'য়ে তবুও মানব গল্প স্নিগ্ধ হয়।

সুকিয়া কামাল জাতীয় গণ্ডাগার
বাংলা, ঢাকা

## কবি

কবিকে দেখে এলাম,
দেখে এলাম কবিকে
আনন্দের কবিতা একাদিক্রমে লিখে চলেছে
তবুও পয়সা রোজগার করবার দরকার আছে তার
কেউ উইল ক'রে কিছু রেখে যায়নি,
চাকরি নেই
ব্যবসার মারপ্যাঁচ বোঝে না সে
'শেয়ার মার্কেটে নামলে কেমন হয়', জিজ্ঞেস করলে আমাকে,
হায়, আমাকে !
'লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সি নিলে হয় না', শুধায়,
'লটারির টিকিট কিনলে কেমন হয় ? ডার্বি নয় আইরিশ সুইপ
নয়– গোয়ার কিংবা বউবাজারের ?'–এই ব'লে
শীতের সকালে চামসে চাদরখানা ভালো ক'রে জড়িয়ে নেয় গায়,
ঘড়ি-ঘড়ি মুখে একবার হাত বুলায়
মাজনহীন হলদে দাঁত কেলিয়ে একবার হাসে,
মাইনাস-এইট্ লেন্সের ভিতর আধমরা চুনো মাছের মতো দুটো চোখ :
বেঁচে আছে ? না ম'রে ?
কোনোদিন যৌবনের স্বাদ পেয়েছিলো ? পায়নি ?
মরুশ্বেত দুটো চুনো মাছ চোখের বদলে কাজ করছে যেন,
মরণোন্মুখ ট্যাংরা,
পৃথিবীর থেকে আনন্দ সংগ্রহ করছে,
সবাইকে ভরসার কথা শোনাচ্ছে,
ভালোবাসার জয়গান করছে–
হলদে দাঁতের ভিতর থেকে পিত্তের দুর্গন্ধ,
বিড়ি হ'চ্ছে খোরাক,
লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট কিছুতেই সে হ'তে পারবে না
এক-হাজার আরব রজনী ঘুরেও একহাজার টাকার কেস্ সে

দিতে পারবে না ওরিয়েন্টালকে কিংবা হিন্দুস্থানকে
জীবনে এইটুকু চমৎকার টনক রয়েছে তার,
কম নয়।
আনন্দবাজারে একটা কাজ জুটিয়ে দাও তাকে;
কিন্তু তাতেও সুবিধা হবে কি !
তাকে কেউ কিছু উইল ক'রে গেলে পরেও
তা হ'লে
চশমার পাথর মুছে নিয়ে
শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চামসে চাদর গায়ে জড়িয়ে
নির্বিবাদে কবিতা লিখে যেতে পারতো সে
আনন্দের কবিতা,
হয়তো প্রফিল্যাকটিক টুথব্রাশও একটা কিনতে পারতো
আর ফরহান্ টুথপেস্ট–
দাঁত ও মাড়ি সুন্দর, শক্ত হ'তো তার,
হ্যালিটোসিস থাকতো না
থাকতো না ডিস্‌পেপসিয়া
পেটের গ্যাস
স্টেপ্‌টোকোকাস
তেলচিটে ঘেমো ভ্যাপসা চাদরটা প্রাণ পেতো
কিন্তু থাক– কবিতার সঙ্গে এ-সবের কি সম্পর্ক
বিশেষত আনন্দের কবিতার সঙ্গে–
কবিকে দেখে আমরা কি করবে ?
পড়বো তার আনন্দের কবিতা– কবিতার বই
আর্ট পেপারে আর্ট প্রেসে ছাপা হয়
অনির্বচনীয় কভার
কখনো বা অন্ধকারিক, নাক্ষত্রিক, কখনো বা প্রান্তরের বটের গুঁড়ির ফাঁকে
জ্যোৎস্নার মতো– জ্যোৎস্নার প্রেতাত্মার মতো;
ডিমাই সাইজ; একটার পর একটা বেরোয়
ফী পুজোর মরশুমে
কিংবা বড়োদিনের গুলজারের সময়
হাতে ক'রে গভীর সান্ত্বনা পাই–
অবাক হ'য়ে ভাবি : কবি কিছু পয়সা পেলো ?
পেলো না হয়তো
কিন্তু উপন্যাস লিখে পায়–
যাক, এসো আমরা তার কবিতা পড়ি
অজস্র আশাপ্রদ কবিতা
টইটুম্বুর জীবনের স্লট-মেশিনে তৈরি
এক-একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের মতো।

## চারিদিকে পৃথিবীর

চারিদিকে পৃথিবীর উৎসে জল ঝরে;
রোদ্দুরে শঙ্খচিল মাঝি
উড়ে যায়, মনে হয় যেন
নীল আকাশের কাছাকাছি।

যেন এ-জীবনে আবছা স্তব্ধ সৃষ্টি আর
ভুল গ্লানি হিংসা চালানির প্রয়োজন
ফুরিয়ে গিয়েছে ব'লে এ-হৃদয় নব জলধারা :
নীলিমার রৌদ্রের মতন।

উজ্জ্বল চিহ্নের মতো উড়ে
হংসী রোদে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তার,
সম্মুখে অমেয় শুক্ল শূন্যে রয়েছে
প্রেম আর কল্পনার ডানা ছড়াবার।

আমরা দুজনে যেন সৃষ্টির প্রথম
অন্ধ রাত্রি ছেদ ক'রে শাদা আর কালো
যে-নদী মৃত্যুর গন্ধ বুকে নিয়ে এসেছিলো তার
ক্লান্ত তৎপরতার চেয়ে অন্য আলো– অন্য এক আলো।

## ভোরের কবি জ্যোতির কবি

ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় :
ভোরের হাওয়া, আলোর হাওয়া
আলোর হাওয়া, আলোর হাওয়া
নারীর মতন প্রেমিককে তার প্রাণের ইশারায়
সূর্যে উৎসারিত চাতক অবিনাশী চিলকে জাগায়,
জাগায়, জাগায় !
শিবের কণ্ঠ নীলকণ্ঠ বিহঙ্গমের অসীম নীলায়
মিলায়, মিলায় !
গাঢ় নীলে রৌদ্রসাগর অগ্নিশাদা ডানায় জ্যোতির্ময়,
নভোনীলের আলোয় মনোনীলিমা জেগে রয়।

ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় :
নতুন দিনের আলোর গতি প্রেমের চেয়েও সাহসিকা,
জ্ঞানের চেয়েও বৃহৎ করুণায়;
মুক্ত পুরুষ পুরাণপুরুষ সময়পুরুষ–

মানবতার সূর্যপুরুষ চায় !
ইতিহাসের অন্তে নবীন ইতিহাসের ক্রান্তিনীলিমায়
ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় !

## সুন্দরবনের গল্প

ভোরের নদীর জলে হরিণ নামলো
কাল সারারাত বাঘিনী ছিলো তার পিছু-পিছু
কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দরী চিতাবাঘিনী এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে
বাতাসের পায়ের মতো এর ছায়ার পিছনে
ছুটেছে কামনার মতো
গহন রূপের আঘাতে যে-রক্তিম কামনার জন্ম হয়
হিংসা নয়—
কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণের মুখের রূপে ফেনিল হ'য়ে উঠেছিলো
কাল চৈত্রের জ্যোৎস্নায়
রূপালি শিশির বেগুনি ছায়ার দেশে
জাফরিকাটা জানালার রাজ্যে
সবুজ জাফরান রঙের বাতাসের উষ্ণতায়
প্রান্তরে-প্রান্তরে চাঁদের আলোর কমলা বর্ণের মদিরার ভিতর
এরা দুজনে অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি করেছিলো কাল
এই হরিণ— এই চিতা—
জ্যোৎস্নার কোমল স্নায়ু এদের শরীরকে বানিয়েছিলো ছবি
অপরূপ নারীর ছবি এঁকেছিলো এই বাঘিনীর দেহ দিয়ে
ছুটেছে হাওয়ার মতো তার (ঈপ্সিত) তরুণের পিছে
আঁকাবাঁকা ডালপালা এদের শরীরের উপর চেককাটা কার্পেট বুনে চলেছে
দ্রুত গতিতে
সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল
জানালার মতো ফাঁক হ'য়ে যাচ্ছে
চৈত্রের বাতাসে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো নীল হ'য়ে যাচ্ছে আবার
যেন মেহগিনির গহন ঘন ছায়ায়
হ'য়ে যাচ্ছে মেহগিনি কাঠের হরিণ
নীল দারুময়ী বাঘিনী
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মতো
পাহাড়ের গুহায়-গুহায় আবেগে স্ফীত হ'য়ে উঠছে

রূপালি চাঁদের আলোর ফোয়ারায়

হাওয়ার ফোয়ারায়
রাশি-রাশি কাঞ্চন ফুলের মতো ফুটে উঠছে এদের দেহ আরেকবার
ছুটেছে ফিটকিরির ঝর্নার মতো
নীল ছায়ার পর্দার ভিতর হারিয়ে গিয়ে
ছায়ার ভিতর থেকে হীরের মতো জ্যোৎস্নাকে খুঁড়ে বের ক'রে
অন্ধকারকে তম্বুরার মতো বাজিয়ে-বাজিয়ে
বাতাসকে তরমুজের মতো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে
চাঁদকে একবার খুঁজে পেয়েছে এরা
একবার হারিয়ে ফেলেছে।

## আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ

এ পৃথিবী বড়ো, তবু তার চেয়ে ঢের বেশি এই
সময়ের ঢেউগুলো– অনিঃশেষ সমুদ্রের থেকে
অন্তহীন সাগরের অভিমুখে কোথায় চলেছে
রাত্রি আসে– রাত্রি শেষ হ'য়ে গেলে আলো;
আলো আরো মৃদু হ'লে তার চেয়ে বেশি
স্নিগ্ধ অন্ধকার সব–আকাঙ্ক্ষিত মেয়েটির হাতের মতন
কাছে এসে সংবরণ করে তবু, যেন নেপথ্যের
ওপারের থেকে তার কথা বলে।
অগাধ আয়ুর শিশু এরা সব : এই দিন, এই রাত্রি,
বাতাসের আসাযাওয়া, নীল নক্ষত্রের ফুটে ওঠা,
শিশির ঝরার শব্দ, আশ্চর্য পাখির
ডিম প্রসবের সাড়া, আবার রোদের দিন মাঘ-ফাল্গুনের;
সহসা বৃষ্টির রাত্রি, হেমন্তের ঠাণ্ডা নিঃশব্দতা:
কবের আয়ুর শিশু এরা সব– ম্যামথ দেখেছে।

শতাব্দীর সন্ধিপথে আজ মানুষের
আধো-আলো আধো-আশা অপরূপ অধঃপতনের
অন্ধকারে অবহিত অন্তর্যামীদের মতন ভোরের সূর্য:
দূরতর সমুদ্রের হাওয়া এসে ছুঁয়ে কিছু ভালো ব'লে যেতে চায়;
নগরীর বিদগ্ধ লোকেরা কথা ভেবে, ব'লে
প্রেরণা জাগাতে চায়;
সহজ ত্যাগীরা কাজ করে;
রক্তে দেশ অন্ধকার হ'য়ে পড়ে;
কথা ভাষা স্বপ্ন সাধ সংকল্পের ব্যবহারে
মানুষেরা মানুষের প্রিয়তর না হ'য়ে শুধু দূরতর হ'য়ে ;
হৃদয় মলিন হ'য়ে যেতে থাকে:

নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানের আকাশ থেকে কুয়াশা বড়ছে:
মুক্ত হ'তে গিয়ে সুখী কেবলি রোমাঞ্চকর রূঢ় সায়েন্সের
জন্ম দেয়: চারিদিকে অগণন মানুষের মৃত্যু তার বড়ো কাহিনীর
হবনিকাপতনের প্রাক্কালে ক্লান্তির মতো:
এখন শতাব্দী অন্ধ– অবসন্ন– ব্যর্থ –
হয়তো এ-পৃথিবীতে মানবের অনন্ত চারণ
লোভ থেকে লোভে শুধু– বাধা থেকে বাধার ভিতরে,
ভুল থেকে উল্লোল ক্ষমতাময় ভুলের গহ্বরে:
চাঁদের কুয়াশা থেকে অম্লান রাতের
নক্ষত্রের অন্ধকারে:
তারপর নক্ষত্রেরা নেই .

নবীন প্রয়াণে স্পর্শে মানুষেরা এক দিন চীন-পিরামিড
গড়েছিলো: সূর্যঘড়ি চিনেছিলো: প্রিয়তর উজ্জ্বল সূর্যকে
দিব্য দিয়ে নগরীর ভাঙা হাড়ে কেবলি গড়েছে
নতুন খিলান স্তম্ভ ফ্যাক্টরি এঞ্জিন ট্রেন:
এ-সব বিচিত্র নীড় কুশলতা কল
সময়ের থেকে দূর বড়ো সময়ের কাছে
মানুষের যেই পরিচয় রেখে যায়
তা তার আবেগ বুদ্ধি উৎকণ্ঠার:
যেন তা কল্যাণ সত্য চায়– তবু অবাধ হিংসার–
রিরংসার পাকে ঘুরে– ঘুরে-ঘুরে শূন্য হ'য়ে যায়:
অন্ধকার থেকে মৃদু আলোর ভিতরে
আলোর ভিতর থেকে আঁধারের দিকে
জ্ঞানের ভিতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
বারে-বারে আসাযাওয়া শেষ করে।

চিরকাল ইতিহাসবহনের পথে
রক্ত ক্ষয় নাশ করে সে এক জগতে,
মানুষের [illegible] মাঝে-মাঝে মুক্ত হ'য়ে পড়ে:
তা কোনো প্রশস্তি নয়, মৃত্যু নয়, অপ্রেমের মতো নয়,
কোনো [illegible] শেষ [illegible]সার বার্তা নয়,
অচিহ্নিত [illegible], দূরতর আকাশের মতো:
পেছনের [illegible] চিহ্ন ও বলয়
অ[illegible] কালহীন পটভূমি জেগে ওঠে:
ব্যক্তি [illegible] সময়ের দিগন্তরে শেষ হ'লে
শূন্য [illegible] ইতিহাসসাগরের শূন্যে মেশে:
চিনে নিতে [illegible] সময়ের অসীম ভূগোলে
আরো শুদ্ধ [illegible] [illegible]ন্তীয় সম্মিলন

মানুষ ও মানুষের: চারিদিকে গ্রোবমাস্টারের শব্দে
অন্তহীন অন্ধকারে হাঙর মকর মৃত্যু কুজ্ঝটিকায়
মৃত দৃঢ় এরিয়েল ও বেতারের ব্যর্থতায়
যদিও প্রত্যাশা সব সর্বস্বান্ত ব'লে মনে হয়—
আশার আত্মার আধার তবু নিজেই মানুষ,
মহাকাশ কিংবা মহাসাগরের চিহ্নগুলো নয়।

## হে জননী হে জীবন

হে অগাধ সন্তানের জননী, হে জীবন,
হে অসীম নক্ষত্রের মাতা,
তোমার ইশারায় অনন্ত সমতল— ঘাসে সবুজ হ'য়ে ওঠে,
সোনালি চিনির ঢেউয়ে নিরবচ্ছিন্ন খেত হ'য়ে ওঠে মিষ্টি
নীহারিকা মিত্র চোখ বুজে ফুরিয়ে গেলো— তুমি কোথায় ছিলে মাতা ?
আজো তুমি মাছরাঙা ওড়াচ্ছো— স্ফটিকের মতো আলো বুনছো—
হিজল-জামের জানালায় সবুজ বাতাসকে চিলের ডানার মতো উড়িয়ে ঘুরছো—
বিরাট ফলন্ত ভূখণ্ডের মতো সূর্যকে লক্ষ বজ্রের কোলাহলে
অভিনন্দিত ক'রে হাসছো তুমি,
হাসছো তুমি জননী,
তুমি জেগে থাকতে নীহারিকা মিত্র কি ক'রে হারিয়ে গেলো জননী,
কি ক'রে হারিয়ে গেলো ?

## প'ড়ে গেলো একেবারে আমারি ছায়ার কাছে

প'ড়ে গেলো একেবারে আমারি ছায়ার কাছে— ঘাসে
দু-মুহূর্ত আগেও যে শাদা নীল রঙের আকাশে

আরো দূর বেগুনি রঙের পানে মেতেছিলো উড়ে,
বেতের ফলের মতো টলমল দুই চোখ জুড়ে

নীল আশা ছিলো চের— আমারি পায়ের কাছে ঘাসে
প'ড়ে গেলো— ভাই বোন আর কেউ অসীম আকাশে

নাই তার ? পেঁপের ফুলের মতো সুন্দর কোমল
শাদা বুক— বুকে রক্ত— রক্ত চের— চোখে তবু জল

নাই তার : পাখনা মেলিতে চায় অসীম সাহসে

আমারি পায়ের কাছে নীল ঘাসে শিশিরের রসে

এই পাখি এই রক্ত সাহসের আকাঙ্ক্ষার রূপ
অগাধ আঁধারে ধীরে ডুবে যায় হ'য়ে যায় পালকের স্তূপ।

## বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে

বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে :
গাছে পাখি দেখিয়াছি আকাশে আপন মনে

উড়ে যায়... পায়রা তিতির
পুকুরের শাকে ঘাসে বাঁধে কেউ নীড়,

কিন্তু তুমি : নরম নদীর মতো পাখা
ঘাড় ভাঙা, মুখে রক্ত মাখা

শেফালি বোঁটার মতো ফোঁটা-ফোঁটা লাল
আধ পোয়া রক্ত তুমি– কচি মেয়ে যেন লাল শাল

প'রে আছে– ঘুমাতেছে : আমার হৃদয়
তোমার মায়ের মতো কাছে জেগে রয়।

## জীবন ভালোবেসে

দ্যাখা হ'লো অনেক রক্ত রৌদ্র কোলাহল;
চারিদিকে অধোমুখে মানুষেরা শব বহন করে;
আজকে শতাব্দীতে মৃত্যু প্রথম কথা, তবু
এ-সব মৃত অবশেষে ঘুমের ভিতরে
জুড়োয় গিয়ে দূর পৃথিবীর ঘাস শিশিরে জলে;
এরা নদী সূর্য প্রেমের দিন ফুরিয়ে ফেলে
মাটি, তোমার নিজের মনের কথা হ'য়ে ধীরে
তোমার সাথে ঘুরছে কেমন অজ্ঞান শরীরে।

এখানে খড়ে ভ'রে আছে দু-চার মাইল কামিনী ধানের খেত;
ঘুঘুর ডাকে আদিম শান্তি আরো অনেকক্ষণ;
মিছরি-গুঁড়ির মতন বৃষ্টি রোদ্দুরে উজ্জ্বল :
আকাশে চাতক : ওর একরাশি আত্মীয়স্বজন;

এ-সব ছাড়া ওই মৃতদের ফুরিয়ে গেছে সবি:
সময়ের এই কার্যকলাপ গভীর মনে হয়,
জীবন ভালোবেসে হৃদয় বুঝেছে অনুপম
মূল্য দিয়ে আসছে চুপে মৃত্যুর সময়।

## সবার উপর

সবার উপর তোমার আকাশপ্রতিম মুখে রয়েছে
সফল সকালের রৌদ্র।
মনে হয়, সৃষ্টির অগ্নিমরালী পৃথিবীকে বঞ্চিত করে যদিও,
পৃথিবী মানুষকে,
যুদ্ধের অবিস্মরণীয় প্রতিভা তাইকে আকর্ষণ করে যদিও
ভাইবোনকে নিঃশেষ ক'রে দেবার জন্যে,
রক্তনদীর ভিতর থেকে ফ'লে ওঠে শাদা মিনার,
মহৎ দার্শনিক মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে জেগে ওঠে খুলির বাটি,
নির্বোধ প্রণয়ীদের নবান্নবসে উপচে ওঠে কিনারা তার,
মিষ্টি, মলিন, রুক্ষ, ভূকম্পহীন অন্ত্যেষ্টিসবে, জেগে ওঠে বাসনা
কৃষ্ণার শাড়ি টেনে দেয়ার,
সাম্রাজ্য ভেঙে যায়-
হেমন্তের মেঘের মতো মিলিয়ে যায় সম্রাটদের চিৎকার,
তবুও দুর্বার সৃষ্টির কুয়াশা সরিয়ে দেবার জন্যে তুমি
ডান হাত হ'লে তোমার:
একটি কালো তিলের নিখুঁত থেকে অপরিমেয় পদ্মের মতো
হ'লে তুমি তোমার বাম হাত।
সৃষ্টি ও সমাজের বিকেলের অন্ধকারের ভিতর
সকালবেলার প্রথম সূর্য-শিশিরের মতো সেই মুখ:
জানে না কোথায় ছায়া পড়েছে আমার জীবনে, তার জীবনে,
সমস্ত অমৃতযোগের অন্তরীক্ষে।

## জীবন মানে ভালো

এখানে নিবিড় ঘাসে শুয়ে আছি- পাশে নদী- নদীতে স্টিমার:
এ-দিকে বাবলার সারি বহুদূর চ'লে গেছে- দূর- আরো দূর-
আজ ভোরের ঝাউবনে মনে হয়েছিলো, মল মৃত্যু অমৃত্যুর
সীমার বাইরে এক অফুরন্ত সূর্যের ঋতুর
এখন বিকেলবেলা লাল নীল আলো জ্বেলে ঝাপসা স্টিমার
কোথায় দিগন্তে যায়- কোন্ যাত্রী সঙ্গে আছে তার,

জানি নাকো; কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত স্নিগ্ধতার
কেমন নরম ছবি, ভেসে ওঠে সন্ধ্যার আঁধারে;
ঘুমে যায় কুয়াশার পারে দূর ছ-সাতটি নক্ষত্রের পানে;
শঙ্খাচিল মাদারের ডালে ব'সে টের পায় শিশিরের ঘ্রাণে
জীবনের মানে ভালো; আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে

## জোনাকি

অসংখ্য সবুজ শিষে শিমলতা পাতা ভ'রে আছে;
শিম পাড়ি; মেয়েটিও আছে কাছে-কাছে;
চার বছরের ছোটো মেয়ে;
কাঁপছিলো ছিমে;
আঁচল ফেলেছে ভ'রে শিমে
জায়গা নেই যে এক তিল,
তবু সে বাড়ালো হাত— তারপর থেমে গিয়ে নিজ মনে বললে, 'কেমন নীল—
কেমন সুন্দর নীল শিমগুলো—
ওই শিমগুলো, বাবা, গাছেই থাকুক।'
নদীর মতন টলমল চোখে তাকালো সে— তারপর মুখ
নামিয়ে সে চ'লে গেলো—

বেলা শেষ হ'লে
শুনলাম ডুবে গেছে পুকুরের জলে।
অনেক গভীর রাতে দেখা গেলো জোনাকি পোকার সাথে নক্ষত্রের তলে
শিমগুলো খেলা করে শিশিরের জলে;
আমাকে দাঁড়াতে দেখে বলে তারা : 'বুঝেছে তো কে এই জোনাকি ?'
'চিনেছো ?' বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি।

## প্রতীক

একদিন অবশেষে ভোরবেলা চায়ের টেবিলে
দ্যাখা গেলো চিনেমাটি দিয়ে গড়া পেয়ালার 'পর
হেলিওট্রোপের মতো আকাশের থেকে
মানুষ ও মানুষের অলভ্য প্রতীক পরস্পর
এক-জোড়া লঘু প্যাঁরাশুট বেয়ে নামে;
লঘুতর মনে হয় পেয়ালার প্রবীণ পালিশে;
যেন তারা অনুকূল বাতাসের ভরে
কোনো এক প্রাসাদের বালিকার শিসে

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

## সে

[illegible]

[illegible]

## আমার জীবনে কোনো দুঃখ নাই

আমার জীবনে কোনো দুঃখ নাই
[illegible]
এই কিছু ?
[illegible]

চিন্তার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন-- বিমুখ
প্রাণ তার :

এই দিন এই রাত্রি আসে যায়– কোনো ধ্বনি ঘ্রাণ
বুঝিতে দেয় না তারে কোনো ক্ষুধা– কোনো ইচ্ছা– পরীরো সোনার চুল যাতে ম্লান :
আমাদের পৃথিবীর পরীদের; জানে না সে; জীবনের লক্ষ মৃত নিশ্বাসের স্বর;
শোনে না সে; তা হ'লে ঘুমোতো কবে ? সে শুধু সুন্দর,
প্রশ্নহীন অভিজ্ঞতাহীন দূর নক্ষত্রের মতো
সুন্দর অমর শুধু; দেবতারা করেনি বিক্ষত
ইহাদের ?

এদের অপার রূপ শান্তি সচ্ছলতা
তবুও জানিতো যদি আমার এ-জীবনের মুহূর্তের কথা
মানুষের জীবনের মুহূর্তের কথা।

দেবতারা করেনি বিক্ষত ইহাদের :
ঘুঘুদের শাদা ডানা– নীল রাত্রি– কমলা রঙের মেঘ–
সমুদ্রের ফেনা রোদ– হরিণের বুকে বেদনার
নীরব আঘাত;
এরা প্রশ্ন করে নাকো; ইহারা সুন্দর শান্ত–
জীবনের উদ্‌যাপনে সন্দেহের হাত
ইহারা তোলে না কেউ আঁধারে আকাশে
ইহাদের দ্বিধা নাই– ব্যথা নাই– চোখে ঘুম আসে।

শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা ?
সকল সংকল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে– মানুষের জীবনের এই বীভৎসতা

ইহাদের ছোঁয় নাকো;– ব্যুবনিক প্লেগের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধতারে নষ্ট ক'রে ফেলিতেছে মানুষের মন।
গোলাপি ধূসর মেঘে পশ্চিমের বিয়োগ সে দেখে না কি ?
প্রজাপতি পাখি মেয়ে করে না কি মানুষের জীবনের ব্যথা আহরণ ?
তবু এরা ব্যথা নয়; ইহারা আবৃত সব– বিচিত্র– নীরব
অবিরল জাদুঘর এরা এক; এরা রূপ ঘুম শান্তি স্থির
এই মৃত পাখি কীট– প্রজাপতি রাঙা মেঘ–
সাপের আঁধার মুখে ফড়িঙের জোনাকির নীড়

এইসব।

আমি জানি, একদিন আমিও এমন

পতঙ্গের হৃদয়ের ব্যথা হবো— সমুদ্রের ফেনা শাদা ফেনায় যেমন
ভেঙে পড়ে ব্যথা পায়।
মানুষের মন
তবুও রক্তাক্ত হয় কেন এক অন্য বেদনায়
কীট যাহা জানে নাকো— জানে নাকো নদী ফেনা ঘাস রোদ
শিশির কুয়াশা জ্যোৎস্না :
অম্লান হেলিওট্রোপ চায় !
সৃজনের জাদুঘরে রূপ তারা— শান্তি— ছবি— তাহারা ঘুমায়
সৃষ্টি তাই চায়।
ভুলে যাবো সেই সাধ যে-সাহস এনেছিলো কেবল
যাহা শুধু গ্লানি হ'লো— কৃপা হ'লো— নক্ষত্রের ঘৃণা হ'লো— অন্য কোনো স্থল
পেলো নাকো।

## ঘুমায়ে রয়েছো তুমি ক্লান্ত হ'য়ে

ঘুমায়ে রয়েছো তুমি ক্লান্ত হ'য়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ-বিস্ময়— বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এলো; তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি;
পাখি ? না ফড়িং কীট ? পাখি ? না জোনাকি ?
বাদামি সোনালি নীল রোম তার রোমে-রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী :

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ !

জোৎস্নায়— শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে ? কতো দূর চেয়েছে উড়িতে ?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিলো ? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে !

না— না— তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর
ব্যথা সে তো জানে নাই— বিচিত্র এ জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর;

রোম– ঠোঁট– পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর।

জ্যোৎস্নায়– শীতে
আমার কঠিন হাতে তবু তারে হ'লো যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে-দিকে অবিরল– তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা ? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি,
আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না: ভুল ক'রে দেবে নাকো ছেড়ে;
জানি আমি, তবু আহা রাতের শিশিরে ভেজা এ-রঙিন তুলার বলেরে
কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়েচেড়ে,
সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার; এই পাখি– এতোটুকু– তবু সব শিখেছে সে– এ এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরো বুকে এই ব্যথা ভয়;
আশা নয়– সাধ নয়– প্রেম-স্বপ্ন নয়
চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়

এই পৃথিবীতে, এই ক্লেশ ইহাদেরো বুকের ভিতর;
ইহাদেরো; অজস্র গভীর রং পালকের 'পর
তবে কেন ? কেন এ-সোনালি চোখ জ্যোৎস্নার সাগর
খুঁজেছিলো ? আবার খুঁজিতে গেলো কেন দূর সৃষ্ট চরাচর ?

## আমি এই অঘ্রানেরে ভালোবাসি

আমি এই অঘ্রানেরে ভালোবাসি– বিকেলের এই রং– রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম– ঢালু মাঠ– বিবর্ণ বাদামি পাখি– হলুদ বিচালি–
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-ঘাসে– কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,

ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে– জীবনেরে জেনেছে সে– কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায়– খেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে– খেতের ভিতর
এখনি সে নেই যেন– ঝ'রে পড়ে অঘ্রানে এই শেষ বিষণ্ন সোনালি
তুলিটুকু; মুছে যায়; কেউ ছবি আঁকিবে না মাঠে-মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় না কেউ– এখন অঘ্রান এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয়;
একদিন নীল ডিম দেখিনি কি ?– দুটো পাখি তাদের নীড়ের মৃদু খড়

সেইখানে চুপে-চুপে বিছায়েছে; তবু নীড়– তবু ডিম ভালোবাসা সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ তাহা চায় নাকো– জীবন অনেক দেয়– তবুও জীবন

আমাদের ছুটি দেয় তারপর– একখানা-আধখানা লুকোনো বিস্ময়
অথবা বিস্ময় নয়– শুধু শান্তি– শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন
অঘ্রান খুলেছে তারে– আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে আহরণ।

## আজ রাতে শেষ হ'য়ে গেলো শীত

আজ রাতে শেষ হ'য়ে গেলো শীত– তারপর কে যে এলো মাঠে-মাঠে খড়ে
হাঁস গাভী শাদা প্লেট আকাশের নীল পথে যেন মৃদু মেঘের মতন
ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে– ইঁদুর তবুও অন্ন যাবে নাকো ঘরে।

তাহার রুপালি রোম জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত ক'রে যায় মন,
হৃদয়ে আস্বাদ এলো ফড়িঙের– কীটেরো যে– ঘাস থেকে ঘাসে তাই
নির্জন ব্যাঙের মুখে মাকড়ের জালে তারা বরং এ অধীর জীবন

ছেড়ে দেবে– তবু আজ জ্যোৎস্নায় সুখ ছাড়া সাধ ছাড়া আর কিছু নাই;
আছে নাকি আর কিছু ? পাতা খড় কুটো দিয়ে যে-আগুন জ্বেলেছে হৃদয়ে
গভীর শীতের রাতে– ব্যথা কম পাবে ব'লে– সেই সমারোহ আর চাই ?

জীবন একাকী আজো– ব্যথা আজো– এখন করি না তবু বিচ্ছেদের ভয়
এখন এসেছে প্রেম; কার সাথে ? কোনখানে ? জানি নাকো; তবু সে আমারে
মাঠে-মাঠে নিয়ে যায়– তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় : সে-এক বিস্ময়
এ-শরীর রোম নখ মুখ চুল– এ-জীবন ইহা যাহা, ইহা যাহা নয়;
রঙিন কীটের মতো নিজের প্রাণের সাধে এক রাত মাঠে জেগে রয়।

## বার-বার সেইসব কোলাহল

বার-বার সেইসব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত– ক্লান্তি লাগে যেন;
তাহারা অনেক জানে– এই দূর মাঠে আমি খুঁজিনাকো জীবনের মানে
শুধু এই মাঠ– রাত– আমারে ডেকেছে, আহা– বলেছি, 'যাবো না আর'– কেন,

কেন যাবো ? এই ধুলো খড় গাভী হাঁস জ্যোৎস্না ছেড়ে আমি যাবো কোনখানে,
সেখানে চিন্তার ব্যথা– ব্যথা নাকি ? আজ রাতে শুধু আমি শান্তির আকাশ
চেয়েছি যে– সেই ভালো– কথা কাজ প্রশ্ন শুধু ভুল করে– ব্যথা ব'হে আনে,

শান্তি ভালো; বাদামি পাতার ঘ্রাণ ভালো না কি ? পাখির সোনালি চোখ– ঘাস–
কোথায় বিবরে তার মাছরাঙা– তার রঙ তার নীড়– হৃদয়ের সাধ
এই নিয়ে কথা ভাবা এইখানে– ছবি আঁকা– মৃদু ছবি– নরম উচ্ছ্বাস;

ইঁদুর ধানের শিষ বেয়ে ওঠে : এই ছড়া এই সোনা আকাশের চাঁদ
এরা যেন নীড় তার– আমারো হৃদয় আজ চুপ হ'য়ে শুধু রং ঘ্রাণ
শুধু শান্তি– নিঃশব্দতা– আবিষ্কার; এইসব এইসব সঞ্চয়ের স্বাদ

জীবনেরে এই ব'লে জানিতেছে– জ্যোৎস্না আরো শান্ত হ'য়ে ভরেছে উঠান
রাত্রি আরো ছবি রূপ হ'য়ে ঘাসের কীটের মুখে শুনিতেছে গানে।

## রাত আরো বাড়িতেছে

রাত আরো বাড়িতেছে– এক সারি রাজহাঁস চুপে-চুপে চ'লে যায় তাই,
এই শান্ত রাতের পৃথিবীটিরে ইহাদের পালকের নরম ধবল
তুলি দিয়ে আঁকে এরা– পৃথিবীতে এই বিজনতা যেন কোনোখানে নাই

এই ছবি– এই শান্তি– ঘাসের উপরে আজ আঁধার দেখায় অবিরল
এইসব: কোথায় উৎসব যেন শুধু রক্ত– শুধু রূঢ় বিবাহের গান–
জীবনেরে অসম্ভ্রম;– পৃথিবী সম্ভ্রম ভুলে হতেছে না কঠিন চঞ্চল !

সন্ধ্যার মেঘের পথে দাঁড়কাক তবু জানে অন্য এক বিশ্রাম কল্যাণ,
অন্য এক ক্ষমা শান্তি সমারোহ– আমিও শুনেছি সেই পাখিদের স্বর
নরম অধীর যেন– পথ ছেড়ে দূরে থেকে তখন উঠেছে কেঁপে প্রাণ

বিয়োগের কথা ভেবে– মাথার উপরে তারা বিকেলের সোনার ভিতর
হারায়েছে; কোন্ দিকে ? শালের গলির ফাঁকে মাঠ ছুঁয়ে হামাগুড়ি দিয়ে
উড়েছে রাত্রির পেঁচা– এ-জীবন যেন দুটো মৃদু পাখা : তার 'পরে ভর–

জীবনের এই স্তব্ধ ব্যবহার অভিজ্ঞতা আমরা জেনেছি পরস্পর
তারপর : শান্তি এলো মাঠে ঘাসে ডানা পাখি পালকের ছবি চোখে নিয়ে।

## আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে

আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে– তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি
পুরোনো জ্ঞানের খাতা রক্ত ক্লেশ রোমহর্ষ চুপে-চুপে করি সঞ্চয়
অন্ধকারে; অজন্তার ইলোরার রোম আলেকজান্দ্রিয়ার আমরা প্রহরী

মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা– চামড়া ও কাগজের বিষণ্ণ বিস্ময়
এই কি পৃথিবী নয় আমাদের ? পৃথিবী কি চেয়েছিলো এমন জীবন
সোনালি বেগুনি মেঘে যাহা কোনো ফড়িঙের পতঙ্গের পাখিদের নয়

সেই কথা চিন্তা কাজ সমারোহ– স্তব্ধ ক'রে রাখে কেন মানুষের মন–
ওই দ্যাখো পায়রারা– এশিরিয়া মিশরেও ইহাদের দেখিয়াছি আমি
হাজার-হাজার শীত বসন্তের আগে কবে দিল্লি নিনেভে বেবিলন

ইহাদের দেখেছিলো– এসেছে ভোরের বেলা উজ্জ্বল বিশাল রোদে নামি
গভীর আকাশ আরো নীল ক'রে দিয়ে গেছে ধবল ডানার ফেনা দিয়ে
এই কি জীবন নয় ? আমাদের ক্লান্তি তবু ক্লান্তি তবু আরো বেশি দামি

জ্ঞান নাই চিন্তা নাই– পায়রারা সেইসব প্রতীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে
একদিনো ব্যথা, আহা, পায় না কি শুধু নীল আকাশের রৌদ্র বুকে নিয়ে ?

## সে কতো পুরোনো কথা

সে কতো পুরোনো কথা– যেন এই জীবনের ঢের আগে আরেক জীবন
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও ফেরোনি পিছে– তুমিও ডাকোনি আর; আমারো নিবিড় হ'লো মন

যেন এক দেশলাই জ্ব'লে গেছে– জ্বলিবেই– হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
আমার এ-জীবনের বন্দরে; তারপর শান্তি শুধু বেগুনি সাগর–
মেঘের সোনালি চুল– আকাশ উঠেছে ভ'রে হেলিওট্রোপের মতো রূপে

আমার জীবন এই; তোমারো জীবন তাই; এইখানে পৃথিবীর 'পর
এই শান্তি মানুষের; এই শান্তি। যতোদিন ভালোবেসে গিয়েছি তোমারে
কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর

চেয়েছি– চেয়েছি, আহা... ভালোবেসে না কেঁদে কে পারে।
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও দ্যাখোনি ফিরে– তুমিও ডাকোনি আর– আমিও খুঁজিনি অন্ধকারে

যেন এক দেশলাই জ্ব'লে গেছে– জ্বলিবেই– হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে।

## এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে

এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে– তারপর কতোদিন আমি
তোমারে রয়েছি ভুলে– একদিন তুমি এসে বসেছিলে কখন এখানে
মুছেছে জীবন থেকে– ফড়িঙের মতো আমি ধানের ছড়ার 'পরে নামি

জীবনের বুঝিয়াছি; আমি ভালোবাসিয়াছি– সেইসব ভালোবাসা প্রাণে

বেদনা আনে না কোনো– তুমি শুধু একদিন ব্যথা হ'য়ে এসেছিলে কবে
সেদিকে ফিরিনি আর– চড়ুয়ের মতো আমি ঘাস খড় পাতার আহ্বানে

চ'লে গেছি; এ-জীবন কবে যেন মাঠে-মাঠে ঘাস হ'য়ে রবে
নীল আকাশের নীচে অঘ্রানের ভোরে এক– এই শান্তি পেয়েছি জীবনে
শীতের ঝাপসা ভোরে এ-জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে

একদিন– হেমন্তের সারাদিন তবুও বেদনা এলো– তুমি এলে মনে
হেমন্তের সারাদিন– অনেক গভীর রাত– অনেক-অনেক দিন আরো
তোমার মুখের কথা– ঠোঁট রঙ চোখ চুল– এইসব ব্যথা আহরণে
অনেক মুহূর্ত কেটে গেলো, আহা; তারপর– তবু শেষে শান্তি এলো মনে
যখন বেগুনি নীল প্রজাপতি কাঁচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে।

## বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা

বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা চুপে-চুপে নেড়ে
কে যেন বিছাতে চায় নীড় তার গাছের মাথায় 'পরে হাঁসের মতন;
তারপর দ্যাখা দেয় একবার; নির্জন বনের এই বিস্মিত হাঁসেরে

দেখি আমি– রুপালি পালকে তার উড়ু-উড়ু জামপাতা ছায়া শালবন
পড়িতেছে– কালো-কালো শাখা ডাঁট দুলিতেছে ডিমের মতন বুকে তার;
কোনো পাখি দেখি নাই তাহার সন্ধ্যার নীড়ে চোখ মেলে বসেছে এমন

এমন কোমল স্থির নিরবিলি পালকের রুপা দিয়ে বনের আঁধার
বুনেছিলো; দূর বুনো মোরগের বুকে তাই এই রাতে জেগেছে বিস্ময়–
তাহার অধীর শব্দ শুনি আমি– সোনার তীরের মতো জলপায়রার

বুকে এসে এই জ্যোৎস্না ব্যথা দেয়– সহসা গভীর রাত ব্যস্ত যেন হয়
চাঁদের মুখের 'পরে অনেক মশার পাকা ছোটো-ছোটো পাখিদের মতো
উড়িতেছে; মিষ্টি ব্যথা এইসব– জ্যোৎস্নার মাংস খুঁটে লয়;

শরের জঙ্গল নদী ছেড়ে দিয়ে বুনো হাঁস উড়ে চলিতেছে ক্রমাগত।
চাঁদ থেকে আরো দূর চাঁদে-চাঁদে– কতো হাঁস-চাঁদ কতো-কতো।

## কি যেন কখন আমি অন্ধকারে

কি যেন কখন আমি অন্ধকারে মৃত্যুর কবর থেকে উঠিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে আমি উড়িলাম

সাত-দিন সাত-রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম ?
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী ?

সাতদিন শেষ হ'লো– তখন গভীর রাত্রি পৃথিবীর পারে
আমারি মতন ক্ষিপ্র ক্লান্ত এক শকুনের পাল
দেখিলাম আসিতেছে চোখ বুজে উড়ে অন্ধকারে,
তাহারা এসেছে দেখে পৃথিবীর সকাল-বিকাল
ক্লান্ত-ক্লান্ত শকুনের পাল।

সুধালাম, 'তোমাদের দেখেছি যে বৈতরণী পারে
সেইখানে ঘুম শুধু– শুধু রাত্রি– মৃত্যুর নদীর পারে, তাহা
পৃথিবীর ঘাস রোদ মাছরাঙা আলোর ব্যস্ততারে
ভালো কি লাগেনি, আহা'– শুধালাম–
শকুনেরা শুনিলো না তাহা,
ডুবে গেলো অন্ধকারে, আহা !

একজন র'য়ে গেলো– বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা ঘুরায়ে সে মাঝ-শূন্যে থেমে :
'কোথায় যেতেছো তুমি ? পৃথিবীতে ? সেইখানে কে আছে তোমার ?'
'আমি শুধু নাই, হায়, আর সবি র'য়ে গেছে– সকালে এসেছি আমি নেমে
বৈতরণী : তার জলে ; যারা তবু ভালোবাসে– ভালোবাসিবার,
পৃথিবীতে রয়েছে আমার।'

খানিক ভাবিলো কি যে সেই প্রাণ– ক্লান্ত হ'লো– তারপর পাখা
কখন দিয়েছে মেলে বৈতরণী নদীটির দিকে;
বলিলাম : 'ওই দ্যাখো– দ্যাখা যায় তমালের হিজলের অশথের শাখা
আর ওই নদীটিরে দ্যাখা যায়– আমার গাঁয়ের নদীটিকে–'
চ'লে গেলো তবু সে যে কুয়াশার দিকে !
তারপর সাতদিন-সাতরাত কেটে গেলো পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
আবার চলেছি উড়ে একা-একা শকুনের কালো পাখা মেলে
পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি– আজো তা মনে ক'রে রেখেছে আমারে,
ভালোবাসে; রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি– আমার এ সংসর্গের ভালোবাসা পেলে,
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন ক'রে পেলে

তাহারা বাসিতো ভালো আরো বেশি– আরো বেশি– এই শুধু– আর কিছু নয়–
সাতদিন-সাতরাত তাহাদের জানালায় পর্দার উড়ে-উড়ে কেবল ভেবেছি এই কথা
আবার পেতাম যদি সে-শরীর– সে-জীবন তা হ'লে প্রণয় প্রেম সত্য হ'তো; আজ তা বিস্ময়–
আজ তা বিস্ময় শুধু– শুধু স্মৃতি শুধু ভুল– হয়তো কর্তব্য-বিহ্বলতা :

সাতরাত সাতদিন পৃথিবীতে কেবল ভেবেছি এই কথা।
তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম- মৃত্যু ভালো- মৃত্যু তাই আর একবার,
বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা মেলে দিয়ে মাঝ-শূন্যে আমি ক্ষিপ্র শকুনের মতো
উড়িতেছি- উড়িতেছি; ছুটি নয় খেলা নয় স্বপ্ন নয়- সেইখানে জলের আঁধার
বৈতরণী- বৈতরণী- শান্তি দেয় শান্তি- শান্তি ঘুম- ঘুম- ঘুম অবিরত
তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।

## আমার এ ছোটো মেয়ে

আমার এ ছোটো মেয়ে- সব শেষ মেয়ে এই
শুয়ে আছে বিছানার পাশে-
শুয়ে থাকে- উঠে বসে- পাখির মতন কথা কয়
হামাগুড়ি দিয়ে ফেরে
মাঠে-মাঠে আকাশে-আকাশে...

ভুলে যাই ওর কথা- আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন
ব'লে বসে : 'বাবা, তুমি ভালো আছো ? ভালো আছো ?- ভালোবাসো ?'
হাতখানা ধরি তার : ধোঁয়া শুধু
কাপড়ের মতো শাদা মুখখানা কেন !
'ব্যথা পাও ? কবে আমি ম'রে গেছি- আজো মনে করো ?'
দুই হাত চুপে-চুপে নাড়ে তাই
আমার চোখের 'পরে, আমার মুখের 'পরে মৃত মেয়ে;
আমিও তাহার মুখে দু-হাত বুলাই;
তবু তার মুখ নাই- চোখ চুল নাই।

তবু তারে চাই আমি- তারে শুধু- পৃথিবীতে আর কিছু নয়
রক্ত মাংস চোখ চুল- আমার সে-মেয়ে
আমার প্রথম মেয়ে- সেই পাখি- শাদা পাখি- তারে আমি চাই;
সে যেন বুঝিলো সব- নতুন জীবন তাই পেয়ে
হঠাৎ দাঁড়ালো কাছে সেই মৃত মেয়ে।

বলিলো সে : 'আমারে চেয়েছো, তাই ছোটো বোনটিরে-
তোমার সে ছোটো-ছোটো মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এতো দিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'- ভয় পেয়ে থেমে গেলো
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে-
ছোটো বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

ব্যথা পেলো সেই প্রাণ— খানিক দাঁড়ালো চুপে তারপর ধোঁয়া
সব তার ধোঁয়া হ'য়ে খ'সে গেলো ধীরে ধীরে তাই,
শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়ালো সে একবার
কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক
চেয়ে দেখি ছোটো মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে— আর কেউ নাই।

## নদী

রাইসর্ষের খেত সকালে উজ্জ্বল হ'লো— দুপুরে বিবর্ণ হ'য়ে গেলো
তারি পাশে নদী;

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?
অশথের ডালপালা তোমার বুকের 'পরে পড়েছে যে,
জামের ছায়ায় তুমি নীল হ'লে,
আরো দূরে চ'লে যাই
সেই শব্দ পিছে-পিছে আসে;
নদী নাকি ?

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

তুমি যেন ছোটো মেয়ে— আমার সে ছোটো মেয়ে;
যতো দূর যাই আমি— হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে-পিছে আসো,
তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি : আমারি নিজের শিশু সারাদিন নিজ মনে কথা কয়।
কথা কয়— কথা কয়— ক্লান্ত হয় নাকো
এই নদী

এক পাল মাছরাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম— নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেইসব দেখে নাই।

তখন আমের বনে চ'লে গেছি
এইখানে কোকিলের ভালোবাসা কোকিলের সাথে,
এখানে হাওয়ায় যেন ভালোবাসা বীজ এক আছে,
নদীর নতুন শব্দ এইখানে : কার যেন ভালোবাসা পুষে রাখে
সোনালি প্রেমের গল্প সারাদিন পাড়ে
সারাদিন পাখি তাহা শোনে; তবু শোনে সারাদিন ?
পাখিরা তাদের গানে এই শব্দ তবু
পৃথিবীর খেতে মাঠে ছড়াতে পারে না,

নদীর নিজের সুর এ যে !

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

গাছ থেকে গাছে– মাঠ থেকে মাঠে রোদ শুধু ম'রে যায়
সব আলো কোন্ দিকে যায় !
নিজের মুখের থেকে রোদের সোনালি রেণু মুছে ফেলে নদী
শেষ রেণু মুছে ফেলে
সে যেন অনেক বড়ো মেয়ে এক– চুল তার ম্লান– চুল শাদা–
শুধু তার ফুল নিয়ে খেলিবার সাধ–
ফুলের মতন কোন্ ভালোবাসা নিয়ে,
ধানের কঠিন খোসা– খড়– হিম– শুষ্ক সব পাপড়ির মাঝে
সেই মেয়ে ইতস্তত ব'সে আছে;

গান গায়;
নদীর– নদীর শব্দ শুনি আমি।

## তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাবো

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাবো পৃথিবীর থেকে;
রূপ ছেনে এখনো হৃদয়ে কোনো আসে নাই ক্লান্তি– অবসাদ–
এখনো সবুজ এই পৃথিবীরে ভালো লাগে– ভালো লাগে চাঁদ
এই সূর্য নক্ষত্রের ডালপালা; এখনো তোমারে কাছে ডেকে
মনে হয় যেন শান্ত মালয়ের সমুদ্রেরে পেলো পাখি– দেখে
জ্যোৎস্নায় মালয়ালি– নারিকেল ফুল সোনা সৌন্দর্য অবাধ
নরম একাকী হাত– জলে ভেজা মসৃণ; এই রং সাধ
কৃমি হয়– কাদা হয়– তবু, আহা; চ'লে যাবো তাই মুখ ঢেকে
তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাবো পৃথিবীর থেকে।

## বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে

বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে, তাই সব থেকে সরে
যখন ঘুমাবো আমি মাটি ঘাসে– সেইখানে একদিন এসে
হয়তো অজ্ঞানে তুমি মাথা নেড়ে বলিবে : 'আমারে ভালোবেসে
ব্যথা পেলো ; আমি আজো ভালো আছি– তবুও গিয়েছে, আহা, ঝ'রে
সেই প্রাণ'; হয়তো ভাবিবে এই– তবু একবার চুপ ক'রে
ভেবে দ্যাখো সে কি ছিলো– একদিন পৃথিবীতে তোমার আবেশে

যখন আমার মন ভ'রে ছিলো, মনে হ'তো চলিতেছি ভেসে
জ্যোৎস্নার নদীতে এক রাজহাঁস রুপালি ঢেউয়ের পথ ধ'রে
কোন্-এক চাঁদের দিকে অবিরল– মনে হ'তো, আমি সেই পাখি :
তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাই তো মসৃণ তুলি হাতে ল'য়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভ'রে দিয়ে; চেয়ে দ্যাখো ঘাসের শোভা কি
লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে।

## তখন অনেক দিন হ'য়ে গেছে

তখন অনেক দিন হ'য়ে গেছে– চ'লে গেছি পৃথিবীর থেকে;
হয়তো ভাবিবে তুমি একদিন : 'ভুলেছি কি– তারে গেছি ভুলে
কেন, আহা !' আঙুল ঠোঁটের 'পরে রেখে দিয়ে চুপে চোখ তুলে
ব্যথা পাবে একবার– সারারাত টেবিলের 'পরে মুখ ঢেকে
রবে তুমি– অনেক-অনেক দিন রাত কেটে যাবে একে-একে
ব্যথা নিয়ে; ভূত তবু আসে নাকো; কে তারে ঘাসের থেকে খুলে
ছেড়ে দেবে ! ভূত নাই, ঘাসেও সে থাকে নাকো– তাই ক্লান্ত চুলে
বিনুনি রিবন বেঁধে– একরাশ পৃথিবীরে লবে তুমি ডেকে

ডেকে লবে কাছে তুমি ইহাদের : বাগানের ক্যানা ফুল– আলো
জামরুলে মৌমাছি– বিড়ালের ছানাগুলো– শাদা-শাদা ছানা
ন্যাটা ফল আতা ক্ষীর– কমলা রঙের শাল– এক ডিম উল্
নতুন বইয়ের পাতা কবিতার যেইখানে সহজে ফুরালো
পুরোনোরা; যেইখানে শেষ হ'লো আমাদের শেষ ধুয়া টানা :
তারপর সেই স্বপ্ন সাধ এসে খুঁজে গেলো আমাদের ভুল।

## কেন ব্যথা পাবে তুমি ?

কেন ব্যথা পাবে তুমি ? কোনোদিন বেদনা কি দিয়েছি হৃদয়ে
যতোদিন পৃথিবীতে তোমার আমার সাথে হয়েছিলো দ্যাখা,
তারপর আমি চ'লে গেলে পরে মনে করো যদি খুব একা
একা হ'য়ে গেছো তুমি– ভাবো যদি কোথায় সে ঘাসের আশ্রয়ে
চ'লে গেলো– ভালোবেসে, ঘৃণা পেয়ে; এই ব্যথা ভয়ে
জেগে থাকো যদি তুমি অন্ধকারে– সেজো নাকো ব্যথার রেবেকা;
তুমি প্রেম দাও নাই– জানি আমি– তবুও রক্তাক্ত কোনো রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীত মধু মোমের সঞ্চয়ে,

কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'রে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে;
তোমারে দেখেছি আমি পৃথিবীতে– নতুন নক্ষত্র আমি ঢের
আকাশে দেখেছি তাই– তোমারে দেখেছে– ভালোবেসেছে অনেকে–
তাহাদের সাথে আমি– আমিও বিস্ময় এক পেয়েছি যে টের–
গভীর বিস্ময় এক শুধু তার ম্লান হাত– চুল চোখ দেখে।
কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'রে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে।

## কমলাবতীর ভালোবাসা

একটি খড়ের ঘর যেন এই মাটির সন্তান :
সারাদিন শুয়ে থাকে সূর্যের দেশে;
উঁচু-উঁচু জাম ঝাউ ঝিরঝির আবেশে
নেজনী নদীর ঢেউয়ে পেতে থাকে কান।

বিকেলের মরচে রঙের স্থির মেঘে
আতুর কাকের জন্ম হয়–
পৃথিবীর, তবু যেন তারা কেউ পৃথিবীর নয়।

কোলাহলে সাম্রাজ্যেরা ভেঙে গেলে পর
তারপর থাকে নাকো কোনো কলরব;
ফাটল– খড়ের মাঠ– প্রচুর, নীরব,
ফরসা ডানার পাখি ঠোঁটে তার খড়;
এইসব থাকে শুধু– পশ্চিমে সূর্যের গন্ধ : যেন মেঠো চাষা;
মাটি যেন ধেনো ঝাঁজ, কমলাবতীর ভালোবাসা।

## যখন খেতের ধান ঝ'রে গেছে

যখন খেতের ধান ঝ'রে গেছে– খেতে-খেতে প'ড়ে আছে খড়
আম বাঁশ ডুমুরের পাতাগুলো মাঠে-মাঠে করে মর্মর
ফাল্গুন ঘাসের ঘ্রাণে ফড়িং এ-জীবনের গন্ধ ভালোবাসে
(বিশুষ্ক পুঁয়ের মাচা ঘিরে-ঘিরে প্রজাপতিগুলো উড়ে আসে)
হলুদ-জর্দা-শাদা প্রজাপতি– হলুদ-জর্দা-নীল-লাল–
দুপুরের মাঠে শুয়ে এই পল্লী– নিস্তব্ধতা– এই খোড়ো চাল–
ভূতুড়ে স্বপ্নের মতো ডালপালা– নীরব নরম দাঁড়কাক–
তেরছা ডানার ছায়া : চিল বুঝি ?– লাল বনে শালিখের ঝাঁক

এইসব ভালো লাগে– দু-দিনেই চুল তবু হ'য়ে যাবে শাদা
এইখানে মাঠে শুয়ে ভালোবাসিবার পথে আরো ঢের বাধা

জ'মে যাবে; এখুনি তো ফাল্গুনের মায়াময় অপরাহ্ণ ভরি
পরীর মুখের মতো কারা যেন সোনার পাখির পিঠে চড়ি
কুয়াশায় মুছে যায় মুছে গেছে;– কোনোদিন ফিরিবে না আর
যদিও ফাল্গুন আছে– আমি আছি - প্রজাপতি আছে নীল-লাল পাখনার।

## তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে
তুমি আমার পদ্মপাতা হ'লে;
শিশিরকণার মতন শূন্যে ঘুরে
শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে
খুঁজে-খুঁজে পেলাম তাকে শেষে।

নদী সাগর কোথায় চলে ব'য়ে
পদ্মপাতায় জলের বিন্দু হ'য়ে
জানি না কিছু– দেখি না কিছু আর,
এতোদিনে মিল হয়েছে তোমার আমার
পদ্মপাতার বুকের ভিতর এসে।

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
শিশির হ'য়ে থাকতে যে ভয় পাই,
তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে
চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে
শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।

জানি আমি তুমি রবে– আমার হবে ক্ষয়,
পদ্মপাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয়।
এই আছে, নেই– এই আছে, নেই– জীবন চঞ্চল ;
তা তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্মপাতার জল
বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে।

## চিঠি এলো

কতো বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার :
এই সকালবেলার রৌদ্রে
আমার হৃদয়ে
বারুণীর কোটি-কোটি সহচরী

তিমির পিঠ থেকে মকরের পিঠে আছড়ে পড়ে
নটরাজ্ঞীদের মতো
মহান সমুদ্রের জন্ম দিলো।

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি,
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল,
একটা সজনে গাছো নেই,
তাই বিরাট আকাশচিল উড়ে এসে
শূন্য বাতাসের ভিতর আঁকাবাঁকা ব্যর্থ জ্যামিতির দাগ রেখে গেলো শুধু,
তারপর দূর নীড়ের দিকে উড়ে গেলো
হৃদয়ের পানীয়ের দিকে।
এই পৃথিবীর অব্যবহারের দিকে তাকিয়ে
কেমন একটা তুহিন ছিলো হৃদয়ে :
তোমাকে দেখে ভেঙে গেলো;
সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত-শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয় সে তার জলের ভিতরে
তাদের সমস্ত ক্ষুধা জড়ো ক'রে
আকাশের পানে গভীরভাবে নিক্ষেপ করে সে :
তোমার উত্তাল গম্বুজের উদ্দেশ্যে
আমার অনুভূতির আলোড়ন—
সেইসব স্ফীত খোঁপার নারী
তোমার নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'রে
গুঁড়োয়-গুঁড়োয় পৃথিবীর শস্যখেতে ছড়িয়ে দেবে;
হৃদয়ের ভিতর প্রতিভার নব-নব সন্তান কলরব ক'রে উঠবে।

## আমি

রাতের বাতাস আসে
আকাশের নক্ষত্রগুলো জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে
যেন কাকে ভালোবেসেছিলাম—
তখন মানবসমাজের দিনগুলো ছিলো মিশর-নীলিমার মতো।

তার তৎপর হাত জেগে রয়েছে সৃষ্টির
অনাদি অগ্নিউৎসের প্রথম অনলের কাছে আজো
সমস্ত শরীর আকাশ রাত্রি নক্ষত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে তাই,
আমি টের পাই সেই নগ্ন হাতের গন্ধের

সেই মহানুভব অনিঃশেষ আগুনের
রাতের বাতাসে শিখা-নীলাভ এই মানবহৃদয়ের
সেই অপর মানবীকে।

সমস্ত নীলিমা-সময় : প্রেম কি উদার অনল সংঘর্ষময়ী লাসনা
মহনীয় অগ্নিপরিধির অন্তহীন কারুশিল্প সংগীতে লীন,
সেই নারীর গুঞ্জরণ শুনছি আমি
আমার গানে হৃদয় বিকম্পিত হ'য়ে উঠছে তার,
কোথাও মৃত্যু নেই-- বিরহ নেই
প্রেম সেতুর থেকে সেতুলোকে--
চলছে– জ্বলছে দ্যাখো। এলো আলো
গতির গলিতশরীরী আগুনের;
কোথাও প্রয়াণের শেষ নেই– আমি গতিবহ্নি, হে তপতীলোক,
হে অন্ধকার–
হে বিরাট অন্তরীক্ষ অগ্নি।

## কনভেন্‌শন্‌

### প্রথম বক্তা

এ-যুগের, আমাদের এ-যুগের
জন্ম হয়েছিলো বটে শূকরীর পেটে;
কলম ছেড়েছি তাই অসূয়ায়
কেননা খড়্গের সাথে এঁটে
এখন কলম কাত রবে ঢের দিন;
তারপর যখন সে মনীষীর হাতে
ধরা দেবে পুনরায়– ঢের দিন কেটে গেলো ব'লে
তখন বেবুন ছাড়া কে উঠেছে মনীষীর জাতে ?

### দ্বিতীয় বক্তা

পৃথিবীতে ঢের দিন টেকা গেলো
সভাসমিতির ফাইল নেড়ে
জলের গেলাসে স্বচ্ছ সূর্যকে রেখে।
মদের পিপেয় সব বাছুরকে ছেড়ে
মনে হয়েছিলো যতো পিপে র'য়ে গেছে
আর যতো বাছুরের লোম,
ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে তারা র'য়ে গেছে ব'লে
আমাদের চামড়ার জুতোও নরম।
সে-সব বাছুর তবু এতো দিনে ষাঁড় হ'য়ে গেছে,

মদের পিপের থেকে (শেষ অবলেপ সব) উঠে
চাঁদের আলোয় সব গোল হ'য়ে বসে
আবার নতুন কিছু মাল গেছে জুটে।
তা না হ'লে দেবদূত হ'য়ে যেতো এতোদিনে সব,
আমাদের মর্মরের মতো সিলিং
ভ'রে যেতো তাহাদের ধবল শপথে;
আমাদের চুল থেকে বার হতো শিং।

তৃতীয় বক্তা

সমিতিতে– কৌন্সিলে– গ্যালারিতে যে-সব মানুষ
সময় কাটায়ে গেছে আমাদের বক্তৃতা শুনে,
প্রত্যক্ষদর্শীর মতো তারা যেন সব
আমাদের উড়ে যেতে দেখেছে বেলুনে।
সময় গিয়েছে কেটে বিবেকের গোলালো তৃপ্তিতে
কথা ব'লে– কথা ব'লে– কথা ব'লে– তবুও এখন
আমাদের চেয়ে ঢের হালুবালু ভালো জানে ব'লে
বেবুন চালাবে মাইক্রোফোন।

চতুর্থ বক্তা

চেয়ে দেখি চারিদিকে আজ
যাদের চোয়ালগুলো লণ্ঠনের মতো
গরিলা বানাতে গিয়ে নিসর্গ যাদের
মানুষ বানালো প্রথমত–
কারণ, অনেক কাজে লিপ্ত থেকে ন্যুব্জ নিসর্গ
মাঝে-মাঝে ভুলে যায় ইঞ্চি-ইঞ্চি স্তর–
প্যারাশুট বেয়ে তারা নারী আর ধর্মযাজকের মতো নেমে
সূর্যের আলোর নিচে সবেচেয় বিখ্যাত রগড়।
তবু এরা মদ পেলে খুশি হয় খুব,
নির্মল ভাঁড়ের মতো রসিকতা জানে,
শান্তির দেবতা কোনো যদি নেমে এসে ইহাদের
মাথা ধ'রে কান টেনে আনে,
আজ তবু ভুল ক'রে দশজন নারী হত্যা ক'রে
একজন দালালের ঋণ করে শোধ,
যেন শুধু সরমাকে নগ্ন ক'রে সারমেয়দের
চাঁদের আলোর নিচে সবচেয়ে বিখ্যাত আমোদ।

পঞ্চম বক্তা

তবুও ঘোষণা ক'রে চ'লে যাই :
ধরেছি অনেক মাছ স্ফটিকের মতো শাদা জলে,

নির্জন পবিত্র রৌদ্রে ঘুরায়েছি শাটিনের ছাতা,
পরিশ্রান্ত পা দুটোকে ঢুকায়ে চপ্পলে
ডোরাকাটা জামা গায়ে ঢিলে ক'রে নিয়ে
বিবেক ব্যথিত হয় ব'লে আঁটো নেকটাই খুলে
শাদা মোম জ্বেলে নিয়ে ঘুমোবার আগে
হঠাৎ দেখেছি শিং– চুলে।

ষষ্ঠ বক্তা

কিছু নয়– লঘু অবলেপ শুধু– দু-এক নিমেষ;
এ-যুগের জন্ম হয়েছিলো তবু খানার ভিতরে;
যখন বাজার বেশ শান্ত হ'য়ে রবে
অতিরিক্ত তেজি হ'য়ে– মন্দা হ'য়ে পড়ে
যখন সবার কাজ ন্যস্ত রবে শ্বেতাশ্বতর শান্ত ঘুঘুর মতন
ব্যাঙ্ক বুলিয়ন কাঁচা-পাকা মাল নিয়ে
পরস্পরের সব মুকুরের মতো মুখে চোখ চেয়ে দেখি
আমার কানের দিকে থতমত খেয়ে কেন রয়েছি তাকিয়ে !

পঞ্চম বক্তা
(উপসংহার)

এখন উইল ক'রে চ'লে যাই তবু
হয়তো বা কোনো এক অতীতের তরে–
তবু আমি আশাস্থির– বর্তমান টপকায়ে
অতীতি তো আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে
এখন উইল ক'রে চ'লে যাই তবে–
ছাতা লাঠি অমুকের হ্যাভেনা– দলিল–
সুন্দর জিনিস সব– বিপর্যস্ত এই পৃথিবীর–
এখন ভূতের হাতে খেয়ে গেলো কিল।

আমাদের কপোলের একটি আঁচিল যেন তবু
আমাদের নাসিকার সরলরেখার মতো ডাঁশা
আমাদের জাহাজের– উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা
যদিও পৃথিবী আজ (আমাদের) টেনে নেয় জঙ্গলের দিকে,
রেডিয়োও ব্যবহার ক'রে যায় বেবুনের ভাষা;
আমাদের জাহাজের– উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা

কেননা আমরা ঢের পড়েছি বিজ্ঞান ইতিহাস–
অধমর্ণ কখন ঘুরেছে উত্তমাশা ?

আমাদের জাহাজের– উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।
আমরা দেখেছি ঢের সমাজের ভাঙন-গড়ন–
বিপ্লবের সূত্রগুলো ভুল গণিতের মতো কূট ভাসা-ভাসা;
আমাদের জাহাজের– উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।

মানুষের সভ্যতা বিজ্ঞান ধর্ম : রাজমুণ্ড ঘিরে
দীনারের মতো গোল– অকৃত্রিম গোল হ'য়ে আসা।
আমাদের জাহাজের– উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।
সভ্যতাকে ভেঙে দিতে চায় যারা দাঁত বার ক'রে
তাহাদের হালুবালু জঙ্গলের ভাষা–
আমাদের জাহাজের– উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।

## তুমি আলো

তুমি আলো হ'তে আরো আলোকের পথে
চলেছো কোথায় !
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায় !
হয়তো আলোর ছায়া নেই;
আলো তুমি তবুও তো–
আলো তুমি ছায়ারো মনেই;
বাহিরে বিশাল ওই পৃথিবীর জাতীয়তা আ-জাতীয়তায়
তুমি আলো।
তুমি আলো
যেইখানে সাগর নীলিমা আজ মানুষের সন্দেহে কালো,
ভাইরা ব্যথিত হ'লে ভাইদের ভালো,
মানুষের মরুভূমি একখানা নীল মেঘ চায়।

## ইতিবৃত্ত

একদিন কোনো এক আঞ্জিরগাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
সোনালি সবুজ এক ডোরাকাটা রাক্ষুসে মাকড়কে আমি
একটি মিহিন সুতো নিয়ে দুলে নির্জন বাতাসে

দেখেছি স্বর্গের থেকে পৃথিবীর দিকে এলো নেমে,
পৃথিবীর থেকে ক্রমে চ'লে গেলো নরকের পানে;
হয়তো সে ঊর্ণনাভ নয়।
অপস্ত্রের মতো নানা আয়ুর সন্ধানে
চোখে তার লেগে ছিলো ব্রহ্মার বিস্ময়।

ঢের আগেকার কথা এইসব– তখন বালক আমি পৃথিবীর কোলে
অশ্বত্থের ত্রিকোণ পাতায় যেন মনে হ'তো বালিকার মুখ
মিষ্টি হ'য়ে নেমে আসে হৃদয়ের দিকে,
নদীর ভিতরে জলে যেন তার করুণ চিবুক
স্থিরতর কথা ভাবে– সমস্ত নদীর ঘ্রাণ আরো
অধিক উদ্ভিদ মাটি মাসে– ধূসর হ'য়ে থাকে;
যেন আমি জলের শিকড় ছিঁড়ে একদিন হয়েছি মানুষ,
কাতর আমোদ সব ফিরে চায় আবার আমাকে।

পৃথিবীর ঘরে তবু ফিরে গিয়ে– অভিজ্ঞতাবশে
সেগুন কাঠের শক্ত টেবিলের 'পরে
নীরবে জ্বেলেছি আলো ছিপছিপে ধূর্ত মোমের
তবুও যখন চোখ নেমে এলো বইয়ের ভিতরে
এক– আধ– দুই ইঞ্চি ঘুমের ভিতরে ডুবে গেলো,
কঠিন দানব এক দাঁড়ালো মুখের কাছে এসে–
যেন আমি অপরাধে বিবর্ণ বালক
উলঙ্গ পরীর চুল– কিংবা তার ঘোটকীর লেজ ভালোবেসে।

তবুও আকাশ থেকে পুনরায়– ধীরে
জলপাই-ধূম্র এক ভোরবেলা উদ্‌গীরিত হ'লে
সকলের আগে ক্ষুদ্র জাগরূক বর্তুল দোয়েল
তখনো বাতাস পেয়ে জাগে নাই ব'লে
নদীর কিনার দিয়ে শঙ্খচূড় সাপের মতন
আমার এ-শরীরের ছায়াকে বাঁকিয়ে নিতে গিয়ে
সহসা দেখেছি তুমি কর্কচের মতন আলোকে
শ্বেতকায়া সাপিনীর মতন দাঁড়িয়ে।

## কোনো ব্যথিতাকে

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছে;
নরম আঁধার ঘর
শান্তি নিস্তব্ধতা;

এখন ভেবো না কোনো কথা।
এখন শুনো না কোনো স্বর।
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মতো মুদে থাকো।

## শবের পাশে

(পুরোহিতের প্রার্থনা : অসামাজিক)

মৃত ?
তবুও সে মাটি নয়।
মাথার চুল যেন আরো অনেককাল ব্যবহার করবে সে–
তার হাতির দাঁতের মতো ধূসর কপালের উপর
ভোরের অজস্র দাঁড়কাকের মতো চুলের আনন্দ,
চুলের আবেগ : যেন মিশরের মহীয়সী শাল প'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে
লাল নীল কাচের জানালা খুলে দিয়ে
নব-নব ভোরের রৌদ্র ও নীল আকাশকে আস্বাদ করবার জন্যে !
কোন্-এক অন্ধকার লাইব্রেরির নিস্তব্ধ হলুদ পাণ্ডুলিপির মতো
দেখলাম তাকে:
শ্রাবণের রৌদ্রে রেবা নদীর মতো ছিলো যে একদিন;
সে আর ঘুমোবে না কোনোদিন,
স্বপ্ন দেখবে না;
তার মৃত মুখের বিমর্ষ মোমের গন্ধকে ঢেকে ফেলে
শুধু তার ঘন কালো চুল
সেই আবহমান রাত্রি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জেগে রয়েছে
কোনো এক দূর, ভালো দ্বীপের মতো
যেখানে জাগ্রত পাখিদের প্রেম
ধূসর সমুদ্রকে জাগাতে পারে না আর।
যে-সমুদ্রের কোনো বেলা নেই,
পাণ্ডুর দেহের নীরবতা নিয়ে তারি ভিতর নামলো সে;
জ্যামিতির ভিতর থেকে রূপ তার কুহক হারিয়ে ফেলেছে;
তারপর বিশৃঙ্খল মাংসের দুর্বলতা নিয়ে
পৃথিবীর বড়ো-বড়ো নাবিকের বিবর্ণ ভয় ও বিস্ময়ের জিনিস সে।

এই নারী আজ নিস্তব্ধ;
মনে হয় যেন কোনো সুদূর দ্বীপে ঘুম রয়েছে শুধু;
এর দেহের ভিতর বিবর্ণ দারুচিনি ছালের গন্ধ,
এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়

কোনো অসীম নির্জনতার ভিতরে উঁচু-উঁচু গাছের বীণা আলোড়ন যেন
(আরো নিস্তব্ধ)
এই মৃতার শরীরে সেই দূর দ্বীপের সবুজ শব্দ– স্বাদ– ছায়া-রৌদ্রের বুনুনি–

আমলকী গাছে কোকিল এই নিষ্পাপ স্রোত অনুভব করেছে,
তাই সে ধূসর সম্রাটের জন্যে সংগীত খুঁজতে চ'লে গিয়েছে;
মৃত্যুর মহান আত্মীয়তা
পৃথিবীর পাখিদের কাছেও মৈথুনের চেয়ে প্রগাঢ়।

## রজনীগন্ধা

এখন রজনীগন্ধা– প্রথম– নতুন–
একট নক্ষত্র শুধু বিকেলের সমস্ত আকাশে;
অন্ধকার ভালো ব'লে শান্ত পৃথিবীর
আলো নিভে আসে।

অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো;
রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে।

## তোমার আমার

তোমার আমার ভালোবাসার এই
পথ ছাড়া পথ নেই
জেনে নদীর জলে চেয়ে দেখি
কালো নদীর রঙ মিশেছে এসে।

এই দু-রঙই আলো,
শাদা পাখির কালো
কালের পাখি সাথী
উড়ছে দেশে-দেশে।

তোমার আমার ভালোবাসা– তা কি
একটি পাখি– একটি শাদা পাখি!
সময় কি তার পথ দেখিয়ে দিয়ে
সঙ্গে চলে ভেসে।

শাদা পাখিই কালো পাখি কি-না
চিনি না আমি, চিনি না চিনি না;
কালো-শাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালোবেসে।

## সুদর্শনা

সুদর্শনা মিশে যায় অন্ধকার রাতে।
নদীর এপারে ব'সে একদিনো দেখিনি ওপার,
প্রকৃতি চায়নি সেই মেয়েটি এ-আলো আর রাত্রির আঘাতে
পৃথিবীকে কূট চোখে দেখে নেবে– বুঝে নেবে জীবনের গ্লানি অন্ধকার।
চায়নি সে কলমির ফুল ভরা রক্তাক্ত প্রান্তরে
অথবা চিন্তায় রূঢ় ক্ষেম সৎ পাণ্ডুলিপি যা খণ্ডন ক'রে
মৃত্যুকে দেবার আগে এইসব একবার তুলে নেবে হাতে

প্রথম ঢেউয়ের থেকে দূর সূচনার মতো নদীর ভিতরে
অরবে সে চ'লে যায়– এক খণ্ড রাত্রি মনে হয়
পৃথিবীর রাত্রিকে যেন তার অনন্তের কাছে;
সব হাঁস ঘুমালেও নক্ষত্রালোকিত হংসী আছে
সমুদ্রের পারে এসে বড়ো চাঁদ এর চেয়ে নির্জন বিস্ময়
দেখেনিকো কোনোদিন; অনেক পবনে মৌমাছিদের ভিড়
যদিও খেয়েছে ঢের আকাশের বাতাসের মতন শরীর
তবু সে শরীর নয়– মাংসের চোখে দ্যাখা নক্ষত্রেরা নয় তার তরে।

## সবারি হাতের কাজ

সবারি হাতের কাজ শেষ ক'রে নিতে হবে পৃথিবীতে আজ।
তাদের ভিতরে তবু (মুষ্টিমেয়) কেউ-কেউ ভালো ক'রে-ক'রে;
তাদের রুধিরে আছে জীবনের সম্পূর্ণ গরজ
সবি অভিনয় জেনে– বিখ্যাত মঞ্চের 'পরে (তবুও তো) চড়ে।
ভালো ক'রে প'রে নেয় অবিকল কালো পরিধান;
সেখানে ক্বচিৎ প্রেম সততা মহত্ত্ব আছে অগণন দালালের বুকে
যেখানে ক্বাথের দিকে চেয়ে ভাঁড় ব'লে যায় 'অনোরণীয়ান'
দার্শনিক গাধা ব'লে ফেঁসে যায় দু-এক চাবুকে,
সেখানে তবুও তারা চাঁই সাজে, মন্ত্রী হয়– মুদ্রারাক্ষস
কিংবা শ্লীল প্রেমিকের খেলা খেলে দগ্ধ করে চাঁদনীর চক;
কানে ধ'রে টেনে এনে ইহাদের মাথার তাড়স

বার ক'রে দিতে চায় অতি সন্দিহান বিদূষক;
তবুও বিয়োগনাট্যে প্রদীপ্তির কাজ করে যারা
টেবিলে তাঁদের সাথে কাসুন্দিতে প্রায়শি পেয়েছে আমেজ,
তবু জানে নিজেদের পরিধানে গুরুতর বিষয়ের জামা,
তাঁদের ধুতির ভাঁজে লুকায়ে রয়েছে শুধু লেজ।

এই পরিপূর্ণ জ্ঞানে বোঝে তারা তাহাদেরো মেরুদণ্ড বেয়ে
ব্যাঙাচির মতো কিছু সততই ন'ড়ে যায় ধীরে;
এ না হ'লে অনিরুদ্ধ, কৌটিল্য ও কর্ণ, দেবযানী
ভূত হ'য়ে মিশে যেতো কোন্ কালে নাট্যের তিমিরে
এখনো অঙ্গার থেকে জন্ম নেয় এইসব বীজ;
চেয়ে দ্যাখে ঊর্ধ্বে মেঘ– সম্মুখেতে সিংহ মেষ ষাঁড়
পায়ের ভঙ্গির নিচে কর্কট বৃশ্চিক
পাদপ্রদীপের আলো কেবলি খেতেছে অন্ধকার।
নাট্যের লিখন তারা– তবু তারা পড়েছিলো মৃগশিরা নক্ষত্রের নিচে,
কথোপকথন গান স্বগতোক্তি নেপথ্যের রব
শিশিরবিন্দুর মতো শব্দ করে দর্শকের কানে;
গ্যালারিতে মৃগীরোগাতুর নীল মহিলারা সব
কলরব ক'রে ওঠে ভয়ংকর করতালি দিয়ে
চামুণ্ডার মতো নেচে ছিঁড়ে ফেলে চুল
মাথার উপরে সব অগণন ভূতযোনি দেখে
তারা আর তাহাদের প্রণয়ীরা নাচায় লাঙ্গুল;
অতএব যবনিকা মাঝপথে নেমে পড়ে বটে
ম্লান হ'য়ে নিভে আসে পাদপ্রদীপের গোল আলো,
তবুও মঞ্চের 'পরে অনিরুদ্ধ দেবযানী কচ
নিজেদের ভাষা ভেঙে একটুও হয় না দাঁতালো।

## তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছি ঘুরে-ফিরে
দেয়াসিনীর মতন শরীরে
খুঁজছো এসে নিজের মনের মানে
কাকে ভালোবেসে যেন– ভালোবাসার টানে।

অনেক দূরের জলের আলোড়ন
যেন তোমার মন;
সেই নদীর জল
যেন আমার মনের কোলাহল;

তোমায় খুঁজে পায় না, তবু
ঘুরছে আমরণ।

অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে
শঙ্খসাগর এ-রোদ ভালো লাগে।
এখুনি ঘুম এসে যাবে, কাছে
কালের কালো মহাসাগর আছে।

## পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে-মাঠে

পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে-মাঠে যারা খেলা করে,
কিংবা যারা অগণন ঘরের ভিতরে
আকাশকে টের পায়;
কোথাও আকাশ আছে মনে ক'রে
কোনো এক নিদারুণ জ্যামিতিকে বেদীর মতন,
কিংবা যারা দীর্ঘ– দীর্ঘতর মঞ্চে ক'রে আরোহণ
ক্লান্ত হয় নাকো যারা যশে জয়ে কপালের ঘামে–
এইসব অবিরাম ধুলো যারা কিনে নেয় নক্ষত্রের দামে,
অক্লান্ত থাকুক তারা– ভয় পাক– ক্রমে-ক্রমে স্থবির বয়স
কেড়ে নিক তাহাদের–

আশ্চর্য নিশীথে আজ ভাবি আমি; যুবা আমি ?
হয়তো যুবক নই

ওইসব নক্ষত্রেরা– এই শান্তি– শিশিরের এই শব্দ সব
মসৃণ চামড়া নীল বাদুড়ের– সৃষ্টির এইসব অনাদি বয়স
আমাকে দিয়েছে অব্যাহতি–
চারিদিকে কেবলি বন্দর আর নগরের কথা কাজ শব্দ আর গতি
বাঘের মতন যেন হরিণের ঘাড়
ভেঙে বার-বার ইতিহাসে অন্ধকার
যারা রৌদ্রে সারাদিন টহল দিচ্ছে পৃথিবীতে
হুণ্ডি ফাঁদছে লুটছে ঘুরছে সাগরে,
কিংবা যারা ভিক্ষা চেয়ে দোরে-দোরে ফেরে,
যারা তিক্ত কিংবা যারা মদের পিপের মতো মিঠে;

এখন করুক তারা স্বার্থের প্রয়োজনে রঙ্গ আর রণ,
অথবা জলের গায়ে কিংবা পাথরের বুকে লিখে যাক নাম,
হোক তারা ইন্দ্রপ্রস্থ মিশরের মতো দীর্ঘ থাম,

সমুদ্রের মতো ক'রে করুক পৃথিবী আলোড়ন;

অথবা দেখুক ভিক্ষাপাত্রের ফাটল আরো কি ক'রে চৌচির হ'য়ে যায়
ক্ষয়িত হয়েছে যা, তা আরো পায় ক্ষয়;
লক্ষ টন ইতিহাসে ছটাক কর্পূর
আছে কি না জেনে আবার গড়ুক রোম লন্ডন বেবিলন উর।

## কোনো-এক জ্যোৎস্না রাতে বার-বার শিকারির গুলির আওয়াজ শুনে

শূন্য রূঢ় অসুন্দর : কতোবার ঘুরে ফিরে দেখিতেছি তাহাদের পৃথিবীর পথে :
দিনরাত ও বস্তিটা... গলায় ঝুলিছে দড়ি তরুণীর...
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় বার-বার গুলির আওয়াজ;
ইচ্ছা হয় কোনো দূর প্রান্তরের কোলে গিয়ে শ্যামাপোকাদের ভিড়ে–
কাশমাখা সবুজ শরতে
ব'সে থাকি; আবার নতুন ক'রে গড়ি সব; আবার নতুন ক'রে গড়ো তুমি;
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই;
মানুষ ঘুমায়ে থাক– এ-সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাক
কাচপোকা মাছরাঙা পানকৌড়ি দয়েল চড়াই
একদিন হবে নাকি তাই ?
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই।

## নির্জন হাঁসের ছবি

নির্জন হাঁসের ছবি দেখি স্বপ্নে– চারিদিকে অন্ধকার ঘর
রুপালি গরিমা তার– যেন হীরা তরবার ঘুমের ভিতর
যতোদূর চোখ যায় কাহার মুখের মেধা নদী যেন স্থির
কাহার মুখের মেধা যেন অরণ্যেরা
রাত যেন লেবুর ফুলের মতো নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা
শান্ত সব প্রতিবিম্ব– কবেকার জীবনের এইসব বেদনার স্তর।

## বড়ো-বড়ো গাছ কেটে ফেলেছে

বড়ো-বড়ো গাছ কেটে ফেলেছে তারা।
এইসব উঁচু-উঁচু গাছকে আমার ইচ্ছা লালন করেছিলো;
আমার দেহের ভিতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ.

আমার মনে শহর ও সভ্যতার মতো শূন্যতা,
আমি দিনের আলোয়
কিংবা নক্ষত্র যে আভা আনে রাতের পর রাতে
এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

কারা যেন অগ্রসরের কবিতা লিখছে কোথায়
কমিউনিজমের স্তম্ভ তৈরি করেছে
মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে আজো মানুষের প্রয়াস।

অনেকদিন দেখেছি: উঁচু-উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব;
আরো অনেকদিন দেখেছি : উঁচু-উঁচু গাছ কাকের ভিড়ে
নীল জাফরান হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব;
তবুও তারপর দেখেছি : রাত্রির সমুদ্রের পারে
নিস্তব্ধ লুক্কায়িত দ্বীপ যেন এক-একটা গাছ—
হৃদয়কে বাদুড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে বলে—

কিন্তু তোমার এ-বিস্ময় থাকুক
গাছ নয়— মানুষকে দাঁড় করাও।

## মনকে আমি নিজে

এই জীবনের ছকে-কাটা খেলার ঘরে এসে
হিসেব ক'রে তোমায় ভালোবেসে
আমি যদি জয়ী হতাম— আলো পেতাম না তো।
ভালোবাসার অকূল সাগর বটের পাতায় ভেসে
পাড়ি দিতে চেয়েছি আমি তোমাকে ভালোবেসে।

তোমায় ভালোবেসেছি ব'লে ঋণ
অথবা চুরি ক'রে আমি এই জীবনের দিন
পেয়েছি— চোর ভালোবাসার ধর্মে জ্ঞানী ব'লে
মরণনদী মুছে জীবননদীর পটভূমি
জেনেছে এই নিখিলে শুধু রয়েছো একা তুমি।
যদি এমন চ'লে যাবে তবে
কালের মহাসাগর হ'য়ে রবে
আমার হাতের জলের অঞ্জলি
মন ছাড়া কেউ বোঝে না তাই মনকে আমি বলি।

## তুমি যদি

তুমিই যদি চ'লে যাবে তবে
হরির নামের চেয়েও কেন বড়ো হ'য়ে রবে
তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা
অনন্তকাল বটের গাছে পাতার যাওয়া আসা
তুমি বুঝি যাবে একটিবারের জন্যে এসে ?

যদি এমন চ'লে যাবে তবে
কোনোদিনো স্থির হ'য়ে কি রবে
গাছের পাতা জীবন-নদীর জল
তোমায় পেলে পাবে সে শেষ ফল
ঘুমে– অন্ধকারের ঘুমে এসে।

জানি নদী নীল সাগরো দু-দণ্ডে শুকায়
চিতায় শরীর ফেলে রেখে মনো কোথায় যায়,
তোমার আমার ফুরিয়ে যাবার সময় তবু নেই
জন্মে-জন্মে – তবুও জন্মে-জন্মে ভালোবেসে।

## সূর্য এলে মনে আসে

সূর্য এলে মনে আসে এক-কোটি প্রান্তরের কথা–
অসংখ্য আঙ্গির গাছে উর্ণনাভ– মাছি;
জীবনকে পুনরায় ময়দানবের মতো বুনন করার লোলুপতা
যদিও পিঙ্গল ধূমা কোথাও রয়েছে কাছাকাছি;

ইতস্তত মিনারের রুপালি আগুন;
কেলাসিত হ'য়ে আছে নক্ষত্রের দোষ;
আপাদমস্তক ঘিরে যেন তাহাদের
মৃত এক ডাইনীর সজীব মুখোশ;

দাঁড়ায়ে রয়েছে তারা; মিনারবিহীন
মূর্খ দেশ-দেশান্তের নিচু নীলিমাকে
পুনরায় উর্ধ্বে তুলে– সূর্যের কাছে–
যতোদিন গিরেবাজ পাখি বেঁচে থাকে।

দিকে-দিকে বুলডোর জ্ব'লে ওঠে, তাতে
মানবিক চোখগুলো বিকশিত হয়;

জেব্রা ক্যাঙারু পুমা হলুদ রঙের বাঘ চিতা
পরস্পরের প্রতি মুখোমুখি অনুভাবনায়

চেয়ে থাকে জানালার চিলে ফাঁক দিয়ে,
এক মুঠো ডাইনামোর অন্তরাল থেকে,
স্টেশনের গ্যাসোলিন-মুণ্ডের পিছে;
কৃমিকীটদের মতো স্থির নিখুঁত বিবেকে

খোঁড়লের মতো কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে হৃদয়:
দিকে-দিকে শুরু হ'লো নগরীর ভোর—
এইসব কথা কিছু অতীতের। এক চুল ভ্রান্তির বিপদে
এখন সকল দেশে রয়েছে ভোরের হাড়গোড়।

## জল

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
অন্ধকারে ঘাসের গন্ধ পাই:
কালো বেতের ফলে নিবিড় দিন
কোথার থেকে আবার এলো ভেসে।
মনে পড়ে, জলের মতন ঘুরে অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নিচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার-হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে;

মৃত্যু এলে, ম'রে যেতে হবে
ভালোবাসা নদীর জলের মতন হ'য়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

## মাঝে-মাঝে

মাঝে-মাঝে অন্য সব সত্য থেকে ছুটি
নিয়ে মন জল হ'য়ে মিশে যেতে চায়।
পৃথিবীর চলমান স্পন্দনের বিহ্বলতায়
রণ আছে, রক্ত আছে, রুজি আর রুটি
আছে— খাঁটি ভালোবাসা দিতে গিয়ে ত্রুটি
হ'য়ে যায়: অন্ধকারে হৃদয়ের দায়

বিমুক্ত করার মতো কাকে আর পায়
জল ছাড়া ? চারিদিকে কেবলি ভ্রূকুটি
ছড়িয়ে এ পৃথিবীতে রক্তছাইরেখা
এঁকে মুখে ফেলে দিতে গিয়ে ইতিহাস
নদীর নিবিড় জলে কেবল জলের শব্দ খোঁজে;
যেন কাছে– কোথাও গভীরভাবে রয়েছে সহজে
পৃথিবীর স্নিগ্ধ অন্ধকার জল একা;
কবের বিলীন হংসী আর তার হাঁস।

## এখন ওরা

এখন ওরা ভোরের বেলা সবুজ ঘাসের মাঠে
হো-হো ক'রে হাসে– হো-হো হি-হি ক'রে
অসংখ্যকাল ভোর এসেছে– আজকে তবু ভোরে
সময় যেন ঘোড়ার মতো নিজের খুরের নাল
হারিয়ে ফেলে চমকে গিয়ে অনন্ত সকাল
হ'য়ে যখন বিভোর হ'য়ে আছে;
মাঠের শেষে ওই ছেলেটি রোদে
শুয়ে আছে ওই মেয়েটির কাছে।
অনেক রাজার শাসন ভেঙে গেছে;
অনেক নদীর বদলে গেছে গতি;
আবহমান কালের থেকে পুরুষ-এয়োতি
এই পৃথিবীর তুলোর দণ্ডে সোনা
সবার চেয়ে দামি ভেবে সুখের সাধনা
নষ্ট ক'রে গিয়েছে তবু লোভে;
ওরা দুজন ভালোবাসে অনন্ত ভোর ভরে
এ ছাড়া আজ সকল সূর্য ডোবে।

## ডালপালা নড়ে বার-বার

ডালপালা নড়ে বার-বার,
পৃথিবীর উঁচু-উঁচু গাছে
কথা আলোড়িত হয়; কেমন সে-কথা।
অন্ধকারে শঙ্খ নুড়ি ঝিনুকের কাছে

অবশেষে একদিন থেমে
মনে হয় ক্লান্তির সাগর

মাঝে-মাঝে চেনাতে চেয়েছে তার
দুই-দুই জমিনের ঘর ;

শূন্যে-শূন্যে ঢের মেঘ মুছে গেছে, তবু
নীলিমায় গা ভাসিয়ে দিয়ে শাদা-মেঘ
সারাদিন কি চেয়েছে তবে,
সারারাত কিসের উদ্বেগ।
কেন এই জীবনের সাগরে এসেছি,
হেসেছি খেলেছি কথা ব'লে গেছি কাজ ক'রে গেছি,
আরো কিছু আলো পেলে ভালো হ'তো ভেবে
তবু তার মূল্য সেই প্রাথমিক আলো হারিয়েছি।

হয়তো সূর্যই আলো– আলো মনোহীন;
মানুষের মনন হৃদয়
আলোহীন; অথবা, যা আলো ছিলো– আজ
আলো চাই নব-আলো আশার আনন্দে জ্যোতির্ময়।

## যাত্রা

জানি না কোথাও শুভ বন্দর রয়েছে কিনা;
কোথাও প্রাণের কল্যাণ-সূর্যালোক আছে ?
কোথাও এ অসময় সময়ের নদী পার হওয়া যায় ?
পার হ'লে সাগর কি শান্তি আলো মুক্তির ভেতরে
যাত্রীকে আশ্বাস দেয় ?
মানুষের ভঙ্গুর সাহস ভয় যাত্রা আর জীবনের মানে
স্থান পায়– স্থানে এসে পরিণতি পায় ?
হয়তো বা পেয়ে যায়; অথবা সকলই অন্ধকার।
মানুষ যাত্রা করে–
যাত্রার প্রথম ফল সাগরের পথে নিরাপদে চলা
বন্দরের দিকে নিরুদ্বেগে যেতে পারা
বন্দরের থেকে বন্দরের বাঁধা পথ ছেড়ে দিয়ে
সমুদ্রের বড়ো আবিষ্কারে নেমে পড়া;
হৃদয় অন্তিম ফল হিসেবে আনন্দ চায়
শান্তি চায় নীল মহাসাগরের ভোরের আলোয়
আর একবার তার তারার আলোয়।
মানুষ জাহাজে চ'ড়ে জীবনের সমুদ্রে ভিড়েছে;
সাগর চলেছে– সময় চলেছে– মানুষ চলেছে–
ক্যাবিনের ছ্যাঁদার ভেতরে ঢুকে একা

(সাগরের স্পন্দনের শরীর অসহায়
বমি করে– কাঠবামি হ'লো যেন–
নাড়ি যেন ছেড়ে গেছে ব'লে মনে হয়।)
ডেকে পাইচারি করে একা। একা একা।
বর্শার ফলার মতো আলো এসে পড়ে।
স্তব্ধ হ'য়ে কোনো এক বিন্দুর ভিতরে থেমে থাকা।
অনেকের সাথে পরিচয় হয়, হাসিগল্প চলে,
মন ব্যথা পায়, বোকার মতন লাগে, ভীষণ অবাক মানে;
শোকাবহ ক্লান্তি র'য়ে গেছে; ভয়াবহ বেদ আছে :
সূর্যের নক্ষত্রের জাহাজের বিদ্যুতের আলোর ভিতরে
কেউ-কেউ গুঞ্জরণ উচ্চারণ ক'রে যায়;
কেউ-কেউ অবচেতনায় চেপে রেখে দিতে চায় সব;
কারো-কারো মন স্বভাবত নিহতচেতন;
হাসছে খেলছে গুলগল্পে গরমে মেতে আছে–
খাচ্ছে– ছুটছে– চালানি মালের মতো দিনরাত দিচ্ছে নিচ্ছে
দেহ– ভালোবাসা– (দেহমাংস)–
সারাদিন চামড়া মাংস বিকিকিনি শেষ হ'য়ে গেলে
তারার আলোয় এসে ঘ-মানুষের মতো এরাও মানুষ;
আচ্ছন্ন করুণ, চেতনা জেগেছে, পথ নেই, বিন্দুর ভিতরে
স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে জাহাজ– মুর্গির খাঁচার মতো যেন;
তবুও তা নয়–
আকাশ বিমুক্ত হ'য়ে আছে।
অনন্তে যে কথা আছে সব স্পর্শসহ
বেতারের বুকে এসে ধরা পড়ে;
জিজ্ঞাসার আলোড়ন– প্রশ্নের মীমাংসা– লেনদেন
কেবলি চলেছে সারাদিন।
জাহাজ চালায় যারা বুদ্ধিমান– নৌবিদ্যাপ্রবীণ
তবু বলে : জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধ'রে কেবলি ডুবছে;
যাত্রীরা ম'রে গেছে– নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলি বিপদ আছে বাঁকে– পথে– তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন–
ম'রে যেতে হবে– যাত্রী, তবু চলো–
না ডুবেও ডুবে যাওয়া যায় দুটো সাগরের জলে–
না মরেও প্রতি মুহূর্তেই তবু ম'রে যেতে হয়:
জীবনের বিনিপাত প্রতি নিমেষেই আছে–
প্রতি নিমেষেই জীবন মরছে, যাত্রী, সাগরনির্জন তলাতলে
কোথায় ডুবছে চিন্তা অনুবেদনায় ভরপুর যাত্রীদের মাথা

বুদ্ধদের শূন্যে ভরপুর
মৃত মাথা আপনার জীবনের খবর রাখছে–
কতোবার মৃত্যু হ'লো ভাবছে– গুনছে–
সাগরের তলে– আরো অন্ধকার তলে লীন হ'য়ে গিয়ে তবু
জাহাজের ডেকের ওপরে ফিরে আসা,
খাওয়া, হাসা, খেলা করা, কথা বলা, চিন্তা করা,
বন্ধু হওয়া, ভেক ধ'রে থাকা, পরামর্শ দেওয়া,
রেজিস্ট্রির সময় হয়েছে ভেবে খাতায় স্বাক্ষর ক'রে বিয়ে করা
কাকে যেন : জীবন তো বিবাহিত হয়েছিলো ঢের বার;
বার-বার: বিচ্ছিন্ন হয়েছে বার-বার
হয়তো এ জন্মে নয়– এই দিকে– এই প্রান্তে নয়–
চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে ওঠে;
ঘুমোবার ভান ক'রে প'ড়ে আছে ঢের যাত্রী
ভান ঢের ভালো হ'লে অঘোরে ঘুমোবে;
কারো চোখে ঘুম নেই;
মৃত্যু হ'লে শব সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়–
সেই মৃত্যু নেই;
অন্য এক হেঁটে চলা ব'সে থাকা কথা শেষ–
কথা শেষ না করার মৃত্যু আছে।
এক জোড়া তাস নিয়ে জাদুকর হ'য়ে
খেলা করা যেতো যদি এই অন্ধকারে,
জাহাজ ভর্তি সব পুরুষমেয়েকে যদি খানিক উড়ুক্কু ভোজবাজি
কি ক'রে টুপির থেকে অনেক পায়রা বার ক'রে
উচ্ছ্বাসে ওড়ানো যায়– দেখিয়ে ওড়ানো যেতো হৃদয়কে
অনন্ত রাত্রির দিকে উন্মাদ উৎসবে–
জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধ'রে কেবলি ডুবছে,
যাত্রীরা ম'রে গেছে– নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলি বিপদ আছে বাঁকে– পথে– তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন–
ম'রে গিয়ে তবু
মৃত্যুশীল– মৃত্যুর নিঃশেষ নেই– নেই– যাত্রী চলেছে।

## বিকেলের আলোয়

রাতের কিনারে ব'সে নয়
বিকেলের আলোয় আমি স্বপ্ন দেখলাম :

কোন এক সুদূর মরুভূমিতে চলে গেছি
সেখানে গভীর জ্যোৎস্নারাত
বালির গায়ে বালুকণার শব্দ
(পৃথিবীর পাতা ঝরার মতো)
স্ফটিকের নির্জন আলোর মতো বাতাস
কুমারীর নির্মল মসৃণ দেহের মতো।
কয়েকটি প্রেত উড়ে বেড়াচ্ছে সেখানে
মানুষের শব্দে চমকে হাওয়ার ভিতর হারিয়ে গিয়ে
মরণের কত শত শতাব্দীর পর
সেই ধূসর পরিধি খুঁজে পাবো আমি :
তার সেই হাত আমার জিভকে আচ্ছন্ন করবে
স্ফটিক আলোর মতো বাতাসের অনন্ত নিস্তব্ধতার ভিতর ?

## এখন রাতের শেষে

এখন রাতের শেষে আবার প্রান্তর আছে শ্যাম হ'য়ে প্রান্তরে ছড়ায়ে;
উর্ণনাভের জালে আবার নেমেছে ব্রহ্মা হৃদয়ের কাজ বুঝে নিয়ে:
সেইখানে শান্ত সব শিশিরের স্তূপে
ভোরবেলা থেকে-থেকে জ্ব'লে ওঠে আধ ফুট সূর্যের রূপে:
ঘাসের উপরে সব ভূতেরা গিয়েছে খেলে– জ্যোৎস্নার রাতে
মহেঞ্জোদড়োর থেকে এসে–
তাদের গায়ের ঘ্রাণ এখনো বাতাসে লেগে আছে মনে হয়;
একটি ধবল ঘোড়া সন্দেহ আতুর হ'য়ে পলনিপলের অবলেশে
তাকায়ে রয়েছে দূর চক্রবাল নীলিমার কুয়াশার দিকে :
সেইখানে কারা তবু আছে :
অনেক ধূসর ঘোড়া খেলে যেতো যদি কোনো মেহগনি-অরণ্যে সেখানে,
সোনালি সবুজ শাদা কাকাতুয়াগুলি জটিল শিকড়শীল গাছে
অসংখ্য ভাষায় হেসে খুন হয় কমলারঙিন রৌদ্র ঘিরে,
তাহলে এ-পৃথিবীর রাজনীতিবিদ যোদ্ধা নেতারা এখন
ডুবে যাক সমুদ্রের পুরুভুজ– পাললিক মনের ভিতরে,
যদিও তাদের দেশে জন্মেছিলো অপরূপ নারীমুণ্ড– শঙ্খের মতন শুভ্র স্তন .

## অনেক রক্তে

অনেক রক্তে উত্তেজিত হয়েছে সারাদিন।
অনেক সাধ স্বপ্ন নিয়ে ফিরে
বুঝেছে প্রাণ মহৎ নামের অন্তরালে প্রেমো

ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে মানবশরীরে।

জানি আমি: তবুও ভালোবাসা
মানবদেহ ছাড়া
মানবাত্মা কোথাও পায় নাকো
গভীর নারীশরীরে এর সাড়া।

মানবহৃদয় নির্মিত হয় তাই;
প্রেমিক উপলব্ধি করে নিজের মনের কথা;
ভালোবাসা, তোমাকে ভালোবাসা;
না হ'লে সব জ্ঞানের নিষ্ফলতা।

## এসো

এসো– (এসো– এসো) আমার কাছে তোমার আসা
না হ'লে মরে যাবে না ভালোবাসা;
মানুষ শুধু চায়
কখনো নীল আকাশকে কি পায়
কোনোদিনের কোনো পথের শেষে।
পাখির পালক বটের পাতা হতেছে মলিন;
কোথায় তুমি রয়েছো এতো দিন ?
সময় তোমার আমার হাতে বুঝি
দেবে না আর যতোই আমি খুঁজি
জলের মতন জলের খোঁজে ভেসে।

মন তবুও না হার মেনে চলে
নদীর জলে– পদ্মপাতার জলে
নিজেকে ঢেলে সাজিয়ে নিয়ে মন
সাত সাগরে ঘুরছে আজীবন
খুঁজছে আবার পদ্মপাতার এসে ॥

## যেখানে মনীষী তার

যেখানে মনীষী তার মোম নিয়ে ব'সে আছে রাত্রির ভিতরে
মাথার একটি চুলো (হ'য়ে আছে) লোহার পিণ্ডের মতো ভারি
মনপবনের চাপ খেয়ে
সকল পাহাড় নদী ডিঙিয়ে এখন তাড়াতাড়ি

সেইখানে চ'লে এসো– কাচের গেলাসে তার– জলের ভিতরে
যখনি সে দিতে যাবে নির্জন চুমুক–
যেন তার সব চিন্তা– সব ক্লান্তি– সৃষ্টির প্রয়াস
হঠাৎ দেখতে পায় প্রমত্ত কুকুরদের মুখ।
আমরা শুনেছি তার কাঁধে এই পৃথিবীর ভার–
সর্বদাই তার মনে জন্ম নিতে চায়
নতুন সমাজ চিন্তা কবিতা প্রসাদ।
সম্মুখীন বিষয়ের মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়ায়।
সর্বদাই অসমাপ্ত কর্তব্যের স্তূপে।
তবুও অমূল্য : জল ! যদিও জলের মতো দর।
চলে এসো মনীষীকে গেলাসের ভিতরে দেখাই
মত্ত কুকুরের মতো আমাদের দাঁতের রগড়।

## অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে

অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে তোমার মুখের ছবি ভেসে ওঠে (আবার)
(তোমার মুখ যেন) আমাকে নিয়ে জীবনের (অনেক) সহজ সৌন্দর্যের ওপর
হাত রাখে (আবার)
(মনে হয়) এক প্রান্তরের দেশে চ'লে গেছি আমরা
পশ্চিমের লাল সূর্য যেখানে চাষার মতো তার শেষ বোমা রাখে
যতদূর চোখ যায় সোনালি খড়ের কান্তার
উঁচু-উঁচু গাছের ডালপালা ঘিরে আকাঙ্ক্ষার করুণ ঝটপটানি
কাক-পাখিদের ডানার থেকে ঝ'রে পড়েছে
তাদের নীল মসৃণ ডানা মেঘের কমলা আলোর আভার ভিতর
বেঁচে থাকে সেইখানে
গাছের হলুদ-রক্তিম পাতা খ'সে-খ'সে লাল সূর্যের দিকে উড়ে যায়।

## কবিতার খসড়া

জীবনের ঢের কাজ হ'য়ে গেলে পরে
মনে হয় মানুষের শরীরের ক্ষয়
পৃথিবীর পথে গিয়ে করণীয় অনেক কাজেই
বিধাতার মতো আর নয়।
তখন নিজের কাছে পৌঁছে ক্রমে মন
অন্ধকারে নক্ষত্রের অগ্নির মতন
স্থান পেয়ে সময়ের সমস্ত আকাশে
নিজেকে সংকীর্ণ ক'রে নিয়ে তবু গভীর পৃথিবী ভালোবাসে।

অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে ভুলে বিলোড়িত হ'য়ে
রাত্রিদিন কাছে চ'লে আসে ইতিহাস;
তাকে যা দেবার দিয়ে তারি ভিতর থেকে তবু
জ্ঞান শান্তি বাস্তবতা প্রেমের নিশ্বাস
পাওয়া যায় কোনো-কোনো লক্ষ্য উৎস ব্যক্তির কাছে।
ইতিহাসে শোকাবহ অন্ধ বেগ আছে;
যদিও আঁধার বড়ো, সংকল্প প্রেরণা প্রেম উদাসীন শক্তির মতন
ভেঙে ফেলে; এখনো ভাঙেনি এই অগ্নি এই মন।

## ঢেউয়ে-ঢেউয়ে

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হালভাঙা জাহাজের সাক্ষ্য রেখে দিয়ে–
কুয়াশার ঘণ্টা নেড়ে কম্পাস তৈরি করে– চাকা
ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কল ভেঙে পড়ে গড়ে ভেঙে গড়ে
বেনামি নদীকে নাম দান ক'রে নাম ভুলে গিয়ে
মানুষের বিবরণে কুয়াশায় অন্ধকারে চলেছে মানুষ;
মৃত মানুষের বোঝা, বিধানের হৃদয়ের অবিরল পচনশীলতা,
মড়কের ইঁদুরের অন্তহীন খাঁচা নিয়ে চলেছে– চলেছে–
এ-সবের থেকে তবু উৎসারিত অনুভূতি জ্ঞান
প্রেম পেয়ে এইবার সব কুজ্ঝটিকা
শেষ ক'রে মহাসাগরের ভোরে আলো
আরো আলো পাওয়া যাবে ?– আরো গাঢ় সম্মিলন ?
নদীর ও নীল সমুদ্রের আরো বড়ো রেখা ?
বলয়ের পরে আরো বলয় রয়েছে;
সেখানে অন্তিম শূন্য আছে;
শতকের মহাশতকের
উজ্জ্বলতা আছে।
শ্মশানের স্তব্ধতাও ভালো, তবু উৎস আলো শান্তি প্রীতি সব
ভিতরের– উপরের– সূর্যের লক্ষ্যে প্রয়াণের।

## হেমন্তের নদীর পারে

মাঝে-মাঝে মনে হয়
হেমন্তসন্ধ্যায় ওই বৃক্ষদের মুখ দেখে
আবছায়া নদীর দর্পণে :
যে-বিতর্ক লোপ পায় বালিকার মেধে
অথবা যুবার চিত্তে অকালজটীর মতো আশ্চর্য নির্বেদে
কিংবা যোদ্ধৃদের প্রাণে সারাদিন বায়ু-কুকুরের মতো ঘুরে–

তবু মানুষের সাথে শুক্ল পরিচয় চেয়ে নিশীথের ভূমিকায়
সেইসব চিন্তা এসে পিতাদের হৃদয়ে দাঁড়ায়।

## মৃত, বর্তমানে উপেক্ষিত কবিদের উপর অনেক সমালোচনা প'ড়ে

শিল্পের উন্মার্গ নিয়ে বেঁচে ছিলো যারা পৃথিবীতে
তাহাদের তাপ যদি এক মাঘে জন্ম নিয়ে অন্য এক শীতে
হ'য়ে যেতো পৃথিবীর ভূস্তরে বিলীন,
তাহলে হৃদয়ে আর অহংকার থাকিতো না ভাষ্যকারদের;
মৃত্তিকার সাত হাত নিচে থেকে কবিও পেতো না তবে টের
যেইসব ব্যূঢ় চিন্তা একদিন করেছে সে মানুষের মতো দেহ ধ'রে
বিষুবরেখার সাথে ঘুরে
তাহারা বিষাক্ত সাপ যেন আজ: আর সবি ভারতীয় খেলার সাপুড়ে।

## শিল্পী

জীবন কাটায়ে দেয় যে-মানুষ সূক্ষ্মতর শিল্পচিন্তা নিয়ে,
ফলকের পর ক্ষুদ্র নিয়ন্তা রেখার টানে ফেলেছে যে সীমানা হারিয়ে,
সেইসব মানুষের আত্মা যেন বিস্রস্ত মুকুরে
কেবলি নড়িতে আছে জলের আভার মতো উদ্বিগ্ন দুপুরে।
অথবা আশ্চর্য হংসী অব্যর্থ ডানার অসংযমে
নির্ঝরের কোনো এক রূপালি শঙ্কের মতো মাছকে প্রণয়ী ব'লে ভেবেছিলো ভ্রমে;
আজো ভাবে; বরফের মতো শাদা ডানা নিয়ে পিঙ্গল ঢেউয়ের পিঠে চড়ে
যখন সে তীর খেয়ে– অথবা রক্তের হর্ষে সৌরপৃথিবীর মতো ঘোরে !

## আমাদের বুদ্ধি আজ

আমাদের বুদ্ধি আজ অন্তহীন মরুচর, তাই
প্রাণে শুধু বিষয়ের নিত্য দাহ আছে।
তার শান্তি সময়ের সাগরের কাছে
হয়তো বা পাওয়া যেতে পারে;
কিন্তু কোন্ সময়ের দিকে যেতে হবে ?
শূন্যের ভিতরে ফল যেখানে রয়েছে মনে হয়?
অথবা যেদিকে গিয়ে হৃদয় ক্রমেই
শান্ত হ'য়ে টের পাবে শূন্য ছাড়া আর কিছু নেই ?

তবুও সূচনা থেকে যাত্রা ক'রে কোনো প্রান্তে যাওয়া
ভালো; কোথাও চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে
বৃক্ষ নদী কুজ্ঝটিকা রক্তের আকাশ শতাব্দীর ভাঙা বাটখারা;
মূল্যনির্ণয়ের কাজে উঠছে পড়ছে–
ঘর বাড়ি সাঁকো নীড় ঘাস
ক্রেন এরিয়েল ট্রেন– গুনচট চালানির মাল
যে-সাগর রোদে চলে– তবু কালো কুয়াশাকে আলো
মনে ভেবে অনাবিলভাবে চলে
বেতার কম্পাস বাষ্প কলকব্জা হাল মাস্তুলের
হাড়গোড়ে বুক ভ'রে কর্মোৎসাহী ব্যাপারীর মতো
সোনা-রুপো চলতি বাজারদর জানার ও জানবার বেগে,
চ'লে যায় অন্ধকারে ভেদ ক'রে
অদ্ভুত আবছা মূর্তি বুকে টেনে নিয়ে
বদ্বীপ ও বন্দরের দিকে,
চেতনার সে-রকম চলা হ'লো ঢের।
দূর কাঁটা কম্পাসের দিক্‌চিহ্ন আজ
ক্রমাগত শূন্যে বিলীন ?
একদিন যা-কিছু স্পষ্ট মনে হয়েছিলো
সে-সব এখন আর স্থির
নির্ধারিত সত্য নয়;
আলো বেড়ে গেছে; আবছায়া আরো
বেড়ে গেছে;
আলো আরো বাড়লে ভয়াল পতঙ্গ সব ঘিরে রবে;
শত্রুদের দণ্ড আরো বেড়ে যাবে;
অনিশ্চিত বড়ো অন্ধকার সব দ্যাখা যাবে;
হয়তো আগুনে পরিণত হ'য়ে যাবে আলো।
হে হৃদয়, তবুও আঁধারদর্শী চেতনা-বলের দরকার।
দূর থেকে আরো দূরে যাত্রার প্রয়োজন আছে।
ভুল ছেড়ে অন্য এক শুদ্ধ কেন্দ্রে গিয়ে–
তাও ঠিক শুদ্ধ নয়– কি হবে দাঁড়িয়ে।
জন্মের আগে সেই কুজ্ঝটিকা ছিলো,
মৃত্যুর পরে সেই অন্ধকার নিঃশব্দতা রবে,
সেইসব কিছু নয়;
জেনে মন চলেছে নতুন সূর্যে দিক্‌নির্ণয়ে
কিছু সূর্য– ঢের বেশি ছায়া দিয়ে হৃদয়কে ভরে
মধ্যবয়সী প্রৌঢ় অস্থির আত্মার বর্ণে
বার-বার সূর্য ভেঙে গড়ে।

## টেবিলে অনেক বই

এইবার চিন্তা স্থির করবার অবসর এসেছে জীবনে
হৃদয় বয়স্ক হ'লো ঢের;
মোম জ্বলে নিভে যায় অনেক গভীর রাত হ'লে
অন্ধকারে এক-আধটা আবছা ইঁদুরের
আসাযাওয়া টের পাই ঘরের মেঝেয়
হয়তো বা সিলিঙের 'পরে
বাইরে শিশির ঝরে কুয়াশায়– শীতে
লক্ষ্মীপেঁচার ডানা সজনের ডালে শব্দ করে

টেবিলে অনেক বই ছড়িয়ে রয়েছে;
চিন্তাগুলো যেন অনুলোম-প্রতিলোম
পরস্পরের প্রতি– ঠাণ্ডা শাদা নারীর মতন
দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপে মোম–
একটি গভীর সূত্রে গ্রথিত কি হবে
বইয়ের সকল চিন্তা জীবনের সব অভিজ্ঞতা ?
সকল নক্ষত্র আর সময়ের অপার গতির
ইতিহাসবৃত্তান্তের আগাগোড়া কথা ?

এ-সব আশ্চর্য তত্ত্ব ভেবে তবু মন
অনুভব করে এই অন্ধকার ঘরে আজ কেউ
নেই, শুধু এক বিন্দু মূল্যনির্ণয়ের চেষ্টা ছাড়া।
কোনো এক দূর মহাসাগরের ঢেউ
এসে এই অন্ধকার বন্দর স্পর্শ ক'রে চুপে
কোন্ এক দূর দিকে চ'লে যায়, তবে
সময়ের অন্তিম সঞ্চয়ে প্রেম-করুণার বলয় রয়েছে ?

ব্যক্তির ও মানবের সফলতা হবে ?
হয়তো এ-ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশ অন্ধকার ছাড়া
মানুষের ভবিষ্যতে কিছু নেই আর;
সেবা ক্ষমা স্নিগ্ধতা যে-আলোর মতন
মানুষের হাতে, তার বুঝে-যাওয়া অন্ধ আধার
বার-বার বড়ো এক পরিবর্তনীয়তার দিকে
যেতে চায়– সনাতন অন্ধকারে এ-প্রয়াস ভালো:
তবু এই পৃথিবীতে প্রেমের গভীর গল্প আছে।
জীবনে রয়েছে তার (অপরূপ) প্রতিভাত আলো।

## কখনো মুহূর্ত

কখনো মুহূর্ত আসে সূর্য আর শিশিরের জলে
ব'সে থাকবার মতো–
অথবা কখনো দেখি দিন নিভে গেছে
হরিয়াল প্রান্তরের পারে চ'লে গেছে
ডানার ঝিলিকে তার সবচেয়ে শেষ রোদ্দুর
জ্বালিয়ে সে সূর্যকে নিভিয়ে এবার নিভে গেলো।

পৃথিবীতে এইবার নদীর নিজের ঠিক মুহূর্ত এসেছে;
টেরচা বাঁক ভাঙা পাড় দিয়ে হেঁটে-হেঁটে
মনে হয়, মানুষের হাতে-গড়া সাঁকো
কোনো প্রতীকের মতো বস্তু নয়,
দিক্‌দর্শনের মতো নিজেই রয়েছে এই নদী
অন্ধকার জল থেকে ধূসর জলের দিকে চ'লে যায়, গেছে;
আজকের কালকের আগামী কালের
নিরিখ ও নাবিককে বুকে ক'রে নিয়ে চ'লে গেছে;
জীবনকে নৌবিদ্যা শেখায়
ঝড়ে আর শান্ত জলে ঘূর্ণি জলে চোরাবালি পাঁকে
ঢের-বার তোমাকে আমাকে গ্রাস ক'রে
আবার ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীর পটে– পটান্তরে– হৃদয়ে– বিষয়ে
দ্রুত ধাবমান শাদা-কালোর রঙের অক্লান্ত ভূমিকায়
যেতে চায় কোনো এক সাগরের দিকে
মানুষের বিবরণ প্রাচীন হয়েছে ঢের
আমাদের সকলের বয়স বেড়েছে খুব
নদী এসে বার-বার যযাতিকে যৌবন দেয়
ঘনজলধন্যা নদী– স্থবিরতা নেই;
পাড় ভেঙে ফেলে পাড়া প্রান্তরের দিকে চলে
যেন সে-আকাশ নীল– আকাশের ঝড়– দুই দিকে তীর আছে– নেই
যেইখানে রাষ্ট্র নেই– স্থবিরতা নেই;
পাড় ভেঙে ফেলে পাড়া প্রান্তরের দিকে চলে
যেখানে মানুষ নেই– অমানুষের ভিড় মরা-আধমরা
হাড় আছে রক্ত আছে বালি ফণিমনসার কাঁটা
নিয়ন টিউব গ্যাস বিদ্যুৎবাতির বিহ্বলতা
এইসব আলোড়ন ভাঙা শূন্য কান্তি আর নীড়
ভেদ ক'রে বিষ গিলে অমৃতকুম্ভের মতো কোলাহলে
ঢের মৃত নাবিককে নিমগ্ন নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে
নব-নব নাবিকের জন্ম দিয়ে তারা আর সূর্যের আলোয়
মাছরাঙা-বর্ণিমায় অন্ধকারে রোদের ঝিলিকে

কেবলি ব্যক্তির মন ভেঙে নিয়ে-নিয়ে নদী নব-নব জল গড়ে নিলো
ইতিহাসবেলা ভেঙে অসীম সাগর
সিন্ধু অতিক্রম ক'রে অপার আকাশ
মানুষকে অতিক্রম ক'রে ফেলে নবীন মানব
নব শীত নব রাত্রি বিপদের দিক্‌চক্রবাল
লক্ষ্য করে অবিরল জলকল্লোলের রক্ত, জল,
আর মরুভূমির মানব চলেছে অবিরল।

## সুদীর্ঘকাল তারার আলো

সুদীর্ঘকাল তারার আলো মোমের বাতির দিকে
তাকিয়েছিলো দুজন ওরা : শান্ত কক্ষে নীল জানালার পাশে
কাছাকাছি দুটো তারা : আলোকবর্ষ অনেক আলোকবর্ষ গেলে পরে
কাছে-কাছে থেকে তারা রবে কি প্রবাসে ?
এই তারাটির আলো গিয়ে পড়বে না কি অপর তারার বুকে
মনের গভীরতম সুখে– সমস্ত অসুখে ?
এ-নক্ষত্র ঝ'রে গেছে হয়তো তখন কালের নিয়মে
ও-নক্ষত্রে পৌঁছাতেছে হয়তো তখন সে-অনুপম মৃত তারার আলো
এমনি পটভূমির ভুলে কি আমাদের সময় ফুরালো ?
ফুরিয়ে যাক– ভুল তো নয়, সে-ভুল যদি সত্য মনে হয়
জীবিত বা মৃত তারা বিশ্ব-অন্ধকারের আড়াআড়ি
অন্য মৃত বা জীবিত তারার দ্যাখা চেয়ে
সময় কি শেষ করতে পারে ? আমরা তো তা পারি।

ওই তো নারী ব'সে আছে হয়তো মৃত তারা;
এই তো আমি তাকিয়ে আছি তারার আলোর মতো
আমরা দুজন অতল অমায় হয়তো নিভে গেছি;
পাশাপাশি জ্বলেছিলাম, অনন্তকাল জ্বলছি; প্রেমের অনির্বাণ-স্বভাববশত।

## কবের সে-রাত্রি আজ

কবের সে-রাত্রি আজ মনে পড়ে প্রিয়।
হঠাৎ এঞ্জিনরোল স্তব্ধ হ'লো অন্ধকারে এসে
দিল্লির না লাহোরের বসন্তরাতের টার্মিনাসে,
অপ্রদীপ রাত্রি রীতি অহেতুক উৎসারিত জিনিস হৃদয়ে
ক্লান্ত শরীরের পরে তবু প্রিয় মননের জয়ে
ঈষৎ উৎসবে মেতে হুইলার স্টলের নিকটে বসেছিলো

চা খেয়ে দু-এক কাপ বইগুলো নেড়েচেড়ে
তারপর কখন অনেক রাত হ'লে
মানব আত্মার ক্রান্তি আঁধার সমুদ্র বেয়ে চেনা
ধু-ধু ঢেউদের সোরগোলে
কখন নিজেকে দেখে অচেনা পালকদামে আধা
বিভূষিত পাখি এক ঢেউয়ের উঠতি পথে শাদা
চাঁদের আলোয় দূর সুমুখের সমুদ্র নির্জন পরিষ্কার।
সাগরের পার দিয়ে দূর দিগন্তের টেলিগ্রাফ তার।
অথবা তা স্নিগ্ধ এক বাতাসের সুর;
সময় চলেছে নিজ পথ কেটে বাতাসের মতন বিধুর
সেখানে প্রেমের কোনো কথা
পৃথিবীর শারীরিকতায় প্রিয় নারীমুখ কেউ
সৈকতের স্পর্শহীন চাঁদের দুয়ারে দূরে র'য়ে গেছে ব'লে
কবেকার অ্যামিবার নীড় ভেঙে ঋজু নীল সমুদ্রের ঢেউ
মানবজাতির চোখে কেঁপে উঠে আজ
দ্যাখাতেছে কাকে বলে প্রকৃতির বিচ্ছেদের রাত
অথবা তা সমাজের প্রেমিকের হৃদয়ের...
এইসব অবিচ্ছিন্ন অনুভব অন্ধকারে থামবে হঠাৎ
কখন দাঁড়ালে তুমি নারীর মতন কেশপাশে।

নারী তুমি আমার না অপরের ?
কাহার পায়ের সুর যেন নেমে আসে
তোমার চোখের সুরে– অপরের অথবা আমার ?
বাতাসে অগুরু গন্ধ ভেসে ওঠে বাতিহীন রাতে
মৃত যারা ম'রে গিয়ে অন্ধ স্নিগ্ধ দিক্‌প্রান্তে সব
সময়ের বিছানায় শুয়ে আছে সব ক্ষোভ ভুলে
তাদের প্রশান্তি এই মেয়েটির আজানুলম্বিত ঘন চুলে
মৃতদের কাছ থেকে এরকম স্বাভাবিক ঋণ
সহজে গ্রহণ করে নারী
দাঁড়ায়ে রয়েছে শাদা সুধাস্পর্শসাক্ষরিত হ'য়ে
কোটি কাল আগে আমি পৃথিবীতে সেই এক শরীর ছিলাম
যেই এক শরীরিণী জীবনীকে চেয়ে
অনেক নক্ষত্র ক্রান্তি শেষ ক'রে সময়ের রূপ ভেঙে গড়ে
সে আজ নিকটে এসে দাঁড়ায়েছে অগণ্য আঁধার
ভেঙে ফেলে পুনরায় অন্ধকারে দাঁড়াবার সাধ
যেইসব দূর-দূর দূরতার নক্ষত্রের
তাদের শখের মতো মেয়েটির গভীর চুম্বক
সৃজনের শোকাবহ অন্ধকারে কান পেতে কোন্ দূর অবক্ষয়ধূসর তারাকে
নিজের অভ্রান্ত একা আয়ুহীন কক্ষলোকে ডাকে

সেই নারী– কোথাও যুবক বুঝি বিশৃঙ্খল অন্ধকারে তাকে
নিয়ে গেছে- নিয়ে যাবে– নিয়ে যেতে পারে--
টার্মিনাসে মরু দিপ্তির রাত ভেঙে ফেলে আমরা দুজন
নক্ষত্রের পথে অন্য নক্ষত্রের আলাকবর্ষের সহ-অসহমরণ
প্রতিভাত ক'রে নিয়ে নেমে গেছি কিছু দূর পৃথিবীর অসুখে আলোকে

হাতে তার দু-চারটে বই, স্টলের চায়ের
ঈষৎ সুমিষ্ট ঘ্রাণ– হৃদয়ে অ্যামিবা ঊর্মিময় এক নীল
সাগর অনন্তকাল পথ চ'লে আজ গভীর ফেনিল
মানুষের প্রমিতির মৃত পত্রে নীলোচ্ছ্বাস হ'য়ে গেছে ব'লে বুঝি
ব্যথায় আতুর হ'য়ে বলেছিলে 'প্রিয়'
আমাকে না আমাদের দুজনের পাশে যে তৃতীয়
যুবক দাঁড়ায়েছিলো তাকে ?
অনাথ অঙ্গার হ'য়ে সৃজনের দ্রুত অন্ধকারে
আমার মতন যুবা– হাতে ধরা মোমের বাতির মতো জ্ব'লে
উঠে যেতে-যেতে চুপে অনন্ত সরল বক্র সিঁড়ির দু-ধারে
দেখেছে বেপথুমান মানবের মহামানবের যান
ক্রমাগত নিভে যেতে থাকে
তারপর দেখেছিলো দেখেছি যে সূর্যচক্ষে
সংক্রান্তি সবিতার মতন তোমাকে।

## এইখানে সূর্যের

এইখানে সূর্যের ততো দূর উজ্জ্বলতা নেই।
মানুষ অনেকদিন পৃথিবীতে আছে।
'মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার
ক্রমেই আলোর মতো হ'তে চায়–
ওরা বলে, ওরা আজো এই কথা ভাবে।
একদিন সৃষ্টির পরিধি ঘিরে কেমন আশ্চর্য এক আভা
দেখা গিয়েছিলো; মাদালীন দেখেছিলো– আরো কেউ-কেউ;
অম্বাপালী সুজাতা ও সংঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
আড়ালে আর-এক আলো দেখেছিলো;
হয়তো তা লুপ্ত এক বড়ো পৃথিবীর
আলোকের নিজ গুণ,
অথবা তখনকার মানুষের চোখের ও হৃদয়ের দোষ।

এই বিশ শতকে এখন
মানুষের কাছে আলো-আঁধারের আর-একরকম মানে;

যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই
সেইখানে অন্ধকার;
যেখানে চিন্তার ধারা রীতিহীন  শব্দের প্রয়োগ অসংগত
প্রাণের আবেগ ঢের শতকের আঘ্রাণ চেষ্টায়
যেখানে সহিষ্ণু স্থির মানুষের সাধনার ফলে
বিপ্লবিনী নদীর বাঁধের মতো হ'য়ে  তবু কোনো একদিন
কেন যেন জলের গর্জনে আলুলায়িত হয়েছে
সেখানে (ওদের মতে) আলো নেই;
অথবা নিজেকে নিজে প্রতিহত ক'রে ফেলে আলো
সেইখানে অন্ধকার।

মনীষীরা এরকমভাবে আজ শুদ্ধ চিন্তা ক'রে
সমাজের কল্যাণ চায়,
দিক্‌নির্ণয় করে।
অটুট বাঁধের মতো মনে হয় জ্ঞানীদের মন যেন—
টেনিসির দামোদর অথবা কোশীর।
তবুও আগুন জল বাতাসের প্লাবনের মানে
সেতু ভেঙে নব সেতু প্রণয়ন; আজ তা আত্মস্থ সেতু জানে ?
মাঝে-মাঝে বাসুকির লিপ্ত মাথা টলে,
ক্লান্ত হ'য়ে শান্তি পায় অপরূপ প্রলয়কম্পনে;
পৃথিবীর বন্দিনীরা হেসে ওঠে।...
রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায়
সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই।
অনেক কল্যাণশীল নগর  জাগছে;
সেইখানে দিনে সূর্য নিজে,
নিয়ন টিউব গ্যাস রাত্রির;
উন্মুক্ত বন্দর সব নীল সমুদ্রের
পারে-পারে মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে
নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে।
সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে ?

দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এলে শাদা ডানার ঝিলিকে
আলো ঠিকরিয়ে গেলে বুঝেছি সংবাদবাহী আশ্চর্য পায়রা
উড়ে যায় সূর্যকে টুকরো ক'রে ফেলে;
খণ্ড আলোর মতো সঞ্চারিত করেছে আবেগে
প্রকৃতিতে; কোনো-কোনো মানুষের বুকে; তারপর
মানুষের সাধারণ ভাবনার বজেট ইনকম-ট্যাক্স প্রভৃতি বিষয়ে
ঠেকে নিভে গেছে।

উৎসবে হৃদয়ে-মনে কাজ ক'রে গেছে একদিন;
সমুদ্রের নীল পথে মহেন্দ্র চলেছে
সমস্ত ভারত শিলালিপির উদ্যমে আনন্দে ভ'রে গেছে;
এ-রকম উৎসাহের দিন আজ তবুও তো নেই আর ?
আমাদের কাজ আজ হক হলা, কিছু দূর চিন্তার সাধুতা
ততো দূর শব্দযোজনার সতর্ক সংগতি নিয়ে;
মাঝে-মাঝে হৃদয়েরো খুচরো-টুকরো ব্যবহারে;
(শাদা কালো রং এসে বার-বার– কেবলি মিশছে অন্ধকারে)
সে-হৃদয় মানুষের আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়
শচীর মতন এসে দাঁড়াচ্ছে;
অথবা সে ইন্দ্রাণীকে ভেদ করে অহল্যার মতো;
সহস্র চোখ না যোনি এতোদিন পরে আজ কলকাতায় ইন্দ্রের শরীরে ?
ইন্দ্র আজ এরা– ওরা ?
ইন্দ্রের আসনে আজ বেটপকা অন্তত বসা যায়
শুল্ক আয়কর সুদ– বেশি সুদ অল্পকে অস্পষ্টভাবে দিলে।

•

আজো তবু অবিরাম প্রয়াণ চলেছে মানুষের :
শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাস্বা জ্ঞান
জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি খুঁজে তবু প্রেম
পাওয়া যায় কিনা তার অক্লান্ত সন্ধানে ?
মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে
আবার যুদ্ধের ছায়া;
পটভূমি দ্রুত স'রে গেলে রূঢ় দেয়ালের মুখোমুখি এসে
আমরা সূর্যের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা
চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেথলেহমে হারিয়ে ফেলেছি–
তাকে শিশুসরলতা মূর্খের আরাধ্য স্বর্গ ভেবে
সূর্যের মাধ্যন্দিন বড়ো ভাস্বরতা
এখনো পাইনি খুঁজে।

এখানে দিনের– জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই;
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনো আসেনি।
চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না-ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোনো-এক মৃত পৃথিবীর
ভেতরের চিহ্ন ব'লে মনে হয়; তবু
মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা;
আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ নগরগুলো সে-রকম
আন্তরিকভাবে মৃত নয়।
বাজারদরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে
জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে

যেন কোনো জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে;
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে; ছিন্ন হ'য়ে; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে– অথবা নিজের দেশ– নিজের নেশন
সবের উপর সত্য মনে করে; জ্ঞানপাপে, অস্পষ্ট আবেগে।

মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা যদি হাইড্রোজেনে
পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় তবে হ'য়ে যাক :
এরকম অপূর্ব অপ্রীতি চরিদিকে
আমাদের রক্তের ভেতরে অনুরণিত হচ্ছে।
কোথাও সার্থককাম কেউ নয়;
আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড়ো সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার-যার নিজের জিনিস,
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়।
এইখানে মর্মে কীট র'য়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে
রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।
প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজনমতো তাতে নির্মলতা আছে।
আরো কিছু আছে তাতে; যেন মানুষের সব-রকম প্রার্থনা
মিটিয়ে বা না-মিটিয়ে প্রকৃতি ঘাসের শীর্ষে একফোঁটা নিঃশব্দ শিশিরে
নিঃশব্দ শিশিরকণা– সব মূল্যবিনাশের তীরে।

পাখিদের ডানা-পালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের আচ্ছন্নতা নেড়ে
বাতাসের মুক্ত প্রবাহের মতো; যেন কোনো ঘুমন্তের মনে
কথা কাজ চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এলো।

চারিদিকে অবিরল নিমিত্তের ভাগীর মতন
এইসব আকাশ নক্ষত্র নীড় জল;
মানুষের দিনরাত্রি প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
র'য়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোয়।
কেউ তাকে না বলতে এ-পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
দ্যাখা দেয়; কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের ঢেউ তার কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে;
নিসর্গের কাছে থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভ'রে যায় : সময় সন্দিগ্ধ হ'য়ে প্রশ্ন করে, 'নদী,
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি ? মানুষের হৃদয়ের থেকে ?'

## এখানে নক্ষত্রে ভ'রে

এখানে নক্ষত্রে ভ'রে রয়েছে আকাশ,
সারা দিন সূর্য আর প্রান্তরের ঘাস;
ডালপালা ফাঁক ক'রে উঁচু-উঁচু গাছে
নীলিমা সিঁড়ির মতো সোজা, আঁকাবাঁকা হ'য়ে আছে

যে যাবে– যে যেতে পারে তার; নিচে রোদের ভিতরে
অনেক জলের শব্দে দিন
হৃদয়ের গ্লানি ক্ষয় কালিমা মুছায়ে
শুশ্রূষার মতো অন্তহীন।

## উনিশশো চৌত্রিশের

একটা মোটরকার
খটকা নিয়ে আসে।

মোটরকার সব-সময়েই একটা অন্ধকার জিনিস,
যদিও দিনের রৌদ্র-আলোর পথে
রাতের সুদীপ্ত গ্যাসের ভিতর
আলোর সন্তানদের মধ্যে
তার নাম সবচেয়ে প্রথম।

একটা অন্ধকার জিনিস :
পরিষ্কার ভোরের বেলা
দেশের মটরশুঁটি-কড়াইয়ের সবুজ খেতে-মাঠে হাঁটতে-হাঁটতে
হঠাৎ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখছি
লাল সুরকির রাস্তার ভিতর দিয়ে
হিজলগাছদুটোর নিচে দিয়ে
উনিশশো-চৌত্রিশের মডেল একটা মোটরকার
ঝকমক করছে, ঝড় উড়িয়ে ছুটেছে;
পথ-ঘাট খেত-শিশির স'রে যেতে থাকে,
ভোরের আলো প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে কোণের বধূর মতো সহসা অগোচর,
মাঠ-নদী যেন নিশ্চেষ্ট,
সহসা যেন প্রতিজ্ঞা হারিয়ে ফেলে,
এই মোটর অগ্রদূত,
সে ছুটে চলেছে
যেই পথে সকলের যাওয়া উচিত;
একটা মোটরকারের পথ

সব সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

স্ট্যান্ডে
শহরের বিরাট ময়দানের পুবে পশ্চিমে– ফুটপাথের পাশে
মোটরকার;
নিঃশব্দ।
মাথায় হুড
ভিতরের বুরুশ-করা গভীর গদিগুলো
পালিশ স্টিয়ারিং-হুইল হেডলাইট;
কি নিয়ে স্থির,
কলকাতার ময়দানের একটা গাছ অন্য কিছু নিয়ে স্থির,
আমি অন্য কিছু নিয়ে স্থির;
মোটরের স্থিরতা একটা অন্ধকার জিনিস।

একটা অন্ধকারের জিনিস :
রাতের অন্ধকারে হাজার-হাজার কার হু-হু ক'রে ছুটছে
প্যারিসে– নিউইয়র্কে– লন্ডনে– বার্লিনে– ভিয়েনায়– কলকাতায়–
সমুদ্রের এপার ওপার ছুঁয়ে
অসংখ্য তারের মতো,
রাতের উল্কার মতো,
জঙ্গলের রাতে অবিরল চিতার মতো,
মানুষ-মানুষীর অবিরাম সংকল্প ও আয়োজনের অজস্র আলেয়ার মতো
তারাও চলেছে–
কোথায় চলেছে, তা আমি জানি না।

একটা মোটরকারের পথ– মোটরকার
সব-সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।
আমি অতো তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না;
আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে-হেঁটে পৌঁছুবার সময় আছে,
পৌঁছে অনেকক্ষণ ব'সে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।
জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য সফলতার উত্তেজনা
অন্য সবাই এসে বহন করুক : আমি প্রয়োজন বোধ করি না :
আমি এক গভীরভাবে অচল মানুষ
হয়তো এই নবীন শতাব্দীতে
নক্ষত্রের নিচে।

## এইসব পাখি

সারাদিন পাখিগুলো কোন আকাশ থেকে কোন আকাশে থাকে।
শহর কলকাতার শহর যেন পাখিহীন হ'য়ে থাকে;
পাখিদের আমি সবচেয়ে বড়ো ক্যাপিট্যাল মনে করি;
জুটমিলের মালিকদের মতো অন্যরকম–
কিন্তু কলকাতা কি শুধু জুটওয়ালাদের ?
কলকাতা আমাদের,
এবং কলকাতা কলকাতাও পাখিদের ;
কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দ্যাখা দেয় মিলাবার আগে
এইখানে সে-আকাশ নেই;
রাতে নক্ষত্রেরা সে রকম
আলোর গুঁড়ির মতো অন্ধকারে অন্তহীন নয়।

তবুও আকাশ আছে :
অনেক দূরের থেকে নির্নিমেষ হ'য়ে
নক্ষত্র দু-একজন চেয়ে থাকে;
চেয়ে থাকে আমাদের দিকে–
যেন টের পায়
পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা– সব কথা বলা
ডাভেন্ট্রিডোমেই টাসে স্টেফনিতে
যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির
মরুভূমি সৃষ্টি ক'রে গেছে;
– কোনো কথা কোনো গান
কাউকেই বলে নাই;
কোনো গান
পাখিরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা স্তব্ধতার দেশে
তুমি আর আমি দুই বিভিন্ন রাত্রির দিক থেকে
যাত্রা ক'রে উত্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে
এখন মিশেছি।

এখন বাতাস নেই– তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মতো সময়ের।

কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারাদিন
হংসের আলোর কণ্ঠ র'য়ে গেছে;
সারা দুপুর পাখিগুলো দূরের থেকে আরো দূরে কোথায় চ'লে যায় !
শহর দরিদ্র হ'য়ে পড়ে।
শহর নির্জন হ'য়ে পড়ে।

ধীরে-ধীরে বিকেলের নরম আলো
নরম আলো পৃথিবীতে নামে;
ভিস্তির জলে তখন রাস্তা ঠাণ্ডা,
রাস্তায় ছায়া;
ব্যস্ততা তখন কম– আরো কম;
পাখিদের তখন পৃথিবীতে নামবার সময়;
রোদের রঙ তখন পেঁয়াজি,
রোদের রঙ তখন সোনালি,
রোদের রঙের সময় শুধু তখন;
ক্লাইভ স্ট্রিটের জানালাগুলোও সচকিত হ'য়ে ওঠে :
পৃথিবী কোন্ জিনের সমুদ্রের ভিতর চলে গেলো !

পাখিরা তখন আকাশ থেকে নামে,
বলে তারা : 'এমনতর কলকাতায় থাকতে পারা যায়;
এই সন্ধ্যার সমুদ্রে
আমরা গোলাপের পাপড়ির মতো খ'সে পড়ছি।'
অনেকক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে দেখি আমি
চারদিকে পাখনা পালক;
পালক আর পাখনা
কলেজের উঁচু-উঁচু দেবদারু গাছের ভিতর ঘুরে যাচ্ছে;
দেবদারু পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার ডিমের মতো সূর্য
রুপোর ডিমের মতো চাঁদ,
শিশির ঝরছে;

কলকাতা ?
কলকাতা !

## জার্নাল : '৩৬

বিস্মৃতি ধুলোর মতো জড়ো হয় যেইখানে–
সেই হিম নিস্তব্ধ আঁধারে

একবার– আধবার– চেয়ে দেখি
আজো আমি সেইখানে তাকে
খুঁজে পাই:–
নিচের তলায় ঠাণ্ডা রোগা অন্ধকারে
রেলিঙের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছে;–
আলোর বেগের মতো প্রাণ
ছিলো সেই যুবকের :
সূর্য আর নক্ষত্রের যেন সে সন্তান।

তবু তার ভালো লাগে আজ স্থবিরতা;
সেখানে সময় শুধু ধূসর ঘড়ির মুখে কথা
ব'লে ক্লান্ত– ক্লান্ত ক'রে রাখছে হৃদয়;
ব'সে থেকে ব'সে নেচে ব'সে থেকে মানুষের ক্ষয়
সেখানে একটি নারীর জন্য হয়।

আমার এ-জীবনের দীর্ঘ– দীর্ঘতর স্তর– অলিগলি ঘিরে
ঈশ্বর বাসনা স্বপ্ন– কতোবার গেছে সব ছিঁড়ে।
শুধু তার প্রতীক্ষা আমাকে
কুশপুত্তলির মতো বার-বার সৃষ্টি ক'রে চলে।
ব্রহ্মাণ্ডের কতো সৃষ্টি– কতো প্রলয়ের কোলাহলে
টলে না তবুও তার প্রেমিকের মন।
তবু সে খাতক, আহা, সময়ই প্রকৃত মহাজন।

## জর্নাল : ১৯৩৪

খানিকটা দূরে লাইন– রেলের কঠিন লাইন সব
অন্ধকারে রয়েছে নীরব;
এখানে ঘাসের 'পরে শুয়ে আছি কার্তিকের রাতে:
অসংখ্য আলোর বিন্দু নেভাতে-নেভাতে
আবার জ্বালায় বারে-বারে
নক্ষত্রেরা আকাশের এপারে– ওপারে :

হঠাৎ রেলের লাইন কেঁপে ওঠে : হিস হিস–
চারিদিকে রূঢ় কলরব;
এক সারি গাড়ি আলো কালো ধোঁয়া বিদ্রূপ বিপ্লব
তবুও যখন তার লাল আলো মুছলো কুয়াশায়
পৃথিবীর আদি দায় অনাদির দায়

ফুরিয়ে গেলো কি কিছু ? খানিকটা লাল নীল আলো
লজেনচুষের মতো গলে-গলে ক্ষীণ শিশু মৃত্যুতে হারালো।

## উপলব্ধি

কোথায় সে যে রয়েছিলাম–
আজকে মনে হয়
সাগর থেকে আরো বৃহৎ আলো
দেখেছিলাম– ঠিক তা সাগর নয়।
প্রশান্ত বা কৃষ্ণ বেরিং ভূমধ্যলীন ভারত মেরুসাগর তাকে বলে;
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে
একটি ঘোড়া সূর্য হ'য়ে জ্বলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিলো;
মনে পড়ে মাছের ঝাঁকে গহন সাগরজল,
ফেনার হাওয়ায় ফসকে শাদা পাখিগুলো দুরন্ত উজ্জ্বল;
নীল কি রৌদ্র ? রৌদ্র কি নীল জলের কোলাহল ?

## হঠাৎ তোমার সাথে

হঠাৎ তোমার সাথে কলকাতাতে সে-এক সন্ধ্যায়
উনিশশো-চুয়াল্লিশে দ্যাখা হ'লো– কতো লোক যায়
ট্রাম বাস ট্যাক্সি মোটর জিপ হেঁকে
যাদের হৃদয়ে বেশি কথা হাতে কাজ কম– তাদের অনেকে
পায়ে হেঁটে চ'লে যায়–

কেবলি ক্লান্তিতে ধুঁকে আমাদের মুখে ঠোঁটে তবু যেই হাসি
ফুটে ওঠে স্বপ্নকে খণ্ডন ক'রে বিষয়প্রত্যাশী
অমূল্য সংসারী সে-ই– বাজারে বন্দরে ঘোরে, মাপজোক করে
হিসেবের খতিয়ানে লাভ হ'লে রক্তের ভিতরে
তৃপ্তি পায়– লোকসান হ'য়ে গেলে অন্ধকারে নিগৃহীত মনে
অনুভব করে কোনো মনিবের সংকীর্ণ বেতনে
ভৃত্যের শরীর তার :– ভৃত্যের শরীরে তার মনে
সারী তার নক্ষত্রের তবু মহাজন ?

[illegible]– সময়ের ঢের আয়ু শেষ ক'রে তবে
[illegible] জ্বলে এ-রকম স্থির অনুভবে

তোমার শরীর আজো সুশ্রী নম্র– তবুও হৃদয়
সেই স্নিগ্ধ শরীরের সন্তানের মতো কাঁটা নয় ?
দুরু-দুরু হৃদয়ের বিস্ময়ে ব্যথায় এ-কথা যদি ভাবি
তবু সে-ব্যথার চেয়ে আরেক শক্তির বেশি দাবি
সেই স্বাদ তুমি– আমাদের চোখে এসেছিলে ব'লে
পৃথিবীকে ভালো ক'রে পাই আমি– এ-পৃথিবী অন্তর্হিত হ'লে
সত্যই সূর্যের আলো– তবুও সূর্যের চেয়ে সুখী
তোমার গভীরভাবে ভালো শরীরের মুখোমুখি
আমার শরীর-মন– ঈশ্বরেরো অনুরোধে কখনো সময়
গতি কি থামায় তার– লীন হ'লে অনুসৃত হয় ?
তুমি তাকে থামায়েছো– সৃষ্টির অন্তিম হিতাহিত
ভুলে আজ কলকাতার শীত রাতে কবের অতীত
রহমান সময়কে অন্ধকারে চোখঠার দিয়ে
নারীর শরীর নিয়ে রয়েছো দাঁড়িয়ে।
তোমার উরুর চাপে সময় পায়ের নিচে প'ড়ে
থেমে আছে ব'লে মৃত তারিখকে আবিষ্কার করে
ভালোবাসা বেঁচে উঠে, আহা, এক মুহূর্তের শেষে
তবুও কি ম'রে যাবে পুনরায় সময়ের গতি ভালোবেসে ?
অতীত তো সুজাতার শিশু; নারী, মনীষীহৃদয়
সে-শিশুকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত নয়।

হে সময়, একদিন তোমার গহন ব্যবহারে
যা হয়েছে মুছে গেছে, পুনরায় তাকে
ফিরিয়ে দেবার কোনো দাবি নিয়ে যদি
নারীর পায়ের চিহ্নে চ'লে গিয়ে তোমার সে-অন্তিম অবধি
তোমাকে বিরক্ত করে কেউ
সব মৃত ক্লান্ত ব্যস্ত নক্ষত্রের চেয়েও অধিক
অধীরতা ক্ষমতায় ব্রহ্মাণ্ড শিল্পের শেষ দিক
এই মহিলার মতো নারীচোখে যদি কেউ খুঁজে ফেরে, তবে
সেই অর্থ আমাদের এই মুহূর্তের মতো হবে।

## রবীন্দ্রনাথ

তারপর তুমি এলে
এ-পৃথিবী সলের মতন তোমার প্রতীক্ষা ক'রে বসেছিলো
সলের মতন দীর্ণ ক্ষুব্ধ এই দানব পৃথিবী
শক্তিমান রাজার মতন রূঢ় রূপবান রক্তাক্ত নক্ষত্র এই আমাদের
ঝলমল আলম্বিত চোগা 'পরে প্রবল উষ্ণীষ শিরে রেখে দিয়ে

কঠিন অসির 'পরে ভর ক'রে
অসীমের অনাবৃত হলঘরে ক্ষণিকের দম্ভ ভুলে ক্যাম্পের নিষ্ঠুর ধাতুর বাদ্য
ইশারায় স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
চোখ বুজে অধোমুখে
এ-পৃথিবী মুহূর্তের কাজ তার ভুলে গিয়েছিলো
মুহূর্তের চিন্তা এসে কখন হঠাৎ তারে সচকিত শান্ত ক'রে দিয়ে
চ'লে গিয়েছিলো ব'লে
মুহূর্তের স্বপ্ন এসে লক্ষ-কোটি বছরের সম্পন্ন কাজের সমৃদ্ধির শিরস্ত্রাণ
নিজের পায়ের তলে রেখে দেয় ব'লে
আমাদের এ-পৃথিবী নিজেরে ব্যথিত বোধ করেছিলো
পরাহত-- পাণ্ডু-- ক্ষুব্ধ;
অবসাদে হিম নীল জর্জরিত হয়েছিলো
হয়েছিলো না কি ?

তুমি এলে ?

আমাদের উপভোগ লালসার এতো শক্তি সমুদ্রের মতো এক ব্যথারেও
বহিতে পারে সে-- বহিতেছে;

আমরা জানিনি তাহা
আমাদের অসুর পৃথিবী জানেনিকো।
কীট পোকা ফড়িঙ হরিণ পাখি মানুষের অবিশ্রাম জীবনের সাগরের
ঢেউয়ের ভিতরে
মুহূর্তে-মুহূর্তে যেই বেদনারা এশিরীয় সৈন্যদের মতো বর্শা তুলে নেচে ওঠে
তারা পরাজিত হয়
ফড়িঙেরো পাখার ভিতরে ব্যথা; তার শক্তি সম্রাটের ক্রূর আঘাতের
চেয়ে আরো ঢের কঠিনতা নিয়ে বেঁচে আছে
কীটেরো জীবনে এক সহিষ্ণুতা প্রাণ পায়
পাখিরো জীবনে এক প্রেম
এক ক্ষমা-- এক প্রেম-- মানুষের হাতের প্রতিটি কাজে বেঁচে থাকে

সৃষ্টি চলে তাই সুন্দরের দিকে
ক্ষমা প্রেম স্থিরতার পানে
নক্ষত্রের শান্তির উদ্দেশে।
এরা কি সুন্দর নয় ? ব্যথার সমুদ্রে ফোটে এইসব সূর্যমুখী

সবচেয়ে আসুরিক বিজয়ের সাম্রাজ্যের থাম ভেঙে সুন্দর পাবে না তুমি কিছু
সেখানে যে সহিষ্ণুতা নাই-- ক্ষমা নাই-- প্রেম নাই--
কোনোদিন ব্যথা ছিলো নাকো-- ছিলো নাকো বিশ্ববোধ

তাহাদের শক্তি ছিলো ব্যথিত ঘাসের কীট সেই শক্তি জানে, ছিলো তাহা।

তবু তাহা সম্ভোগে অন্যায়ে জয়ে অত্যাচারে লক্ষ লাল লাম্পট্যের রাতে
রক্ত মাংস মাটি হ'য়ে গেছে
আর কিছু হয় নাই।

এই গান গাহিয়াছো কবি তুমি,
গেয়ে চ'লে গেছো।

অবনত রূঢ় বিদ্ধ একটি ভ্রূকুটি পীড়িত মুখে কোন এক দৈত্যসম্রাটের মতো
আমাদের পৃথিবী– শতাব্দী তাহা শুনিয়াছে
যেমন শুনেছে সল ডেভিডের গান
একদিন
আন্দোলিত হয়েছিলো এক রাত
তুমি এই পৃথিবীরে তোমার গানের সূতা দিয়ে আকাশের অন্য সব
নক্ষত্রের সাথে বেঁধে দিয়ে চ'লে গেছো।
আজো তাই নক্ষত্রেরা এতো কাছে, সুন্দর নিকটে এতো শান্তি, প্রেম, ক্ষমা।

আজো তাই নক্ষত্রেরা এতো কাছে
তাদের নৃত্যের সুর তবু থেকে-থেকে ক্ষীণ হ'য়ে আসিতেছে
কবি-তুমি ক্রমে-ক্রমে হিম হ'য়ে পড়িতেছো ব'লে
সুন্দর যেতেছে ম'রে ধীরে-ধীরে
শান্তি আর থাকিবে না।

ব্যারাকে ধাতুর বাদ্যে হৃদয়ের ধাতব আঘাতে
রুপালি শলার সেই দীর্ঘদেহ গানগুলো বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত হ'য়ে প'ড়ে রবে

মৎস্যনারীদের মৃত শরীরের মতো।
ব্যথা রবে শুধু।
সহিষ্ণুতা রবে।
প্রেম রবে।

## ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে

ভয়-ভুল-মৃত্যু-গ্লানি-সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আজ
দিন শেষ হ'য়ে যায়– রাত্রি আসে–
দিন নেমে আসে–
জ্ঞান আছে, তবু তার সে-রকম প্রচলন নেই

প্রেম আছে– তবু যে-প্রেরণা
কামনার চেয়ে তাকে উজ্জ্বলতায়
সকলের সাধারণ প্রয়োজনে দান ক'রে
সেই প্রেম ফুরিয়ে এসেছে প্রায়।

একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেলে এবারে মানুষ
চেয়ে দ্যাখে আরেক পৃথিবী বুঝি ধ্বংসপ্রায়;
লোভ থেকে লোভে তবু– ভুল থেকে ভুলে
শূন্যতার থেকে আরো অবিকল শূন্যতার দিকে
আবর্ত ক্রমেই আরো দ্রুত হ'য়ে আসে।

বেলা প'ড়ে গেলে পশ্চিমের
মেঘের ভিতরে যেই আভা লেগে থাকে কিছুক্ষণ
সেদিকে সম্পূর্ণ চোখে তাকাবার মতো লোক নেই,
যে-আলো ঠিকরে ওঠে ভোরে
পথে মাঠে জানালার ভাঙা কাচে
রক্তে শূন্যে বচনে ও নিহতবচনে
তারো কোনো মানে নেই মানুষের মনে।
ক্লান্তি আছে– শীত আছে
অন্তহীন মৃত্যু র'য়ে গেছে।
বার-বার দৃশ্য মুছে ফেলে
মৃত্তিকার নির্জনতাকে শুধু সাক্ষী রেখে
নতুন আভাস আলো পটভূমি জাগিয়ে-জাগিয়ে
কাজ ক'রে চলেছে সময় মনে হয় :

মৃত্যু যেন মৃত্যুর ভিতরে শুধু নির্লিপ্ত নয়;
কেবলি ব্যক্তির মৃত্যু হয়– তবু সময়ের কাছে
মানব ও মানবতা শাশ্বত কাহিনী হ'য়ে আছে।
ওরা মরে– ফিরে আসে– নতুন চেতনা এনে দেয়
যেন তা অনাদিকাল থেকে শুধু অগণন গ্লানি ক্ষয় শব
অন্ধকারে ব'য়ে তবু মহাজিজ্ঞাসার মর্মে উজ্জ্বল মানব।

## একবার ভালো নীল ভাঙা ভুল পৃথিবীর

একবার (ভালো নীল) ভাঙা ভুল পৃথিবীর হাত থেকে বার হ'য়ে আমি
চ'লে যাবো কোথাও হিরণ মেঘলোকে;
তবুও তোমার দেহে র'য়ে যাবো– র'য়ে যাবো, নারি,
দেহের ভিতরে প্রাণে– প্রাণের ভিতরে মনোলোকে।

কঠিন আঘাত পেয়ে অন্ধকারে শিখার মতন
ধাতুর ভিতর থেকে জেগে উঠে আমি
সেই কথা আর সেই অন্ধকার পৃথিবীধাতুকে
পরিহার ক'রে দূরে অভিযানকামী
আলোর মতন জ্ব'লে সূর্যে উড়ে যাব;
মিশে যাবো জ্যোতিষ্কের ভিড়ে;
দেহ নেই মন নেই প্রাণ নেই অমেয় আভায়
প্রাণ মন দেহ হ'য়ে যাবো আমি তোমার শরীরে।

## যখন দিনের আলো নিভে আসে

যখন দিনের আলো নিভে আসে আমি ক্লান্ত– তবুও উদয়
জ্বলন্ত তারার মতো সময়ের অন্ধকার শক্তিনীলিমায়;
আমার উৎসারী স্নেহ আলো মন প্রাণ
এখন ঠেকেছে এসে অকূলের পবিত্র সীমায়।
পৃথিবীর ধুলো নিয়ে মানুষ কি শরীরী হয়েছে ?
শরীর কি ভালোবাসে নারী– নারীমন ?
রাত্রির জ্যোতির পথে প্রাণ এক পুরুষনক্ষত্র ?
কিন্তু কতোক্ষণ ?

কি সঙ্গীত জানা আছে প্রাণের মনের
কোথায় সে পেয়েছিলো অগ্নিউৎস আলোকের জ্ঞান ?
ভোরবেলা অস্তসূর্যে রাত্রির নক্ষত্রবেলায়
পুরুষ নারীকে দান ক'রে তবু তার প্রতিদান
পেয়েছে সৃষ্টির স্বত্ব : অন্ধকার ? অমেয় শীতের
শূন্যের সংঘর্ষ থেকে নীল শিখা বুনে
আমাকে জাগাবে, নারী, একদিন সৃষ্টি লোপ পেলে,
জেনে আমি গাঢ় স্বর্ণ অনন্তের স্বর্ণকার, তোমার আগুনে।

## নক্ষত্রমঙ্গল
(১৯৪২-১৯৪৭)

রাতের আঁধার বাড়লে পথে প্রান্তরে কি ঘরে
থামে এসে সারাদিনের রীতি।
সার্থবাহ নটীর হিসেব ফুরিয়ে গেলে তবে
হস্তা স্বাতী বিশাখা শতভিষা

যতো না প্রিয় বাতির মতন জ্বলে ব'লে যেন

তাহার চেয়ে অনেক বেশি ধীকলরোল করে :
'সমস্ত দিন মেঘ ভেঙে কি বৃষ্টি হয়েছিলো ?
কিংবা অঢেল রক্ত ঝরেছে

এক পৃথিবীর সন্ততিদের আলোড়নের থেকে ?
কালো মেঘের পিছে আকাশ ছিলো কি নীল তবু ?'
'জানি না সে সব। হে গুণ, মনপবনে প্রদীপ তারা,
আমার হৃদয় মৃৎশতাব্দীশীল ;

তবুও হাতের মুখের রক্ত শিশির ঘাসে মুছে
হৃদয় আমি তারকাদের পানে
মানবসময় সরিয়ে আইনস্টাইনি লোক ভেঙে
ছড়িয়ে দিলে দিতাম অনবতুল অনবতুলে;

কি মানে তবু নক্ষত্রদের— প্রেমের প্রতীক যদি
ক্লেদপৃথিবীর পুরুষনারীর থেকে সরে গিয়ে
নিখিলে রেতঃ হ'য়ে থাকে ? মাটি সহজ হয়
ইতিহাসের ক্ষমতাতীত রক্ত খরচ করে ?'

'তবুও অর্থ র'য়ে গেছে— সুপরিসর ঢের;
ম্যামথ বা তার পাঁকের থেকে মানুষ এখন জেগে
স্বাতীতারার শিশির দিয়ে যে অনিমেষ গল্প বানিয়েছে
তাই তো প্রেম : যান নিরূপণ-জ্ঞানের প্রবলতর আবেগে।'

## রাত্রি অনিমেষ

কেমন এক পরিচ্ছন্ন গভীর বাতাস ভেসে আসে।
অঘ্রান রাত্রির অগণন জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোয়
সমস্ত পৃথিবী তার জলঝরনার— নগ্ন নারীহস্তের নির্মলতায়
নিঃশব্দে উৎসারিত হ'য়ে উঠছে আজ।
পৃথিবীকে আকাশের মতন মনে হয়;
আকাশকে সময়ের মতন;
কোথায়ই বা উদয় হয়নি সে— কোথায়ই বা যায়নি ?
সমস্ত আধো-আলোকিত সৃষ্টির বুকের উপরে
যেন কার দীর্ঘ নারী-অঙ্গের ছায়া পড়েছে
মাঠে— খাদে— বস্তির মরণে— মিনারে—
শান্তি-অশান্তির কলরোলে— নগরীর জ্বলায়— মানুষের চোখের ঘুমে।

আকাশে তারা কম।

বাতাসে শাদা মেঘের ফাঁকে একটি কি দুটি নক্ষত্রে আলোকিত রাত্রে
কোনো সার্থবাহের উটের পাশে কি এই ছায়া
আমার জীবন থেমে আছে, অতএব তাকে নিমেষহীনতা করে ?
কোনো ক্যাম্পে ঘুমিয়েছিলাম যেন সমস্ত হেমন্তকাল;
জেগে উঠে দেখলাম কোথাও কেউ নেই আর;
কোনো শব্দ নেই,
কোনো উট নেই; উটের ছায়া রয়েছে মরুভূমির
অম্লানের আলোশক্তির শান্ত অপরিমাণ রাত্রে;
কি এক গভীর বাতাসে প্রতিটি নক্ষত্র নিভে-নিভে-নিভে
আবার জ্ব'লে উঠছে সেই নারীর হাতের নিবিড় মোমের মতো।

## হে হৃদয়, নীড় থেকে ঢের দূরে

হে হৃদয় নীড় থেকে ঢের দূরে ধরা প'ড়ে গেছো
বিকেলে আলোর রঙ নিজ মনে কাজ করে পাখিকে না ব'লে
ছায়ায় অঘ্রান মাঠ ঢেকে ফেলে চমকায়ে দিলো
কেউ নেই-- শূন্যাকাশ পটসঙ্গিনীর মতো হ'লে
তার কাছে বলা যেতো : আমি ডানা-পালকের প্যাকাটির মতো হরিয়াল
কাউকে না পেয়ে একা চারিদিকে উপচানো রাত্রির মুখতে
ধাঁধার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা ঘুম মরণের ঢেউয়ে
প্রেমের সূর্যকে কোনোমতে
জাগায় জ্বালায়ে আমি উড়ে যাই ডিসেম্বর রাতে--

এইসব ভোরভাষা নিচের নগরহ্রদ বস্তি মৃত্যুকে
দান ক'রে বাতাসের ঘুরনচাকির আগে পাখি
টের পায় জীবনের ভিতরের অনুভূতিটিকে
কেলিরো চেয়ে সে ভালো অন্য এক আনন্দসাগর
সেদিকে যাবার পথে চোখ তার ভর্ৎসনা বেদনা ভয় দোষ থেকে মুক্তির মতন
আকাশ নদীর জল শ্মশান এয়ারোড্রাম ঝাউয়ের সাগরে
হঠাৎ সকলি সূর্য– নিজেও সে সূর্য একজন।

## শহর-বাজার ছাড়িয়ে

শহর-বাজার ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি পড়ে নক্ষত্রদের দূর আকাশের পানে
যখন আমি রাতের বেলা দেখি–
নগরীর ওই পুরুষ নারী কি চেয়েছে কোথায় যাবে– কিছুই জানে না
চারিদিকে প্রেম ও প্রাণের আততীয় দীক্ষা অপশিক্ষা আগুন উত্তেজনার ঢেউ

ভাঙছে আমার শতাব্দীকে– স্বাতীতারার মতন তবু কেউ
নিজের স্বচ্ছ কক্ষ থেকে একা
এই পৃথিবীর সে-কোন্ অধম শক্তিগুলোর 'পরে
ভালো হবে ব'লে শিশিরফোঁটার মতো ঝরে।
তোমার আসাযাওয়া কথা আদানপ্রদান কুশীলবের দূর বলয়ের থেকে
আমার পানে, নারি, তুমি আজকে রাতে আবার তাকায়েছো
কি যে কবে বলতে চেয়েছিলাম তোমায় আমি
কি যেন ঋণ– সে-কোন্ সিঁড়ির ঘুরুনিতে মাঠে অন্ধকারে আজকে মনে নেই–
নিয়েছিলাম : আমায় তুমি ফিরিয়ে দিয়েছিলো ?
দুইটি তট; কিন্তু তবু একটি নদী দুইটি তট মিলে।

রোদ যেখানে হরিণ মেঘের মৌমাছিদের সেই পৃথিবীর তুমি
সরোবরের পথে বুকের ঐশী জিনিস ঢেকে
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরণে চমক ভেঙে চেয়ে দেখে
আমার কণ্ঠবিষের পানে তাকিয়েছিলে।
চারিদিকে রক্ত ক্ষতি গ্লানির কাছে ঋণ
লাভ ক'রে আর শ্রীলাভ করার দিন
মানুষো তার আ-চলমান নিশ্চয় মৃত্যুর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা– মাঝখানেতে চোরাবালি আশ্বাসে ভরপুর
আজ আমাদের পৃথিবী– এই শতাব্দী এ-রকম।

তোমার কারণ ক্রান্তি তবু আমায় অভয় দিলো
তোমার আলো আঁচল আভাস শরীর
নীল আকাশে শরৎ এলে সূর্য জ্যোৎস্না হরিয়ালের কথা
জাগিয়ে দিয়েছিলো–
পাখিহন্তারকের প্রাণে– কামের চেয়ে প্রেমে তাহার দু-চোখ পূর্ণ ক'রে
অন্ধকারে তারা নদী সাকোরখোরার ঝিরঝিরানির মতন তোমার চোখের মণি, চুল,
শরীর শান্ত দয়ালুতায় জেগে উঠে পরীর, মনে হয়,
জানে দয়ার মীমাংসা– দান, শরীরদান নয়।

তবুও কেন আমার পানে তাকিয়ে আছো একা
এগারো বৃহস্পতি বারো সূর্যে ভরা আজকে পৃথিবীতে
চারিদিকে আর্তি অব্যাহতি তলব সুখবরের দিনে
খাতক কেন আটকে প'ড়ে আছে তবু মহাজনের ঋণে ?
ক্রূর আমি ? তিক্ত তুমি ? কিংবা স্বীয় স্বীয়
প্রাণের বিনিময়ে সবি সত্য, স্থির : কাকচক্ষু জলে কি পূরণীয় ?

ঢের তাপিত জেগে উঠে ওই মহিলার বলয়-আলোর পানে
কিশোর যুবা প্রবীণ মনে তবুও নতুন উত্তেজনা নিয়ে

কি চায়, আহা,
সে-কোন্ নতুন আলোর গ্রন্থি সন্দীপনের তারা ?
আমার এসব কুশল প্রশ্নে চকিত হ'য়ে শচী অহল্যারা
বলছে, হেসে, সেই রমণী এইখানেতেই আছে
এসো শরীর অথবা তার ব্যাধির অতীত মৃগনাভির কাছে
রাত্রিবেলা ঘাসের শিষে একটি শিশির ফোটে
চারদিকে তার নক্ষত্র ও শিশির লাখো-লাখো
প্রেম কি তাদের গণিত স্থির ক'রে দেবার সাঁকো ?–
শুধাতেছে তোমার পানে তাকিয়ে মহীয়সী
সময় সূর্য সাগরপারে নতুন দিনে দণ্ডায়মান তুমি
দ্বৈপায়নের মতন অন্ধ মহাশূন্য দেখছো নাকি আলোর প্রতিসারী
    প্রেম তবুও নিজের প্রতিভারি
মতন আরেক আঁধার আলো সময়বীমার শূন্য নিঃসময়,
কৃষ্ণা, তোমার আঁধার ঘিরে শাড়ির মতো নিজেকে মনে হয়।

## এখন এ-পৃথিবীতে

এখন এ-পৃথিবীতে ভালো আলো নেই–
ভাষার বেগের বিহ্বলতার শেষ ক'রে অন্ধকার
মাঝে-মাঝে জীবনের পথে আসে,
আজকে সততা সত্য সুধা নেই– কিন্তু পৃথিবীর পথে রূঢ়
রক্তাক্ত অন্যায় আলো বেনামদারের মতো জেগে
নিজেকে প্রাণের সূর্য ব'লে যদি এখনো প্রচার করে তবে
সে-আলোর প্রতিবাদে আজকের পৃথিবীতে অন্য আলো নেই
অন্ধকার র'য়ে গেছে।

আজকের পৃথিবীর নরনারীদের
কেবলি হাতের কাছে প'ড়ে পাওয়া অন্ধকার নয়
আরেক গভীরতর ধর্মের জিনিস।

প্রকৃতিতে সূর্য আছে; প্রকৃতিতে নয়– তার মানুষের মনে
সূর্য ভেঙে গেলে তার বুক থেকে নিঃসৃত নিষ্ফল অন্ধকার
আকাশের মতো বড়ো ব্যাপ্তির মতন
অখণ্ড অনন্ত এক
প্রাণের কামনা থেকে ইচ্ছুককে মুক্ত ক'রে নিয়ে
হৃদয়ের সব দোষ প্রক্ষালন করে
কবেকার থেকে আজো ক্লান্তিহীন সময়ের সাধনার ফল অন্ধকার
মানুষের পৃথিবীতে সে-অনেক শতাব্দীর আগে

ঈশ্বর স্খলিত হ'য়ে গেছে– তবু মানুষের স্বভাবের গভীরতা আছে
প্রেম চায়, ন্যায় চায়, জ্ঞান চায়– অথবা এ-সব
আজ এই পৃথিবীর বিমূঢ় আলোয়
সকলি নিষ্ফলপ্রায় হ'য়ে গেলে অন্ধকার চায়
সকলি সফলকাম একদিন হ'য়ে যাবে ব'লে।

## কোথায় গিয়েছে

কোথায় গিয়েছে আজ সেইসব পাখি,– আর সেইসব ঘোড়া–
সেই শাদা দালানের নারী ?
বাবলা ফুলের গন্ধে, সোনালি রোদের রঙে ওড়া
সেইসব পাখি, আর সেইসব ঘোড়া
চ'লে গেছে আমাদের এ-পৃথিবী ছেড়ে;
হৃদয়, কোথায় বলো– কোথায় গিয়েছে আজ সব !
অন্ধকার : মৃত নাসপাতিটির মতন নীরব।

## পথের কিনারে

পথের কিনারে দেখলাম একটা বিড়াল প'ড়ে আছে,
আস্তে-আস্তে ছটফট ক'রে ম'রে যাচ্ছে;
কেন এই মৃত্যু ?– বরং অল্পবয়সের এই প্রাণীটির ?
একে ঘিরে কোনো জনতা নেই,
খানিকটা কলরবো নেই, এর মৃত্যুকে আস্তে-আস্তে ভালোবেসে তরিয়ে দেবার জন্য
বিড়ালটা তার শরীরের সমস্ত শাদা কালো রঙ দিয়ে
মুহূর্তের জন্য আমার মনের ভেতর চিন্তা হ'য়ে এলো
তার নির্জন অদ্ভুত শরীরের সমস্ত শাদা কালো রঙ নিয়ে
আমার কবিতার ভেতর এলো;
বললে, 'এর চেয়ে অসাধারণ দাবি কোনোদিন করবো না আমি আর।'

## বাইরে হিমের হাওয়া

বাইরে হিমের হাওয়া
হেমন্তের হাত;
দরজায়-জানালায়
অবিরাম রাতের আঘাত;
যতোদূর আকাশের কালো চোখ যায়

অগণন নক্ষত্রের ফোঁটা-ফোঁটা বরফ ঘুমায়।

পৃথিবীর সব নদী সকল সমুদ্র—
আর সব রাজপথ ফেলে
এসেছে প্রেমিক এক—
চারিদিকে ঠাণ্ডা ময়লা দেয়াল ও ঘর;
কক্ষ থেকে কক্ষের ভেতর
এঁকেবেঁকে সিঁড়ি চ'লে গেছে।
পৃথিবী মানুষ প্রাণ হেতু অকারণ
নির্জন আঙুল তুলে করেছে বারণ :
'কোন্ কক্ষে যাবে তুমি সিঁড়ি বেয়ে—
কোন্ দিকে যাবে ?
এইসব সিঁড়িগুলো পার হ'য়ে শেষে
আদি শূন্য সিঁড়িতে দাঁড়াবে ফের এসে।'
জীবনের সময়ের বিশ্বের এই এক মানে
পথ ছাড়া নেই কিছু অনন্ত পথের অন্তর্ধানে।

## মানুষের কবেকার অপলক সরলতা

মানুষের কবেকার অপলক সরলতা আজ
নষ্ট হ'য়ে গেছে ব'লে মৃত বই ছবি আলো জিনিসের সারি
হৃদয়ে বহন ক'রে সচকিত সার্থবাহদের
পৃথিবী ও পৃথিবীর লক্ষ্যে দরকারী
অনেক নতুন জ্ঞান সহিষ্ণুতা অগ্নির বলয়
স্বভাবে সফল ক'রে তোমার মতন নারী হয়।

আমার চোখের দিকে চেয়ে আধো-ইতস্তত মনের গরজে
কি এক অতল হ্রদের সীমা খোঁজে
কলকাতার বিকেলের নিভন্ত আলোকে
মনে হয় সে-হ্রদের তলদেশ যেন তার চোখে।
তবু সে আমার নয়, অপরের, জেনে তার নেই সন্তাপ
এমনি সচ্ছল এই পৃথিবীতে উৎসারিত সূর্যের পাপ।

## নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে

নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে
তাকিয়ে আছে হেমন্তলোক স্পষ্ট ক'রে নিচের নিরাশায়
মৃতপ্রায় মানবতার অনাথ চোখের দিকে।
এই পৃথিবীর মৃত মহাজাতকের মুখচ্ছবির মতো

নক্ষত্রেরা শুভ্র শূন্য নিমেষনিহত।

চলার পথে শীত অতীতের প্রয়োজনীয় স্মৃতি
বহন ক'রে ম্যামথ ম্যামল কালক্রমে মানুষ বানালো,
নিনেভে রোম হিরোশিমায় পৌঁছে অ্যাটমের
হাতে মানুষ, মানব-ফসিল, ক্রমোন্নতির আলো।

## তবুও মনকে ঘিরে

তবুও মনকে ঘিরে মহামানবিক আলোড়ন
আর এই পৃথিবীর অন্তহীন দ্বিধা দ্বেষ প্রেম সংগ্রাম
আমাদেরো রক্ত দিয়ে আদি রক্তবীজের নিধন
চেয়েছে, মিটিয়ে দেবো ষোলো আনা দাম।

সুঅধ্যায় পর্বের প্রায় ক্ষয় হ'লো আজ
এই শতকের দিন ক্ষয় প্রায় হ'য়ে এলো আজ।
অনাদি আশার বার্তা কালে-কালে নীল নিরালয় শূন্যে ভেসে
অসংখ্য শতক ধ'রে অঙ্কিত রেখেছে সমাজ,
কিছুই হয়নি আজো।
তবুও মৃত্যু ভালো, যুগে-যুগে মহান এ-যুদ্ধ ভালোবেসে।
আশাশীল রাত্রি আসে চিরায়িত আশা ভালোবেসে।
সচেতন রবে আলো অপ্রাপ্য ও আলো ভালোবেসে।
শত-শতাব্দীর আশা নষ্ট হ'লো মৃতপ্রায় মানবসমাজ
চলেছে তবুও
চ'লে।
বহু শত শতাব্দীর অনাগত আশা ভালোবেসে।
যুগে-যুগে আলম্বন অন্বেষণ করবার কাজ
রক্তাক্ত মানুষদের দিতেছে গভীর ভালোবেসে।

ঘরে কোনো লোক নেই– কয়েকটি গ্রন্থ তবু আছে,
রয়েছে অব্যয় ছবি তিনজন চারজন একান্ত শিল্পীর
ফ্রান্সের, ইটালির, নিম জাম আমলকী গাছে
রয়েছে অগণ্য সব পাখিদের নীড়।
বার-বার নষ্ট হ'লে তবু ম্লান মানবসমাজ
চলবার বেগ পায় ইন্দ্রধনুকে ভালোবেসে।

## শরীরিণীকে

নির্ঝর বনানী নদী আকাশ ও নারীর শরীর,
তোমাদের স্বাভাবিক সুকৃতি রয়েছে।

আমরা মৃত্যুর হাতে ভ্রান্ত হ'য়ে জীবনের সেবা
আধেক তো শুরু করি– সৌন্দর্যকে হয়তো আধেক
হৃদয়কে ধারণ ক'রে চোখ বুজে চুপে ব'সে থাকি;
দিনের সূর্যের দিকে আমাদের জীবনের বাতি
ঈষৎ ফিরিয়ে– রাতে অনিমেষ নক্ষত্রের থেকে
আশ্বাস হারিয়ে ফেলে, খুঁজি কেন অন্য এক সীমা !
কিছু নেই; হবে না; রবে না ঠিক; তবু স্বাভাবিকতার সকল ম্লানিমা।
চারিদিকে সময়ের শূন্যতার থেকে
লীনপ্রাণ বৃক্ষকে ডেকে-ডেকে
যে-রকম স্থির নীল হয় দিন হয় পাখি হয় পাখিদের নীড়
নক্ষত্র নির্ঝর নদীর নারীর শরীর।

## জল

অনেক বছর পরে এখন আবার দ্যাখা;– ভালো
চারিদিকে কলকাতার হেমন্তের বিকেল নিভছে;
গ্যাসল্যাম্পে বেশি আভা– আকাশে নক্ষত্রলোক হ'তে
কম আলো– কোথাও প্রকৃতি নেই– কিংবা তার ভিতরের পাখি
উচ্ছল পাতার মতো শব্দ হয়, জেগে ওঠে
কলকাতার ফুটপাথে ল্যাবার্‌নাম গাছে
নারীকে শুধানো যেতো– তবু নিরুত্তর হ'য়ে আছে
বারো বছরের আগের মনের ভিতরে দূর দেশে;
যেন গর্ভিণীর মতো;– অজাত শিশুর ধ্যানে চুপ
হ'য়ে গিয়ে মুহূর্তেই অনুভব করেছে স্বরূপ
স্বভাববন্ধ্যার মতো যেন তার।

রূপকে এসব কথা ভেবে নিয়ে আমি
বুঝেছি, বুঝেছে সব– আমারি মতন অন্তর্যামী।
তারপরে বেশি হাসে কথা বলে দোকানের কেনাকাটা করে
আমি জল– তবু যেন অন্য কোন্ জল এসে পড়ে
চোখে মুখে নাড়ীর কম্পনে তার জানি
কোনো দূর অন্ধকারে অবিরল ঋণী যে কি ঝরঝরানি
এ-নারীকে দেনা নিয়ে, অপর জলের দূর দেশ থেকে শোনা যায়–
সে এই নারীর স্বামী অথবা প্রেমিক
তবু জলের মতন যেন ঠিক ! ক্রমে সুদ খুব বেশি জ্বলে।
সব জ্ঞান ধর্ম উদ্যমের চেয়ে জল ভালো ব'লে
খাতক হ'য়েও তবুও উত্তমর্ণ মহিলার চেয়েও সফল
সৃষ্টির অন্তিম কথা অন্ধকারে জল।

## যেন তা কল্যাণ সত্য চায়

যেন তা কল্যাণ সত্য চায়,– তবু অবাধ হিংসার
রিরংসা-পাকে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে শূন্য হ'য়ে যায়–
অন্ধকার থেকে মৃদু আলোর ভেতরে
আলোর ভেতর থেকে আঁধারের দিকে
জ্ঞানের ভেতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
বার-বার আসাযাওয়া শেষ ক'রে ফেলে।
একদিন আসে জ্ঞানী হ'য়ে তবু ক্লান্ত হ'য়ে রবে।
ব্যবসা-বাণিজ্য যুদ্ধে বার-বার বিজ্ঞান বিষম
হ'লে তা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভয়াবহ ব্রহ্মাণ্ডের:
সময়ের আবর্তনে নিমিত্তের ভাগী বুঝি প্রেম।

সনাতন সময়ের উন্মোচনে তবু
হৃদয়ে এসেছে প্রেম বার-বার:

চিরকাল ইতিহাসবহনের পথে
রক্ত ক্ষয় নাশ ক'রে যে এক বলয়ে
মানুষের দিকচিহ্ন মাঝে-মাঝে মুক্ত হ'য়ে পড়ে
অচিহ্নিত সাগরের মতন তা, দূরতর আকাশের মতো
কোনো প্রশান্তি নয়, মৃত্যু নয়, অপ্রেমের মতো নয়,
কোনো হেঁয়ালির শেষ মীমাংসার গল্প নয়,
শুধু আরো শুদ্ধ– আরো গাঢ় অনির্বচনীয় সম্মেলন :
(হৃদয়ের ভূগোলের মহাদেশ আবিষ্কৃত হবে।)
সব পেছনের পাশ্বের লীন লীয়মান
অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো কুলহীন পটভূমি জেগে ওঠে।

## যদিও আজ তোমার চোখে

যদিও আজ তোমার চোখে আমি ছাড়া অন্যরা বিখ্যাত
মনে পড়ে অনেক আগে এমন ছিলো না তো
মাঠে ঘরে সম্মেলনের থেকে ফিরে
তখন তুমি সহজ স্বাভাবিকের মতন ছিলে
আমিও তখন তোমাকে ছেড়ে সমাজ পৃথিবীর
অসংগতির করুণ ক্লান্ত ভাষা
শুনিনি এমন। গভীর অন্তরঙ্গ আঘাত করে :
চূর্ণ ক'রে ফেলতে পারে তোমার আমার মতন ভালোবাসা।

দিনে তোমায় সঙ্গে নিয়ে নদী নগর প্রাক্‌সামরিক রাষ্ট্রে পৃথিবীতে

হৃদয় ভ'রে কিছু নিতে, কিছু দিয়ে দিতে
ব্যস্ত থেকে ভুলে যেতাম বীজাণু রোগ মৃত্যু মলিনতা
ক্লান্তি বিয়োগ ছিলো, তবু সে-সব নিছক মাংসপেশীর ব্যথা
সুস্থরতার কাল চলেছে তখনের প্রায় ভারতে ইউরোপে
প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শুরু তখন, কানে খানিক জল
ঢুকে গেলেও পূর্বাচার্যেরা সব ঝেড়ে
ব্যাঙ্কে ধর্মে যৌন সম্মিলনে সূর্যে আশ্চর্য সফল।

দিনের বেলা ফ্যাক্টরি ডক বস্তি ফাঁড়ি আজিকাজি ভাঙার ভিতর দিয়ে
ঢাকনি খুলে ঘুরে বেড়ায় সে-সব পথে তোমার কাছে গিয়ে
পরিহাসের রসিকতায় উৎসারিত হ'য়ে
সৈন্য, নটী, দালাল, ভাঁড়, ব্রাত্য, সার্থবাহের ঘরে
সচ্ছলতা আশা আপোস কাড়াকাড়ি বিলাস ব্যর্থতায়
দেখেছিলাম কল্কী ও তার ঘোড়া রগড় করে।

আঁধার সভা স্বদেশী মেলা ঢের জানালার হৃদয়বিদারক
অন্ধকারে চেয়ে থেকে পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরো ছক
হৃদয় এলো ধীরে– ক্রমে– বিষণ্ণতার স্থির প্রতীকের মতো।
ইতিহাসের নিয়ম কঠিন, তবুও ফোটায় করুণাবশত
অপার আশার আকাশকুসুম; লোকায়ত সফলতায় প্রবেশ ক'রে নিতে
দেরি করে;– মানুষেরাও ক্লান্তিবিহীন প্রাণের প্রকাশ দেখিয়ে দিতে জানে
ব'লে : তখন লোহা পাথর ছিলো, এখন অণুর বিদারণে
পথে এলো, আলো পেলো মানবতার মানে।

এখনো সে তেমন হ'তে পারেনি কিছু তবু
ভেবেছিলাম মানুষ ইতিহাসের হাতে ক্রমেই বড়ো হবে
মেশিনকে বশ ক'রে খেলার চেয়ে
হ'য়ে পড়ে অন্য সফলতায় প্রবীণ;– তবুও মানুষ খেয়ে
মেশিন ক্রমেই আজ পৃথিবীর একক শক্তি হ'লো
প্রেমের ছেদ হ'য়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা
বেড়েই গেলো– জ্ঞানের পরিণামের মানে হ'লো
এই ধরনের পৃথক করার কথা ?

এখনো ঢের আলোয় পথিক রয়েছে তবু জানি
অনেক অমর অর্ধসত্যে অবিশ্রান্ত রাজকীয় চালানি
চলছে আজো স্পষ্ট শতাব্দীকে স্পষ্ট অর্থে দাঁড় করাতে গিয়ে
দেখেছি সে-কাজ প্রথমদের; চারিদিকের অন্ধকারের ভিতরে দাঁড়িয়ে
তবুও দেশ সময় ও সমাজ বাস্তবতা
অনেক দূরের থেকে করুণ সুরের মতো ক্রমে-ক্রমে বজ্রশব্দে এসে

আজকে যুগের গণনাহীন ব্যক্তি জাতি অর্থ প্রয়াস রীতির স্তম্ভ ভেঙে
মৃত্যু সে কি, গভীরতর (সফলকাম) সভা ভালোবেসে।

## আকাশে রাত

এখন আকাশে রাত,
সে অনেক রাত:
উনিশশো অনন্তের রাত্রি নাকি।
সময় ও অসময়– সকলের সুর
স্থির স্থিরতর হ'য়ে উঠে
জলের উপরে জলকণিকার কথিকার শব্দের মতন
অবনমনের ব্যাপ্তি পায়।
পৃথিবীর জাগরীর গুঞ্জরণ দূরে
সৈন্য নটী ভিখিরের:
তারপর কোনো এক সময়ের জন্য নীরবতা
মেতে নিতে হবে জেনে সার্থবাহদের
আলাপ মিইয়ে আসে মুখে
এখন ঘুমের আগে
গভীর রাত্রির পথে।
পৃথিবীর নানা দেশনগরীর কয়েকটি সচকিত ছবি
প্রাণে উৎসারিত হ'য়ে যেতে চায় :
দিল্লি, চীন, প্যালেস্টাইন, কলকাতা, করাচি,
এথেন্স, মিশর, ফ্রান্স, মস্কৌ, লন্ডন, ন্যুইয়র্ক, ওয়াশিংটন,
আধুনিক ভূমিকার গাঢ় মানদণ্ডের মতন
এইসব।

এইসব নগর বন্দর দেশ আজো
অতীতের উত্তরাধিকার থেকে ক্লান্ত প্রাণে উঠে
নতুন সূর্যকে সেকে তবু তাকে শীত ক'রে দিতে চায় যেন।
কোথাও হ্বার্সাই প্ল্যানে লোকার্নো জেনিভা প্রেত...প্রাণে
কথা কয় ব'লে মনে হয়;
নিথর আটোয়া-চুক্তি ফেঁড়ে গিয়ে– থেমে
কেউ নয় আজ আর;
নিউনিখ প্যাক্ট চিরন্তন বিষয়ের
লক্ষ্যভেদ হ'য়ে গেছে ভেবেছিলো;
প্রায়ান্ধ দেবীর মতো নীলজলরাশির ওপার থেকে দ্বীপ
সমস্যার নিরসন হবে বলেছিলো
ভারতকে যাকে যা দেবার সব স্থির ক'রে ভালো ক'রে

দান করে;
আরো পরে পনফারেন্স কমিশন প্ল্যান
বিদেশ স্বদেশ সমসাময়িকতার হ'য়ে তবু
যেন ঢের বিস্তীর্ণ সময়
অধিকারে র'য়ে গেছে মনে ভেবে বিহ্বলতায়
মানুষকে বিজড়িত ক'রে চ'লে গেছে।
কবেকার অন্ধকার আদি দায়ভাগ থেকে ক্রমে মানবের
জীবন বন্ধনমুক্ত হতেছিলো নাকি ?
কারা যেন সেই
সমুদ্রের মতন মুক্তিকে
গোষ্পদে বিমুক্তি দিতে গিয়ে নেশনের
ব্যবহারে ব্যভিচারে বার-বার ছেনেছে ছিঁড়েছে।

রাষ্ট্রনীতি কামনাকেলির চুক্তি সব;
এছাড়া এ-সব বেশ জাতি অধিনায়কের প্রাণে
কোথাও প্রেরণা নেই– দীপ্তি নেই:
আজ এই আধুনিক দিনে মাসে সময়ে কি কাজ হ'তে পারে
সে-জ্ঞান হারায়ে ওরা অন্তহীন হেতুহীন সময়ের হাতে
সব ভুল শুদ্ধ হবে ভেবে
অবচেতনায় অন্ধকারে প্ল্যান গড়ে, প্যাক্ট করে।
সময়ের ব্যাপ্ত চোরাবালির ভিতরে
ডুবে যায়।
তবুও এখন ওরা
নতুন শক্তির মতো
নিজেদের মতো সেই মূল্যজ্ঞান রয়েছে: তাছাড়া
কোথাও অপর কাজে মূল্য নেই মনে ভাবে ওরা
আবার প্রলুব্ধ ক'রে যায়,
অবসন্ন পৃথিবীর প্রাণে আত্মপ্রসাদের ঋতু
আবার নেমেছে বলে।

ব'লে নিতে চায় : সবি নেশনের-নেশনের-নেশনের।
কানাডার সমুদ্র ও বল্‌কান্ বল্‌টিক্ গ্রীক সাগরের থেকে
দিল্লি লন্ডন কাইরো ডাম্বার্টন ওক্‌স্ টেহেরান ইয়াল্টায়
ফ্রান্স লেক্‌সাক্‌সেস্ চীন আমেরিকা সোভিয়েটে
বিরাট বিসাদ নাদ মনে হয় যেন ব্যস্ত, অন্তরীক্ষে ঘুরে
সন্তানের মতো নিঃসীম জীবনের জননীকে খুঁজে
শিহরিত হ'য়ে তবু দেখে গেছে আজ এই অন্ধকার পৃথিবীর সীমা
যদিই-বা আলোকিত হয় তবে সে-এক বিমূঢ় হিরোশিমা।
চারিদিকে তাই ব্যর্থ মৃত্যুশীল তবুও আশ্চর্য সব

আশাশীল মানুষের আলোড়ন।
তারা স্থির নেই;
দিন শেষ হ'য়ে গেলে আরো বড়ো রাত্রির ভিতরে
ঘুমে নেই; মৃত্যু আছে; অথবা আমৃত্যুলাক– পামর, অনন্দা;
সেসব মরণোত্তর ভিড় আজ অন্ধভাবে অনুভব করে;
তাদের দেহের সব অনাগত সন্তানের তরে রেশনের
নির্দিষ্ট মাত্রার মতো কোনো দিকে নারী,
নারীরা রয়েছে– কিংবা নেই;
প্রেম নেই, প্রীতি নেই, সূর্য নেই, অন্ন নেই, কিংবা মহাকাল
কেউ নয়

অন্ন নেই– অন্ন নেই– নেই;
ইতিহাস : বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃসত্ত্বার মতন;
বাকি সব সন্তানের সন্তানেরা এসে একদিন
লিখে যাবে।

মানুষের চেতনার দাহ আছে আজো শোকাবহ
যতো বেশি আলো তাতে আরো বেশি তাপ
সঙ্গতি বেড়ে গেলে পেতে পারে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
প্রাণের প্রেমের স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে হবে
দিতে হবে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
এ না হ'লে বিজ্ঞানের মর্মে-মর্মে কীট আর ব্যথা
নিরন্তর দোষে পরিণত হবে মানবের প্রতিভার গুণ
সব আলো হ'য়ে যাবে ক্ষমাহীন নিয়মের আগুন।

## অম্লান রাত

অনেক-অনেক দিনের পরে আজ
অন্ধকারে সময় পরিক্রমা
করতে গিয়ে আবছা স্মৃতির বইয়ের
পাতার থেকে জমা–
খরচ সবি মুছে ফেলে দিয়ে
দানের আয়োজনে নেমে এলো,
চেয়ে দেখি নারী কেমন নিখুঁতভাবে কৃতি;
ডানা নড়ে শিশির শব্দ করে
বাহিরে ওই অম্লান রাত থেকে;
এ-সব ঋতু আমার হৃদয়ে
কি এক নিমেষনিহত সমাহিতি

নিয়ে আসে; ভিতরে আরো প্রবেশ করে প্রাণ
একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি
লীন দেখেছে, গভীর পাখি গভীর বৃক্ষ তুমি।

## এখানে দিনের– জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই

এখানে দিনের– জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখানে আসেনি
চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোন্ এক মৃত পৃথিবীর
নিহত জিনিস ব'লে মনে হয়, তবু,
মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা

আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ– নগরগুলো সে-রকম আন্তরিকভাবে মৃত নয়
বাজারদরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোন্ জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে– ছিন্ন হ'য়ে– বিরোধিতা করে
সকলের আগে নিজে– অথবা নিজের দেশ নিজের নেশন
সবের উপরে সত্য মনে করে– জ্ঞানপাপে অস্পষ্ট আবেগে
পৃথিবীর মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা সফলতা যদি দেশলাইয়ে
পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় তবে
আমি ও আমার দেশ আমার স্বজন ছাড়া ওরা
উৎসাদিত হ'য়ে যাক– এই ভাব– এমনি কঠিন অপ্রীতি চারিদিকে
আমাদের রক্তের ভিতর অনুরণিত হতেছে
তবুও সার্থককাম কেউ নয়
আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড়ো সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার-যার নিজের জিনিস
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়
এইখানে মর্মে কীট র'য়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে
রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।
প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজনমতো তাতে নির্মলতা আছে
আর কিছু আছে তাতে, হেন মানুষের সব প্রয়োজন সীমা
শেষ ক'রে অহেতুক অন্তহীন চকিত জিনিস
র'য়ে গেছে– এক-আধজন কবি প্রেমিকের তবু
এ-সব জিনিস নিয়ে প্রয়োজন– সকলের নয়।

প্রকৃতি ও জীবনের তীরবাসী জ্ঞানময় মুক্ত মানুষের
নিকট সংস্পর্শে এসে শান্ত শান্তিকাম

হবে না কি আমাদের শতকের অবিশ্বাসী অধীর মানুষ
কবে সে উজ্জ্বল হবে প্রিয় হবে সহৃদয় হবে
পৃথিবীর অগণন সহোদর জীবনের তরে।

সাগরকণ্ঠের মতো রাত্রির বাতাস অন্ধকারে
আমাদের শরীরের শুভ্রশঙ্খে কেমন বিধৌত হ'য়ে উচ্ছলিত হয়
মানুষের কানে-কানে কথা বলে সমস্ত আকাশ
সহসা সুদূরে গিয়ে আধো-পরিচিত মহিলার
শাড়ির মতন নীল— উপস্থাপিত হ'য়ে রৌদ্রের ভিতরে
নীলিমা কি প্রকৃতির ? অথবা সাধনোচিত নারীর প্রতিভা ?
পাখিদের ডানা-পালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের কৃতার্থতা ভেঙে
প্রশান্তির বাতাসের মতো আসে, যেন কোনো ঘুমন্তের মনে
কথা কাজ চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এলো—
এইসব অবিরল উৎসারিত বন্ধুর মতন
আমাদের চারিদিকে দিন রাত্রি আকাশ নক্ষত্র নীড় সিন্ধুজল
সমাজের শুভ দিন প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
আশ্চর্য প্রাণের উৎসে র'য়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোকে
কেউ তাকে না বলতে এ-পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
ছেয়ে যায়;— কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের জল তার, কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে
প্রকৃতির ভালো জল— সঞ্চারিত নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভ'রে যায়— সময়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে প্রশ্ন করে : নদী
নির্ঝরের থেমে নেমে এসেছো কি ? মানুষের হৃদয়ের থেকে ?
শুভ্র হবে, কখন উন্নত হবে, মানুষের নিজের হৃদয়।

## কে কবিতা লেখে

কে কবিতা লেখে
মানুষ, কবি, পুরাণপুরুষ
সূর্য, অন্তহীন শূন্য আধারের স্বগত নীলিমা ?
কে ?
যেন সময়ের কৌতুকী উৎস থেকে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠছে
পাপ, অন্ধকার, রিরংসা, মৃত্যু
তবু অগ্নিশ্বেত নারীর মতো জেগে উঠছে স্ফুলিঙ্গের সংঘর্ষে
এইসব অপরিমেয় সচ্ছল নদী পৃথিবীর,
জ্বলন্ত রাত্রির মতো এইসব অকুতোভয় আলো
জোরের বেদনার বিপ্লবের ব্যাপ্তির

ক্যাসান্দ্রা কণ্ঠের মতন উজ্জ্বল বাণীর
বিদুর, দ্বৈপায়নের মতন অনিমেষ নির্মম প্রেমের শক্তির

## বর্ষবিদায়

পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে এই মানবজীবন
একদিন শুভ পাবে;– হয়তো বা অতীতেই পেতো :
সবাই সবার হ'লে;– ক্ষুধা পেলে কেউ
একগাল বাতাস কি খেতো।

অনেক মানুষ ভেবে গিয়েছিলো স্বপ্নই সফল।
দিনরাত নক্ষত্র নীলিমা অনুভব
করে তারা নিজেদের মননের দেশ গ'ড়ে তবু
দেখেছিলো পৃথিবীর রক্তাক্ত বিপ্লব।

তাই আরো বাস্তবিক হ'য়ে তারা সমস্তই ঠিক
ক'রে নিতে চেয়েছিলো শূন্য, সীমা অনর্থ ও অমেয়তা ভেঙে;
মানুষের জীবনের প্রতিটি দিনের কাজে লেগে
ইতিহাস বিকথিত সমাজে নগরে
জেগেছিলো। করাল রাত্রির দিকে, নীহারিকা, নারীদের দিকে
নিজের সৃষ্ট ড্রোম, ক্রেন, প্লেন, কালো আকাশের পানে তাকায়ে জীবন
এই মৃগপিপাসায় তবুও মানুষি হ'তে চায়;–
গভীর রৌদ্রের প্রেমে লোকসাধারণ
সফলতা পেতে গিয়ে সৃষ্টি ক'রে নবীন মৃত্যুর দিন তবু ?
– জেনে লোক ক্রমশই জীবনে মহৎ
হ'লেও তো হ'য়ে যেতো;– ইতিহাসবিষমতা আর ইলেক্‌ট্রোন–
– অন্ধতাকে মেনে তবু মহাসামাজিকভাবে সৎ
হওয়া যেতো নীড় আর নিখিলের বঞ্চনার পথে।

## মনমর্মর

আমার মনের ভিতরে ছায়া আলো এসে পড়ে;
যেইসব অনুভূতি ঝ'রে গেছে তাদের কঙ্কাল
নদীকে দিয়েছি আমি– বিকেলকে– নক্ষত্রের দাহনে বিশাল
আকাশকে; ফিরে আসে নব দিকচিহ্ন নিয়ে মর্মের ভিতরে।

সময়ের ঢের উৎস গ্রন্থ ছবি মননের পদ্ধতি সব

নিয়ে যায় হৃদয়কে যেন কোন শেষ অনুশীলনের পানে;
অন্তহীন অন্ধকার র'য়ে গেছে হয়তো সেখানে:
অসীম আলোর মতো তবুও করেছি অনুভব।

## অনেক মুহূর্ত আমি

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
ক'রে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে-অনন্ত নিয়ে নয়।

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ-হৃদয়।

## তুমি এই রাতের বাতাস

তুমি এই রাতের বাতাস
বাতাসের সিন্ধু– ঢেউ
তোমার মতন কেউ
নাই আর !
অন্ধকার নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছে জাগায়ে,
ছেঁড়ে দেহে– ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছে জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি,– বাতাসের সিন্ধু– ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

## নদী

১. ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ওই যাইছে বহিয়া।
কতো শত জীবজন্তু বক্ষেতে ধরিয়া।

স্রোতস্বিনী বহে ওই কল-কল রবে
উত্তরিয়া কতো দেশ সমুদ্রেতে যাবে।

২. সমুদ্রের পানে সদা ছুটিতেছে নদী
কুলু-কুলু রব করি বহে নিরবধি।
কখনো বা বড় হয় কখনো বা ছোটো।
তরণী পোতাদি কতো বহিতেছে মোট।

৩. পর্বত প্রমাণ উঠে বীচিমালা কভু।
কভু শান্ত ক'রে রাখে দয়াময় প্রভু।
কতো পোত মনুষ্যাদি করিছে ভক্ষণ।
কখনো করিছে নদী ভীষণ গর্জন।

৪. উর্বর করিছে কতো দেশ কতো গ্রাম
নীরবে সে করিতেছে আপনার কাম
করিতেছে কতো দেশ শস্যশালিনী
নীরবে করিছে নাহি একটিও বাণী।

## কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভ'রে

কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভ'রে
আমরা কি জানি কিছু ?– দিনের আলোর পথ ধ'রে
চলি আজ,– অবসর নাই কারু,– কেউ কারু কাছে
থাকিবে না,– যেই ব্যথা সহিবার জন্য জন্মিয়াছে
মানুষ,– যে-ব্যর্থতা মানুষের মেনে নিতে হবে
ভুলে,– একা, (সঙ্গে তার কে আসবে রবে ?)
শিখিতেছি– জানিতেছি তবু তবি জানা
ঘুমাবার আগে তবু, ঘৃণা এক– কিংবা ভালোবাসা
নিবিড় আনন্দ এক,– কোনো এক গভীর উল্লাস
অসীম কলহ এক কিনিবার চাই অবকাশ
চাই তাই,– তারপর চোখ ঘুমে সকলের মতো
ঘুমাবো, হবো না তবু আমি পরাহত
আমার মরণে,–
কারণ,– ঘুমের আগে জীবনের ব্যর্থতার জন্য
ভুলে গিয়ে এক ঘৃণা– কিংবা এক গাঢ় ভালোবাসা
নিবিড় আনন্দ এক– কিংবা এক গভীর উল্লাস
অসীম কলহ এক কিনিবার ছিলো অবকাশ।

## এতো দিন ডাকি নাই

এতো দিন ডাকি নাই,– তবু আজ– আজ তুমি চ'লে এসো কাছে !
রেলের লাইনের পাশ দিয়ে আমি চলিতেছি মেঠো পথ ধ'রে,
এমনি তো বিকালের অন্ধকারে এইখানে ছিলে,– মনে আছে;
এই আবহাওয়া ছিলো একদিন তোমার মতন ঘ্রাণে ভ'রে !
এখানে ঘাসের পথে আমাদের চোরকাঁটা ফুটেছে কাপড়ে,
এখানে পাখির নাম জানি নাই,– গান শুধু শুনেছি বিকালে;
সন্ধ্যায়– তারপরে অন্ধকারে মাটির আঘ্রাণ মনে পড়ে,
বাতাসের ফোঁপানি– সে মনে পড়ে বাব্‌লার বকুলের ডালে।
বিকালের অন্ধকারে মাঠের হেমন্তে আজ বেড়ায়েছি একা,
সেইসব পাখিদের গান আমি শুনিয়াছি, আড়ষ্ট এমন !–
তোমার ভূতের সাথে হলুদ ঘাসের 'পরে হ'লে যেন দ্যাখা,–
আগুনের মতো কেঁপে– হাতের হাড়ের মতো শাদা সে কেমন !–
আমারে সে দ্যাখা দিয়ে দাঁড়ালো না,– চ'লে গেলো আলেয়ার পাছে
এতো দিন ডাকি নাই, তবু আজ– আজ তুমি চ'লে এসো কাছে।

## আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে

আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে সমুদ্রের মতো
তারি তীরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
মনে হয় বিরাট প্রাসাদ যেন একে-একে কক্ষ খুলে দেয়
ঢের দূরে– রাত্রির গায়ে

এ-পৃথিবী চ'লে গেছে– ঘুমের ভিতরে
যে-মিনার বাজারের বন্দরের নয়
সমুদ্রের রূঢ় জল স্তব্ধ হয় যেন মনে হয়
যখন সে প্রাসাদের আলিসার জ্যোৎস্নায় বিস্ময়
চোখে এলে লাগে তার– আমিও দেখেছি তাই নিশীথের তীরে
ঝাউয়ের নির্জনে নিত্য অবিনাশ পাখিদের কথা
মনে পড়ে;– সেইসব পাখি এই পৃথিবীর নয়;
পৃথিবীতে পাখি আর পাখিনী হত্যার নিষ্ফলতা।

## সময়ের কাছ থেকে

সময়ের কাছ থেকে যদি কিছু নিতে চায় বিহ্বল মানুষ
পাখি ও নির্ঝর প্রীতি সংস্কৃতির থেকে চেয়ে নিক
ঘাসের তরঙ্গ– রোদ– বেঁচে থাকা : পবিত্র জিনিস

এ-সবের চেয়ে কি অধিক
সাধ কেউ চেয়েছিলো কোনোদিন কারু কাছ থেকে

সকলের সফলতা সকলকে দিতে তবু চেয়েছিলো না কি
সারাদিন প্রিয় সৃষ্টি রাত্রির আলোকবর্ষ চোখে রেখে ঘুম
ঘুমের ঈষৎ আগে স্মরণীয় জীবনের প্রতিধ্বনি
আবার ভোরের রৌদ্রে সমাজ শুভ্রতা, পাখি, নভোনীল–
আকাশ-কুসুম

আজ সব। মানুষের আগে পাখি দূর চিত্রভানুলোকে উড়ে চ'লে গেলে
মৃতদের অনাগতদের কাছে আমাদের ঋণ
মুক্ত হোক মধু হোক সুবাতাস শুভ্র সূর্য হোক
সে অনেক-ইতিহাস-তীর্ণ নরনারীদের রীতিতে নবীন।

## স্ট্যাঞ্জা তিনেক

আকাশের মেঘ থেকে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি প'ড়ে ভিজে গেছে ধুলো,
এখন মাটির গন্ধ চারিদিকে টের পাওয়া যায়
স্টেশন ছাড়িয়া ট্রেন চ'লে গেলো,– এঞ্জিনের কালো ধোঁয়াগুলো
চাঁদের আলোয় যেন বাদুড়ের মতন লাফায় !

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে : একটা কি দুটো কালো মোটরের পিছে
ক্রহ্যাম– ছ্যাকড়া গাড়ি চ'লে গেছে যে যাহার দিকে:
কারা এলো ? ওই দূরে সাহেবের ল্যান্ডোর ল্যাম্প কি জ্বলিছে ?
শব্দ নাই কোনোদিকে,– বাতাস ছাড়িয়া গেছে ঝাউ গাছটিকে।
এখন তোমার নাম ধ'রে ডাকি,– ভাবি আমি, তুমি যে কোথায় !
এখানের ভিজে মাটি ঘাস পাতা ডালিয়ার কামিনীর ঘ্রাণে
কোনো পাখি জেগে নাই আমার মতন একা– একা– অসহায়
এখন তোমার নাম ধ'রে ডাকি,– কই তুমি !– কেউ কি তা জানে !

## এ ও সে
(সংলাপ কবিতা)

এ

শীতের সকালবেলা রোদের ভিতর
ডেক-চেয়ারের 'পরে ঢের বসা যায়;
পাখির মতন বুড়ো আর হয় না হৃদয় !

ওইখানে গেলাসের জলের ভেতরে
মুক্তা এক পড়েছিলো—
সারারাত গলে-গলে
তারপর পৃথিবীতে
ছড়ায়ে পড়েছে যেন !

সে

তবুও সে-মুক্তা কেউ চুরি ক'রে নিতে পারে !

এ

কোথায় ? কখন ?

সে

সেইদিন শীত আরো বেশি হবে;
কাঁকড়াবিছের ছানা এসে
তোমার হাড়ের থেকে মাংস খেয়ে বেঁচে রবে;
কেউ জানে ?

এ

তোমরা জানো না কিছু;
মুক্তা চুরি গেলে কোথাও রবে তা তবু;
কোথাও গেলাসে জল র'য়ে যাবে;
আমার টেবিলে নয়
অন্য কারু দেরাজের নিচে
রবে তবু;
তবুও তা রবে !

আজ তবু এখানেই আছে;
তোমার হৃদয় থেকে হয়তো কাহারও হাত এসে
মেয়েমানুষের পেটে সন্তানের মতো
বাঁচায়ে রেখেছে তারে !
এমন সকালে
আকাশের নীলের চেয়েও
নীল মলাটের বই ভালো লাগে !

সমুদ্রের জলের চেয়েও তারা নীল ?

আরো নীল !

বইগুলো ঝেড়ে দেই ?

বাংলা একাডেমি জাতীয় গ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

মনে হয় ময়লা হয়েছে
শাদা বিড়ালের লেজ অন্ধকারে
ঝেড়ে দিয়ে যায়;

তখন সে ঘুমায়ে-ঘুমায়ে
হয়তো হলুদ এক বিড়ালমেয়ের
সবুজ চোখের স্বপ্ন দ্যাখে !
নরম থাবার নিচে
রুপার মতন তার নখ;
আমিও দেখেছি তারে।

সেইসব অন্ধকারে দেখেছো তো !
– এখন দিনের বেলা;
টেবিলের থেকে গেলাস সরায়ে রাখি ?
কোথাও কি নিয়ে যেতে চাও ?

কোথাও;

নিয়ে যাও;

একখানা বই তুমি নেবে নাকি ?

দাও;

হাতের ভিতরে বই রেখে দিয়ে
চোখ বুজে আছো তবু ?

নিয়ে যাও;
(বইখানা ফিরিয়ে দিয়ে)
পাতার ভেতর থেকে কোন এক গন্ধ এসে যেন
নরম থাবার নিচে রুপার নখের কথা
সেইসব রূপকথা বলে !
সেইসব অন্ধকারে শোনা যাবে;
এখন শীতের বেলা তাড়াতাড়ি বেলা প'ড়ে যায়;...
দুধের ভেতর থেকে মাখন কোথায় যেন তোলে,–
আমি সেই শব্দ পাই !

কোথায় ?

দুধের ফেনার চুমা কাহারো বুকের দুধে লাগে ?

কই ?...
হয়তো কাপাশ ফেটে গিয়েছে কোথাও !
তারি শব্দ হয়তো শুনেছো;
ভোরের হাওয়ায় তুলো তার ভেসেছিলো;
চোখের পাতার 'পরে কেউ এসে কার যেন আঙুলের মতো লেগে থাকে !
আঁতুড়ের ঘরে এমন আঙুল থাকে,
মাখনের গন্ধ লেগে থাকে তাহাদের গায় যেন !
সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-সব দেখেছি ভেবে।

এখন সকালবেলা তবু;

মাকড়ের পেটের ডিমের মতো শাদা ওই আলো !
তবুও পৃথিবী যেন সেই ডিম ল'য়ে
চোখ বুজে একদিকে র'য়ে গেছে স'রে;
স্বপ্ন দেখে তাহার সময় কেটে যায় !

ওই হাওড়ের জল যেইখানে ফুরায়ে গিয়েছে
আরেক পৃথিবী থাকে তবু;
তারে তুমি দ্যাখো নাই
কেমন সে ?
সেইখানে মাঠের উপরে
গোল হ'য়ে 'গোসেমার' নাই ?

নাই;

সেইখানে বিকালের হাওড়ের জলে
মাছরাঙা ঢিলের মতন শব্দ করে
ডুবে যায় নাকি ?

সেইখানে হাওড়ের জল ফুরায়েছে;

আমি তবু সেই দেশে যাই নাই;

ডেক-চেয়ারের গাছ এই দেশে আছে;– তবু–
চেয়ার সেখান থেকে আসে;
কাঠের পালিশ আছে সেইখানে,
লাল নীল কেম্বিশ্ রয়েছে,
দেরাজ টেবিল আছে,
এনামেল-রুপার পেয়ালা;

তোমার এ-ঘরখানা একদিন তারা এসে ক'রে গেছে।
এইখানে হাড়ের চিরুনি হাতে নিয়ে
এলোমেলো রোগা চুল বুলোতে-বুলোতে
যখন দু-চোখ তবু বুজে আসে সন্ধ্যায়,
আমার মাথার স্বপ্ন রুপার জালের মতো হ'য়ে
হাওড়ের অন্ধকার জলের উপর থেকে
ছায়া ধ'রে আনে !
তাই খেয়ে বেঁচে থাকে !

পৃথিবীর থেকে তুমি ন্যাকড়ার থলির মতন
খ'সে গেছো;
সোনার রুপায় তার পেট চিরে যাবে,–
পাখির ঠোঁটের থেকে এক মুখ বাতাস সে চায় !

## শিকার

(সংলাপ কবিতা)

**একজন শিকারি**

মিছেমিছি কেন ওই শিকারির সাথে
আমরা শিকারে যাই ?

**আর জন**

শিকার জানে না সে কি ?

**এক জন**

ধলা এক ঘোড়া শুধু আছে;

**আর জন**

দুধের ভিতর থেকে সেই যে মাখন তোলে
গয়লার ধলা মেয়ে ভোরের বেলায়
ফেনার ধোঁয়ায় তার দুই চোখ ঘোলা হ'য়ে আসে;
তাদের সবার কথা মনে হয় যেন
ঘোড়ার পিঠের দিকে চেয়ে,–
আমরা ঘোড়ার মুখ দেখি নাকো !

**এক জন**

কেবল সে চ'লে যেতে আছে;

## আর জন

কোথায় সে যায় ?
আমরা জানি না কেউ !
তবু তার পিছে যেতে হবে ?

স্বপ্নের ভিতরে যেন চলিতেছি !

আমাদের লাল ঘোড়া;

আমাদের ঘোড়া এতো লাল,–
তাহাদের লোক যেন কালো হ'য়ে আসে !

ওদের গায়ের রং আমাদের ক্ষুধার মতন;
পৃথিবীর জল থেকে ফিরে
মিছেমিছি অন্য দিকে যায় এরা;
কোন ঘাস কোন জল এদের সান্ত্বনা দেবে?
এরা ম'রে যাবে,– আমরাও;
আমরা রয়েছি বেঁচে পৃথিবীতে তবু,
সেইখানে আমাদের খুঁজে পাবে– দেখো;
বুড়ো পাখিদের মতো সেইখানে থাকি না আমরা;
হাঁসের ছানার মতো পাখনায় ভিজে
ছোটো এক পুকুরের পাড়ে
আমরা সেখানে থাকি;

তারপর বড় হই;
আমরা হই না তবু বুড়ো;

হাঁসের মতন ডিম পাড়ে সেইখানে
আমাদের হৃদয়ের আশা !

হাঁসের মতন ডিম,
তবুও সোনার ডিম নয় !
খড়ের কুটার মাঝে অনেক ময়লা ডিমে অন্ধকারে ব'সে
ভেবেছি অনেকদিন এই কথা;–
এই ডিমে ব্যথা পাই !

এর চেয়ে বেশি ব্যথা আছে,–

জানি আমি;

কোনেদিন কড়ি ফেলে তেল আমি নেই নাই, –
তবু কোনো কুনো ব্যাং কানাকড়ি দেবে ?
কানাকড়ি ছাড়া তবু তেল পাবে না কি ?
তাই আমি হিজলের গাছে
এবার লয়েছি নাও বেঁধে !

দাও ছাড়া কথা নেই;
সাড়ে সাত চোর যদি ম'রে বেঁচে ওঠে
আমি সেই আধখানা চোর হবো !
মেয়েমানুষের ব্যথা, –
আমার মদের মুখ নাই !
মদের পিপার 'পরে সারা রাত একা ব'সে থেকে
আমি তবু মাংসের– মাংসের কথা ভেবে-ভেবে
মেয়েমানুষের স্বাদ চাই আমি শুধু;
এর চেয়ে কম কিছু নয় !

গাছের খোড়লে থেকে সারা দিন ব'সে
পেঁচানীর কাছ থেকে পেঁচার মতন
চুমো খেয়ে তোমরা হয়েছো ক্লান্ত,– জানি
কিন্তু আমি কিছু পাই নাই !

আমরা হইনি ক্লান্ত;

তোমরা অনেক চুমো পেয়েছো তবুও;
পেঁচার মতন তবু, – ঘুঘুর মতন কিছু নয়

জানি আমি; – চুমা তবু চুমা;
তোমরা পেয়েছো চুমা, আর সব চুমার সন্তান
তোমরা পেয়েছো;
আমি তবু একদিন ঘুম থেকে উঠে
রাতের বিছানা ধ'রে শুয়ে থাকি;
তবুও দেখিতে হবে চুনের মতন আলো এসে
চুন শাদা ক'রে গেছে জুলপির কাছে;
কাদাখোচা জলপিপি আবার এসেছে
চোখের ঘুমের পাতা খুঁড়ে-খুঁড়ে খেতে;
নষ্ট বিড়ালের মতো সারাদিন মন
শুকনো পাতার পিছে ছুটে-ছুটে অবসন্ন হয়!

পৃথিবীতে ক্লান্ত হ'য়ে আমরা তো বেঁচে থাকি তবু;

চুমো পেয়ে বেঁচে থাকি;
তবু জানি অন্য দিকে কোনো এক চুমো বেঁচে থাকে
আমাদের সব মেয়েমানুষেরা ম'রে গেলে !...
রুপার হাঁসের পাখা দেখি নাই,
তবুও রুপার হাঁস আছে
কোনো এক পালকের বিছানার 'পরে;
সাত দিন সাত রাত শেষ হ'লে বনের ভিতরে
যে-মানুষ মরে নাকো তার মেয়েমানুষ সে আছে—।

আমরা কি সেই দিকে চলিতেছি ?

ধলা ঘোড়া সেই দিকে যায়;

আমরাও ?
পিছে-পিছে যাই;
তবুও এ-দিকে গিয়ে কেউ খুশি হয় ?

আমি খুশি হবো নাকো আর;

কেন তুমি ?

আইবুড়ো;
দেশে ফিরে গিয়ে
আমার করিতে হবে বিয়ে !

হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

আমি এ-সবের নই;

আমিও না;

আমাদের ফিরে যেতে হবে;

হয়তো হিজল গাছ সেখানেও আছে;

হয়তো;

ওর ঘোড়া চ'লে যাক ওর চাঁদকপালের দিকে;

যেই দিকে যায় চ'লে যাক;
(শিকারি দুজন ফিরে চ'লে গেলো।)

তুমি

তোমার পিছনে কারা ?

আমি

আমার পিছনে আমি এতোদিন ঘুমে-জেগে কি কয়েছি কথা
কেউ তুমি শুনেছো কি ?
চাঁদের আলোয় এসে যেন কোন্ চিতাবাঘ হ'য়ে
ঘাড় ধ'রে কামড়ায়ে গিয়েছে আমারে আকাশের চাঁদ যেন !
ব্যথা পেয়ে তবুও দেখেছি
চিতার উজ্জ্বল ছালে রূপ লেগে আছে !
চোখে তার পৃথিবীর কোনো এক মেয়ের মতন
ভালোবাসা আছে !
তাই আমি ক্লান্ত হ'য়ে গেছি।

তুমি

কোথায় যেতেছো তুমি ? পৃথিবীর শেষে ?
তুমি খুশি হবে নাকি পৃথিবীতে থেকে ?
অন্য সকলের মতো ডিমের হলুদ খেয়ে তুমি
স্বাদ তবু পাবে নাকি ?
জলের পদ্মের বড়ো পাতার নিচেতে
ছায়া খুঁজে থাকিবে না মাছের মতন ?
– মাছের আঁশটে গায়ে লেগে
কোথাও পুঁটির মুখে রূপ খুঁজে !
তুমি ধান ভানিবার উঠোনের 'পরে
ইঁদুরের শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে এসে
রবে নাকি ছোট এক ইঁদুরের সাথে
সকল ভয়ের থেকে ছুটি নিয়ে– ভালোবেসে– ?
কমলালেবুর মতো লাল রোদ গিলে ?
– অশথ বটের গাছে পাখিদের মতো
ব'সে থেকে দুই ঠোঁট বাঁকা হবে নাকি !
বুড়ো পাখিদের মতো হবে নাকি আর
পৃথিবীতে ব'সে থেকে !

আমি

বেহালার মতো তবু সেইসব প'ড়ে আছে:
তবুও কোথাও কানে দোষ:
তাই আমি অশথ বটের গাছে বাঁকা ঠোঁট লয়ে

পাখিদের মতো বেঁচে বুড়ো হবো নাকো !

তবুও শেখাও
গাছের ছালের পরে ঠোঁট ভেঙে ফেলে
পাখিরা কি ম'রে যায় ?
অনেক দেখেছি মেয়ে পড়শিনীদের;
তাদের বুকের থেকে খুদের মতন ঘ্রাণ পেয়ে
কেউ যেন একবার গিয়েছিলো খেয়ে
মুখের স্বাদের মতো তাহাদের স্বপ্নের হৃদয় !
তারে তারা একদিন মশারির জালের ভিতরে
মাথার স্বপ্নের মতো
কাছে পেতে চেয়েছিলো !
কিন্তু তবু এক ভোরে পচা এক ডিমের মতন
সেইসব ভেঙে ফেলে চ'লে গেছে তারা;
মাংস আর রক্তের বিছানার পরে– তারপর
সন্তানের জন্ম তারা দিয়েছে সকলে ;
... আমি তবু তাহাদের মতো নাই।

স্বপ্ন,– কিন্তু তবু যাদের হৃদয় জ্ঞান আছে
তাহাদের ঠোঁট বাঁকা !

জানি আমি;

পৃথিবীতে ব'সে থেকে তাহাদের রোম সব শাদা হ'য়ে গেছে,
তাদের কপালে শিং পেঁচার মতন জেগে ওঠে;
অনেক রাতের বেলা জেগে থেকে তাহারা তারার কাছ থেকে
ফিতা আর চাখড়ির শাদা লাঠি ধার করে আনে;
তারপর পৃথিবীর মানুষের হৃদয়েরে মেপে ফেলে।
তাহাদের কথা তবু সকলেই মানে।

– জানি;

স্বপ্ন নয়;– তাদের হৃদয়ে বোধ আছে !
পাঁকের জলের মতো তারা নয়,– তাহাদের গভীরতা আছে !
তবু তারা ভালোবাসে !
তবুও তারার মতো আমি কোনো সবুজ পাহাড়ে
অন্ধকারে তাহাদের দেখি নাই !
তারা পাহাড়ের নিচে তারার আলোর মতো আছে;
সেইখানে ? ঘোড়া আর কুকুরের সাথে ?

চাঁদের শিঙের দিকে চেয়ে
পাহাড়ের পাথরের গায় মাথা খুঁড়ে
তাহারা অলস নয়– !
ছোট মেয়েদের মতো হ'য়ে গেছে আমার হৃদয় !
পৃথিবীর অন্ধকারে ভয় পেয়ে তবুও সে পারেনি ঘুমাতে,
লুকাতে চেয়েছে মুখ বিছানার কাপড়ের তলে;
সেইখানে স্বপ্ন খুঁজে ভুলিতে চেয়েছে ব্যথা,
তবু তার বুড়োরা তো ঘুমায়েছে;
তাহারা ঘুমায়।

কোন্ এক ইঁদুর এসে ঘুম ভেঙে গেছে ?
কোন্ ভয় ?

আমি এক বোতলের মতো ক'রে তোমার নিকটে যদি রাখি
আমার এ-হৃদয়েরে, –
তুমি তার ছিপি খুলে দ্যাখো; –
কিছু কি দেখিতে পারো ?
ছিপি তুমি খুলে দাও;

আমি এক কাচের গেলাসে সব হৃদয়েরে ঢেলে
তোমার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরি যদি;

সেই জলে কার যেন মুখ ভেসে ওঠে !
চেয়ে দ্যাখো,–
তবু তারে কোথাও কি দ্যাখা যায় ?
... কোথাও সে চ'লে যেতে আছে !
ইঁদুরেরা খুঁজে গেছে সব সব-শেষ শিষ,
ছড়ায়ে-ছড়ায়ে ছিঁড়ে ইঁদুরেরে খুঁজে গেছে পেঁচা,
তারে তবু দ্যাখে নাই কেউ !

আমার হৃদয়ে তারে তবুও দেখেছো;
সেখানে পেঁচার পাখা রুপার মতন,
তাদের কপাল থেকে দুই শিং উঠে
চাঁদের শিঙের সাথে মিশে গেছে যেন;
সেই সরু পোলের উপর দিয়ে হেঁটে
মুখের রূপের মতো কারা সব আসিতেছে যেন !
রূপ তাই বেড়ে গেলো এতো !

– তবু তারে পৃথিবীতে চাই আমি !

যা'রা চায় তাদের বিষণ্ণ হ'তে হয় !

সব বিষাদের স্বাদ জানি;

তবু তারে পাবে না তো;

হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন আছে !

পাখার মতন স্বপ্ন তাহার পায়ের চারিপাশে, –

স্বপ্নের উপর দিয়ে তবুও সে চ'লে যায় !

গেলাসে-গেলাসে আমি হৃদয়েরে ঢেলে দিয়ে
সেই জলে ছবি খুঁজে-খুঁজে
অবসন্ন হ'য়ে গেছি;

অবসন্ন হ'তে হয়;

চাঁদের আলোয় এক সমুদ্রের নৌকার মতো
আমার হৃদয়;
ভূতের নাওয়ের মতো, – আমি তবু একা তার হালে;
কোনোদিকে কোনোখানে কেউ নাই আর !
সমুদ্রের বড় সেই শাদা পাখি চ'লে গেছে উড়ে
যেইখানে জ্যোৎস্নায় ছাওয়া থাকে হয়তো সে-দিকে;
অথবা যে ম'রে গিয়ে রয়েছে পিছনে;
ময়লা আলোয় তার ডানা যেন দেখিয়াছি আমি
মাঝ-সাগরের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে আসিতেছে কাছে;
আমারে সে নিয়ে যাবে;
শান্ত ঘুঘুর মতো এক রাতে তবুও হৃদয়
শেষের চাঁদের শীতে বইঠার পরে
একাই ঘুমায়ে থাকে;
সেই ঘুম ভেঙে দিয়ে তবু
কোলের ছেলের মতো কেঁদে ওঠে ঢেউ !
মাঝ রাতে মোম জ্বেলে কে তুমি এসেছো !
চোখ কচ্‌লায়ে উঠে দেখি নাই আর, –
বাতাসে মোমের গন্ধ পড়ে থাকে পিছের সাগরে !...

অস্পষ্ট ভূতের ছায়া দ্যাখা যায় ঢের
মাঝসাগরের পথে চাঁদের আলোয় !

– তোমার হৃদয় ম'রে গেলে তবু এ-সব থাকে না।

আমার হৃদয় তবু বেঁচে আছে;
খোলা পাখা তবু তার রয়েছে পিছনে;

কখনো সুমুখে;
কখনো বা ডান ধারে,– কখনো বা বাঁয়ে;
ঢেউ ভেঙে বার-বার সে আমার কাছে এসে পড়ে;
কোথায় সে নিয়ে যাবে ?

কোথাও সে নিয়ে যেতে পারে;

তবু তার ঢেউ ভাঙা হয় নাকো শেষ;
একদিন শেষ হবে,– কেউ জানে ?
তবু তার পাখা যেন পৃথিবীর মতো নয়;
. কাঁচা চোখে উঠে
ময়লা আলোর ঢেউয়ে দূরে
তারে দেখে মাঝসাগরের ঢেউ ভয় পেয়ে ওঠে !
তবু তার মোহ আছে, –
ভয় হয়– আমি তারে একদিন ভালোবাসি যদি !

তারে ভালোবেসে তুমি ঢের দূরে চ'লে যেতে পারো,
সেখানেও সুখ আছে;
সেইখানে হৃদয়ের স্বপ্নের শিশুরা সব বড়ো হ'য়ে বেড়ে গেছে, –
ঢের বড়ো সুন্দরীর মাংসের মতন !
সেইখানে রূপসীর মাংসে শুধু রূপসীর মাংস জন্ম লয়,
তারপর মাংসে পোকা প'ড়ে যায় !
সবচেয়ে রূপ যারা ভালোবাসে
তাহারা রূপের স্বপ্ন ভালোবাসে সবচেয়ে !
তবুও সেখানে সব স্বপ্ন নষ্ট হয় !

কারা তবু সেইখানে যায় ?

পৃথিবীতে বিবাহের বিছানায় শুয়ে
যাহারা অনেক ক্লান্ত হ'য়ে গেছে।
– তাহাদের ঢের অবসাদ,
তবু তারা আরো ক্লান্তি চায়;
তাহাদের মাংস ছুঁয়ে দেখেছো কি ?

দেখি নাই;

হয়তো দেখিবে তুমি একদিন !
আমি মাঝ-সাগরের চাঁদের আলোয় একা আছি;
কিন্তু চাঁদ হেলে প'ড়ে গেলে
কপাল ঘামায়ে পড়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে,
তখন ব্যথার জন্ম হয়;
পৃথিবীর মানুষেরা সেই ক্ষুধা জানে !
বুড়ো মরা পাখিদের গলার নলির মতো নষ্ট মনে হয়
সকল মাংসের কথা এইখানে !

স্বপ্নের নাড়ির সাথে হৃদয়ের নাভি যারা বাঁধে
তারা কি হয় না নিঃসহায় !
... ভেবে দ্যাখো তবু তুমি।

এইখানে হালে ব'সে
পৃথিবীর মেয়েদের রূপ তবু আমার পড়েছে মনে;
তাদের মাড়িতে আর দাঁত নেই;
তাদের নাকের ডাঁশা ভেঙে প'ড়ে গেছে;
তাহাদের পেট থেকে অনেক সন্তান
কৃমির মতন ক'রে খেয়ে গেছে তাহাদের;
কোনোদিন যারা আর মরে নাকো তাহাদের মনের ভিতর
রূপ হ'য়ে বেঁচে আছে তারা তবু !

**অনেক বয়সের মেয়ে**

তোমাদের সব কথা আমিও শুনেছি,
ঘুমাতে-ঘুমাতে তাই জেগে ব'সে আছি;
হয়তো আমার মুখ ধনেশ পাখির মতো হবে;
তাহার তেলের মতো মন তবু;
আমার হৃদয়ে আছে অসুখের তবুও ওষুধ !

**তুমি**

কোনো এক মেয়েলোক ?

**আমি**

পৃথিবীর বিছানায় শুয়ে
মানুষের বুকে থেকে সেই সব ভালোবাসা ফুরায় না;
ভোরের আলোর মতো আঁশটে জালের থেকে ফেঁসে
তবু আমি চ'লে গেছি !

**অনেক বয়সের মেয়ে**

তবু তুমি রূপ ভালোবাসো !

**আমি**

মাছের আঁশের মতো তবু তুমি;

**অনেক বয়সের মেয়ে**

আমার পেটের থেকে যাহারা হয়েছে ?–

**আমি**

তারাও তোমার মতো হবে;

**অনেক বয়সের মেয়ে**

তাদের মতন কেউ সুন্দরী কি আছে ?

**আমি**

মন্ত্রী-কোটালের সাথে তাহাদের বিয়ে হ'য়ে যাবে;
পৃথিবীর মানুষেরা তাহাদের নিয়ে ক্লান্ত হবে,
তাহাদের মতো আমি কেউ নই;

**অনেক বয়সের মেয়ে**

রূপ নয়– রূপ নয়– কোনো এক ডাইনীর হাতে
কাপাশ তুলার মতো হৃদয় তোমার ধরা প'ড়ে গেছে !
চরকায় সব শেষ সুতা কেটে তোমারে সে ছেড়ে দেবে, –
তারপর হৃদয়ের রবে কিছু ?

**তুমি**

কে জানে হয়তো তারা ঠিক কথা বলে
পৃথিবীর এইসব মেয়েমানুষেরা !

**আমি**

এরা শুধু পৃথিবীর মানুষেরে দেখেছে যে,
সেখানে হৃদয় তবু অনেক সহজে খুশি হয়!
সবুজ তোতার মতো মটরশুঁটির খেতে থেকে

দুই ঠোঁট লাল ক'রে তারা আর চায় নাকো কিছু !
কিন্তু আমি পৃথিবীর মটরের খেতে গেলে ম'রে যাবো,–
দু-ঠোঁট হলুদ হবে, – তারপর শাদা হ'য়ে যাবে;
বলো তুমি, এমন বিষণ্ন মুখ দেখেছো কি !

আমি তবু পারি না কি খুশি হ'তে
পৃথিবীর পথে গিয়ে ?

পৃথিবীতে কে তোমারে দেখেছিলো ?

হয়তো দেখেছে কেউ,
একজন থাকে, দেখে ফেলে;–

হয়তো সে পৃথিবীর গর্ভের ভিতর আজো এসে জন্মে নাই,
কিংবা তার জরায়ুতে সোনার ডিমের মতো উঠিতেছে ফলে !...
অথবা,–
মাংস আর রক্তের জীবাণুর ঢেউয়ে
কোথাও অনেক স্বপ্ন বেঁচে থাকে !
(সমুদ্রের ভেতর দামি জাহাজ ডুবে যাচ্ছে।)

**তুমি**

ওইখানে কারা ?

**আমি**

কোনো এক রাণী হবে,
আর তার মেয়েমানুষেরা;
কোথায় চলেছে তারা ?

ওদের জাহাজ ওই সমুদ্রের হীরেকষ ফেনার ভিতরে
ডুবে যায়;– চেয়ে দ্যাখো !

**তুমি (অবাক হ'য়ে)**

জাহাজের ওই সব পুরুষেরা এই-এই মেয়ে নিয়ে ছিলো !...
পৃথিবীর শেষে গিয়ে কোথাও তবুও
ওইসব মানুষেরা আবার বাঁচিতে পারে।
ম'রে যায়;–
ওদের মেয়েরা তবু এদের এখন ভালোবাসে ?

## আমি

মখ্‌মল্‌ পেটারার থেকে লাল রেশমের রুমালের মতো
এ-সব মেয়েরা;
সাগরের সবুজ চোখের রঙে তাহাদের ভয় নেই,
'এলডোরেডোর'র থেকে সোনা খোঁজে যারা
তাহাদের হৃদয়েরে জুতোর হিলের তলে রেখে
তাদের সোনার থলি এরা ভালোবাসে—।

তবুও ডাকাত যদি রাজা হয় ?

বেদে আর ডাকাতেরা তবুও অনেকবার রাজা হয়,—
তা না হ'লে পৃথিবীতে রুপার পেয়ালা সব চুরি যাবে;
পৃথিবীতে রূপ আর রবে না তো কিছু !
দাঁত থেকে এনামেল নষ্ট হ'লে
সেখানে রুপার দাঁতে রূপ তবু থাকে ?

রুপা আর রূপ !...
চাঁদ হেলে চ'লে গেলে অন্ধকারে জলের ভিতরে
মুখ তার,
সে কাহার মেয়ে !

যখন সে চ'লে যাবে
এক মুখ বাতাস সে রেখে যাবে
পাখির মুখের মতো মুখ থেকে;
আর কিছু থাকিবে না !
দেখেছি অনেকবার;
তবুও বুঝেছি— আমারে সে ধরা দেবে !

সময়ের শেষে গিয়ে তারে পাওয়া যাবে !

আমার হৃদয়ে তবু সময়ের শেষ আছে;

তবে তুমি বেঁচে থেকে দ্যাখো,—
সব পেঁচা ম'রে গেছে জ্যোৎস্নায় হিমশিম হ'য়ে !
ইঁদুরেরা ম'রে গেছে আগে;
সকল চাঁদের শিং খ'সে গেছে আকাশের থেকে
ভেড়ার শিঙের মতো বুড়ো হ'য়ে;
ফুটোনো জলের থেকে ধোঁয়ার মতন
আমার হৃদয় তবু ভাসিতেছে !

সব ধোঁয়া কোথায় যেতেছে ?

জল হ'য়ে ফিরে আসে সব !

যখন ভেঙেছে সব, হারায়েছে, গেছে সব চুরি
তোমার হৃদয় এক বাসনের মতো তুমি রেখেছো গুছায়ে;
আমার চোখের জল মাংসের মতো তার !
তাই খেয়ে বেঁচে থাকে !

## তোমার সবিতা ভালোবেসে

তোমার সাথে আমার ভালোবাসা;
সাগর যেন ডাক দিয়ে যায়
গৃহবলিভুখের ডানায়,
পিঞ্জরে তার বাসা।
আমার পথে সূর্য রৌদ্র জ্বলা
নীল নিখিলের সমুদ্র নেই;
তবুও সাগর আছে মনেই;
আমার প্রাণের সাগরতীরে
শাদা ডানায় উড়ছে কি রে
পাখি, – না সে পাখি হওয়ার মতন পিপাসা!
আমার সাথে তোমার ভালোবাসা।
নয় তো আকাশ সাগরো নয়;
দুয়ের মতন তবুও উদয়;
জাগায় প্রাণে অপার আশা
অসীম নিরাশা।

## এ কি আলো ! এ কি আঁধার

এ কি আলো ! এ কি আঁধার
সৃষ্টিধারার অলখ থেকে আসে !
কোথাও তুমি নেই তবুও
তোমারি কেশপাশে
রাত্রি-ঝ'রে-পড়ার আকাশ কালো;
আঁধার আকাশ আলো
ক'রে সে-মুখ বনজুঁয়ের বৃষ্টি জ্বালালো
মউমাছিদের রৌদ্রে বাতাসে।

এই আলো কি কালের দেয়াল-বিজয়িনী পাখি ?
তোমারি চোখ প্রেমের ক্ষমতা কি !
তবু সিন্ধুর দুই তীরেতে দুজন একাকী,
অঙ্গে কেঁদে উঠে দূরের অঙ্গ ভালোবাসে।

## শোনো– শোনো– নীলকণ্ঠ পাখিরা

শোনো– শোনো– নীলকণ্ঠ পাখিরা
আলোর ফোয়ারাপারে
তোমারি ঘুমের কুহেলি ঝরার আগে
পেয়ে গেছে নীলিমারে।
এসো-এসো-এসো প্রথম ভোরের অনুভাবনায়
আজ পৃথিবীর ঘুম ভেঙে যায়;
আকাশের নীল নিরালায়
ডেকে যায় বারে-বারে
কোনোদিন এই মাটি পৃথিবীর মনে
কোনো প্রণয়িনী-জন চেয়েছিলো যারে।
সোনালি রৌদ্রে মৌমাছি অনুরাগে
উড়ে গেলে আলো চোখে এসে ভালো লাগে;
কি কবে হারায়ে গিয়েছে সে-কথা অন্তরে যদি জাগে
সে-ব্যথা তবুও নেই আজ এই আলোকের পারাবারে।

## আলো দূরে– আরো দূরে

আলো দূরে– আরো দূরে
চ'লে গেছে কোন সঙ্গীতে উড়ে–
ভোরের মেঘের দিকে কোন আকাশে।
সেখানে চাতকী তার প্রিয়ের পাশে
প্রবাল রঙের ডানা জ্বালে
পৃথিবীর নীল সকালে,
চঞ্চল চেতনার সমুদ্দুরে।
আমার প্রাণের বীণ
তবুও কি আঁধারে অন্তর্লীন !
কেন মনে হয়
বাতাস নিজেরি ব্যথা বয়,
জল সে একাকী কথা কয়
বন্দিনী নদীদের নিয়মে ঘুরে !

হে প্রেম, অমেয় প্রেম, তুমি
সূর্যের মতো আজ লুকায়ে রয়েছো
গ্রহণের লগ্নে তুমিও;
তবু জানি অপরূপ আলোর সাগর স্মরণীয়
রয়ে গেছে চাতকের কালো চোখে প্রিয়
নভোনীলে চাতকীর চঞ্চল নিঃসৃত সুরে।

## তোমারে ডেকেছি আমি

তোমারে ডেকেছি আমি
মায়াবীর মতো নেমে এসে।
চিত্রা তারার মতো রাতের দেশে
ধীরে আসে ধীরে নারী,
মায়াবিনী ক্রান্তি ঘনায়;
রক্ত দাহন দিন নগরী সমাজ দূরে যায়;
আমরা কি সৃষ্টির আঁধারের
বাহিরের দূর বিদেশে !
অনেক তারার ভিড় মিনারের ফাঁকে
একটি তারার মতো
পৃথিবীর পানে চেয়ে থাকে;
চিত্রা তারা তো তুমি হিমের শেষে !
সুদূর সাগর থেকে হাওয়া
সময়ের থেকে সময়ের পানে যাওয়া;
গান কি অন্ধ পাখি ?
প্রেম কি তিমিরে গান গাওয়া–
সূর্য নিভায়ে, নারি,
তোমার সবিতা ভালোবাসে।

## সে-জাহাজ দেখেছে কি কেউ ?

(সংলাপ কবিতা)

সে-জাহাজ দেখেছে কি কেউ ?

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে ভুলে গিয়ে শীতের সাগরে
কোথাও চাঁদের আলো বরফের মতন সবুজ;
-- সেখানে পালের শব্দ একবার শুনেছি বাতাসে,
যেন কার মসলিন শাড়ির ভিতর থেকে এসে

নীল রেশমের মতো চোখের পাতার পথ খুঁজে
আসিতে সে চেয়েছিলো,— সেইসব আমাদের নাই;
জেগে উঠে তারে আর দেখি নাই কিছু।

তবু তুমি বলো না কি সে-জাহাজ আছে!

আমরা নাবিক;
মাথার ভিতরে এক সাগর রয়েছে যেন আমাদের!
ঢেউয়ের ফেনার ঝিমে আমাদের নীল শিরা ভ'রে গেছে;
আমরা হয়েছি তাই সমুদ্রের স্পঞ্জের মতন
সাগরের ঢের গল্প খেয়ে ফেলে বেঁচে থাকে!
স্বপ্নের বুদ্বুদ ঢের সমুদ্রের সেইখানে জ'মে আছে,
আর তুমি নিঙড়ায়ে লও যদি—

নাবিক, অনেক বড়ো হ'য়ে গেছো তুমি;
বুড়ো এক পেঁচার মুখের মতো জাহাজের হালে ব'সে থেকে;
তোমার এপ্রন পালে ডানা মেলে অনেক সমুদ্র ঘুরে এসে
কোথাও কখনো ঘুমে শুয়ে থেকে বুঝেছো কি তুমি
জাহাজের পোষা তোতা পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়!
কেউ তারে নাম ধ'রে ডেকেছে কি অন্য এক ডেকে!

কোন ডেক্?

শুনেছো কি উড়ে যেতে গিয়ে পালকের রোম তার খ'সে গেছে,—
একখানা— দুইখানা— তিনখানা পাখার পালক তার প'ড়ে যায়!
তবুও সে উড়ে গেছে!
জাহাজের নাবিকেরা তখন ঘুমায়ে থাকে;
মাঝ-সমুদ্রের শীতে জ্যোৎস্নায় একা যদি জেগে ওঠে কেউ
ঢেউয়ের ভিতরে আলো চিতার মতন তারে কামড়ায়ে ফেলে যেন।
দুই হাত হিম হ'লে হৃদয়ে অনেক ব্যথা জ'মে যায়।

শুক্তির খোলায় ফুটো হ'য়ে গেলে রক্ত দিয়ে সেইসব শু'রে ফেলে তারা;
জানো তুমি সেই রক্তে কিসের অবাধ জন্ম হয়!...
অনেক সমুদ্রে তুমি বেঁচে থেকে সে-সব বুঝেছো।
যেইখানে আরশীর মতো সব মানুষের মুখে
আমাদের মানুষের মুখ সব দ্যাখা যায়
অনেক দেখেছি আমি সেইসব;
তাহাদের হৃদয়ের সব লোনা গল্প আমি জানি।
মাংসের পায়ের 'পরে ভর ক'রে কাঠের ডেকের 'পরে হাঁটে যারা,

কাপড়ের পাল তোলে,
যাহাদের জাহাজের অতো উঁচু মাস্তুলের থেকে
সমুদ্রের তিমিরেও ইঁদুরের মতো মনে হয়,
তাহাদের সেইসব গল্প আমি জানি;
দাঁড়ির ভিতরে শাদা বরফের মতো গুড়ো গুড়ো হ'য়ে জ'মে আছে সব।
তুমি কোনো অন্য এক জাহাজের পিছে পিছে যাও নাই?

উত্তরের হাওয়া ছেড়ে পৃথিবীর মধ্যের সাগরে
বিষুবের ঢেউ থেকে দক্ষিণের গরমের সমুদ্রের দিকে
স্পেইনের জল ডাকাতের মতো
অনেক অদ্ভুত জলে আমরা ঘুরেছি।
কোথাও দেখেছি কোনো জাহাজের পালে আজো 'স্কাল্' আর 'ক্রসবোন্' আছে,
বাবড়ির মতো চুল দুই কানে মাকড়ি রয়েছে
কোথাও বা নাবিকের!

আজো তবে তারা বেঁচে আছে? তাহাদের জানি আমি,
তাহারা অনেক সোনা চুরি ক'রে বাঁচে,
তোমার জাহাজ থেকে তোতা তবু চুরি ক'রে নেয় নাই তারা।

আবার তোতার কথা বলো তুমি? শোনো তবে, মনে প'ড়ে গেছে
অনেক-অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলো যেন,
তার এক রাণী ছিলো; - শোন তুমি, রূপকথা নয়।
তাহারা জাহাজে চ'লে একদিন আমাদের মানুষের পাশে এসেছিলো,
হয়তো তাহারা কোনো 'এল্‌ডোরেডো'র!
মলদ্বিপ সোনার কথা শুনিবে না তুমি আর?
আমরাও অবসন্ন হ'য়ে গেছি অনেক রেশম রূপা দেখে,
তবু সেই জাহাজের ভিতরের দিকে
একবার চেয়ে দ্যাখা যায়!
আমাদের সবুজ তোতারে সেই তাহাদের ভালো লেগেছিলো;
সারাদিন সেই পাখি টি-টি ক'রে কেঁদেছিলো তাহাদের কাছে গিয়ে তবু,
কেন? তুমি বলো দেখি!

বিমর্ষ ঘুঘুর মতো সে-রাণীর মুখ?

হয়তো বা।

তার মুখে পৃথিবীর বিষণ্ণতা লেগে আছে।

তবুও তা এমন সুন্দর!

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রূপ বেঁচে থাকে বিমর্ষের মুখে,
তবুও তা পৃথিবীর।
অনেক সাগর ঘোরে যে সব জাহাজ
তাহাদের হাওয়ার ভিতর কোনো কোনো পাখি থাকে
গল্পের ছবির মতো কি খেয়ে যে তারা বেঁচে আছে
সবচেয়ে বুড়ো বুড়ো নাবিকেরা জানে নাকো।
কাহার সে পাখি ?... জাহাজের নয় ?

তবে কার

কে তাহারে কিনেছিলো ?
বাইজেন্টিয়ামে— রোমে— অজন্তায়— এলোরায় কোনো কারিগর
সোনার ভিতর থেকে গেলে-গেলে গড়ে নাই তারে।
যে-সব বিড়াল শাদা—
গল্পের ভিতরে থাকে পরীদের হাতে
তাহাদের সবুজ চোখের মতো পালকের রং !
হয়তো দেখেছি তারে... কে তাহারে কিনেছিলো ?
বুয়েনস আইরিস ছেড়ে
হয়তো জাভার দিকে চলেছিলো তখন জাহাজ,—
কোনো এক ট্যারা মানুষের কাছে কোথাও বন্দরে
হয়তো পেয়েছি তারে।— তার হাতে ছের তোতা থাকে।

কুখসিতের হাতে রূপ পৃথিবীতে আছে !
যখন বন্দর ছেড়ে তবুও জাহাজ
রুপার দখের মতো বাঁকা এক চাঁদের ভিতরে
ঢুকে-ঢুকে যেতেছিলো চুপে,
পৃথিবীর বুড়ো মেয়েদের সেই স্বপ্নের সময়,—
এখন তোমার তোতা কোনো এক গল্প বলেছে কি ?

কারে ?

সেই গল্প কারো মনে নাই ?

আমরা তোতার গল্প শুনি নাই।

কানে তবু পালের হাওয়ার শব্দ ছের শোনা যায়।

জাহাজের পাল বেয়ে ভরে থেকে সেসব শুনেই আমি জোৎস্নায়— দিনে
তবুও তো বুঝি নাই জলা কোনো জাহাজের ডেক থেকে কেউ
আমাদের সবুজ তোতারে বলে বিষ্ণু দিয়ে ডেকে গেছে !—

কখনো কি শোনো নাই ?

কেউ কি শুনেছে ?
এমন নাবিক তবু থাকে না কি সমুদ্রের পরে...
পালের হাওয়ার গান শুনে-শুনে যাদের খাবার
তিক্ত হ'য়ে যায়
কোথাও আস্বাদ বেশি র'য়ে গেছে পৃথিবীর মাংসের চেয়ে !
কোথাও আমরা ছায়া,– আমাদের স্বপ্ন সব শরীরের মতো !
কোথাও রয়েছে বাতি,– আমরা তাহার ছায়া শুধু।
সবচেয়ে বেশি যারা স্বপ্ন দ্যাখে তাহাদের মাথার ভিতরে
মুক্তার মতন ঘোলা আলো র'য়ে গেছে,–
একদিন ক্রমে-ক্রমে তারার মতন
আরো আরো প্রসবের স্থান হবে তাদের হৃদয়ে:
আমরা এমন ক'রে বাড়ি:

জালের ছাঁদার থেকে সমুদ্রের জলের মতন
সকল নীলাভ গল্প সকলের হৃদয়ের থেকে
পলায়ে যেতেছে তবু !
মাছের মতন মাংস পাই না কি তবু ?

শুধু এক চামচের নীল ঢেউ তবু যদি ধ'রে রাখা যায়
মাছের আঁশের সাথে ছাই তবে হবে না মিশাতে !
ঘাঁটাতে হবে না তবে কিছু আর !
সেইসব– সেইসব ব্যথা ভুলে যাবে।

সেসব বেদনা তবু করেনিকো বিষণ্ণ আমারে:
জলের ভিতরে ডুবে স্নান ক'রে সমুদ্রের জাহাজের মতো
আমিও উঠেছি বেড়ে,– বুড়ো হ'য়ে– আরো বুড়ো হ'য়ে !
সাগরের ঈগলের মতো আমি,
শরীরে শাদা-শাদা লোম থেকে সমুদ্রের লোনা জল ঝরে !
সকালের আলো থেকে দুপুরের– দুপুরের রোদ থেকে বিকালের নীল জ্যোৎস্নায়
দুই হাতে– দুই পায়ে– লোমে– মাংসে বেঁচে আছি আমি,–
তোমরা বিমর্ষ তবু হও !

তুমি এক অন্য কোনো নাবিকেরে দেবে কি পাঠায়ে ?

সকল সমুদ্র ঘুরে এমন বিষণ্ণ কেউ থাকে ?

বিমর্ষ রাণীর মুখ মনে আছে ?

কোথাও সাগরে আমি তেমন বিষাদ আর দেখি নাই,– জানি:–

তাহাদের সে-জাহাজ কবে চ'লে গেছে !

কোনদিকে ?

কেউ তার খোঁজ জানে নাকো:

তোমরা সে-জাহাজের পিছে আর যাও নাই ?
আমরা তাদের মতো নই:
তোমাদের ক্ষুধা আছে,
তবুও সেখানে আরো ক্ষুধা বেঁচেছিলো;–

আরো ক্ষুধা ? আমাদের চেয়ে আরো বেশি ?

আরো বেশি;

বেতের লতার মতো সরু এই সূতার ভিতরে ?

ভিতরের সেই ক্ষুধা আমাদের মাংস খেয়ে ফেলে
আমরা খাপের মতো,
আগুন লেগেছে যেই ভরোয়ালে, সেই ক্ষুধা তাই !
আমার হৃদয়ে ক্ষুধা জ'মে উঠে ঝ'রে যায় নাকো:
সে কোথাও– সে কোথাও বেঁচে আছে তবে :
যার চোখে মুখ দেখে মুছে যাবে আমার চোখের...
যে-চুমার স্বাদ খুঁজে দুই ঠোঁট তিতা হ'য়ে আছে
কোথাও রয়েছে বেঁচে সেই ঠোঁট !

পৃথিবীতে পাও নাই কিছু ?

যখন দুপুরবেলা পৃথিবীর পথে ব'সে থেকে
শরের ভিতরে ভিজে বাতাসের শব্দে ক্ষুধা পাই,
বাজকুড়ুলের ডাকে যখন হৃদয়ে ক্ষুধা পাই;
তখন বুঝেছি আমি পাই নাই !–

পৃথিবীতে পাওনি যা সমুদ্রের পথে তারে পাবে ?
কোনো এক জাহাজে সে আছে !

কোথায় শুনেছো ?

বিকালের অন্ধকারে ডেকে ব'সে থেকে
সমুদ্রের দিকে চেয়ে হয়তো দেখেছি তার !
হঠাৎ পেয়েছি তারে,– অনেক নিকটে যেন থাকে;

এতো কাছে চ'লে এসে তবুও সে ফিরে যায়,
জাহাজের রেলিঙের 'পরে হাত রেখে
আঙুলে আবার শীত লাগে !–
কাল রাতে তোমারে পাইনি কেন বিছানায় ?

আমি কি অনেক রাত বিছানায় কাটাইনি তবু ?

ডেকে তুমি গিয়েছিলে ?

ডেকে;

তোমার লোমের কোট পিছে রেখে গিয়েছিলে কেন ?
শাল কেন নেও নাই ?
কাল রাতে জেগে উঠে এসব দেখেছি,– প'ড়ে আছে;
তবুও তোমারে আমি দেখি নাই,– এমনি কি কোনোদিন হ'তো ?

কোনোদিন হয়নি যা একদিন তবুও তা হয়;

শিস্ কেউ দিয়েছিলো ?

আমি কারু পোষা পাখি ?

জাহাজের 'পরে ঢের ট্যারা লোক থাকে–
মাথার ওপর থেকে তাহাদের টুপি খ'সে যায় !
একরাশ পরচুলা তাদের মাথার থেকে ঝুলে পড়ে;
তাহাদের বাঁ-পায়ের মোজা খুলে প'ড়ে গেছে গুড়ুলির পরে;
তাহারা অনেক রাত জেগে থেকে ঝিনুকের মালা গাঁথে,–
জালের মতন খিঁচে সাগরের জলে ফেলে দেয় !
তবুও জাহাজে সব মেয়ে থাকে তাহাদের তামাশায় আছে !

তাহাদের হয়তো বা তামাশার সময় এসেছে;

সমুদ্রের জাহাজের 'পরে ঢের ভাঁড় বেঁচে থাকে,
পৃথিবীতে এতো নাই !

এখানে চাঁদের আলো ঘুমন্তের মাথা নিয়ে খেলা করে,
কোথাও এমন চাঁদ পৃথিবীতে দেখেছে কি কেউ !
সাগরের থেকে এক বাঁকা মরা মাছের মতন
তাহার সবুজ মুখ ভাসে যেন সমুদ্রের জলে !

সাগরের ফেনার মতন হাত হিম হ'য়ে যায়
ডেকের রেলিঙ আরো ঠাণ্ডা– আরো ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে !

আর কেউ ডেকে ছিলো ?

দেখি নাই;

অসম্ভব জলে-জলে যখন জাহাজ চরে তখন ঘুমাতে হয় !–
পুরুষের রক্তে তার যেইখানে বিছানা গরম
তখন সেখানে তার বিবাহের মেয়েলোক থাকে।

সেখানে থেকেছি আমি বিবাহের শীত রাত থেকে;
সে রাতে কি শীত ছিলো ?

ঢের শীত জমেছে শরীরে তবু বিছানায় শুয়ে।

ডেকে আরো বেশি শীত।

সেখানে তবুও লোক থাকে;

লোক ? মেয়েলোক ?

এমন মানুষ আছে
সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলে অন্ধকারে ঘুমায় না আর !

দোল্‌নায় শিশুদের মতো এই সমুদ্রে আমরা,
এখানে সহজে ঘুম আসে !

সকল মানুষ আর শিশু নয়,– কেউ-কেউ বেড়ে যায় !
জাহাজের ইঁদুরের মতো তারা,– তাহাদের অসুখ রয়েছে !

জাহাজের মানুষের চেয়ে তবু জাহাজের ইঁদুর তরাসে;
অসুস্থ জাহাজ ছেড়ে চ'লে যায় তারা,
তাহাদের বেশি ব্যথা আছে।

তবুও জাহাজ আজো পচে নাই,
কেউ কারে ডাকে তবু অন্য এক জাহাজের ডেকে ?
এমন সময় চ'লে আসে
কুঠুরির অন্ধকারে শুয়ে থেকে ঘুম ভেঙে যায়;

তখন কেবিনে ভেঙে পড়ে এলোপাথারি সাগর !
সমুদ্রের বাতাসের মুখ কোনো মানুষের মতো কথা কয় !
কারে সে ঘুমাতে দেবে ? ঘুম নাকি সবচেয়ে ভালো ?
তবুও ঘুমের থেকে ভালো এই জেগে থাকা,– এই জেগে থাকা !
আমরা বাঁচিয়া থাকি আমাদের হৃদয়ের দোষে,–
অবসাদ ধ'রে গেলে অবসন্ন হ'তে চাই আরো !
পালকের বিছানায় শুয়ে তাই অপরাধ জমে,
অপরাধ– অপরাধ– অপরাধ– অপরাধ জমে !
মাঝের সমুদ্রে এসে এইখানে কোথাও তবুও
হৃদয়ের হাত থেকে রক্ত মুছে ফেলে
মুক্তার গেলাসে আমি জলের মতন তারে রেখে দিতে চাই !

কখন হৃদয়ে তার পাপ জমেছিলো ?

কেউ আর সেই কথা জানিবে না !

আমিও না ?

তুমিও না,– একজন ছাড়া।

একজন ছাড়া ? কোথায় সে ?

সে কোথাও আছে;

এই ডেকে ?

ডেকে গিয়ে দ্যাখা যায় তারে ?

কখন ?

তোমার বিছানা ছেড়ে যখন তাহার কাছে যাই;–

মেয়েলোক, তোমার পুরুষ যেই বিছানায় আছে
সেইখানে কি রয়েছে ?
তারে ছেড়ে অন্য এক বিছানায় মেয়েলোক কেন তবু যায় !
আমি কোনো মেয়েদের বিছানায় কোনোদিন যাই নাই;
এখন অনেক আলো দিনের সমুদ্রে দ্যাখা দেবে
এইসব অসম্ভব ইচ্ছা মুছে যাবে;
এখন ঘুমায়ে পড়ো,– ঘুমায়ে-ঘুমায়ে পড়ো তুমি;

ঢের-ঢের অসুস্থ হয়েছো !

তুমি নও,– আমি কারো হৃদয়ের বোন !

কার ?

আমারে অনেক ভেবে চুল তার শাদা হ'য়ে যায়।

কখনো পড়ার বইয়ে এই কথা থাকে ? কোথাও গল্পের বইয়ে ?

অন্ধকারে– দিনের আলোয়– পৃথিবীতে– সমুদ্রের শেষে–
আমি কারো– আমি কারো হৃদয়ের বোন।

কোনদিকে জাহাজ চলেছে ?

চলে গিয়ে কোথাও সে হৃদয়ের নিয়ে যাবে;

এখানে সমুদ্র খুব দোলে।

হয়তো জাহাজ আর কোনোদিন আসে নাই এমন সাগরে;

জাহাজের নাবিকেরা পথ ভুলে গেছে ?
সবচেয়ে বুড়ো– বুড়ো নাবিকের চোখে
সমুদ্র চোখের ধুলো দেয়।
জাহাজ আবার দুলে উঠিতেছে;

আমাদের কেবিনের অন্ধকারে এলোমেলো হ'য়ে গেছে সব,–
গুছায়ে দেবে না তুমি ?

এইখানে ওইসব এলোমেলো হবে;

তবুও গুছাবে চলো;

এখন না;

তোমার মাথার থেকে খোঁপা
পালের মতন ছিঁড়ে যায়
তোমার মুখের চুল গুছাবে না !
এখন না;

দাও,– আমি সাজায়ে দিতেছি;

সমুদ্রের দোলা শেষ হ'লে,–

সমুদ্রের দোলা শেষ হয় ?

কারা যেন কেঁদে ওঠে।

কোথায় ?

শোন না কি ?
জাহাজ কি ডুবে যায় ?
হয়তো;

না– না– না– না– কেউ আর কাঁদে নাকো;
জাহাজ ডোবেনি,– তবুও কোথায় যাও তুমি ?

না– না– না– না,– জাহাজ ডোবেনি !

ডুবে-ডুবে বেঁচে গেছে !

এখানে এসেছো কেন এতো রাতে ? ডেকে আর কেউ নাই।

কেবিনে যাবে না ফিরে তুমি ?

না– না– না– না– এইখানে চাঁদের আলোয় আমি শিস্ দিতে ভালোবাসি
তবু আমি ফিরে যাবো;

কোথায় ?

একদিকে ফিরে যাবো;

হঠাৎ তোমারে এই কালো কোটে এইখানে দেখে
অনেকের ভয় লাগে !

কেউ তবু এইখানে থাকে নাকো এমন সময় !

কেউ-কেউ এসে পড়ে !
না– না– না– না– এখন ঘুমায়ে থাকে সব !

ঘুমায়ে-ঘুমায়ে কেউ হাঁটিবে না ?

এখন,– তুমি কেন এখানে এসেছো ?

এইখানে বার-বার পায়চারি ক'রে আমি দেখেছি তাকায়ে
আমার লম্বা ছায়া একাই আমার সাথে হাঁটে !
কখনো বা ডান দিকে,– কখনো চলিতে থাকে বাঁয়ে,
কখনো সুমুখে এসে পড়ে,– কখনো পিছনে তারে পাওয়া যায়;
তবু, জানো ?– এমন এ-জ্যোৎস্নায় কেউ আর কোনোদিন নিকটে থাকেনি
আমার লম্বা ছায়া ছাড়া !
সেই ছায়া মাঝে-মাঝে বেঁটে হ'য়ে যায়,– তবুও সে কাছে থাকে;
আমার এ-হৃদয়ের কাছে আর কেউ থাকে নাকো,
কেবিনের অন্ধকারে ছায়া তবু চ'লে যাবে,– সেইখানে কেউ-কেউ রবে নাকো আর।
তাই এই জ্যোৎস্নায় শীতে কেঁপে তবু আমি ভালোবাসা শিখি–।

কোথায় তোমার ছায়া ?

এবার পিছনে;

দ্যাখা যায়:

চেয়ে দ্যাখো, আবার সুমুখে চ'লে আসিবে সে !

দ্যাখা যাবে;
একবার চ'লে যাবে ডান দিকে, একবার চ'লে যাবে বাঁয়ে:
কুকুরের মতো ক্ষেপে সমুদ্রের ঢেউ যদি খেতে আসে
ভয় পেয়ে পিছাবে না !
কোনো এক মেয়েমানুষেরে আমি ভালোবাসি যদি
হিংসা ক'রে তবুও সে আমারে কি ছেড়ে যাবে ?– এই ছায়া ?
মেয়েমানুষেরা তবু একদিন ভালোবেসে আমাদের হিংসা ক'রে ছেড়ে যায়;
বইয়ে প'ড়ে দেখেছি সে-সব !

আমি দেখেছি,
বইয়ে– বইয়ে– বইয়ে– বইয়ে প'ড়ে !
হাতের চুরুট আর জ্বালাবে না ?

জ্বালাবে;

ভেবে-ভেবে জ্বালাতে পারেনি আর এতোদিন:
কতোদিন ?

তিনদিন– চারদিন আঙুলের ফাঁকে র'য়ে গেছে,

কখনো পকেটে নেমে  কখনো ডেকের 'পর পড়েছে গড়ায়ে;
জ্বালাবে তবুও;

দেশলাই আছে ?

এতো রাতে ডেকের উপরে ?

হয়তো আমার কাছে আছে তবু,– এখানে বাতাসে সব নিভে যায়।

কেবিন তো ভালো ছিলো ?

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ– চুরুট জ্বালাতে,–

এইখানে তার চেয়ে বেশি কিছু আছে ?

এইখানে পায়চারি ক'রে-ক'রে তবু কিছু পাওয়া যায় !

কোথায় চলেছো তুমি ?

কোনদিকে জাহাজ যেতেছে ?

জাহাজের দিক নিয়ে যারা বাঁচে তুমিও কি তাদের মতন ?

আমার নাকের নিচে এই ডেক– একখানা ডেক বেঁচে আছে।
তবুও ডেকের নিচে ফুটো ক'রে ইঁদুরের মতো লেজ তুলে
হৃদয় এখানে কারে খোঁজে !
কাহারো পায়ের পাতা তারে এসে পিষে ফেলে যদি,
সে যদি শুকায়ে থাকে চার ঠ্যাং তুলে,
প'চে যায়– প'চে-প'চে যায়,
তখন তোমরা তারে সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে !
সমুদ্রের ঢেউয়ে আমি এখন ঝাঁপায়ে পড়ি যদি
তাহলে তোমরা এসে জাল দিয়ে মাছের মতন
আমারে তুলিতে তবু যাবে !

এই কথা ভাবো তুমি ?
এইসব ভেবে-ভেবে আমার হৃদয় ঢের বুড়ো হ'য়ে গেছে।

বেঁচে থেকে আরো বুড়ো হ'য়ে যাবে !

সমুদ্রের জলে গিয়ে পচা-পচা ইঁদুরেরা লেজ তুলে খুঁড়ে-খুঁড়ে মরে না কি আর।

সেইসব দ্যাখা যাবে সমুদ্রের জলে গেলে;

আগে তবু একবার জলের ভিতরে গিয়ে ডুবে থাকা চাই !

চলো তবে;

চলো;

ডেকের উপর থেকে দুইজন লোক চ'লে গেছে
তাদের দেখেছে কেউ ?

এইখানে এতো রাতে তুমি ?

কি হয়েছে ?

দুই হাত হিম হ'য়ে যায় !

দস্তানা আছে হাতে ?

সে-সব হারায়ে গেছে– কোনোদিন ছিলো নাকো আর !

তাহলে শীতের আর দোষ ?

কুঠের হাতের মতো অনেকের হাত থেকে দস্তানা খ'সে যায়, তবু,
তাদের আঙুল হিম হ'য়ে যেতে চায় !

সেইসব জানি নাকো,– কতো রাত ?

রাত ঢের !

কোনদিকে জাহাজ চলেছে ?

ওসব কে জানে !

কোথাও বন্দর আছে কাছে ?

কেন ?

জাহাজের ইঁদুরেরা পালাতেছে না কি ?

কে বলেছে ?

তাহাদের শব্দ আর শুনি নাকো !

তুমিও কি জাহাজের ইঁদুরের শব্দ নিয়ে অন্ধকারে বেঁচেছিলে ?
তোমার মুখের পরে ইঁদুরে লেজের ছায়া ফেলে নাই তবু !

কতো রাত ?

অনেক,– অনেক !

ভোর খুব কাছে ?

দেরি আছে;

অন্ধকারে পায়চারি করা যায়;

দুইজন এইখানে পায়াচারি ক'রে গেছে;

তাদের দেখেছি আমি;

আমিও দেখেছি;

কোথায় পালালো তারা ?

দু-জন ইঁদুর;–

কোথায় গিয়েছে ?

তারাও জাহাজ ছেড়ে পালায়েছে;

এখানে সমুদ্র খুব দোলে !
জাহাজের হাল ভেঙে যায় যদি– ইঁদুরেরা পালাতেছে তাই !
যাদের বুটের তলে আঁটা নাই পিছলায়ে প'ড়ে যায় তারা,
জাহাজ তবুও তার বন্দরের দিকে চ'লে যাবে।

– বন্দরের দিকে ঠিক যাবে ? জানো তুমি ?
নাবিক, তোমার কি মনে হয় ?

অনেক খারাপ গল্প শুনেছি আমরা
আমাদের এসব বয়সে– !

গল্প তবু গল্প ব'লে শেষ হয়,

তাদের ভিতরে কোনো রক্ত নাই,– মানুষের মাংসে তারা বাঁচে নাকো।

মানুষের কেবিনের জানালায় তবু তারা বেঁচে থাকে !

জানালায় আমরা পর্দা টেনে দেই;

সমুদ্রের বাতাসের হাত এসে সেইসব তুলে ফেলে;

কেন ?

কোথাও সমুদ্রে আলো এইখানে পৃথিবীতে চাঁদের আলোর মতো নয় !
কোথাও হৃদয়ে খুব শান্তি আছে,– তবুও সেসব শান্তি দেরি ক'রে আসে;
এখানে জলের শব্দে– সমুদ্রের বাতাসের স্বরে
ঘুম থেকে জেগে উঠে যাহারা বিবর্ণ হ'য়ে যায়,
কোথাও– কোথাও গিয়ে একদিন শান্তি পাবে তারা !
ফুটো কলসির মতো ঘুমায়ে-ঘুমায়ে কোনো শান্তি আছে আজ ?

এইখানে কে কাহারে চুমো দেয়।

চেয়ে দ্যাখো।

একদিন সে কাহার বিছানায় ছিলো !

তোমারো বিবর্ণ হ'তে হবে।

কোন কথা ভেবে ?

তোমার বিছানা ছেড়ে একজন চ'লে গেছে;

সে কাহারো বিছানায় যায় নাই !

বিছানায় নাই কিছু... কোথায় যেতেছো তুমি ?

ওইখানে আরো আগে– ডেকে।

ভোর হ'য়ে গেছে !

সমস্ত সমুদ্র ভ'রে এখন কুয়াশা !

শীত লাগে ?

এই শীতে হৃদয়ের ভালো করে:

তোমার আঙুল তবু হিম হ'য়ে গেছে:

একদিন জাহাজের রেলিঙের চেয়ে আরো বেশি হিম ছিলো তো আঙুলে,
সেদিন সাগরে তবু রোদ ছিলো:
তবু এই কুয়াশার দিকে তুমি চেয়ে দ্যাখো:

মাথার ভিতর থেকে যদি কোনো শাদা চুল দ্যাখা দেয়
এ-কুয়াশা সেইসব মুছে ফেলে যেন:
বড়ো হ'য়ে বেড়ে গিয়ে একদিন কুয়াশার দিকে আর চেয়ে দেখি নাই,
সাগরের 'পরে তবু আবার সকাল আসে যখন হৃদয় বুড়ো নয় !
এই শীতে একদিন তবু এক অন্য কথা মনে হ'তো,
তখন বুকের 'পরে শাল রেখে চেয়েছি সহজ হ'তে,
কিন্তু তবু সেইসবে কোনোখানে কোনো এক খোঁচ র'য়ে যায় !
চেয়ে দ্যাখো বুকের উপরে আজ কিছু নাই,–
এই শীতে– কুয়াশায় কোথাও এসেছি তবু সেইসব দিনে
পৃথিবীর বুড়োদের সাথে মিশে হৃদয় যেখানে আর ফিরিতে পারে না।

## এখানে মরণশীল হংস নেই আর...

এখানে মরণশীল হংস নেই আর...
আর পাখপাখালির নীড় নেই গাছে,
এখানে পৃথিবী নেই, সৃষ্টি নেই, তুমি
আমি আর অনন্ত রাত্রির বৃক্ষ আছে।

## স্থির হ'য়ে আছে মন, মনে হয়, তবু–

স্থির হ'য়ে আছে মন, মনে হয়, তবু–
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধ'রে
সৃষ্টির গভীর– গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে– এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।

## কৃষ্ণাদশমীর রাতে : তোমাকে

এখানে পৃথিবী আর নেই
বলে তারা মনকল্যাণেই

হিংসা– ক্লান্তির পানে
বিদায় নিয়েছে;
কল্যাণ-কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।

## যারা এই জীবনের স্বাদ

যারা এই জীবনের স্বাদ
পেতে চায়– তাহাদের তরে;
সবুজ গাছের থেকে ভোরবেলা শিশিরের মতো যেন ঝরে
তোমাদের দেহ থেকে রাতের শিশির
ভোরের বাতাসে কেঁপে বার-বার;–
শীতল জলের সুর যেন আর থামে নাকো
হয় নাকো স্থির
তোমাদের মাথার ভিতরে;
দিনের আলোর বেলা এ-পৃথিবী জেগে গেলে 'পরে
শিশুদের স্বর
ভেসে আসে দূর থেকে যেন তারপর
মাথার ভিতর !
তাহাদের আসা-যাওয়া– হাসি– কোলাহল
মুছে লয় যেন ওই শিশিরের জল !
ঘাসের বিছানা থেকে ধীরে
শুকায়ে যেন তা যায় তোমাদের এইসব ঘাসের শরীরে;
ধীরে– আরো ধীরে।

## যদিও প্রেমের মৃত্যু হ'য়ে গেছে

যদিও প্রেমের মৃত্যু হ'য়ে গেছে এ-জীবনে,
জীবনের রক্তে তবু ঘ্রাণ আছে– তবু আছে স্বাদ !
এ-জীবন,– মানুষের এ-জীবন– সে যে কি অগাধ !
একবার নক্ষত্রের দিকে চেয়ে
একবার পৃথিবীর চোখে চোখ রেখে
পুরানো রাতের ধোঁয়া উড়ায়ে দিতেছি সব এ-মাথার থেকে।
পৃথিবীর– নক্ষত্রের নতুন আস্বাদ
জানিতেছি;– এ-জীবন,– সে যে কি অগাধ !
নক্ষত্রের বুক ঘেঁষে রাতের আকাশে
ফেনার মতন মেঘ-মেঘ হ'য়ে ভাসে
সুস্থ স্বচ্ছ সহজ হৃদয় !

নতুন শিশুর মতো আবার প্রেমের জন্ম হয়,
যদিও প্রেমের মৃত্যু হ'য়ে গেছে জীবনে আমার;
পুরানো মায়ের মতো যদিও মরেছে প্রেম
নতুন শিশুর মতো তার
প্রেম তবু আসিতেছে ফিরে !
পৃথিবীর মানুষের ভিড়ে
আকাশের নক্ষত্রের ভিড়ে
ঘ্রাণ আছে– জীবনের রক্তে আছে স্বাদ;
এ-জীবন– আমাদের এ-জীবন– সে যে কি অগাধ !

## ঘুমাও; কারণ, ঘুমের মাঝে

ঘুমাও; কারণ, ঘুমের মাঝে মৃত্যুর মতন শান্তি আছে;
যাহাদের জীবনের জ্বর ছাড়িয়াছে
ঘুমায়েছে তারা !
জেগে আছে যারা
নদীর জলের 'পরে তারা মুখ দ্যাখে
তাহাদের;– ম্লান মুখ;– ক্লান্ত হ'য়ে তারপর চুপে একে-একে
তাহারা ঘুমায়ে পড়ে;
তবুও নদীর জল নড়ে !
নড়ুক তা,– অমন নড়ুক !
আকাশের নক্ষত্রের মুখ
ভাসুক নদীর জলে একা,
অনেক হয়েছে মুখ-দ্যাখা
আমাদের;

ঘুমাও; সকল সুর মাথার ভিতর
থেমে যাক সব,– মাথার ভিতরে সুরে জ্বর– শুধু জ্বর !
আমাদের রক্তে ঘ্রাণ
আমাদের রক্তে রূপ– স্বাদ
মুছে যাক; ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমাবার সাধ
আসুক চোখের 'পরে– মাথার ভিতর !
সব সুর থেমে যাক,– সুরে জ্বর
সুরে শুধু জ্বর !

ঘুমাও; তবুও নদীর জল নড়ে ?
নড়ুক তা;– অমন নড়ুক;
আকাশের নক্ষত্রের মুখ

ভাসুক নদীর জলে একা;
অনেক হয়েছে মুখ-দ্যাখা
আমাদের।

## আমার হাতের কাজ অন্ধকারে

আমার হাতের কাজ অন্ধকারে ফুরোলো যখন,-
যখন অনেক গল্প শেষ হ'লো,- অবসন্ন মন
একা জেগে রয় যদি সেদিন এ-পৃথিবীর 'পর,
বাদুড়ের মতো একা কোটরের ছায়ার ভিতর
তখন সে জেগে রবে !- এই কালো দেয়ালের পাশে
যখন অনেক রাতে অন্ধকার- শীত নেমে আসে,
পুরানো মানুষ যারা তাদের মতন শব্দ করে
পুরানো গাছের পাতা কুয়াশায় পড়িতেছে ঝ'রে
তখন অনেক রাতে !-

এই কালো দেয়ালের পাশে
জাগি যদি- জেগে রবো- জেগে রবো নিজের আশ্বাসে !
গাছের গুঁড়ির মতো হ'য়ে যাবে যখন শরীর,
মাথার কোটরে তবু স্মৃতি আর স্বপ্নের ভিড়
জেগে রবে; জেগে রবে বাদুড়ের মতো ডানা মেলে
আমার হাতের কাজ অন্ধকারে শেষ হ'য়ে গেলো।

## মনে হ'লো- হয়তো যেতেছি আমি ম'রে,-

মনে হ'লো- হয়তো যেতেছি আমি ম'রে,-
দু-চোখ আসিতে আছে অন্ধকার করে !
পাখির বাসার 'পরে ছায়ার মতন
শীতের সকাল বেলা জেগেছিলো মন;
অন্য এক শীত তবু এই শীত হ'তে
এক রাত দুই রাত হয়তো ঘুমোতে
চ'লে যাই; তারপর জাগিতেই হবে !
কাহাদের সাথে চেনা হয়েছিলো কবে,-
আবার আসিতে হবে তাহাদের কাছে;
তখন হয়তো এক বেলা পড়িয়াছে,
অন্ধকার আসে নাই,- শীত তবু আসে !
কুয়াশা জমিয়া যায় হয়তো আকাশে।

এরি মাঝে তার সাথে হ'য়ে যাবে দ্যাখা,
একদিন যারে আমি পথিবীতে একটা
ফেলে রেখে– ছেড়ে দিয়ে গেছিলাম চ'লে,–
একে-একে সকলের সাথে দ্যাখা হ'লে
যখন পৃথিবী আরো অন্ধকার হয়,
পথে শেয়ালের বুকে কি যেন কি ভয়
যখন চমকে দেবে, তখন তোমারে
হয়তো দেখিতে পাবো; কাছে ডেকে কারে
ব'সে আছো,– হাসিতেছো,– বলিতেছো কথা;
আমারে যা বলেছিলে তারেও বলো তা;
দুই-ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে– কেঁপে কথা কয় !
পথে শেয়ালের বুকে কি যেন কি ভয়
তখন চমকে দেবে !– তখন তোমারে
আবার দেখিতে পাবো,– কাছে ডেকে কারে ব'সে আছো !

## শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলের কোলাহলে

শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলের কোলাহলে;
দুই গাল ভেঙে যায় তবুও তো,– বড়ো হ'লে চলে !
এখন তো সেই মেয়ে আসিবে না কাছে,
হয়তো আমার মতো বুড়ো হ'য়ে আছে !
তখন সোনালি ছিলো সেই মেয়ে– যখন শিশির ছিলো ঘাসে;
সন্ধ্যায় সব হাঁস শাদা হ'য়ে আসে !

আমি তবু খুঁজি নাই– খুঁজি নাকো তারে;
চোখ ব'সে গেলো তবু পাই নাকো চেয়েছি যাহারে !
যাদের দেখেছি আমি তাহার মতন নয় তাহাদের মাংস আর মন,
তোমরা এমন সব, আমরা এমন;
... তারে খুঁজে দুই-গাল ভেঙে যায়, বুড়ো হ'তে চলে;
শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলের কোলাহলে !

## এইবার ছুটি পেয়ে

এইবার ছুটি পেয়ে
ফিরিবো না পৃথিবীতে আর !
মূর্তি যারা গড়ে শুধু রুপার-সোনার,
তাহাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মন
হবে নাকো কোনো কাঠ গাছ ধাতু দাঁত আর হাড়ের মতন !

আমারে পাবে না খুঁজে আর কোনো মায়াবীর মন !
আমারে পাবে না খুঁজে–
আমারে পাবে না খুঁজে যেইখানে বাদুড়ের ডানা নড়ে-চড়ে
কোনো এক গুহার কোটরে
পৃথিবীর 'পরে !
তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মন
হবে নাকো কোনো কাঠ গাছ ধাতু দাঁত আর হাড়ের মতন !
আমাদের পাবে না খুঁজে আর কোনো মায়াবীর মন !

## অন্ধকারে খ্যাঁকশিয়ালিরা এসে খেয়েছে হৃদয়

অন্ধকারে খ্যাঁকশিয়ালিরা এসে খেয়েছে হৃদয়,
হৃদয়,– কোথায় তুমি ছিলে !
যেইখানে বিড়ালের চোখে লাল আগুনের রং লেগে রয়,
সব বুড়ো বিড়ালেরা মিলে
অন্ধকার করে,
সেই এক ছায়ার ভিতরে
গিয়েছিলো আমার হৃদয় !

আমার হৃদয়,
গল্প তুমি বলিবে না আর
পরী আর পরীর পাখার ?
শবের ভিতর থেকে বাতাসের শব্দ শেষ হয়,–
ঝ'রে গেছে আমার হৃদয় !

## যখন অনেক স্বপ্ন দ্যাখা শেষ হয়েছে আমার

যখন অনেক স্বপ্ন দ্যাখা শেষ হয়েছে আমার,
খয়ে গেছি সমুদ্রের পারে বালির মতন,
শাদা চুল আঁচড়াবে চেরুনিতে যখন সে তার,
তখন হাওয়ার নায়ে চ'ড়ে চ'লে যাবে এই মন
হটর্-হটর্ ক'রে কোনো এক বুড়ির মতন !
আকাশের শেষে গিয়ে বিকালের চাঁদের ভিতরে
আবার স্বপ্নের খেই ল'য়ে জাল বুনে যাবে মন,
যখন অনেক স্বপ্ন শেষ হ'লো পৃথিবীর 'পরে !

## সেই ফুল মেখে দেবো আমি তার চুলে

সেই ফুল মেখে দেবো আমি তার চুলে,
ভোমরার মতো এক বন খুঁজে বনের ভিতরে,
আমি উড়ে চ'লে যাবো মস্‌লিন্‌ দুই পাখা তুলে !
সে-ফুলের রেণু নিয়ে ফিরে এসে ঘরে
সেই ফুল মেখ দেবো আমি তার চুলে;
ভোমরার মতো এক বন খুঁজে বনের ভিতরে
আমি উড়ে চলে যাবো মস্‌লিন্‌ দুই পাখা তুলে।

## আমরা হতেছি বুড়ো— শাদা হ'তে নষ্ট হ'তে হয়

আমরা হতেছি বুড়ো— শাদা হ'তে নষ্ট হ'তে হয়
দুই হাত হাড় হ'য়ে ন'ড়ে ওঠে অন্ধকারে শীতে !
ভালোবাসা সারাদিন ভালো ক'রে পারে না বাসিতে,
সময়ের আগে শেষ হ'য়ে যায় আশার সময়।

বুড়ি হ'য়ে যাবে তুমি,— বুড়ো হ'য়ে চলিতেছি আমি
জেলের জালের মতো আমাদের ফেলিতেছে ঘিরে
দিন আর রাত এসে,— সময়ের সমুদ্রেতে নামি।
মাছের মতন আমি চলিতেছি জাল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে।

এরি মাঝে ভালোবেসে ফেলিবার ছিলো অবসর,
আশার সময় ছিলো,— আস্বাদের গল্প ছিলো না কি !
আমি বুড়ো হ'য়ে যাবো, তুমি বুড়ি হবে তারপর—

## পড়িবে না তোমার এ-লেখা এসে মানুষেরা কোনোদিন

পড়িবে না, তোমার এ-লেখা এসে মানুষেরা কোনোদিন !
হাতের এ-লেখা নয়,— নয় বাইজেনটিন্‌ !
— সেইসব পরিপাটি কামারের শাদা আগুনের জ্বালা সবিস্ময়ে
ফলিয়া ওঠেনি আর সুন্দর সোনার মতো হ'য়ে !
খনির ভিতর থেকে মণি ল'য়ে কোনো কারিগর
বানায় না এ-জিনিস পৃথিবীর 'পর;
এ-কবিতা হয় নাই পৃথিবীর ধাতুর মতন,—
কিন্তু এ-মাংসের গিট ছিঁড়ে মন
এখানের হাত ছেড়ে দিয়ে

সকালের মেঘ থেকে বিকালের,– বিকালের মেঘ থেকে সকালের নীল মেঘে গিয়ে
কি জিনিস নিয়ে
বানায়েছে শরীর তাহার !
– পৃথিবী তা বুঝিবে না– পৃথিবী তা বুঝিবে না আর !

## নিজেরে অনেক ভেবে

নিজেরে অনেক ভেবে
দুই-গাল ভেঙে গেছে তার।
দুই-হাত রোগা হ'য়ে রোগীর খাবার
মুখে তুলে লয়;
– ছায়া ছাড়া আর কিছু নয় !

নিজেরে অনেক ভেবে দুই-গাল ভেঙে গেছে তার:
দুই-হাত রোগা হ'য়ে ন'ড়ে ওঠে বিকালবেলার
অন্ধকারে:– সেখানে সে পায়চারি করে
গাছের ছালের কাছে,– ছায়ার ভিতরে !

## তুমি চ'লে আসো কাছে, চ'লে আসো নিভৃত-নিভৃত

তুমি চ'লে আসো কাছে, চ'লে আসো নিভৃত-নিভৃত !
নির্জন-নির্জন পথ, তোমরা চলিয়া আসো কাছে !
আমাদের হৃদয়ে যে শীত এতো,– হৃদয়ে যে শীত !
পৃথবীর পরীরা যে আমাদের ভালোবাসিয়াছে
অনেক ধুলার পথে আমাদের ডেকে লয় তারা,–
শিকারের কুকুরের শব্দ ওই আমাদের ডাকে !
আমরা দেখেছি সব সন্ধ্যার নদীর জল ছাড়া !
সন্ধ্যার নদীর জল,– কোনোদিন দেখে আমাকে ?
পৃথিবীর লাল পথ ভাঁড় আর ভাঁড়ের মতন:
সেখানে টুপির ছবি,– সেখানে ঘন্টার শব্দ হয় !
সেখানে মুকুট প'রে অবসন্ন হ'য়ে যায় মন,–
উজ্জ্বল দিনের সূর্যে-রৌদ্রে-রঙে নাইকো বিস্ময় !
পাহাড়ের বুকে থেকে সেখানে পাথর শাদা হ'লো,
সেখানে সময় তার আরো শাদা– শাদা হ'য়ে আছে,
সেখানে নদীর ঢেউয়ে ঢেউ তুমি– ঢেউ তুমি তোলো।
সন্ধ্যার নদীর জল,– তোমারে সে ভালোবাসিয়াছে।

## আমি সব ছেড়ে দিয়ে পুরানো গাছের মতো হ'য়ে

আমি সব ছেড়ে দিয়ে পুরানো গাছের মতো হ'য়ে
ওই দূর বিকালের লাল মেঘে জেগে রবো একা !
মানুষের ছাল ছেড়ে গাছের ছালের গন্ধ ল'য়ে;
বিকালের অন্ধকারে বাদুড়ের সাথে হবে দ্যাখা।

সেখানে অনেক শাদা পথ এক আরো শাদা হয়,
সময় হতেছে শাদা পাহাড়ের বুকে লেগে থেকে;
আমি যাবো,– সেই পথ– পাথরের মুখের বিস্ময়
আমার এ-মানুষের মতো মুখে লবো আমি মেখে !

## শীতরাত আসিতেছে নেমে

শীত রাত আসিতেছে নেমে
কোন কাজের শব্দ গেছে সব থেমে
মাঠে-মাঠে
নাই– কিছু– আছে শুধু খেতের ফাটল
পেঁচার চোখের 'পরে শিশিরের জল

চুপ-নদী চুপ-গাছ চুপ-চাঁদমারি
কোথায় 'রুকারি'
চ'লে গেছে !

পৃথিবীর সব সোনা গলেছে, [বিদায়]
মৃত ইচ্ছা– মৃত প্রেম– মৃত স্বপ্ন কই চলে যায়
তুমি জানো চাঁদ-পেঁচা-তুমি চাঁদমারি
আমাদের সোনার গ্র্যানারি
কই গেলো !

## তোমার চোখের নিচে আমি এক মাছের মতন

তোমার চোখের নিচে আমি এক মাছের মতন,–
রুপালি ঢেউয়ের তলে-তলে
সমুদ্রের জলে !
তোমার রুপার জাল যেতেছে জড়ায়ে
রুপার সুতার মতো গায়ে !

বার-বার পড়িতেছি ফেঁসে:
আমারে খুঁজিবে তবু
সমুদ্রের শেষে গিয়ে,– সমুদ্রের শেষে !
আমারে ডাকিবে তুমি আমার রূপের নাম ধ'রে,
তবুও ঝিনুকে-শাঁখে তোমার রুপার জাল ভ'রে
ফেনার ভিতরে যাবো ফেঁসে !
আমারে খুঁজিবে তবু সমুদ্রের শেষে গিয়ে সমুদ্রের শেষে।

## লেডা

কোথাও বিদ্যুৎ নাই– তার শুদ্ধ করুণার ভরে
অন্ধকার মাঝরাতে অগ্নি জ্বলে মেঝের উপরে।
কার মেঝে?– মৃত্তিকার, শাদা পাথরের–
নিবিষ্ট আলোর রঙে পাই না তা টের।
ধবল ডানার মৃদু করতালি দিয়ে রাজহাঁস
সকল নদীর জলে ঢেলে ফেলে আঁধার গেলাস
পেয়েছে আগুন এই– বিস্মিত কুম্ভীর সহবাস।

## মিডিয়া

আমি এই পৃথিবীর হেলিওট্রোপের মতো নীল সমুদ্রকে
একদিন ভালোবেসে চোখ বুজে থেমে গেছি–
তবু তারপর চোখ মেলে
তারে আর কোনো দিগন্তেরে
পাইনিকো; (আমরা প্রতিভূ তবু জেসন ও থিসিয়ুসদের
যে-দেশে সমুদ্র নাই আজ আর আমাদের
ভিজে কনিফার কাঠে ন'ড়ে উঠে তবুও জাহাজ
র'য়ে গেছে; যাত্রী; কিসের উপর যায় তারা।
মনে পড়ে একদিন গাধার দুধের মতো ম্লান শাদা হাত–
হাতের প্রতিভা ছিলো সে-সময় পৃথিবীতে বেঁচে
মিডিয়ার : (লেসবস-এর) সমুদ্রের গরম উর্মির রৌদ্র ভেঙে গেলে ঘুম
মাথার অগণ্য চুলে নেমে এসেছিলো– সেই শঠ সর্পীদের
নির্জন নিস্তব্ধ ক'রে রেখে
সর্বদাই দুপুরের রৌদ্র চারিদিকে জলে-স্তনের উপরে– থামে
মাথার উপরে দূর দড়ির রহস্যে বাঁধা শাদা পালগুলো
হয়তো বকের মতো উড়ে গেছে আকাশের দিকে
সাগরে জলের রোল চারিদিকে যুবাদের দৃষ্টির ভিতরে

বালির ঘড়ির মতো বেজে যায়– মোমের আলোর মতো নড়ে
মিষ্টিরের মতো এসে কলস্বরে উত্তেজিত করে।
জাহাজের কাঠের ছালে গন্ধে-অন্ধকার মোলায়েম তলনিরে ঘিরে
মদের পিপার নাচ– অগণন শামুকের ভিড়
ক্ষিপ্র হাঙরের গতি– সময়ের দ্রুততার স্থির
স্থির ক'রে রেখে দেয়।

সোনালি ডোবার মতো রৌদ্ররেখা আমাদের নাকে মুখে চোখে
জল থেকে সূর্য যাহা তুলে দেয়-দুপুরের গম্ভীর আলোকে
সে-সব বিম্বের মাঝে দীর্ঘ নারী দাঁড়ায়েছে একা
মাথার গভীর খোঁপা ভূমার মতন উঁচু, ধীর
হাজার বছর ধ'রে চোখ বুজে অনুভব ক'রে
হে মিডিয়া, আজ আমি সূর্যের শরীর।

## কিছুদিন আগে ইয়াসিন আলি ম'রে গেছে

কিছুদিন আগে সেই ইয়াসিন আলি ম'রে গেছে
সারাদিন ভবঘুরে নাবিকের মতো
সমস্ত নহর ঘুরে নিরপেক্ষতায়
তারপর ফ্ল্যাটে ফিরে পাঁচফুট জমিনে ফলত
একটি মৃত্যুকে পেতো পরিষ্কার চোখে।
আমরা বিশদ হ'য়ে মরণের দিকে
অগ্রসর হ'য়ে চলি পৃথিবীতে রোজ,
বহুল আস্বাদ নিয়ে তবু পৃথিবীকে
অবসন্ন ক'রে ফেলে আরো ঢের দ্রাঘিমাকে দেখি।
দুইদিকে চাপা এক কমলালেবুর চেয়ে চড়ো
এই শতাব্দীর সব অমরতা, তবু কবে হবে
ইয়াসিন আর তার মরণের চেয়ে দীর্ঘতর ?

## প্রেমিক ১৩৪৫-৪৬

এমন সময় এক মানুষকে হাতে পাওয়া গেলো
যাকে ধ'রে পৃথিবীর বাজারের কাছে
ভবঘুরে ভিড়দের বলা যায় : তোমাদের চেয়ে
অধিক আবহমান ধাতু বেঁচে আছে।

সারাদিন কবি আর মুখের ভিতরে

অবহিত দার্শনিক যার প্রণিধানে
নিজেদের, পৃথিবীকে, ব্যাপ্ত পৃথিবীর
বাস্তবতাকে আরো ভালো ক'রে জানে।

এ না হ'লে ঘড়ির ঘণ্টার শব্দে
ভোরবেলা জেগে উঠে রোজ
ঈষৎ বিবর্ণ সব মুখোসকে দ্যাখা যায় শুধু
মেজে-ঘ'ষে মানুষের মতন সহজ

অথবা আত্মস্থ সব লোকগুলো ব'সে আছে স্বকীয় আসনে,
যতোদিন টিকে আছে পৃথিবীর নাম
তাহাদের কারু কোনো সংশয় নেই
পেতে পারে আপনার পিতার প্রণাম।

অথবা অসংখ্য কোটি লোক যেন কেঁদে যায়,
কান পেতে মনে হয় অগণন লোক যেন হাসে,
সমান্তরাল দুই ঘন ঘোর রেখা যেন সম্মিলিত হ'লো
ইন্দ্রজাল– স্মরণীয় দিনের আকাশে।

## একদিন মনে হয়েছিলো

একদিন মনে হয়েছিলো সব যুবক ও তরুণীকে
রাবিশের ফুটপাতে শাদা নীল হরিদ্বর্ণ পাখির মতন
কোনো এক সমুদ্রঘড়ির দিকে ভেসে যায় তারা–
তাহাদের অবয়বে সূর্যফেনার আলোড়ন।
তাদের পিতারা সব দাঁড়ায়েছে হেমন্তের নদীর নিকটে,
সুদীর্ঘ দিবস ক্লান্ত বায়ুকুকরের মতো ঘুরে
মৃত পৃথিবীকে মিছা প্রভাতের সূর্যে ফেলে দিয়ে
উদ্ভিদধূসর অন্ধ মাংস হ'য়ে নদীর মুকুরে

দেখে গেছে নিজেদের– অনুভব ক'রে গেছে অন্ধকারে
সূর্যের অকৃত্রিম অন্ধকারে নীরবে দাঁড়ায়ে,
অনুভব ক'রে গেছে কি ক'রে মানুষ ক্রমে জল হ'য়ে যায়
মাছের শল্ক, গুল্ম, ছাতকুড়ো লেগে থাকে গায়ে,

কি ক'রে শরীর ক্রমে স্মৃতি হ'য়ে যায়।
গার্গী, নাগার্জুন, বুদ্ধ, শেলি, প্যাসকাল–
চোখের খোড়ল থেকে অঙ্কুরের মতো জেগে উঠে

হ'য়ে থাকে পাললিক উদ্ভিদের জাল।

তাদের শিকড় দূর– দূরতর মাটির ভিতরে
আঁকাবাঁকা কঙ্কালের কঞ্চির মতন,
ওদের মতন বুনো মুখ নিয়ে মৃত্তিকাকে পরিহাস ক'রে
অন্ধকারে বার করে পরিণত গাজরের স্তন।

বহুতর আলোচনা হয়েছিলো পৃথিবীতে– একদিন
অনেক মানুষ এসে বসেছে কুশনে,
তারপর কি হয়েছিলো– কিছু মনে নেই
জল গুল্ম উদ্ভিদের গলাধঃকরণে
মৃত্তিকা নিজের যুষ টের পায়
মিষ্টি আলুর শীর্ণ দীর্ঘ এক দাড়ির ভিতরে,
আপন জন্মের আগে বেঁচেছিলো কনফুশিয়াস,
টিকে আছে আপনার মধুমান মৃত্যুর পরে।

## ভোরের মানুষ এক

ভোরের মানুষ এক প্রান্তরের পথে একা ঘুরে
নিসর্গের কথা ভাবে পুনরায়,
মীমাংসার পরিণতিদের কথা ভাবে।
মাঠে জলে মাকড়ের জলে এই শিশিরের রূপ
কতোদিন রবে আর ?
নেউলধূসর এই মাঠের ভিতরে হাঁস ব্যাং খরগোশ
মানুষের জীবনের নক্ষত্রের দোষ
পুনরায় ধূর্ততায় পৃথিবীতে পথ চেয়ে তবু– কতোদিন
ষড়যন্ত্রহীন হচ্ছে এ-রকম প্রভাতকে রেখে যাবে
মানুষের সংসর্গলোলুপ ?
শরীরের অন্ধকার ঘাসে পাবে শিশিরের গূপ ?

## গফুর

'গফুর'– নীরবে তাহাকে আমি ডাকিলাম, তবু–
তবুও আমার কানে লেগে এই– এ-রকম বায়বীয় রোল
ততোটা কৃত্রিম নয়, যতোটা অসমীচীন– হিম–

'তোমার বলদদুটো কই গেলো ?'– 'সে-সব অনেকদিন আগে

ম'রে গেছে– যেন কারু সহোদর ম'রে গেছে, অথবা হানিফা
নেই আর– তবুও কিছুই নেই ব'লে
কোথাও অন্য কিছু নেই ব'লে গফুরের মুখের ভিতরে
নিসর্গ নিজেই চুপে বিকেলের প্রান্তরের দোয়েলের মতো
নেমে এলো– কোনো এক উপস্থিত কৃমির উপরে
নীরবে আঁচড় কেটে– নিজ মনে– তবুও কোথাও কোনো রেখা–
ভাষা– সুর– বক্রোক্তির অব্যর্থ স্পষ্টতা
পেলো নাকো– সকলি অব্যর্থ, হিম– হেমন্তের অব্যর্থতায়।

## পেলবশীর্ষ

ধানের পেলব ফুল মাইল-মাইল খেতে
মণিমালা শঙ্খমালা নারীর মতন
কৃষকের সরলতা থেকে জেগে উঠে
দাঁড়ায়েছে গণিকার মতো বিচক্ষণ।

নিমেষে হারায়ে যাবে পৃথিবীর আলোর বাজারে
নিমেষে হারায়ে যাবে পৃথিবীর রাতের বাজারে
যেখানে ভূমিকা নেই সেই দেশ মূল গায়েনের হাতে তুলে
অভিজ্ঞ পেঁচার শ্লেষে ফেলে রেখে যাবে, শূন্যতারে।

## আমি ওই সমুদ্রের যুবনারীদের

আমি ওই সমুদ্রের যুবনারীদের সাথে কোনো একদিন
কোথাও ছিলাম ব'লে মনে পড়ে– ট্রিপলি, ইটালি, গ্রীস, সিন্ধু মালাবারে
তবুও সময়ে ঢের বেড়ে গিয়ে মানুষের ক্রান্তিহীন জন্মমরণের
গণনার দাঁড়ি টেনে যুগ-যুগ– বিচিত্র মূল্যের পথে দাঁড়িয়েছি আজ।
জানি না তুমিও কেউ সেই দীপ্ত দূর উদয়ের
সাগরের পার থেকে আমার নিকটে এসে দাঁড়ায়েছো কি না।
নারী আছে– সে অনুরাধাপুরের যদি হ'য়ে যেতো তবে
হ'য়ে যেতো– তবুও নারীরা আজ ইতিহাসভণিতার থেকে
ক্লান্তি নিয়ে কাছে আসে– দূরে যায়– কৃতী ইতিহাসপ্রতিভার
নিকটে কাহারো ঋণ নেই আজ– নারীসূর্য নেই।

## আঁধার থেকে উঠে এসে

আঁধার থেকে উঠে এসে অন্ধকারে ফুরিয়ে যাবার আগে
জীবনের এই সাদাকালো রঙের মুখে এসে

অন্য কোনো নতুন কথা নদী পাখি কূর্য মানুষের
নিকটে নেই বোধ করেছি - বলেছে সবি তারা।

মানুষকে তার দেশ শতাব্দীর লক্ষ্য মনে রেখে
তবুও বহিঃপৃথিবী ধ্রুব-অধ্রুব সর্বদিকে
গভীরভাবে তাকিয়ে স্থির করতে হয় প্রিয়
সত্য সেবা সংকল্পকে- না হ'লে সবি অনবনমনীয়।

## কে শরীর কে-বা ছায়া

কে শরীর ? কে-বা ছায়া ? সমান্তরাল সব ছায়ার ভিতরে
শরীরিণী মৃগী এসে (মনে হয়) নিজ পথে বিচরণ করে।
পিপুলের ডালগুলো সেই মৃগী রূপসীর মুখে এসে পড়ে।

তাদের পিছনে গিয়ে টের পেয়ে যাই তবু ভুল,
কনফুশিয়াস থেকে কার্ল মার্কস্ হয়েছে বিমর্ষ
এ-সব ছায়ায় চ'রে– ক্রমেই আকীর্ণ শিরাকূলে।

## নিজের পাখার হিমে

নিজের পাখার হিমে কেঁপে উঠে– পাখির মতন
জীবন উড়িতে আছে অন্ধকার আকাশের তলে
তাহার চোখের ছায়া শীতের নদীর ধীর জলে
অস্থির ইচ্ছার মতো তুলিতেছে শুধু আলোড়ন
ঘুমন্ত বনের পারে অন্ধকারে ঘুমায়েছে তবু ওই নদীও তেমন
জীবন চলিছে তবু– অধীর জোনাকি শুধু চলে
তার সাথে– হেমন্তের মতো হিম পাখাটির তলে
আলো জ্বলে তাহাদের, নিভে যায় আলো
কোন্ দূরে– কোথায় হারালো
শীত নদী– কোথায় হারালো
শীত নদী– কেন মৃত জোনাকিরা প'ড়ে আছে পিছে
পাখার ছায়ার মতো মৃত্যু এসে পাখিরে খুঁজিছে
নদী বন অন্ধকারে হতেছে ধারালো

ঘুমায়নি নদী তবু,– ঘুমায়নি অন্ধকার বন
ঘুমন্ত দৈত্যের মতো পড়োনি ঘুমায়ে
হে পাহাড়,– সাপের মতন পথ এলোমেলো পাহাড়ের পায়ে

তোমরা ছড়ায়ে আছো হৃদয়ের স্বপ্নের মতন
অনেক আকাঙ্ক্ষা ব'য়ে তোমাদের মন
অন্ধকারে স্তব্ধ হ'য়ে আছে
তোমাদের মতো আমি তোমাদের কাছে
আসিয়াছি-- তোমাদের পাশে
ছায়া ফেলে-- আমার ডানার থেকে ঝরে
শিশির-- হিমের গন্ধ পৃথিবীর 'পরে
আমারে সবার চেয়ে মৃত্যু ভালোবাসে !

নিরাশা আমারে বাসে সবচেয়ে ভালো
ব্যথা-- বিদ্যুতের মতো চুমো খায় এসে
আমার বুকের 'পরে স্থান ভালোবেসে
আমার বুকের 'পরে কেবল ফুরালো
সোনার মতন মেঘ আনে যেই আলো
ভোরবেলা কোনো দূর মাঠের উপরে
কিম্বা কোনো সমুদ্রের তরে
সীসার মতন পথ-- পৃথিবীর শেষে
আকাশের আঁধারের আঘাত ফুরালে
ভোর এসে যেই আলো জ্বালে
প্রিয়ার মতন ভালোবেসে !

কেন আমি আসিয়াছি পৃথিবীর 'পরে
ইচ্ছার নদীর ঢেউ কেন আমি তুলি
ভেঙে' যায় ডুবে যায় ঢেউ-- ঢেউগুলি
হতাশার কোলে ব'সে তবু অপেক্ষারে
ভালোবাসি-- আঁধার রাতের মতো জেগে থাকি গহ্বরের ধারে
হৃদয়ের গুহার উপর
আসিতেছে-- তুলিতেছে স্বর
স্বপন ঢেউয়ের মতো নেমে
নিরাশার মতো নেমে
হৃদয়ের ভাঙনের-- ফাটলের মাঝে
যাবে কি তা কোনোদিন থেমে !

শীতের নদীর জলে চকিত পাতারা
কেঁপে-কেঁপে চুমো খেয়ে ঘুমায় যেমন
হৃদয় কাঁপিতে আছে তাহাদের মতন তেমন
সে কাহারে চুমো দেবে-- নদীর ঢেউয়ের মতো কান্না
তাহারে তুলিয়া লবে-- কেঁপে-কেঁপে পায় না সে তাহাদের সাড়া
ভূতের মতন ছায়া ফেলে

কোন পথে পেলে তুমি কারে তুমি পেলে
পৃথিবীতে আকাশের 'পরে
কোন পাতালের বুক
কোন কবরের মুখ
তোমারে টানিয়া ল'বে বুকের ভিতরে !

মেঘের গুহার পথে মেঘে আসে নিভে যায় বিদ্যুৎ যেমন,
পৃথিবীরে একবার দিয়ে যায় ধাঁধা
তারপর অন্ধকার প'ড়ে থাকে একা
তেমন আহত হয়ে প'ড়ে আছে মন
বিদ্যুতের তরে কালো আকাশের ক্ষুধার মতন
জেগে আছে... বুক তার বুজে নিভে আসে
আকাশের পিছনে আকাশে
পাতালের মতন শূন্যতা
তবুও পড়িয়া থাকে... শীত... অন্ধকার
ঢেকে ফেলে সমুদ্র - পাহাড়
তারার হৃদয়ে তার লাগে আড়ষ্টতা

কেঁদে ওঠে পাহাড়ের পাইনের বন
একবার... বার-বার যেমন আঁধারে
... সারারাত সে-কাঁদন কে থামাতে পারে !...
কে মুছে ফেলিতে পারে এই অন্ধ রাতেরে এমন !
শীতার্ত শাখার মতো পাইনের কেঁদে ওঠে মন
দিকে-দিকে ঝ'রে পড়ে হৃদয়ের পাতা
শিকড় ছিঁড়িয়া যায়... মৃতের মতন তবু মাথা
নিস্তব্ধে ঘুমায় কই পৃথিবীর 'পরে
বাতাস বাসের মতো বিঁধিতেছে তারে
অন্ধকার মেঘে আসে আরো অন্ধকারে
সে একা জাগিয়া আছে নক্ষত্রের তরে !

জেগে আছে নদী বন সমুদ্র আকাশ
হাত ধ'রে অপেক্ষায় আছে পরস্পর
কোন স্বপ্ন কাজ ক'রে তাহাদের প্রাণের ভিতর
বাঁচায়ে রাখিতে আছে তাহাদের বুকে-বুকে জীবনের স্বাদ
কোন ইচ্ছা... কোন ক্ষুধা... সে-কোন উল্লাস...
আমিও তাদের মতো... হৃদয়ে আমার
ব্যথা এক... উৎসবের মতো বেদনার
অস্থির আঘাত এক বার-বার উঠিতেছে জেগে
পশ্চিম মেঘের বুকে নিরাশার সব রক্ত মেলে

[illegible]
[illegible]

## তেরোশো তিরিশে

মনে পড়ে সেই কলকাতা, সেই তেরোশো তিরিশ,
বিষের মতো দিন
বৌবাজারের মোড়ে দিনরাত
ট্রাম করে ঝরঝর
আমাদের কিছু ছিলো না তখন
ছিলো শুধু যৌবন
সাগরের মতো বেপরোয় আকাশে
সোনালি চিলের মন

ছেঁড়া শাড়ি প'রে কাটাইতে দিন
বাটনা হলুদ মাখা
বিজয়াদী বোস, তোমার দু-হাতে
ছিলো দুটো শাদা শাঁখা
শাদা শাঁখা শুধু তোমার দু-হাতে
জুটিতো না তেল চুলে
তবুও আমরা দিতাম আকাশে
বুকের পাখনা খুলে

জুটিতো না কালি কলমে আমার
কাগজে পড়িতো টান
তোমার বইয়ের মার্জিনে, বিজা,
লিখিতাম আমি গান
পাশের বাড়ির পোড়াকাঠ এনে
দেয়ালে আঁকিতে ছবি
আমি বলিতাম : 'অজন্তা, বিজা !'
তুমি শুধাইতে : 'গঁগল কবি !'

চক্ষে তোমার মিষ্ট ঘুম ভাসে
কাঙড়ার ছবি দু-নীল চোখে
আমার হৃদয়ে অনুরাধাপুর
পুরোনো ফরাসী গানের বোকে
সেদিন আমার পথে-পথে ছুটা
সেও তন্বুরা— মাঙলিন

তোমার সে দিন ঘর সিঁড়ি ভাঙা :
বাংলার পট, পুরোনো টান

পৃথিবীর মুখে তুড়ি দিয়ে-দিয়ে
দুইটি হৃদয় সেই
ডাল তেল নুন জোটে না যাদের
জামা শাড়ি কিছু নেই
তবুও আকাশ জয়ের বাসনা
দুঃখের গুলি সে যেন ঢিল
আমরা দু-জনে সেগুনি আকাশে
সোনালি ডানার শঙ্খচিল
শরীরের ক্ষুধা মাটির মতন
স্বপ্ন তখন সোনার সিঁড়ি
মানুষ থাকুক সংসারে প'ড়ে
আমরা উড়িবো আকাশ ছিঁড়ি
সকাল হয়েছে : চাল নাই ঘরে
সন্ধ্যা হয়েছে : প্রদীপ নাই
আমার কবিতা কেউ কেনে নাকো
তোমার ছবিও ঘুঁটের ছাই
ছ মাসের ভাড়া প'ড়ে আছে বাকি
ঘরে নাই তবু চাল কড়ি নুন
আকাশের নীল পথে-পথে তবু
আমার হৃদয় আভিলা হুন
আকাশের নীল পথ থেকে-থেকে
জানালার পর জানালা খুলে
ভোরের মুনিয়া পাখির মতন
কোথায় যে দিতে পাখ্না তুলে

সংসার আজ শিকার করেছে
সোনালি চিলেরা হ'লো শিকার
আজ আমি আর কবিতা লিখি না .
তুমিও তো ছবি আঁকো না আর
তবুও শীতের শেষে— ফাল্গুনে
মাতাল যখন সোনাল বন
তেরোশো তিরিশ— দারিদ্র্য সেই
ফিরে চাই আজ সে-যৌবন

ফিরে চাই আমি তোমারে আবার
আমার কবিতা, তোমার ছবি

সুধাতাম আমি : 'অনুরাধাপুর'
সুধাইতে তুমি : 'নকুল বীর'
সেই যে অকাল কোকার স্বপ্ন
দূরের ধরণী যে যেন চিত্র
আমার দু-জন বেদনি আকাশে
যেমনি তারার [illegible]

## রাত্রির বাতাসে

যখন চলিয়া গেছি ওপারের দেশে,–
তুমি যদি একা থাকো,– ডাক দাও তুমি যদি এসে
সবুজ বনের পারে
নক্ষত্রের রাত্রি আঁধারে
আমারে– আমারে যদি ডাকো !
–যেই দিন অন্ধকারে একা তুমি থাকো,
মুখখানা ক'রে থাকো নিচু,
যেই দিন পৃথিবীর কিছু
ভালো আর লাগে না তোমার,
যেই দিন মাথা নুয়ে,– যেই দিন ঘাড়
নিচু হ'য়ে আসে,–
একবার চেয়ে দ্যাখো রাত্রির আকাশে,–
নক্ষত্রের পানে !
একবার অন্ধকারে– বাতাসের গানে
কান পেতে থেকো,–
নক্ষত্রের পানে চেয়ে দ্যাখো !

...
আমারে ডেকেছো তুমি– শুনিয়াছি আমি !
আমারে ডেকেছো তুমি বনে মাঠে নামি,–
নক্ষত্রের তলে
আমারে ডেকেছো তুমি,– রাত্রির সাগরের জলে
সেই সুর ভেসে
আমার এ-দেশে
আসিয়াছে;
রাত্রির বাতাসের কাছে
বলিয়া দিয়েছে কোন্ কথা,–
শুনিয়াছি !– রোজ রাত্রে আমি শুনিবো তা !
যদিও অনেক দূর সমুদ্রের পারে

থাকি আমি,– রাত্রে– অন্ধকারে
অমরে যেতেই তুমি ডাকি,–
জানি আমি,– যদিও অনেক দূর নক্ষত্রের দেশে আমি এক থাকি।

...

সেই দিন–রাত্রির কথা,
ফুলের সেই বাসনাত
ঢেউয়ের মতন:
তোমার অবর যদি মনে পড়ে,
কেনে রাত্রে কাঁদে যদি মন
আরেক রাত্রির কথা লেবে,
যদি তুমি এক থাকে,– কে সন্ধান নেবে
বুঝে তুমি পাও নাকো আর,–
একবার রাত্রির অঁধার,
নক্ষত্র– আকাশ,
আর এই ঘুমে– মাটি– ঘাস,–
এ-সবের পানে
এসে তুমি,– রাত্রির বাতাসে
তখনো পাতা উড়ে যায়,– তারি সাথে জেনো
সে এসেছে,– তারে তুমি চেনো!

## নক্ষত্রের পথে

[illegible]
[illegible]
[illegible]

হয় মনে হয়,–
একদিন যে-সব বিস্ময়
চোখে মোর রেখেছিনু ভ'রে,–
চলেছিনু একদিন যেই পথ ধ'রে
তারে দূরে যেতে হবে ব'লে,–
বর-বর যেই রাত– পরাজয় দলে
দৃষ্টি মোর উঠেছিল নক্ষত্রের পানে,
– আলো– আরো আলোর সন্ধানে,–
আরো রূপ– ছবি– ছন্দ খুঁজে,–
অন্ধকারে– হিমে– চোখ বুজে
কঙ্কালে– মরুতে
ঘুমাতে সে পারে,– আজো ঘুমাতে সে পারে !

...

কালের পায়ের শব্দ শুনি অন্ধকারে,–
তার পানে– অকাশের কোন্ পারপারে
চলেছে সে !
পথে যেতে-যেতে,
পৃথিবীর মাঠে– মাঠে– খেতে
জমি সমতের
অশান্ত পায়ের
শব্দ শুধু শুনি !
তার সাথে চলি কোন্ নক্ষত্রের তরে !
যে-ফসল ফ'লে গেছে মাটির উপরে
রেখে যাই:
যাহা ছিলো,– কিম্বা যাহা আছে,
একে-একে ছুটি পাই সকলের কাছে !

...

কোনোদিন ফুরাবে না পথ– পথে যেতে-যেতে
একবার ক'রে গেছি পৃথিবীর খেতে
হেমন্তের ফসলের মতো,
আবার উঠিবো তবু ফ'লে
কোনো এক নক্ষত্রের কোলে,
কোনো দূর দেশে
নতুন ধানের গন্ধ বুকে ক'রে
জন্মি নব শস্যের বেশে !
পৃথিবীর পথের ফসল
এসেছি কোনো একদিন,–

এ-নদীর জল
আর এই অন্ধকার– আলো
বুকে নিয়ে,–
ধীরে-ধীরে– আজিকে ফুরালো
পথ-চলা এই দেশে,–
নক্ষত্রের বুকে তবু মৃত্যু নাই,
আকাশের শেষে
রয়েছে আকাশ আরো,
আরো তারা– জ্যোতি !
– ফুরাবে না পথ ওই,– পথিকের গতি
থামিবে না;–
পৃথিবীর খেতে-খেতে হয়তো এমনি ফলিয়া যাবে ধান,
গেয়ে যাবে গান
হয়তো এ-নদী,
আমি দূরে চ'লে গিয়ে এ-দিকে নামিয়া আসি যদি
হেমন্তের রাত্রে এই মাঠের উপরে
হয়তো দেখিতে পাবো কুয়াশায় শেষ শস্য ঝরে !
মৃত্যুর পায়ের শব্দ বাজে
হয়তো শুনিতে পাবো– তবু ওই আকাশের মাঝে
মৃত্যু নাই,–
ঝরেছে যে অন্ধকারে শেষ নাই তারো !
আকাশের শেষে রয়েছে আকাশ আরো !
আরো তারা,– জ্যোতি !
ফুরাবে না পথ ওই,– থামিবে না পথিকের গতি !

## POEMS

### I

The Sky is red
    Another night is gone
The Silver-sheeted dew
    Lies on the lawn

But there are patches
    Of crushed dewless grass
Imprinting the footsteps
    That nightly pass

On the day I see the trace
    Of the farers' feet
They are gone– gone away
    Elsewhere to meet

On the hill there are scratches
    Of fingers and toes
Unfamiliar names
    In straggling rows.

They are gone– gone away
    Their voices are still
But their steps I find
    Their nerves I feel

They stamped on this earth
    This mud they press
Now they are safe
    In some cosy of rest.

Their aimless sprawling feet
    Their flickering brain
Have gained the sphere
    Above the strain.

II

The country side is lulled in a shell
The woods are looking at the sky
The heaven tonight is full of stars
They seem so dear, –they seem so nigh

Like a noisy baby is slumber's hush
Rests the tumultuous pulse of earth
The silence is in the milky way
The silence is in creation's girth

Soft some one will come tonight
Blow out our candles in the darkened face
Of the trackless sands and waters
        I catch the tune of his pace

The empty road that rambles through the wood
Through fen, through hill
        Is brooding of the dawning hour
            Is lying still

'Tis the season of his bloom
            The self same hour
When our cracking bones
            Will gain in power

When in our darkened socket
            Will rain a light
He is coming– coming
            Tonight– tonight

## CHORUS

I

They have been long on this earth
But they have not been able to make much of life.
And now Death is at hand.
Once they held that Doom was far away,
And graced their hearts with ease.
But now a shadow, not of the sun, hails on them.
It has come home to stay.

To their children life is a violent experience now.

Touched but lightly by family and fireside
These fledglings are old enough to know better
Than what old birds in their fouled nest have to teach.

With their innate love of values, not their fathers',
Their sons have hiked their faith to what seems to be
a baffle of their fathers' faith.

The fathers have had faith to build houses, come home to
roost now.
Empty of children.
They have had faith to grow food, to put shadows into
the mouths of their children.
The children have given all to travel the road of
same ideas
And midmost of the track find it fudge.
Silence is astir in homes of fathers.
They have wandered about places, moralised their days out of
possible aberrations;

They have worked, been paid for, and voted for the people's man;
Have read to know; have cursed; have not cared a
Tinker's curse for the spirit when the letter was gay;
Have given rope enough to the sanctity of honest sex;
But is has not been a furlough in Heaven for them
to have been through all this for a lifetime.
Out there on the streets of the city
They are dancing on their graves.
Out beyond it the read the landscape of the dead.
Their experience, knowledge, women, autumnal crops
Are pitched forward to fall across the semblance
of a hope;
We hope there is hope yet; there is hope.

II

As we look on, looms 1944 before us
Soughing like wind on sands.
Sunk within themselves apart, men stare straight in front of them,
They seed on the vagueness of their hearts;
Time is a grey wood to them, a grove of gallows-tress,
Which, nonetheless, would sing as a green deodar (?) grattto—
Had they known that it is not for history to always ache to the bone,
But that there is hope as men have known more & wondered more.
But these people have been taught by time to save their pleasures.

They don't know if life would have the laugh of them in the end.
Now they draw together in fear; fear gone, are loosened up.
These men have long been in our land,
Have seen how our heroes have given hostages to fortune,
And have been beaten by reality.
In the darkness of our fields
The far year has no guts in it.
Put in the hearts of our cities
Are the men who have created nothing,
And don't know it.
The moving tunes come on them unawraes,–
Come on congenital calm they can't put away.
Matter of habit with them to sleep,
Rise & sleep as a matter of right.

From all this grow clamour, fear, sick heart,
wasted breath, split & fall.

III

Has the will been awakened ?
Do we get the common people today as becoming
more & more the great book of the people ?
They seek love and wisdom ?
They have hoodwinked,— or, moralised their moments
Out of blood, lechery vandalism, lie & teror ?
Ah, Common people,
Common man, common woman.
Fresher than blades of grass is woman;
And man, dead & unborn, nobler than rivers.
The sunlit Horials, high above the nuzzles of cannons
Hold the freedom of their will to quit the skyline of lost rhythms–
And fare on to a great, noble blue.
Favourable winds and our tenderness follow them.
With all their airiness they are no more than birds,
Give room to millions as round their path the sun falls
Catching their dishonoured shrouds and unfaltering
headpieces into yet another sun.
Wind stirs
With gentle head over the grass;
Minds us of the grass that is green.
Dim images, before we can make them, look into
our eyes as chiming rivers of the earth.

Quickened by many more suns than we have seen

The waters of joy pass away into image
Of man's death, disease, dereliction and strain,–
Hoping to rise refreshed from the wastes of 1944.

Man seeks love & wisdom ?
He has hoodwinked ?— or, moralised his moments
Out of blood, lechery, vandalism, lie & terror ?
Has the will been awakened ?
Do we see the common people today as singing masters
of Time & Times.

## I HAVE FELT THE BREATH

I have felt the breath of autumn wind,
With the fragrance of spring still in my heart;
I have touched, shiveringly, the skirt
Of autumn– her treasures nervously gleaned;
She laughed not like summer, nor grinned
Like the wind-weary phantom-girt;
Nights that out of winter dart
To her own wining sadness she is pinned.

With a flower, or two– a vanishing scent,
A flash of smile on her demure face,
She walks with a light half-spent
By life and half in death's embrace;
She looks like a lady that is gracefully bent
To track the lost lover's fading trace.

## BANALATA SEN

Long I have been a wanderer of this world.
Many a night
My route lay across the sea of Ceylon somewhere winding to
The ocean of Malaya
I was in the dim world of Vimvisar and Asok, and further off
In the mistiness of Vidarbha.
At moments when life was too much a sea of sounds–
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom.

I remember her hair dark as nights at Vidisha,
Her face : image of Sravasti; the pilot
Undone in the blue milieu of the sea
Never twice sees the earth of grass before him.
I have also seen her, Banalata Sen of Natore.

When day is done, no fall somewhere but of dews
Dips into the dusk; the smell of the sun is gone
Off the kestrel's wings, Light is your wit now
Fanning fireflies that pitch the wide things around.
I am ready with my stock of Tales
For Banalata Sen of Natore.

## MEDITATIONS

We are closed in, fouled by the numbness of this concentration cell.
The honeybees on the upper wall know well enough
That the man below have been crossed by the stars
Turned on their uncertainty : they are lost
Treading upon the phantasy of their hearts,
They should have been men.
Outside the rage momently undoes
What were patterns of human hope and love.
In the sharp history of man, with his back turned
upon the sensuousness of the sea,
And neck craning on to some usable good
Every phase were glad of its own death
Had it felt that keeping to their own past intent
Were sons whom it bore–
Holding out hopes of more mature dispensations.
The golden Sun, the wings of this, the wisp of grass which

Grown miraculously somewhere in the waste
Is at peace with its life and our mockery;
The river bickering down with its sudden waters of death;
Mirrored in the eyes of a couple of mating flamingoes–
Too late to be saved–
As the love of Nature that is forsworn;
And the men who have played their parts to build
And were outwitted by– genius, love, common mistake
Or natural declension of the soul
To fall down what they created;

All the flavour stays in the Sun
And moves forward on the fatal flood of times
Like parables that improve as they are are recounted.

## DARKNESS

In deep darkness
I awoke once more
Distracted by the splash and fret of the river flowing by.
I saw the pale moon wont to gleam on *Vaitarani*
Had caught *Kirtinasha* in its still noose of shade.
I had slept by Dhansiri river on a cold December night.
And had never thought of waking again.

O Moon, dimmed to a faint blue disc,
Day's light you are not, you are not enterprise,
ambition, or dream;
The quiet and peace of death,
Its sleep– so dear to our heart
Is like a holy tryst
Which you moon have no means to spoil.

Do you not know, O Moon,
Do you not know, O Night,
I have gone to bed with Darkness,
And slept with her
For long, silent ages;
And then all of a sudden on a morning
I have found myself awake in the horrid crack
of this earth's light–
So loud, so foolish !

The sun from a red sky, in a dry level tone,
has called on me as a soldier

To range against foes I have never known
The vast belt of the sun-bedevilled earth
Has shrieked and squealed like millions of pigs in merriment
Ah, mirth ! a penumbra in my soul radiating
darkness darkness ever more

O Man, O Woman,
I have never known your level,
Nor am I a wanderer from another star
Only this I have known that wherever there is
movement, desire, work and thought
There are divisions of friends, families, nations, the
whole range of day-time madnesses

I am too full of sleep, of enveloping nescience,
Why should you keep me awake ?
O Time, O Sun, O Koïl of January night, O Memory
O Winter wind,
Why stir, to announce me to the day ?
Never more shall I waken
By the river's ruthless gurgling.
I shall not see how the dim, assorted moon
Divides her flickering between the River of Death
and the River of Mutability

By the water of Dhansiri
I shall go to bed with Darkness that never ends,
The sleep that never abates.

## CAT

All day long
I hail a cat in shine, shades of brown leaves.
He is just up from a few bones of fish,
and then has will of this earth.
Like a hushed bee,
He spins a cat clawing the barks of *Krishnachura*
Moves in the sun's wake.
He [illegible] upon me.
[illegible] green.
[illegible] twilight.
[illegible] white paws disembark
[illegible] in and out on the mildewed sun-
[illegible] of darkness,
[illegible] world of night.

[illegible]

## SAILOR

The sailor has a sense of defeat as he gets up with a start
and finds that instead of taking his place at the helm
He had dreamed of hoping that his ship at sea
Would take care of itself
He pulls himself together remembers his promise, wields
and sail
Sun, the dust and heavy of a past months
and the rest of passes had been.
His ship moves on.

To the premises with a church of golden hour
The evening sun seems like the egg of the bird of paradise
To the farmer a plaything amid his acres of ripening wheat
Human hands huddled together in dark
Have a glimpse of heavy a dust
Pulsing like a lance into their bowel
They look, sign, at the golden hours and the mains as it
Rapidly throbbing and flying. flying and throbbing, who "
to wait and "
O sailor you press on, keep pace with the hour
You have been caught partly in the currents of Babylon,
Nineveh, Egypt, China and Ur
Lowered yourself and headed for other shores
the impulse from Athens, Byzantine and Alexandria
Has been to you like this, straight candles glowing on
remembered beaches
They are good, but what the quest
You want deeper knowledge, complete experience
As long as honeybees with wings sparkling like spray fly
in the sun
And the horse with a warm touch than the jet plane
Brings home the virgin vastness of the blue
Man will not rest content.
Purged of hollow, sin and anger, resentment
His sailor-soul will fare forward
To move into a better discovery of life on this planet,
A greater joy- a deeper communion

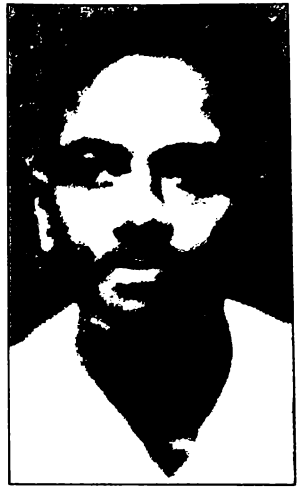

# পরিশিষ্ট

## জীবনানন্দ দাশের বংশলতিকা (পিতৃকুল)

- হরিচরণ দাশ
- সত্যানন্দ দাশ (কুসুমকুমারী দাশ)
  - জীবনানন্দ দাশ (লাবণ্য দাশ)
    - মঞ্জুশ্রী দাশ
    - সমরানন্দ দাশ
  - অলোকানন্দ দাশ
  - সুচরিতা দাশ
- প্রিয়ম্বদা সেন
- যোগানন্দ দাশ
- প্রেমদা চক্রবর্তী
- প্রেমানন্দ দাশ
- বিনোদা দাশ (অজ্ঞানমৃত্ত)
- স্নেহলতা দাশ
- অতুলানন্দ দাশ
- ব্রহ্মানন্দ দাশ
- জ্ঞানানন্দ দাশ

বলরাম দাশ
- তারিণীচরণ দাশ
- তোলানাথ দাশ
- সর্বানন্দ দাশ (প্রসন্নকুমারী)

## জীবনানন্দ দাশের বংশলতিকা (মাতৃকুল)

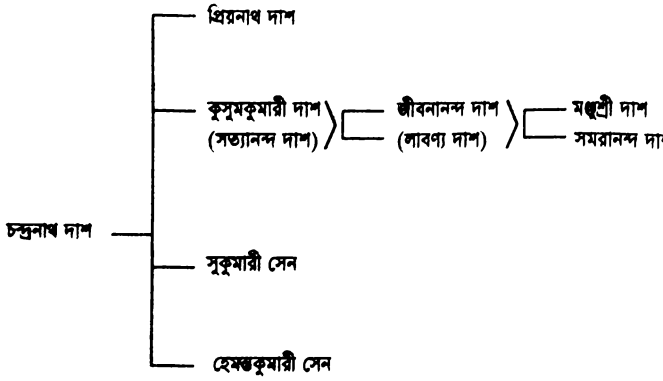

# কবিজীবন

১৮৯৮/৯৯: বোন সুচরিতা দাশের বক্তব্য মেনে ৯৮-এ জীবনানন্দ দাশের জন্ম। মা-মেনে বহুলপ্রচলে জীবনানন্দের জন্ম ১৮৯৯ সালে। বরিশালে। বিক্রমপুর থেকে পিতামহ সদানন্দ বরিশালে চলে গিয়েছিলেন।

বাবা : সত্যানন্দ দাশ।

'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার সম্পাদক।

মা : কুসুমকুমারী দাশ।

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে... বড় হবে"-এর রচয়িতা।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ৯৮-এ স্পেনে কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার জন্ম।

১৯০৮ : বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এর আগে বাড়িতে পড়াশোনা করেছেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ইতালীয় কবি ফিলিপ্পো মারিনেত্তি ফ্রান্সে ফিউচারইজমের ইশতেহার প্রকাশ করলেন।

১৯১৫ : ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হলেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ইংল্যান্ডে এজরা পাউন্ডের ইমেজইজমের ইশতেহার প্রকাশ, প্রকাশিত হল তার বহুল আলোচিত 'দ্যা কান্টোজ' কাব্যগ্রন্থ। এর দুবছর আগে (১৯১৩) থেকে শুরু হয়েছে হ্যারিট মনরোর 'পোয়েট্রি' পত্রিকার প্রকাশনা, প্রকাশিত হয়েছে রবার্ট ফ্রস্টের 'এ বয়েজ উইল' কাব্যগ্রন্থ। ১ বছর আগে লন্ডনে এজরা পাউন্ড ও টি. এস. এলিয়টের সাক্ষাৎ। হ্যারল্ড মনরোর পোয়েট্রি বুকশপের সূচনা। পাশাপাশি জর্জিয়ান পোয়েট্রিরও সূচনা হল, চলবে ১৯৩৬ পর্যন্ত। রুশ কবি বরিস পাস্তেরনাক-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেঘের মধ্যে বসন্ত' প্রকাশিত হল।

১৯১৭ : ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করলেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ফরাসী কবি গিয়োম অ্যাপলিনিয়ের প্রথম 'স্যুররিয়ালিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করলেন এবং 'নতুন কবিতা' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিলেন। পল ভ্যালেরির 'তরণী নিয়তি' এবং টি.এস. এলিয়টের 'প্রুফ্রকের প্রেমগান' কবিতার বই দুটি প্রকাশিত হল।

১৯১৯ : ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি. এ. (অনার্স) পাশ করলেন। 'ব্রহ্মবাদী'তে প্রথম কবিতা 'বর্ষ-আবাহন' ছাপা হল।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : রুশ কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি ফ্রান্সে এসে পল আলুয়ার, লুই আঁরাগ, আঁদ্রে ব্রেতোঁদের সাথে দাদাইজমের সূচনা করলেন।

১৯২২ : ইংরেজিতে এম. এ. (দ্বিতীয় শ্রেণীতে) পাশ করলেন। ইংরেজির সাথেই আইন পড়তে শুরু করে পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সিটি কলেজে ইংরেজি বিভাগের টিউটর হলেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : টি. এস. এলিয়টের কাব্যগ্রন্থ 'ওয়েস্টল্যান্ড' প্রকাশিত হল। ঠিক আগের বছর (১৯২১) স্পেন থেকে 'আল্ট্রাইজম' নিয়ে আর্জেন্টিনায় এসেছিলেন হোর্হে লুইস বোর্হেস। তারই ধারাবাহিকতায় এ-বছর ফরাসী ধারার চেয়ে ভিন্ন এক স্যুররিয়ালিজমের আঁচ নিয়ে বেরুলো ভালেজার 'ট্রিকল্' বইটি। রুশ কবি বরিস পাস্তেরনাকের বন্ধুত্ব হল ফিউচারিস্ট কবিদের সাথে। কিন্তু তিনি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হলেন না।

১৯২৫ : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে লেখা 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' কবিতাটি ছাপা হল 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। পরে কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'-এ গৃহীত হয় 'দেশবন্ধু' শিরোনামে। 'প্রবাসী' এবং 'বিজলী'তেও কবিতা ছাপা হল।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : এর ঠিক এক বছর আগে (১৯২৪) মূলত আঁদ্রে ব্রেতোঁর মাধ্যমে ফ্রান্সে স্যুররিয়ালিজম শুরু হয়েছে। সেই বছরই টি. এস. এলিয়ট সম্পাদিত 'ক্রাইটেরিয়ান' পত্রিকায় কন্‌স্তান্তিস কাভাফির 'ইথাকা' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে ল্যাংস্টন হিউজ প্রমুখদের নিয়ে শুরু হওয়া কাব্য-আন্দোলন 'হার্লেম রেনেসা'র কবি অ্যালেই লকে-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্যা নিউ নিগ্রো' প্রকাশিত হল।

১৯২৭ : প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' বেরুল। 'দাশগুপ্ত'-এর পরিবর্তে কবির পদবী ছাপা হল 'দাশ'।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সংস' বেরুল।

১৯২৮ : সিটি কলেজের ইংরেজির টিউটরের চাকরিটি চলে গেল।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ডব্লিউ. বি. ইয়েটসের একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে।

১৯২৯ : মাস তিনেক চাকরি করলেন খুলনা বাগেরহাটের প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে। পরে কলকাতায় ফিরে থাকতে লাগলেন বোর্ডিংয়ে। গৃহশিক্ষকতা করতে শুরু করলেন অর্থের প্রয়োজনে। ডিসেম্বরে দিল্লির রামযশ কলেজে যোগ দিয়ে কাজ করলেন চার মাস।

১৯৩০ : ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিয়ে করলেন। পাত্রী শ্রীমতি লাবণ্য। উপস্থিত থাকলেন বুদ্ধদেব বসু ও অন্যান্য কবিবন্ধুরা। বিয়ের পর দিল্লিতে আর ফিরে গেলেন না। এ-বছর থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর কর্মহীন থাকলেন। তবে কিছুদিন ইনশিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করলেন। ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা করারও চেষ্টা চালালেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ল্যাটিন অ্যামেরিকান দেশগুলোয় উত্তর-আধুনিকতার শেষ পর্যায় এবং ভ্যানগার্ডিজমের প্রথম পর্যায়ের শুরু। 'হার্লেম রেনেসা'র শেষ সময় চলছে। টি. এস. এলিয়টের কাব্যগ্রন্থ 'অ্যাশ ওয়েনেসডে' প্রকাশিত হল।

১৯৩১ : প্রথম সন্তান মঞ্জুশ্রীর জন্ম হলো। বিষ্ণু দের মাধ্যমে 'ক্যাম্পে' কবিতাটি ছাপা হল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায়। বিতর্ক উঠল অশ্লীলতার। গোপনে ছোটগল্পও লিখতে শুরু করলেন।

১৯৩২ : মার্চ ও অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে 'প্রেতিনীর রূপকথা' ও 'নিরুপম যাত্রা' উপন্যাস দুটো লিখলেন।

১৯৩৪ : মার্চ মাসে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো লিখলেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : ডিলান থমাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এইটিন পোয়েমস' প্রকাশিত হল।

১৯৩৫ : বরিশালের বি. এম. কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'মৃত্যুর আগে', দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বনলতা সেন' কবিতা দুটি ছাপা হল। প্রথম কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় অবস্থানকারী বুদ্ধদেব বসুকে চিঠিতে 'চিত্ররূপময়' বললেন। ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে চাকরি হল।

১৯৩৬ : দ্বিতীয় সন্তান সমরানন্দের জন্ম হল। গল্প লিখলেন। ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : বৃটিশ কবি ডব্লিউ.বি. ইয়েটসের সম্পাদনায় 'অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্স' ১৮৯২-১৯৩৫ প্রকাশিত হল।

১৯৩৭ : বুদ্ধদেব বসু 'ধূসর পাণ্ডুরিপি'র সহৃদয় আলোচনা করলেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : যুক্তরাষ্ট্রে আইওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এঙ্গেল-এর উদ্যোগে 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং কোর্স'-এর শুরু।

১৯৩৮ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এ পরিমার্জন করে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি নেয়া হল। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটি ছাপা হল 'কবিতা'য়।

১৯৪২ : কবিতাভবনের এক পয়সায় একটি সিরিজে 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হল। বাবা সর্বানন্দ দাশের মৃত্যু।

১৯৪৪ : জানুয়ারিতে একটি সংকলনের জন্যে 'কেন লিখি' গদ্যটি লিখলেন। জুলাইয়ে প্রকাশিত হল কাব্যগ্রন্থ 'মহাপৃথিবী', পূর্বাশা লিমিটেড থেকে।

১৯৪৬ : ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন। ছুটিতেও বেতন চালু ছিল। ছুটির তারিখ নিয়ে গোলমাল আছে।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : এক বছর আগে (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়েছে টি. এস. এলিয়টের প্রবন্ধগ্রন্থ 'হোয়াট ইজ ক্ল্যাসিক'।

১৯৪৭ : কলকাতায় চলে এলেন স্থায়ীভাবে, পরিবার নিয়ে, দাঙ্গার আগেই। হুমায়ুন কবিরের 'স্বরাজ' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হলেন। কয়েক মাসের বেশি কাজ করলেন না।

১৯৪৮ : 'সুতীর্থ, মাল্যবান' উপন্যাস দুটি লিখলেন মে-জুনে। ডিসেম্বরে কাব্যগ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হল। মা কুসুমকুমারী দেবীর মৃত্যু।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : টি.এস. এলিয়টের প্রবন্ধগ্রন্থ 'নোটস টুয়ার্ডস দ্যা ডেফিনিশন অব কালচার' প্রকাশিত হল।

১৯৪৯ : স্টেটসম্যানে bengali poetry today ছাপা হল।

১৯৫০ : 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র'-এর মুখপত্র 'দ্বন্দ্ব'র সম্পাদনা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হলেন।

১৯৫২ : পরিবর্তিত 'বনলতা সেন' সিগনেট সংস্করণে প্রকাশিত হল। বইটি নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সম্মেলনে-এ শ্রেষ্ঠ বইয়ের পুরস্কার পেল। বড়িষা কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেলেন।

১৯৫৩ : ফেব্রুয়ারিতে বড়িষা কলেজের অধ্যাপনার চাকরি চলে গেল। হাওড়া গার্লস কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকলেন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় জীবনানন্দের ১০টি কবিতা নেয়া হল। এর আগে ১৯৪০-এ আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় তাঁর ৪টি কবিতা গৃহীত হয়েছিলো।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : লন্ডনে টি. এস. এলিয়ট, বাসিল, র‍্যাকওয়েল, জোসেফ কম্পটন প্রমুখ 'পোয়েট্রি বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯৫৪ : সেনেট হলের কবি সম্মেলনে কবিতা পড়লেন জানুয়ারিতে। নাভানা থেকে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বেরুলো মে মাসে। ১৪ অক্টোবর ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হলেন। ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করলেন।

সমকালীন বিশ্বকবিতা : চিলির কবি নিকানোর পারর্‌রার "কবিতা ও প্রতিকবিতা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল।

# কবিতা প্রাসঙ্গিক মৌলিক গ্রন্থ

**জীবদ্দশায় প্রকাশিত**

| কাব্যগ্রন্থ | প্রকাশকাল |
|---|---|
| ঝরা পালক | ১৯২৭ ইং, ১৩৩৪ বাং |
| ধূসর পাণ্ডুলিপি | ১৯৩৬ ইং, ১৩৪৩ বাং |
| বনলতা সেন | ১৯৪২ ইং, ১৩৪৯ বাং [কবিতাভবন সংস্করণ] |
| | ১৯৫২ ইং, ১৩৫৯ বাং [পরিমার্জিত সিগনেট সংস্করণ] |
| মহাপৃথিবী | ১৯৪৪ ইং, ১৩৫১ বাং |
| সাতটি তারার তিমির | ১৯৪৮ ইং, ১৩৫৫ বাং |
| জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা | মে ১৯৫৪ ইং, ১৩৬১ বাং |

**মরণোত্তর প্রকাশনা**

**কাব্যগ্রন্থ**

| | |
|---|---|
| রূপসী বাংলা | ১৯৫৭ ইং, ১৩৬৪ বাং [সিগনেট সংস্করণ] |
| | ১৯৮৪ ইং, ১৩৯১ বাং [পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর সংস্করণ : সম্পাদনা দেবেশ রায়] |
| বেলা অবেলা কালবেলা | ১৯৬১ ইং, ১৩৬৮ বাং |

**প্রবন্ধগ্রন্থ**

| | |
|---|---|
| কবিতার কথা | ১৯৫৫ ইং, ১৩৬২ বাং |

# কবিকৃত ভূমিকা

## ঝরা পালক

ঝরা পালকের কতগুলি কবিতা প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিলো। বাকিগুলি নূতন।

কলিকাতা,
১০ই আশ্বিন ১৩৩৪

## ধূসর পাণ্ডুলিপি

আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৩৪ সালে। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে : আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে।

১৩৩৬ সালে আর একখানা বই বার করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিলো। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ক'রে সে উচ্ছাকে আমি শিশুর মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বার-বার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে-রকম কষ্ট হয় সেইরকম কেমন একটা উদ্বেগ– খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়– এই ক'বছর ধ'রে বোধ ক'রে এসেছি আমি।

আজ ন-বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হ'লো। এর নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। ১৩৩২ সালে লেখা কবিতা, ১৩৩৬ সালে লেখা কবিতা– প্রায় এগারো বছর আগের, প্রায় সাত বছর আগের রচনা সব আজ ১৩৪৩ সালে এই বইয়ের ভিতর ধরা দিলো। আজ যে-সব মাসিক পত্রিকা আর নেই– প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল– এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেইসব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিলো একদিন।

সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয় তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হ'য়ে বেঁচে রইলো।

আশ্বিন ১৩৪৩

## মহাপৃথিবী

'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮-এর ভিতর রচিত হয়েছিলো। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বেরিয়েছে ১৩৪২ থেকে ১৩৫০-এ। 'বনলতা সেন' ও অন্য –

কয়েকটি কবিতা যার ছাপিয়েছেন 'কলকাতা লেখা' বইটিতে। বাকি সব কবিতা আমার প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেয়েছে।

শ্রাবণ ১৩৭১

## শ্রেষ্ঠ কবিতা

কবিতা কী এ-জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেকরকম। ক্রোচেরও কবিতা নির্দেশিলেন, ম্যালার্মে র‍্যাঁবো ও রিলকেও। শেকসপীয়র কালিদাসের রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা লেখে ক'রে গেছেন। কেউ– কেউ কবিকে সবের ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন, কারো– কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার ভিতরে– তত্ত্ব বাজনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।

বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভবপর কবির; কবিতার সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকেরা যীভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন– এবং যীভাবে তা করা উচিত সেইসব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাজ, আমার মনে হয়, অনেক স্পষ্টভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেতে পারে। কাজ চেনবার জানবার করবার ও বিচার করবার নানারকম স্বভাব ও পদ্ধতির বিভিন্ন সত্যনিষ্ঠার পথে আধুনিক কবিতার আধুনিক সমালোচককে প্রায়ই চলতে দ্যাখা যায়, কিন্তু সেই কাজের সেইগুলি সত্যও অনেক সময়ই তাঁকে এড়িয়ে যায়।

আমার কবিতাকে যা এ-কালের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম বাসনা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ কাজ একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম ভাবনা চোখে পড়েছে। এর সবই আংশিকভাবে সত্য– কোনো-কোনো কবিতা বা কাজের কোনো-কোনো অংশের সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কবিতাপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এতো তারতম্য। একটা মীমাংসাও আছে এ তারতম্যের; সেটা জানিয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয়।

নানা দেশে অনেক দিন থেকেই কাজের সমাদর হোয়েছে। কিন্তু কবিতার সমাদর খুবই কম। নানা শতকের অন্তরঙ্গের যুক্ত জন তাঁদের সংস্কারকদের মধ্যে বড়ো কবি প্রায়ই কেউ নেই; কিন্তু সংস্কারকদের তাদের হয়েছে। দেশ পুরোনো কাজের বাস্তবিকরে বেশি সার্থকতা বেশি সহজ, অনুজ কবি ও কবিতার স্বীকৃতি বিচার বেশি কঠিন। অনেক কবির সমাদরে একটি সমস্যা; একজন কবির প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট কবিতা নিয়ে আর-এক জাতীয় সংস্কার; পশ্চিমে এ-ধরনের অনেক কবি আছে, তাদের ভেতর কয়েকটি– অংশবিশেষ একান্ত-কি মানুষের প্রায় অনুভূত। আমাদের দেশে

দু-একজন পূর্বজ (উনিশ-বিশ শতকের) কবির নির্বাচিত কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়েছিলো; কতোদূর সফল হয়েছে এখনো ঠিক বলতে পারছি না। ভালো কবিতা যাচাই করবার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদি নির্বাচন অনেক সময়ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোনো কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দ্যাখা যায়। পাঠকের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ– স্থাপনের দিক দিয়ে এ-ধরনের প্রাথমিক সংকলনের মূল্য আমাদের দেশেও লেখক পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে ক্রমেই বেশি স্বীকৃত হচ্ছে হয়তো। যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি তাঁর কবিতার এ-রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ– কাব্যের যথেষ্ট সংগত পরিচয় পেতে পারেন; যদিও শেষ পরিচয় লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।

এই সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন, তাঁর নির্বাচনের বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস– সাধনে মোটামুটিভাবে রচনা– কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

কলকাতা
২০.৪ ১৯৫৪

## অগ্রন্থিত কবিতার প্রকাশতালিকা

| কবিতার নাম | প্রকাশস্থান | প্রকাশকাল |
|---|---|---|
| বর্ষ-আবাহন | ব্রহ্মবাদী | বৈশাখ ১৩২৬ |
| বেদুঈন | কল্লোল | বৈশাখ ১৩৩৩ |
| আঁধারের যাত্রী | কল্লোল | জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ |
| মোর আঁখিজল | কল্লোল | আষাঢ় ১৩৩৩ |
| হাজার বর্ষ আগে | উষা | আষাঢ় ১৩৩৩ |
| ভারতবর্ষ | বঙ্গবাণী | শ্রাবণ ১৩৩৩ |
| বিজয়ী | গণবাণী | শ্রাবণ ১৩৩৩ |
| রামদাস | বঙ্গবাণী | ভাদ্র ১৩৩৩ |
| নিবেদন | বঙ্গবাণী | কার্তিক ১৩৩৩ |
| কোহিনূর | কল্লোল | কার্তিক ১৩৩৩ |
| অলকা | বঙ্গবাণী | শ্রাবণ ১৩৩৪ |
| ঝরা ফসলের গান | কল্লোল | পৌষ ১৩৩৪ |
| পলাতক | প্রগতি | পৌষ ১৩৩৪ |
| যুবা অশ্বারোহী | কালি-কলম | পৌষ ১৩৩৪ |
| পলাতকা | বঙ্গবাণী | মাঘ ১৩৩৪ |
| কবি | প্রবাসী | মাঘ ১৩৩৪ |
| পরবাসী | প্রগতী | মাঘ ১৩৩৪ |
| আদিম | কল্লোল | ফাল্গুন ১৩৩৪ |
| আজ | কালি-কলম | জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ |
| ফসলের দিন | কালি-কলম | আশ্বিন ১৩৩৫ |
| আমরা | ধূপছায়া | কার্তিক ১৩৩৫ |
| আজ | প্রগতি | আশ্বিন ১৩৩৬ |
| নক্ষত্র কেমন ক'রে জেগে থাকো তুমি | বিভাব | ১৪০৫ |
| মৃত মাংস | কবিতা | পৌষ ১৩৪২ |
| নদী | কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৩ |
| ১৯৩৬ | বিভাব | শরৎ ১৯৩৬ |
| সমুদ্রচিল | পরিচয় | কার্তিক ১৩৪৪ |
| হঠাৎ-মৃত | কবিতা | পৌষ ১৩৪৪ |
| বিস্ময় | শান্তি | আশ্বিন ১৩৪৫ |
| জীবন-সংগীত | চতুরঙ্গ | চৈত্র ১৩৪৫ |
| পিতৃলোক | আনন্দবাজার পত্রিকা | বার্ষিক ১৩৪৫ |
| অগ্নি | কবিতা | চৈত্র ১৩৪৫ |
| একদিন ভাবিনি কি | উন্মেষ | ১৩৪৫ |
| উদয়াস্ত | কবিতা | আষাঢ় ১৩৪৬ |
| সুমেরীয় | কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৬ |
| মৃত্যু | কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৬ |
| আমিষাশী তরবার | কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৬ |

| | | |
|---|---|---|
| দানবীয় | শান্তি | আশ্বিন ১৩৪৬ |
| কালাতিপাত | যুগান্তর | শারদীয় ১৩৪৬ |
| হেমন্ত | কবিতা | কার্তিক ১৩৪৬ |
| নিঃসরণ | কবিতা | কার্তিক ১৩৪৬ |
| উদয়াস্ত | চতুরঙ্গ | পৌষ ১৩৪৬ |
| অনুভব | জয়শ্রী | মাঘ ১৩৪৬ |
| মৃত মানুষ | জয়শ্রী | মাঘ ১৩৪৬ |
| সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন | কবিতা | চৈত্র ১৩৪৬ |
| শান্তি | কবিতা | চৈত্র ১৩৪৬ |
| হে হৃদয় | কবিতা | চৈত্র ১৩৪৬ |
| আমি হাত প্রসারিত ক'রে দেই | (?) | ১৩৪৭ |
| ১৩৩৬-৩৮ স্মরণে | কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৭ |
| এইঘর অবিকল | (?) | ১৩৪৭ |
| গতিবিধি | নিরুক্ত | আশ্বিন ১৩৪৭ |
| নির্দেশ | নিরুক্ত | আশ্বিন ১৩৪৭ |
| প্যারাডিম | পরিচয় | আশ্বিন ১৩৪৭ |
| রাত্রি | নিরুক্ত | পৌষ ১৩৪৭ |
| রবীন্দ্রনাথ | পূর্বাশা | রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৪৮ |
| গরিমা | নিরুক্ত | আশ্বিন ১৩৪৮ |
| আবছায়া | জয়শ্রী | আশ্বিন ১৩৪৮ |
| কুহলিন | (?) | আশ্বিন ১৩৪৮ |
| ঘাস | কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৮ |
| সমিতিতে | কবিতা | আশ্বিন ১৩৪৮ |
| রবীন্দ্রনাথ | পরিচয় | অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ |
| কোরাস | কবিতা | পৌষ ১৩৪৮ |
| রবীন্দ্রনাথ | পঁচিশে বৈশাখ | শ্রবাণ ১৩৪৯ |
| বাতাসের শব্দ এসে | সম্প্রতি | বার্ষিকী ১৩৪৯ |
| অনুভব | প্রতিরোধ | শারদীয় ১৩৪৯ |
| আলোসাগরের গান | নূতন লেখা | কার্তিক ১৩৪৯ |
| দোয়েল | কবিতা | পৌষ ১৩৪৯ |
| পৃথিবীলোক | স্বাতী (?) | ১৩৪৯ |
| নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান | দেশ | ১৭ বৈশাখ ১৩৫০ |
| মানুষ চারিয়ে | দিগন্ত | শারদীয় ১৩৫০ |
| এই শতাব্দী সন্ধিতে মৃত্যু | পরিক্রমা | শারদীয় ১৩৫০ |
| শতাব্দী শেষ | একক | শারদীয় ১৩৫০ |
| কার্তিকের ভোর ১৩৫০ | (?) | ১৩৫০ |
| শীতের রাতের কবিতা | একক | বসন্ত ১৩৫০ |
| শ্রুতি-স্মৃতি | নিরুক্ত | চৈত্র ১৩৫০ |
| সমুদ্রপায়রা | বৈশাখী ৩ | ১৩৫১ |
| অনিবার | (?) | ১৩৫১ |
| সোনালি অগ্নির মতো | (?) | ১৩৫১ |

| | | |
|---|---|---|
| সৌরচেতনা | কবিতা সংকলন মিছিল | ১৯৪৪ |
| অন্তর বাহির | একক | শারদীয় ১৩৫২ |
| অনির্বাণ | মাসিক বসুমতী | পৌষ ১৩৫২ |
| 'ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ ইন্‌ ট্রপিকস্‌' প'ড়ে | মাসিক বসুমতী | ফাল্গুন ১৩৫২ |
| হেমন্ত-কুয়াশায় | মাসিক বসুমতী | ফাল্গুন ১৩৫২ |
| চেতনা-লিখন | মাসিক বসুমতী | আষাঢ় ১৩৫৩ |
| জার্মানীর রাত্রিপথে : ১৯৪৫ | মাসিক বসুমতী | ভাদ্র ১৩৫৩ |
| আজ বিকেলের ধূসর আলোয় | | রচনা ১৯৪৬ |
| রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে | | রচনা ১৯৪৬ |
| সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম | | রচনা ১৯৪৬ |
| পৃথিবীতে যতো ইতিহাসে যতোক্ষয় | | রচনা ১৯৪৬ |
| অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে | | রচনা ১৯৪৬ |
| আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো | | রচনা ১৯৪৬ |
| আমরা যেন মেঘের আলো ভিতর থেকে এসে | | রচনা ১৯৪৬ |
| ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো | | রচনা ১৯৪৬ |
| দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে | | রচনা ১৯৪৬ |
| কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি | | রচনা ১৯৪৬ |
| তোমার সাথে আমার ভালোবাসা | | রচনা ১৯৪৬ |
| ভোরের বেলায় তুমি আমি– | | রচনা ১৯৪৬ |
| ধ্বনিপাখির আলোনদীর স্মরণে | | রচনা ১৯৪৬ |
| মকরসংক্রান্তি প্রাণে | | রচনা ১৯৪৬ |
| মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা | | রচনা ১৯৪৬ |
| এই কি সিন্ধুর হাওয়া | ক্রান্তি | শারদীয় ১৩৫৩ |
| নবপ্রস্থান | যুগান্তর | শারদীয় ১৩৫৩ |
| দাও-দাও সূর্যকে জাগিয়ে দাও | একক(?) | ১৩৫০ |
| পটভূমিবিসার | মেঘনা | বৈশাখ ১৩৫৪ |
| মৃত্যু, সূর্য, সংকল্প | ৯ অগাস্ট সংকলন | শ্রাবণ ১৩৫৪ |
| রাত্রি ও ভোর | দিগন্ত | শ্রাবণ ১৩৫৪ |
| এই পথ দিয়ে | ক্রান্তি | আশ্বিন ১৩৫৪ |
| কার্তিক-অঘ্রান ১৯৪৬ | দেশ | শারদীয় ১৩৫৪ |
| ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২ | সওগাত | কার্তিক ১৩৫৪ |
| পৃথিবী ও সময় | ক্রান্তি | কার্তিক ১৩৫৪ |
| অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে | ইঙ্গিত | পৌষ ১৩৫৪ |
| মহাত্মাজি | ক্রান্তি | মাঘ ১৩৫৪ |
| মহাত্মা | একক | জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ |
| পৃথিবীগ্রহবাসী | চতুরঙ্গ | আশ্বিন ১৩৫৫ |
| চেতনা-সবিতা | যুগান্তর | শারদীয় ১৩৫৫ |
| এই চেতনা | সাহিত্যপত্র | কার্তিক ১৩৫৫ |
| বিপাশা | মৌসুমী | বৈশাখ ১৩৫৬ |
| আলোকপত্র | কৃষক | শারদীয় ১৩৫৬(?) |
| স্বাতীতারা | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৫৬ |

| | | |
|---|---|---|
| আলোকপাত | যুগান্তর | শারদীয় ১৩৫৬ |
| দিনরাত্রি | পূর্বাশা | ফাল্গুন ১৩৫৬ |
| সূর্যকরোজ্জ্বলা | মাসিক বসুমতী | ফাল্গুন ১৩৫৬ |
| আশা-ভরসা | দ্বন্দ্ব | আষাঢ় ১৩৫৭ |
| ক্রান্তিবলয় | আনন্দবাজার প্রত্রিকা | শারদীয় ১৩৫৭ |
| আজ | নির্ণয় | শারদীয় ১৩৫৭ |
| পৃথিবী আজ | সত্যযুগ | শারদীয় ১৩৫৭ |
| রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী | সত্যযুগ | শারদীয় ১৩৫৭ |
| আশা, অনুমিতি | একক | জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ |
| মহাগ্রহণ | চতুরঙ্গ | আশ্বিন ১৩৫৮ |
| অন্ধকারে | পূর্বাশা | আশ্বিন ১৩৫৮ |
| অমৃতযোগ | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৫৮ |
| তিমির সূর্যে | দেশ | শারদীয় ১৩৫৮ |
| মহাপতনের ভোরে | যুগান্তর | শারদীয় ১৩৫৮ |
| পৃথিবী, জীবন, সময় | গণবার্তা | শারদীয় ১৩৫৮ |
| নিজেকে নিয়মে ক্ষয় | একক | শারদীয় ১৩৫৮ |
| জীবনবেদ | দেশ | ২৬ মাঘ ৫৮ |
| শত শতাব্দীর | পূর্বাশা | বৈশাখ ১৩৫৯ |
| সমস্ত দিন অন্ধকারে | উষা | (?) |
| চারিদিকে নীল হ'য়ে | উষা | (?) |
| মনবিহঙ্গম | পূর্বাশা | আশ্বিন ১৩৫৯ |
| নিবিড়তর | দেশ | শারদীয় ১৩৫৯ |
| নদী | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৫৯ |
| রশ্মি এসে পড়ে | শতভিষা | শরৎ ১৩৫৯ |
| যাত্রা | উত্তরসূরি | আশ্বিন ১৩৫৯ |
| সূর্য নিভে গেলে | একক | শারদীয় ১৩৫৯ |
| যাত্রী | কবিতা | চৈত্র ১৩৫৯ |
| হৃদয় তুমি | কবিতা | চৈত্র ১৩৫৯ |
| এই পৃথিবীর | পূর্বাশা | বৈশাখ ১৩৬০ |
| এখন এ-পৃথিবীর | চতুরঙ্গ | আষাঢ় ১৩৬০ |
| মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল | ময়ূখ | আশ্বিন ১৩৬০ |
| কে এসে যেন | শতভিষা | শরৎ ১৩৬০ |
| নদী নক্ষত্র মানুষ | দেশ | ২ আশ্বিন ১৩৬০ |
| জীবনে অনেক দূর | ব্রাত্য | আশ্বিন ১৩৬০ |
| নব হরিতের গান | একক | শারদীয় ১৩৬০ |
| [illegible] সন্ততি | উষা | শারদীয় ১৩৬০ |
| [illegible] | দেশ | ২১ কার্তিক ১৩৬০ |
| [illegible] | দেশ | ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ |
| [illegible]সে | কবিতা | পৌষ ১৩৬০ |
| [illegible] | আনন্দবাজার পত্রিকা | বার্ষিক ১৩৬০ |
| [illegible] | ক্রান্তি | ফাল্গুন ১৩৬০ |

| | | |
|---|---|---|
| জার্নাল : ১৩৪৬ | চতুরঙ্গ | বৈশাখ ১৩৬১ |
| মৃত্যুসাগর সরিয়ে সূর্যে বেঁচে আছি | প্রাঙ্গণ | বৈশাখ ১৩৬১ |
| রবীন্দ্রনাথ | উষা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ |
| কখনো নক্ষত্রহীন | পূর্বাশা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ |
| মরুতৃণোজ্জ্বলা | ক্রান্তি | শ্রাবণ ১৩৬১ |
| জন্মতারকা | কল্পনা সাহিত্য | ভাদ্র ১৩৬১ |
| সে | দেশ | ২১ আশ্বিন ১৩৬১ |
| মহাইতিহাস | ক্রান্তি | আশ্বিন ১৩৬১ |
| লক্ষ্য | জয়শ্রী | শারদীয় ১৩৬১ |
| রাত্রিদিন | ময়ূখ | শারদীয় ১৩৬১ |
| তোমাকে | বর্ধমান | শারদীয় ১৩৬১ |
| কোনো এক নারীকে : যে | কবিপত্র,৩য় সংকলন | ১৩৬১ |
| মানুষ যেদিন | সেতু | ১৩৬১ |
| জর্নাল : ১৩৪২ | উষা | শারদীয় ১৩৬১ |
| কার্তিক ভোরে : ১৩৪০ | শতভিষা | শরৎ সংখ্যা ১৩৬১ |
| তোমাকে ভালোবেসে | দেশ | শারদীয় ১৩৬১ |
| মহাজিজ্ঞাসা | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৬১ |
| অনেক রাত্রিদিন | দৈনিক বসুমতী | শারদীয় ১৩৬১ |
| প্রেমিক | বন্দেমাতরম | শারদীয় ১৩৬১ |
| অবিনশ্বর | পূর্বাশা | শারদীয় ১৩৬১ |
| আলোপৃথিবী | দেশ | ১৩ কার্তিক ১৩৬১ |
| আজ | আনন্দবাজার পত্রিকা | ১৪ কার্তিক ১৩৬১ |
| বৃক্ষ | দেশ | ২৭ কার্তিক ১৩৬১ |
| কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন হ'য়ে | ক্রান্তি | কার্তিক ১৩৬১ |
| অন্য প্রেমিককে | দেশ | ৯ পৌষ ১৩৬১ |
| অন্য এক প্রেমিককে | দেশ | ৯ পৌষ ১৩৬১ |
| এক অন্ধকার থেকে এসে | কবিতা | পৌষ ১৩৬১ |
| তোমায় আমি দেখেছিলাম | কবিতা | পৌষ ১৩৬১ |
| ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে | কবিতা | পৌষ ১৩৬১ |
| অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে | কবিতা | পৌষ ১৩৬১ |
| দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই | কবিতা | পৌষ ১৩৬১ |
| রক্তনদীর তীরে | কবিতা | পৌষ ১৩৬১ |
| কেন মিছে নক্ষত্রেরা | আনন্দবাজার পত্রিকা | বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬১ |
| উপলব্ধি | উত্তরসূরি | পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১ |
| সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে | ময়ূখ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ |
| ওইখানে সারাদিন | ময়ূখ | পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ৬১-৬২ |
| এলো বৃষ্টি বুঝি এলো | ময়ূখ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ |
| জানি না কোথায় তুমি | ময়ূখ | আশ্বিন ১৩৬২ |
| মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে | দেশ | শারদীয় ১৩৬২ |
| কারা কবে | অধুনা | সংকলন ১৩৬২ |
| শান্তি ভালো | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৬২ |

| | | |
|---|---|---|
| কবি | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬২ |
| চারিদিকে পৃথিবীর | আনন্দবাজার পত্রিকা | বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬২ |
| ভোরের কবি জ্যোতির কবি | চতুরঙ্গ | চৈত্র ১৩৬২ |
| সুন্দরবনের গল্প | চতুরঙ্গ | চৈত্র ১৩৬২ |
| আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ | চতুরঙ্গ | মাঘ-চৈত্র ১৩৬২ |
| হে জননী হে জীবন | অনুক্ত | চৈত্র ১৩৬২ |
| প'ড়ে গেলো একেবারে আমারি | কবিতা | চৈত্র ১৩৬২ |
| বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা | কবিতা | চৈত্র ১৩৬২ |
| জীবন ভালোবেসে | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৬৩ |
| সবার উপর | দেশ | শারদীয় ১৩৬৩ |
| জীবনের মানে ভালো | কবিতা | আশ্বিন ১৩৬৩ |
| জোনাকি | কবিতা | আশ্বিন ১৩৬৩ |
| প্রতীক | উত্তরা | আশ্বিন ১৩৬৩ |
| সে | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬৩ |
| আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| ঘুমায়ে রয়েছো তুমি ক্লান্ত হ'য়ে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| আমি এই অঘ্রানের ভালোবাসি | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| আজ রাতে শেষ হ'য়ে গেলো শীত | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| বার-বার সেইসব কোলাহল | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| রাত আরো বাড়িতেছে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| কতো পুরোনো কথা | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| এইখানে একদিন তুমি এসে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| কি যেন কখন আমি অন্ধকারে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| আমার এ ছোটো মেয়ে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| নদী | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| তখন অনেক দিন হ'য়ে গেছে | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| কেন ব্যথা পাবে তুমি ? | ধূসর পাণ্ডুলিপি | ফাল্গুন ১৩৬৩ |
| কমলাবতীর ভালোবাসা | ঊষা | ১৩৬৩ |
| যখন খেতের ধান ঝ'রে গেছে | (?) | ১৩৬৪ |
| তোমায় আমি | দেশ | ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ |
| চিঠি এলো | কবিতা | আষাঢ় ১৩৬৪ |
| আমি | কবিতা | আষাঢ় ১৩৬৪ |
| কনভেন্‌শন্‌ | অনুক্ত | শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৪ |
| তুমি আলো | দেশ | শারদীয় ১৩৬৪ |
| ইতিবৃত্ত | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬৪ |
| কোনো ব্যথিতাকে | দেশ | ২৫ মাঘ ১৩৬৪ |
| শবের পাশে | কবিতা | চৈত্র ১৩৬৪ |

| | | |
|---|---|---|
| রজনীগন্ধা | কবিতা | চৈত্র ১৩৬৪ |
| তোমার আমার | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৬৫ |
| সুদর্শনা | উষা | শারদীয় ১৩৬৫ |
| সবারি হাতের কাজ | ময়ূখ | অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ |
| তোমায় আমি | দেশ | ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ |
| পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে-মাঠে | নবান্ন | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ |
| কোনো-এক জ্যোৎস্না রাতে | কবিতা মেলা স্মারকগ্রন্থ | ভাদ্র ১৩৬৬ |
| নির্জন হাঁসের ছবি | কবিতা | আশ্বিন ১৩৬৬ |
| বড়ো-বড়ো গাছ | কবিতা | আশ্বিন ১৩৬৬ |
| মনকে আমি নিজে | কবিতা | আশ্বিন ১৩৬৬ |
| তুমি যদি | নবান্ন | অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ |
| সূর্য এলে | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬৬ |
| জল | দেশ | ১২ চৈত্র ১৩৬৬ |
| মাঝে-মাঝে | দেশ | ৩১ বৈশাখ ১৩৬৭ |
| এখন ওরা | পূর্বপত্র | ভাদ্র ১৩৬৭ |
| ডালপালা নড়ে বার-বার | দেশ | শারদীয় ১৩৬৭ |
| যাত্রা | আনন্দবাজার পত্রিকা | শারদীয় ১৩৬৭ |
| বিকেলের আলোয় | পূর্বপত্র | আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ |
| এখন রাতের শেষে | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬৭ |
| অনেক রক্তে | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬৭ |
| এসো | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬৭ |
| যেখানে মনীষী তার | উত্তরসূরি | পৌষ ১৩৬৭ |
| অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে | মানসী | মার্চ ১৩৬১ |
| কবিতার খসড়া | পূর্বপত্র | অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ |
| ঢেউয়ে-ঢেউয়ে | উত্তরসূরি | কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ |
| হেমন্তের নদীর পারে | প্রবন্ধ-পত্রিকা | মাঘ ১৩৬৮ |
| মৃত, বর্তমানে উপেক্ষিত | প্রবন্ধ-পত্রিকা | মাঘ ১৩৬৮ |
| শিল্পী | প্রবন্ধ-পত্রিকা | মাঘ ১৩৬৮ |
| আমাদের বুদ্ধি আজ | শতাব্দীর শত-কবিতা | বৈশাখ ১৩৬৯ |
| টেবিলে অনেক বই | মনবিহঙ্গম | কার্তিক ১৩৮৬ |
| কখনো মুহূর্ত | মনবিহঙ্গম | কার্তিক ১৩৮৬ |
| সুদীর্ঘকাল তারার আলো | পঁচিশে বৈশাখের কবিতা | বৈশাখ ১৩৭৪ |
| কবের সে-রাত্রি আজ | জলসা | শারদীয় ১৩৭৫ |
| এইখানে সূর্যের | কাব্যসম্ভার, ঢাকা | ভাদ্র ১৩৭৬ |
| এখানে নক্ষত্রে ভ'রে | কাব্যসম্ভার, ঢাকা | ভাদ্র ১৩৭৬ |
| উনিশশো চৌত্রিশের | কৃত্তিবাস | আষাঢ় ১৩৮০ |
| এইসব পাখি | কৃত্তিবাস | আষাঢ় ১৩৮০ |
| জার্নাল : '৩৬ | শতভিষা | শ্রাবণ ১৩৮৩ |
| জর্নাল : ১৯৩৪ | শতভিষা | শরৎ ১৩৮৪ |
| উপলব্ধি | কৃত্তিবাস | আশ্বিন ১৩৮৫ |
| হঠাৎ তোমার সাথে | প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯০ |

| | | |
|---|---|---|
| রবীন্দ্রনাথ | প্রতিক্ষণ | বৈশাখ ১৩৯১ |
| ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| একবার ভালো নীল ভাঙা ভুল | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| যখন দিনের আলো নিভে আসে | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| নক্ষত্রমঙ্গল(১৯৪২-৪৭) | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| রাত্রি অনিমেষ | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| হে হৃদয়, নীড় থেকে ঢের দূরে | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| শহর-বাজার ছাড়িয়ে | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| এখন এ-পৃথিবীতে | জীবনানন্দ সমগ্র ১, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯১ |
| কোথায় গিয়েছে | জীবনানন্দ সমগ্র ২, প্রতিক্ষণ | বৈশাখ ১৩৯২ |
| পথের কিনারে | জীবনানন্দ সমগ্র ২, প্রতিক্ষণ | বৈশাখ ১৩৯২ |
| বাইরে হিমের হাওয়া | জীবনানন্দ সমগ্র ২, প্রতিক্ষণ | বৈশাখ ১৩৯২ |
| মানুষের কবেকার অপলক সরলতা | জীবনানন্দ সমগ্র ২, প্রতিক্ষণ | বৈশাখ ১৩৯২ |
| নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে | জীবনানন্দ সমগ্র ২, প্রতিক্ষণ | বৈশাখ ১৩৯২ |
| তবুও মনকে ঘিরে | জীবনানন্দ সমগ্র ২, প্রতিক্ষণ | বৈশাখ ১৩৯২ |
| শরীরিণীকে | জীবনানন্দ সমগ্র ৩, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯২ |
| জল | জীবনানন্দ সমগ্র ৩, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯২ |
| যেন তা কল্যাণ সত্য চায় | জীবনানন্দ সমগ্র ৩, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯২ |
| যদিও আজ তোমার চোখে | জীবনানন্দ সমগ্র ৩, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯২ |
| আকাশে রাত | জীবনানন্দ সমগ্র ৩, প্রতিক্ষণ | মাঘ ১৩৯২ |
| অম্লান রাত | কবিতাসমগ্র:জীবনানন্দ, ঢাকা | ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ |
| এখানে দিনের জীবনের স্পষ্ট | কবিতাসমগ্র:জীবনানন্দ, ঢাকা | ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ |
| কে কবিতা লেখে | | |
| বর্ষবিদায় | কবিতাসমগ্র:জী. দা, প্রতীক | ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ |
| মনমর্মর | কবিতাসমগ্র:জী. দা, প্রতীক | ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ |
| অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয় ক'রে | কবিতাসমগ্র:জী. দা, প্রতীক | ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ |
| তুমি এই রাতের বাতাস | কবিতাসমগ্র:জী. দা, প্রতীক | ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ |
| নদী | দেশ | নভেম্বর ১৯৯৮ |
| কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভ'রে | দেশ | নভেম্বর ১৯৯৮ |
| এতোদিন ডাকি নাই | দেশ | নভেম্বর ১৯৯৮ |
| আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে | দেশ | নভেম্বর ১৯৯৮ |
| সময়ের কাছ থেকে | দেশ | নভেম্বর ১৯৯৮ |
| স্ট্যাঞ্জা তিনেক | দেশ | নভেম্বর ১৯৯৮ |
| এ ও সে | দেশ | নভেম্বর ১৯৯৮ |
| শিকার | দেশ | ডিসেম্বর ১৯৯৮ |
| তোমার সবিতা ভালোবেসে | শারদীয় আজকাল | ১৪০৬ |
| এ কি আলো । এ কি আঁধার | শারদীয় আজকাল | ১৪০৬ |
| শোনো শোনো নীলকণ্ঠ পাখিরা | শারদীয় আজকাল | ১৪০৬ |
| আলো দূরে আরো দূরে | শারদীয় আজকাল | ১৪০৬ |
| তোমারে ডেকেছি আমি | শারদীয় আজকাল | ১৪০৬ |
| সে-জাহাজ দেখেছে কি কেউ ? | শারদীয় প্রতিদিন | ১৪০৬ |

| | | |
|---|---|---|
| এখানে মরণশীল হংস নেই আর... | অনুবর্তন | মাঘ-চৈত্র ১৪০৬ |
| স্থির হ'য়ে আছে মন, মনে হয়, তবু | অনুবর্তন | মাঘ-চৈত্র ১৪০৬ |
| কৃষ্ণাদশমীর রাতে : তোমাকে | অনুবর্তন | মাঘ-চৈত্র ১৪০৬ |
| যারা এই জীবনের স্বাদ | কল্লোল, শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব | জুলাই ২০০০ |
| যদিও প্রেমের মৃত্যু হ'য়ে গেছে | কল্লোল, শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব | জুলাই ২০০০ |
| ঘুমাও | কল্লোল, শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব | জুলাই ২০০০ |
| আমার হাতের কাজ অন্ধকারে | কল্লোল, শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব | জুলাই ২০০০ |
| মনে হ'লো— হয়তো যেতেছি আমি | কবিতীর্থ | আশ্বিন ১৪০৭ |
| শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলে | কবিতীর্থ | আশ্বিন ১৪০৭ |
| এইবার ছুটি পেয়ে | কবিতীর্থ | আশ্বিন ১৪০৭ |
| অন্ধকারে খ্যাঁকশিয়ালিরা এসে | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| যখন অনেক স্বপ্ন দ্যাখা শেষ হয়েছে | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| সেই ফুল মেখে দেবো আমি তার চুলে | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| আমরা হতেছি বুড়ো শাদা হ'তে | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| পড়িবে না তোমার এ-লেখা এসে | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| নিজেরে অনেক ভেবে | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| তুমি চ'লে আসো কাছে, চলে আসো | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| আমি সব ছেড়ে দিয়ে পুরানো গাছের | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| শীতরাত আসিতেছে নেমে | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| তোমার চোখের নিচে আমি এক | তথ্যকেন্দ্র, শারদ সাহিত্য | ১৪০৭ |
| লেডা | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| মিডিয়া | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| কিছুদিন আগে ইয়াসিন আলি ম'রে | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| প্রেমিক ১৩৪৫-৪৬ | অনুষ্টুপ | মাঘ ০৪ |
| একদিন মনে হয়েছিলো | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| ভোরের মানুষ | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| গফুর | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| পেলবশীর্ষ | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| আমি ওই সমুদ্রের যুবনারীদের | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| আঁধার থেকে উঠে | অনুষ্টুপ | মাঘ ১৪০৪ |
| কে শরীর কে-বা ছায়া ? | মহাপৃথিবী | আষাঢ় ১৪০৫ |
| নিজের পাখার হিমে | দাহপত্র | জুন ২০০০ |
| তেরোশো তিরিশে | দাহপত্র | ডিসেম্বর ২০০০ |
| রাত্রির বাতাসে | দাহপত্র | ডিসেম্বর ২০০০ |
| নক্ষত্রের পথে | শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন | ১৪০৮ |

# বিকল্পপাঠ

বিকল্পপাঠ-অংশটুকু অর্ধোরেখার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে

## রূপসী বাংলা

| কবিতাক্রম | বিকল্পপাঠ |
|---|---|
| ৫ | হাঁসের পালক, শ্যালা, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের |
| ৬ | গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, সুদর্শন, শ্যামাপোকা ঢের, |
| ৮ | ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভেঅমারার বুলাতেছে– শাদা স্তন ঝরে |
| ৯ | কাটাইনি দিন, মাস, লহনার খুল্লনার মধুর জগতে |
| ১০ | ভাঙা সোঁদা ইঁটগুলো– তারি বুকে নদী এসে কি কথা মর্মরে, |
| ১১ | আকাশ বৈশাখ মেঘ– শাদা-শাদা যেন কড়ি শঙ্খের পাহাড় |
| | নদীর ওপার থেকে চেয়ে রবে– কোনো এক শঙ্খবালিকার |
| | মাথুরের গান শুনে কতোবার ঘর আর খড় গেলো ভেসে |
| ১২ | তোমাদের ব্যস্ত মনে;– তবুও কিশোর তুমি নখের আঁচড়ে |
| | ঝরিবে ঘাসের 'পরে– শালিখ খয়েরি-চিল কতোদূর ওঠে |
| ১৫ | তাহলে জানিও তুমি আসিয়াছে অন্ধকারে দূরের আহ্বান |
| ১৬ | নতুন ডাঙার দিকে– পিছনের নিরুত্তর মৃত চর বিনা |
| ১৭ | গুমরায়– পাশ দিয়ে খল্ খল্ খল্ ব'য়ে যায় খাল |
| ১৮ | কতোকাল নিঙরাবে;– নোনার নরম স্বাদ ভুলে গিয়ে বুঝি |
| ১৯ | নীল মৃত্যু উজাগর– বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ |
| | কৃষ্ণা যমুনার নয়– যেন এই জলসিড়ি ঢেউয়ের আঘ্রাণ |
| ২০ | করবীর কচিপাতা/বাঁশের হলুদ শাখা; চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটিব পায় |
| | কড়ি খেলিবার ঘরে মজে গিয়ে গোক্ষুরার ফাটলে হারায় |
| | চ'লে গেছে– শ্মশানের পাশে কোন্– সন্ধ্যা আসে সহসা কখন |
| ২১ | অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে |
| | শেষ হ'য়ে গেছে আজ,– চেয়ে দ্যাখো কতো শত শতাব্দীল বট |
| | মধুকূপী ঘাস ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌড় বাংলার |
| ২২ | হারায়েছে; বধূও উঠানে নাই– প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি |
| ২৫ | চৈত্রের/কার্তিকের/পৌষের রাঙা রোদ চড়িতেছে আকাঙ্ক্ষায় চিনিচাঁপা গাছে |
| ২৬ | সেখানে নেবুর পাতা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর |
| ২৮ | বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে |
| ৩০ | আলোকলতার পাশে গন্ধ ঢালে দ্রোণফুল বাসকের গায় |
| ৩১ | জামের গভীর ডাল ছাওয়া শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে |
| | যদি তার পিছে যাও দেখিবে সে শাদা ভাঁট, আকন্দের বনে |
| ৩২ | ধরা দেও;– তাহলে অনন্তকাল থাকিতে হবে যে এই বনে |
| | হলুদ নরম পায়ে খয়েরি শালিখগুলো মাড়ায় উঠান |
| | চেয়ে দ্যাখো সুন্দরীরে গোরচনা রং নিয়ে এসেছে কি রাই |
| | নীল নদে– গাঢ় রৌদ্রে কবে আমি দেখিয়াছি– করেছিলো স্নান |
| ৩৩ | বুকে ওই; বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে |

৩৫ হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে-চেয়ে হিম হ'য়ে গেছে তার স্তন।
৩৬ আকাশপ্রদীপ তুলে তখন কাহারা যেন কার্তিকের মাস
৪০ মউরির মৃদু গন্ধে ভ'রে রবে;– কুমারীর স্তন
প্রথম জননী হ'য়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
নক্ষত্রের নীল ফুলে ফুটে রবে;– বাংলার নক্ষত্র কি নয় ?
৪২ পরিয়াছো... তারপর ঘুমায়েছো : কল্কাপাড় আঁচলটি ঝরে
আর রাত্রি মায়ের মতন তার ছড়ায়ে রয়েছে তার ডানা।...
আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোয় কাঁটায়
রূপসী হাড়ের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন– পানের বাটায়।
৪৩ আকাশের নক্ষত্রের কথায়– শিশিরের শীত/ক্লান্ত সরলতা
৪৪ ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চ'লে গেছে নারীর মতন ভালোবেসে
বার-বার উড়ে যায়– তেমনি গোড়ন সাধে এই জল ঝরে
৪৫ অন্ধকারে; পথে-পথে গন্ধ পাই কাহাদের নরম শাড়ির
ধূসর কড়ির মতো হাতগুলো– ক্লান্ত হাত সন্ধ্যার বাতাসে
৪৬ কাটায়েছি; মাঠে-মাঠে আমপাতা– যেন পরী জিন
অস্পষ্ট, করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে নদীর ভিতর
এইসব দেখিয়াছি; দেখিয়াছি নদীটিরে– ঘুমাতেছে ঢালু অন্ধকারে
৪৮ ফড়িঙের ডনা দিয়ে ওড়ে আহা : চেয়ে দ্যাখে অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা
স্বপ্নি কি দ্যাখেনি রোম, এশিরিয়া, গৌড় বাংলা, দিল্লি, বেবিলন ?
৪৯ ডুবে থাক;... কতোকাল কেটে গেলো, তবু তার কুয়াশার পর্দা না সরে
৫১ ফুটাতাছে– ভোরের আকাশ মাঠ রাজহাঁস ভ'রে গেছে নব কোলাহলে
৫২ সোনালি রোদের রং দেখিয়াছি– মনের প্রথম কোন্ প্রেমের মতন
রূপ তার– এলোচুল ছড়ায়ে রেখেছে ঢেকে ম্লান রূপ– আনারস বন;
৫৩ ঘুরেছে সে সৌন্দর্যের নীল স্বপ্ন বুকে ক'রে– রূঢ় পৃথিবীতে গিয়ে তারে
৫৪ সন্ধ্যার বকের মতো চ'লে এসো নরম শাড়ির মতো শান্ত পথ ধ'রে
৫৫ খেলা ক'রে গেছে তারা কতোদিন– ফড়িং কীটের দিন যতোদিন চলে
শুধালাম... উত্তর নাইকো কিছু উদাসীন অসীম আকাশে।
৫৬ রূপের বিচিত্র বাতি ধ'রে আছো– তাই প্রেম ধুলায় কাঁটায় যেইখানে
৫৯ আবার শালিখ,আহা, খড়গুনো কুড়ায় নিশ্চুপে
৬০ পৃথিবীর পথে আমি ফিরি যদি দেখিবো সবুজ বাতাস
৬১ মৃদু আরো মৃদু হ'য়ে অবিরল বাতাসে হারায়
৬২ পউষের শেষরাতে কতোদিন দেখি চেয়ে আবার সে আমাদের দেশে
নরম জামের মতো চুল তার– ঘুঘুর বুকের মতো নরম আঙুল
পউষের শেষরাতে দাঁড়কাকটির সাথে আসে সে যে ভেসে
পৃথিবীর নাই আর– দাঁড়কাক শুধু একা-একা সারারাত জাগে
দাঁড়কাক তবু হাঁকে : 'পাবে নাকো কোনোদিন– পাবে নাকো কোনোদিন–
৬৭ খড় মুখে নিয়ে এ শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে
পৃথিবীর সব শান্তি লেগে আছে ঘাসে
আকাশ ছড়ায়ে আছে রূপ হ'য়ে আকাশে-আকাশে
৭০ দেবতা ভক্তি না আমি
৭১ গভীর অসাধ অনিচ্ছায়

৭২ হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হ'লো সেইদিন– গিয়েছে সে শান্ত, হিম ঘরে
লক্ষ পাখা অন্ধকারে থরথর... অথবা হয়তো কেউ চালতার ঝরাপাতা জ্বালে
ঝরে নাকি ? ঝিঁঝির সবুজ রূপে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে বউদের প্রাণে–

**অগ্রন্থিত :**

নক্ষত্র কেমন ক'রে তুমি জেগে থাকো ওই আকাশের শীতে

| **কবিতাক্রম** | **বিকল্পপাঠ** |
|---|---|
| ২৪ | এইখানে,– যেদিন সকল পথ দেশের মাঠের পথে এসে শেষ হয়–। |
| ২৯ | যদিও নতুন দিন আসিয়াছে,– কাঁধে ক'রে আনিয়াছি নতুন লাঙল, |
| | তার ক্রীতদাস হ'য়ে শুধু আমাদের অন্তরের রক্ত আজো হ'য়ে যায় জল ! |
| ৩২ | তাহাদের মৃতদেহ ভ'রে গেছে তবু সেই সমুদ্রের ফুলে– ফেনাফুলে– ! |
| ৩৩ | সমুদ্রেরে:– তবুও সমুদ্র তবু আকাশ সিন্ধুর পিছনে জেগে ওঠে যতো ! |
| ৩৪ | যেখানে অনেক রৌদ্রে ভরিয়া গিয়েছে দ্বীপ,– যেখানে বিস্তৃত অন্তরীপে |
| ৩৫ | বিস্তৃত ফেনার জটা এলায়েছে চরে-চরে তাহাদের হৃদয়ের 'পর ! |
| ৩৬ | সেখানে গভীর ব্যথা গুমরিয়া ফিরে যায়,– তবুও পিপাসা জন্ম লয় |
| ৩৭ | সে-সব দেখেছে/বুঝেছে তারা,– নরকের রাত্রে এসে;– উপরের পৃথিবীর পানে |
| ৩৯ | তখন দিনের আলো শাদা হরিণের মতো গহ্বরের আঁধারের ধারে– |
| | পৃথিবীর দিকে-দিকে সিন্ধুর মতন |
| | যাহারা বুঝেছে সব;– এখানের বেদনা আহ্লাদ |
| | যাহারা তাদের আয়ু ফুরায়েছে ধীরে |
| | স্বচ্ছন্দ ঘুমের মতো মৃত্যু এসে তার |
| ৪০ (সমুদ্র) | পুরনো জলের |
| | যেখানে সিন্ধুর গন্ধ, যেখানে ঢেউয়ের শিহরণ |
| | অনেক অতীত ভিজে পাহাড়ের-পাইনের বনে; |
| | পবিত্র শীতল ঢেউ– পুরোহিত-ছেলেদের মতো |
| | তাহাদের ডাকে নাকো;– নীড়ের মতন এক স্থান |
| | সকল শৈলের শেষে সমুদ্রের পারে জেগে রয় |
| | সন্ধ্যার আঁধারে সেই পর্বতের নীহারের তরে |
| | পৃতিবীর আয়োজনে বেড়ে উঠে,– কোলাহল/আলোড়ন ক'রে |
| | প্রথম বনের গন্ধে ভরা এক জলের জগতে |
| | অন্য এক সাগরের আলো-অন্ধকারে গিয়ে মেশে; |
| | সিন্ধু-সমুদ্রের পিছে পাখা মেলে চলে অবিরত |
| | তারপর– তাহাদের– মাঝপথে– পিছে ফেলে রেখে |
| | কোথায় মেঘের মতো শাদা হ'য়ে যায় একে-একে ! |
| | পিছের আস্বাদ/আহ্বান নিয়ে প'ড়ে থাকে পৃথিবীর স্থল, |
| | পরিচ্ছন্ন শিশিরের শব্দ ল'য়ে সমুদ্রের 'পরে; |
| | পাইনের গাছে ঘেরা ভিজে এক পাহাড়ের প্রেমে |
| | বেঁচেছে সবুজ শাখা– সেইখানে ফলেছে নিভৃতে |

# প্রথম ছত্রানুসারে কবিতার সূচিপত্র


অজস্র বুনোহাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নায় ৪৫৪
অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ ৫৭২
অদ্ভুত সিন্ধুর ঘ্রাণ বুকে ল'য়ে নামিয়া গিয়েছে তারা আশ্চর্য সাগরে, ৪৪৪
অনন্ত জীবন যদি পাই আমি— তাহলে অনন্তকাল একা ৩৩৮
অনেক-অনেক দিনের পরে আজ ৬৬০
অনেক অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছো তুমি এই পৃথিবীর পারে ৪৩৫
অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন ৪৬৫
অনেক নদীর জল উবে গেছে— ৩৫৩
অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে ৩৬২
অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে তোমার ৬২৫
অনেক বছর কেটে গেছে, ৫৩৫
অনেক বছর পরে এখন আবার দ্যাখা;— ভালো ৬৫৫
অনেক বছর হ'লো সে কোথায় পৃথিবীর মনে মিশে আছে। ৫২১
অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয় ৬৬৪
অনেক রক্তে উত্তেজিত হয়েছে সারাদিন ৬২৩
অনেক রাত হয়েছে— অনেক গভীর রাত হয়েছে; ২২২
অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীতে ৩৮৬
অনেক রাত্রিদিন ক্ষয় ক'রে ফেলে ৫৬৪
অনেক শতাব্দী ঝ'রে চ'লে গেছে,— তবু সেই পৃথিবীর পুরানো সে-পথ ৪৪১
অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোনো এক বলয়িত পথে ৪৭৪
অনেক সংকল্প আশা নিভে মুছে গেলো; ৫৩০
অন্তরে চাই না তাপ,— হৃদয়ে তারার মতো স্থির ৪৩১
অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিলো তারা ২৭০
অন্ধকারে খ্যাকশিয়ালিরা এসে খেয়েছে হৃদয় ৭০৭
অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে ৫০২
অন্ধ সাগরের বেগে উৎসারিত রাত্রির মতন ৫২৭
অন্ধকারে থেকে-থেকে হাওয়ার আঘাত মাঠের উপর দিয়ে ৫৩১
অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে ৩১৯
অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী; ৩২৯
অসংখ্য সবুজ শিমে শিমলতা পাতা ভ'রে আছে; ৫৮৮

আঁধার থেকে উঠে এসে অন্ধকারে ফুরিয়ে যাবার আগে ৭১৫
আঁধারের শিশির ঝরে ৪০৯
আঁধারের হিমের রাতে আকাশের তলে ৩৭৭
আকাশ দিয়ে উড়ে গেলো শাদা হাঁসের ভিড়। ৫২৩
আকাশ ভ'রে যেন নিখিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা ৫৫২
আকাশে চাঁদের আলো— উঠানে চাঁদের আলো— নীলাভ চাঁদের আলো— এমন ৩৪১
আকাশে জ্যোৎস্না— বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ ২১৩
আকাশে সমস্ত দিন আলো ৫৪৮

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে ৩১১
আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে মুছে ফেলে তুমি ৪৩২
আকাশের মেঘ থেকে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে ভিজে ৬৬৭
আকাশের থেকে আলো নিভে যায় ব'লে মনে হয়। ৩৭০
আগার তাহার বিভীষিকাভরা,– ১০৩
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল ২১৮
আজ এই পৃথিবীতে অনেকেই কথা ভাবে ৪৮০
আজ তারা কই সব ? ওখানে হিজল গাছ ছিলো এক– পুকুরের জলে ৩৩৬
আজ বিকেলের ধূসর আলোয় ৫০০
আজ রাতে মনে হয় ৪৬১
আজ রাতে শেষ হ'য়ে গেলো শীত– ৫৯৩
আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো ৫০২
আজকে অনেকদিন পরে আমি বিকেলবেলায় ৫৫৩
আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল ৫৬১
আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা ৩৯২
আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তবে ঘরে ৪৫৬
আবার আকাশে অন্ধকারে ঘন হ'য়ে উঠছে : ১৯০
আবার আসিবো ফিরে ধানসিড়িটির তীরে– এই বাংলায় ৩১৫
আবার দেখেছি স্বপ্ন কাল রাতে,– নক্ষত্রের আলোয় ৪৩৪
আবার বছর কুড়ি পরে তাহার সাথে দ্যাখা হয় যদি ! ১৮৫
আমরণ কেবলি বিপন্ন হ'য়ে চ'লে ২৭৬
আমাকে ১৯৮
আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো ৩৫১
'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন– কতোদিন আমিও' ১৯৬
আমাকে সে নিয়েছিলো ডেকে ৫৫৭
আমরা আশ্চর্য পথে যাবো নাকি আর ? ৪৮০
আমরা কিছু চেয়েছিলাম প্রিয় ৫২৪
আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো, ১৬৮
আমরা বিশেষ কিছু চাই না এবার ৪৮৩
আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর ৩৬৯
আমরা যাইনি ম'রে আজো– তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় ২৩৭
আমরা হতেছি বুড়ো– শাদা হ'তে নষ্ট হ'তে হয় ৭০৮
আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়, ১৭৭
আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে ৫০৩
আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে– ৫৯৪
আমাদের পরিজন নিজেদের চিনেছিলো না কি ? ২৬০
আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে ? ২২৩
আমাদের বুদ্ধি আজ অন্তহীন মরুচর, তাই ৬২৭
আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি স'রে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ ৩৩৩
আমাদের হাড়ে এক নিধূর্ম আনন্দ আছে জেনে ২৪৩
আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে ২২৯

আমার আকাশ কালো হ'তে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে; ৩৮৩
আমার এ ছোটো মেয়ে– সব শেষ মেয়ে এই ৫৯৮
আমার এ-গান ১২৬
আমার এ-জীবনের ভোরবেলা থেকে– ২৫৬
আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই ৫৮৯
আমার মনের ভিতরে ছায়া আলো এসে পড়ে ৬৬৩
আমার লেগেছে ভালো তবু ওই সমুদ্রের শ্বাস ৪৪৮
আমার হাতের কাজ অন্ধকারে ফুরোলো যখন,– ৭০৫
আমার হাতের কাজ আজ রাত্রে গিয়েছে ফুরায়ে ৪১৫
আমি এই অম্লানেরে ভালোবাসি– বিকেলের এই রং– রঙের শূন্যতা ৫৯২
আমি এই পৃথিবীর হেলিওট্রোপের মতো নীল সমুদ্রকে ৭১১
আমি ওই সমুদ্রের যুবনারীদের সাথে কোনো একদিন ৭১৫
আমি কবি,– সেই কবি,– ৭১
আমি যদি কোনোদিন চ'লে যাই এই আলো অন্ধকার ৪৩৩
আমি যদি হতাম বনহংস, ১৮৭
আমি সব ছেড়ে দিয়ে পুরানো গাছের মতো হ'য়ে ৭১০
আমি হাত প্রসারিত ক'রে দেই বায়ুর ভিতরে ৪৬৫
আলো আর আঁধারের পানে চেয়ে যদিও গাহিতে পারি ৪৪২
আলো-অন্ধকারে যাই– মাথার ভিতরে ১৪৩
আলোর চেয়েও তার সহোদরা আঁধারের পথে ৪৯১
আলো দূরে– আরো দূরে ৬৮৫
আলো যেন কমিতেছে– বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো ৫৮৯
আলোর মতন ব্যাপ্ত অন্তরাত্মা নিয়ে ৫১৮
আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে সমুদ্রের মতো ৬৬৬

ইতিহাসপথ বেয়ে অবশেষে এই ৫২৬

উত্তীর্ণ হয়েছে পাখি নদী সূর্যে অন্ধ আবেগের ৫৪১

এ-অন্ধকার জলের মতো : এই পৃথিবীর সকল কিনার ৫২৯
এ-আলো নিভে যাবে ৫৭৭
এই কি সিন্ধুর হাওয়া ? রোদ আলো বনানীর বুকে ৫০৯
এই ঘর অবিকল পারম্পর্য বুঝে লয় তবু ৪৬৭
এই জল ভালো লাগে– বৃষ্টির রুপালি জল কতোদিন এসে ৩৩০
এই জীবনের ছকে-কাটা খেলার ঘরে এসে ৬১৬
এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে ৩২২
এইপথ দিয়ে কে চ'লে যেতো জানি ৫১৪
এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি– আমি হৃষ্ট কবি ৩৩৪
এই পৃথিবীর এ এক শতচ্ছিদ্র নগরী ৩০০
এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে– সবচেয়ে সুন্দর করুণ ৩২১
এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে ৫৪৩
এইখানে অন্ধকার রচনা করেছে তার সপ্রতিভ মুখে ৪৭৭

এইখানে অন্ধকার সমুদ্রের জলে ৪৯৩
এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে ৫৯৫
এইখানে মাইল-মাইল ঘাস ও শালিখ রৌদ্র ছাড়া কিছু ৩৬৬
এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে ৩৫৮
এইখানে সূর্যের ততোদূর উজ্জ্বলতা নেই ৬৩৩
এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,– জানি না সে ২৪০
এইবার চিন্তা স্থির করবার অবসর এসেছে জীবনে ৬২৯
এইবার ছুটি পেয়ে ৭০৬
(এইসব ভালো লাগে) : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে ৩৩৯
এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ২১৮
এ কি আলো ! এ কি আঁধার ৬৮৪
এ-পৃথিবী বড়ো, তবু তার চেয়ে ঢের বেশি এই ৫৮৩
এ-যুগের, আমাদের এ-যুগের ৬০৫
এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা ৩২৭
এ-হৃদয় শুধু এক সুর জানে, সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ৪৩৬
এক অন্ধকার থেকে এসে ৫৩৯
এক অন্ধকার থেকে এসে ৫৭১
একজন সামান্য মানুষকে দ্যাখা যেতো রোজ ৩৬১
একটা মোটরকার ৬৩৭
একটি খড়ের ঘর যেন এই মাটির সন্তান ৬০২
একটি নক্ষত্র আসে; তারপর একা পায়ে চলে ৫৫১
একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে ৪৮২
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায় ২৮৩
একটি বিপ্লবী তার সোনা-রুপো ভালোবেসেছিলো ২৮৫
একদিন অবশেষে ভোরবেলা চায়ের টেবিলে ৫৮৮
একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার ৩৩৫
একদিন এ-পৃথিবীজ্ঞানে আকাঙ্ক্ষায় বুঝি স্পষ্ট... ৫৫৮
একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি ৩৪৮
একদিন কোনো এক আঞ্জিরগাছের ডালে সকালের... ৬০৮
একদিন খুঁজেছিনু যারে ৮৬
একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি; আমার শরীর ৩৩১
একদিন ভাবিনি কি আকাশের অনুরাধা নক্ষত্রেরা বোন ৪৫৭
একদিন মনে হ'তো জলের মতন তুমি ২৮৪
একদিন যদি আমি কোনো দূর বিদেশের সমুদ্রের জলে, ৩২৮
একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে ৩১০
একদিন, মনে আছে যে এক বিস্তৃত রাতে জেগে ৪৩৭
একদিন মনে হয়েছিলো সব যুবক ও তরুণীকে ৭১৩
একদিন ম্লান হেসে আমি ১৯৩
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে– একবার বেদনার পানে ২২৩
একবার নক্ষত্রের দিকে চাই– একবার প্রান্তরের দিকে ২০৯
একবার (ভালো নীল) ভাঙা ভুল পৃথিবীর হাত... ৬৪৬

একবার যখন দেহ থেকে বার হ'য়ে যাবো ১৯৫
এতোদিন ডাকি নাই,– তবু আজ– আজ তুমি চ'লে... ৬৬৬
এবার তৃতীয়বার চ'লে যাবো বিদেশভ্রমণে ৪৮৭
এলো– বৃষ্টি বুঝি এলো– ৫৭৬
এসো– (এসো– এসো) আমার কাছে তোমার আসা ৬২৪
এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছো ৬০৯
এখন আকাশে রাত ৬৫৮
এখন এ-পৃথিবীতে ভালো আলো নেই– ৬৫১
'এখন এ-পৃথিবীর গোধূলিসময় আর আমাদের হৃদয়ের যেন বেলাশেষ–' ৫৪৪
এখন ওরা ভোরের বেলা সবুজ ঘাসের মাঠে ৬১৯
এখন কিছু নেই– এখানে কিছু নেই আর, ৩৮৩
এখন চৈত্রের দিন নিভে আসে– আরো নিভে আসে ৩০৩
এখন সে কতো রাত; ২৬৬
এখন রজনীগন্ধ্যা– প্রথম– নতুন ৬১১
এখন রাতের শেষে আবার প্রান্তর আছে শ্যাম হ'য়ে... ৬২৩
এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে ২৮৭
এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরির ২৪৬
এখানে অর্জুন ঝাউয়ে যদিও সন্ধ্যায় চিল ফিরে... ৫৫৮
এখানে আকাশ নীল– নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল ৩২৩
এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের মনে ৩২৪
'এখানে জলের পাশে বসবে কি ?' জলঝিরি এ-নদীর নাম; ৫৪৬
এখানে দিনের– জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই ৬৬১
এখানে নক্ষত্রে ভ'রে রয়েছে আকাশ ৬৩৭
এখানে পৃথিবী আর নেই ৭০২
এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু-উঁচু গাছ ১৯৭
এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়– সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে ৩২৮
এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি ১৫১
এখানে মরণশীল হংস নেই আর ৭০২
এখানে নিবিড় ঘাসে শুয়ে আছি– পাশে নদী ৫৮৭
এমন সময় এক মানুষকে হাতে পাওয়া গেলো ৭১২

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে ৪০১
ওইখানে কিছু আগে– বিরাট প্রাসাদে– এক কোণে ৪৭২
ওইখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক ৪৭৮
ওইখানে সারাদিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে ৫৭৫
ওগো জলধর তোমারি মতো সে কাম্য অলকপুরী ৪০৮
ওগো দরদিয়া ১১৭
ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁশ হাওয়া... ৮২

কখন সোনার রোদ নিভে গেছে– অবিরল সুপুরির সারি ৩২১
কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভ'রে ৬৬৫
কখনো নক্ষত্রহীন কুয়াশার রাতে ৫৫৫

কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে ৩৭১
কখনো মুহূর্ত আসে সূর্য আর শিশিরের জলে ৬৩০
কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় ১৮৮
কতো বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার ৬০৩
কতো ভোরে– দুপহরে– সন্ধ্যায় দেখি নীল সুপুরির বন ৩২২
কতোদিন ঘাসে আর মাঠে ৩৩৯
কতোদিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর ৩২৭
কতোদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে ৩২৬
কতোদিন হ'য়ে গেলো– ৫৪০
কবিকে দেখে এলাম, ৫৭৯
কবিযশ চাহি না মা, তোমার দুয়ারে ৪০৬
কবে তব হৃদয়ের নদী ৮০
কবের সে বেবিলন থেকে আজ শতাব্দীর পরমায়ু শেষ ৫১২
কবের সে-রাত্রি আজ মনে পড়ে প্রিয় ৬৩১
কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি ৫০৫
কার্তিকের ভোরবেলা কবে ৫৬১
কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হ'য়ে ২৩৯
কারা অশ্বারোহী কবে উষাকালে এসে ৪১০
কারা কবে কথা বলেছিলো ৫৭৮
কান্তারের পথ ছেয়ে সন্ধ্যার আঁধারে ১৮৯
কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ ৫৬০
কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা ২০৫
কি যেন কখন আমি অন্ধকারে মৃত্যুর কবর থেকে... ৫৯৬
কুজ্‌ঝটিকায় আকাশ মলিন হ'য়ে থাকে কি যে ! ৫৬৮
কুহেলীর হিমশয্যা অপসারি ধীরে ১০৪
কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিলো বাতি ৫৪৬
কে কবিতা লেখে ৬৬২
কে পাখি সূর্য থেকে সূর্যের ভিতরে ২৭২
কে শরীর ? কে-বা ছায়া ? সমান্তরাল সব ছায়ার ভিতরে ৭১৬
কেউ যাহা জানে নাই– কোনো এক বাণী ১২৮
কেন ব্যথা পাবে তুমি ? কোনোদিন বেদনা কি... ৬০১
কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর ? ৫৭৩
কেবলি স্বপ্নের ক্ষয় হয় ৫৩৩
কেবলি আরেক পথ খোঁজো তুমি; আমি আজ... ৫৬৭
কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী– ৩৬৫
কেমন এক পরিচ্ছন্ন গভীর বাতাস ভেসে আসে ৬৪৮
কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারাদিন সমুদ্র-পাখির ৪৯১
কেমন বৃষ্টি ঝরে– মধুর বৃষ্টি ঝরে– ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে– রোদে যে বৃষ্টি ঝরে আজ ৩৪২
কোথাও চলিয়া যাবো একদিন– তারপর রাত্রির আকাশ ৩১৭
কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশরেখায়– তবে... ২৪৪
কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস– প্রান্তরের পারে ৩১১

কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে— ২৪৮
কোথাও নতুন দিন র'য়ে গেছে না কি ২৬৩
কোথাও পাখির শব্দ শুনি; ২৬৫
কোথাও পাবে না শান্তি— যাবে তুমি এক দেশ... ৩৯০
কোথায় পেয়েছো তুমি হৃদয়ের স্থির আলো পৃথিবীর কবি ৪৩৫
কোথাও বাইরে গিয়ে চেয়ে দেখি দু-চারটে পাখি ৫১৪
কোথাও মাঠের কাছে— যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হ'য়ে আছে ৩২৩
কোথাও রয়েছে মৃত্যু— কোনো-এক দূর পারাবারে ৪২০
কোথায় গিয়েছে আজ সেইসব পাখি ৬৫২
কোথায় সে যে রয়েছিলাম ৬৪২
কোথায় সে যে রয়েছিলাম;— ৫৩৪
কোথায় সূর্যের যেন নব-নব জন্ম ঘিরে ৪৬৪
কোনো এক অন্ধকারে আমি ১৭২
কোনো এক প্রেমিকের তরে ৪১৬
কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময় ২৬১
কোনো হ্রদে ২৬২
কোনোদিন দেখিবো না তারে আমি : হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে ৩৩৭
কোনোদিন নগরীর শীতে প্রথম কুয়াশায় ৩৬৭
ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ— চিরকাল; ২৪৯

খানিকটা দূরে লাইন— রেলের কঠিন লাইন সব ৬৪১
খুঁজে তারে মরো মিছে— পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে নাকো আর ৩২০

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল-চ্ছল শব্দে... ১৯৪
গভীর শীতের রাত এইসব, তবু ৪৯০
গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল— অসংখ্য নক্ষত্রের রাত ১৮৬
'গফুর'— নীরবে তাহাকে আমি ডাকিলাম, তবু— ৭১৪
গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে ৪৭৯
গল্পে আমি পড়িয়াছি কাঞ্চী কাশী বিদিশার কথা ৩৪৫
গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে ১৩৩
গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ-পৃথিবীর আজকের... ৩৮১
গুবরে ফড়িং শুধু উড়ে যায় আজ এই সন্ধ্যার বাতাসে ৩৩৮
গুলি খেয়ে শূন্যে মৃত্যু হবার আগে পাখি ৫৭৮
গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম; ৩৯১
গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায় ৩১৮

ঘরের ভিতরে দ্বীপ জ্ব'লে ওঠে— ধীরে-ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয় সন্ধ্যায় ৩৩৮
ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে ৫৭২
ঘাটশীলা— ঘাটশীলা ৩৪৭
ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর ৩৩০
ঘাসের ভিতরে যেই চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে— আমি ভালোবাসি ৩৩৭
ঘুমাও; কারণ, ঘুমের মাঝে মৃত্যুর মতন শান্তি আছে ৭০৪

ঘুমায়ে পড়িতে হবে একদিন আকাশের নক্ষত্রের তলে ৪৩০
ঘুমায়ে পড়িবো আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে ৩১৪
ঘুমায়ে পড়িবো আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে ৩১৪
ঘুমিয়ে রয়েছো তুমি ক্লান্ত হ'য়ে, তাই ৫৯১
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে,– ১৭৫
ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো ৫০৩

চলছি উধাও, বল্গাহারা,– ঝড়ের বেগে ছুটি ৮৩
চ'লে যাবো শুকনো পাতা ছাওয়া ঘাসে– জামরুল হিজলের বনে ৩২৪
চারদিকে ধু-ধু রাতি– সৃজনের অন্ধকাররাশি ৪০২
চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি; ৩৫৪
চারদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে ৩৫৭
চারদিকেতে হলদে কালো শাদার পৃথিবীর ৫৪৭
চারিদিকে কঠিন পটভূমি ৫৫১
চারিদিকে আছে ব্যস্ত নদীদের ক্ষণ ৫৪৮
চারিদিকে নীল হ'য়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে দেখে ৫৩৭
চারিদিকে পৃথিবীর উৎসে জল ঝরে ৫৮১
চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর, ১৫৩
চারিদিকে ভাঙনের বড়ো শব্দ ৪৯০
চারিদিকে শান্ত বাতি– ভিজে গন্ধ– মৃদু কলরব ৩৪৪
চিরদিন শহরেই থাকি ৩৪৫
চুলিচালা সব ফেলেছে সে ভেঙে,... ৭৯
চোখ দুটো ঘুমে ভরে ১১৮
চোখের জলের মতো যেখানে সমুদ্র ডাকে অন্ধকার... ৪৪৫

ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নিচে; ৫৬২

জয়,– তরুণের জয় ! ৯৮
জন্মেছিলো– চেয়েছিলো– ভালোবেসেছিলো ৫৩২
'জানি আমি তোমার দু-চোখ আজ আমাকে খোঁজে... ২০৪
জানি না কোথাও শুভ বন্দর রয়েছে কিনা : ৬২০
জানি না কোথায় তুমি– শরের ভিতরে সন্ধ্যা... ৫৭৬
জাগিয়াছে শুভ্র উষা– পুণ্য বেদবতী ৪০৫
জামিরের ঘন বন ওইখানে রচেছিলো কারা ? ২২৪
জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে– আর এই বাংলার ঘাস ৩১২
জীবন কাটায়ে দেয় যে-মানুষ সূক্ষ্মতর শিল্পচিন্তা নিয়ে ৬২৭
জীবন কি নিরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর ৪৬৪
জীবনে অনেক দূর সময় কাটিয়ে– তারপর তবু ৫৪৭
জীবনে কখনো প্রেম হয়েছিলো বুঝি ৫৫৭
জীবনের ঢের কাজ হ'য়ে গেলে পরে ৬২৫
জীর্ণ-শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে ৪৭০

টাইটানের মতো তারা;– টাইটান মায়ের মতো হে তুমি সাগর ৪৪৪
টাইটান-মায়ের মতো সিন্ধু তুমি– সমুদ্রের গর্ভ হ'তে অব্যর্থ সন্তান ৪৪৬

ডাকিয়া কহিলো মোরে রাজার দুলাল,– ৯৩
ডালপালা নড়ে বার-বার ৬১৯
ডুবলো সূর্য; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ ৩৭৩
ডুবারির ছেলেগুলো শঙ্খ ল'য়ে সমুদ্রের ধারে আজ করিতেছে খেলা ৪৪০
ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো তাহাদের সূর্যের প্রবল আলো,– বিস্তৃত আকাশে ৪৪৩

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হালভাঙা জাহাজের সাক্ষ্য রেখে ৬২৪
ঢের দিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবীভরা আলো ৫৬৬
ঢের যুগ নিষ্ফল হয়েছে ৫৩৭
ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব ২৫০

তখন অনেক দিন হ'য়ে গেছে– চ'লে গেছি পৃথিবীর... ৬০১
তবু তাহা ভুল জানি রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা ৩২৫
তবুও মনকে ঘিরে মহামানবিক আলোড়ন ৬৫৪
তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত ২৪২
তার সাথে আজ সাত-আট বছর পরে– অজ্ঞানে ৫৬৫
তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে ২২০
তারপর তুমি এলে ৬৪৩
তারা সব মৃত ৫১৬
তুমি আলো হ'তে আরো আলোকের পথে ৬০৮
তুমি এই রাতের বাতাস ৬৬৪
তুমি কেন বহুদূরে– চের দূরে– আরো দূরে– নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ ৩৩২
তুমি চ'লে আসো কাছে, চ'লে আসো নিভৃত-নিভৃত ৭০৯
তুমি তা জানো না কিছু, না-জানিলে,– ১২১
তুমি যদি চ'লে যাবে তবে ৬১৭
তুমিও মৃত্যুর মতো ওহে সিন্ধু ওই দূর উত্তর সেরুর ৪০২
তোমার আমার ভালোবাসার এই ৬১১
তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাবো... ৬০০
তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন। ২০২
তোমার চোখের নিচে আমি এক মাছের মতন ৭১০
তোমার শরীর,– ১৬৪
তোমার নিকট থেকে ২৭৫
তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিলো ৩৫৫
তোমার সাথে আমার ভালোবাসা ৬৮৪
তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও ৩০৯
তোমরা স্বপ্নের হাতে ধরা দাও– আকাশের রৌদ্র ধুলো ধোঁয়া থেকে স'রে ৩৩৫
তোমাকে দ্যাখার মতো চোখ নেই– তবু ২৭০
(তোমার সাথে আমার ভালোবাসা) ৫০৫
তোমারে ঘেরিয়া জাগে কতো স্বপ্ন– স্মৃতির শ্মশান ৪০৭

তোমাকে দেখেছি আমি ৬৮৬
তোমায় আমি দেখেছি দূরে ফিরে ৬১৩
তোমায় আমি দেখেছিলাম ৫৭১
তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে ৬০০৩
তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই ৬১৮

থমথমে রাত, আমার পাশে বসলো অচিন্ত্য ১১৪

দরদালানের ভিড় পৃথিবীর শেষে ২৩৯
দাও দাও সুখকে জাগিয়ে দাও ৫১১
দিগের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট বাস্তুতা ২৯৪
দু এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্দুর কোলে তুমি আর আমি ২১০
দুপুর রৌদ্রে ব'সে প্রাণে আত্মা ভাবিতেছে চের ৪৬২
দু দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ ৫৭২
দুপুররাতে ও কার আওয়াজ ! ৯১
দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাতাসির ঘর ৩২৯
দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ৪৮৩
দেয়ালচিত্রের দীপে পৃথিবীর কোনো এক আশ্চর্য ৪৭৪
দেশ সমুদ্রের ক্লান্তি রাতে আজ এ পৃথিবীর ৫০৪
দাখা হ'লো রক্ত রৌদ্র কোলাহল ৫৮৬

ধবল কঙ্কাল দেখা দিকে দিকে রয়েছে ছড়ায়ে ৪০১
ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন— খেতে মাঠে প'ড়ে ২০০
ধূম্র তপ্ত আঁধির কুয়াশা ভরবাতি দিয়ে চিরে ৭৫
ধানিপাখির আলোনদীর স্বপ্নে এসেছি ৫০৬

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ ১৯৯
নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে ৬৫৩
নক্ষত্র-আকাশ নদী পাহাড়ের বধির গরিমা ৪৯৬
নখ নদীদের লাশি ৭২
নগরের ভিড় আসে— সহসা বিস্মিত হ'য়ে আমি ৪৫৪
নরটি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে তোরে ২৪৭
নিঃশব্দ পাখার কাছে আছে প্রাণ ৪৮১
নিখিল আমার ভাই ১০২
নিছে হতাহত বৈশাখের ভিড় পেরিয়ে, ৩৮৪
নিজেকে নিয়ত ক্ষয় ক'রে ফেলে রোজি ৫৩৫
নিজের পাখায় হিমে কেঁপে উঠে— পাখির মতন ৭১৬
নিজেরে অনেক ভেবে ৭০৯
নির্জন হাঁসের ছবি দেখি স্বপ্নে— চারিদিকে অন্ধকার ঘর ৬১৫
নির্ধন বনানী নদী আকাশ ও নারীর শরীর ৬৫৪
নিরাশার খাতে অতোধিক লোক উৎসাহ ছাড়ায়ে... ২৩২

পটভূমির ভিতর দিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম ৬৮১

পথে পথে অজস্র কীর্তন, ২১২
পথের কিনারে দেখলাম একটা বিড়াল প'ড়ে আছে ৩৫২
পথের খেতের ধানে খই দিয়ে উঁচু ক'রে নকশার আলপনা ১৬৪
পাড়বে না তোমার এ লেখা এমে মানুষেরা ভোলেনিশ ২০৬
প'ড়ে গেলো একেবারে আমারি ছায়ার কাছে আমে ৫৮৫
পাতালিশ কাছে রেখে ধূসর নিশের কাছে আমি ২১৪
পাহাড়, আকাশ, জল, অনন্ত প্রান্তর ৫১৪
পাড়াগাঁর দুপহর আলোবাসি ছিল একা নদীটির পাশে ৩২৬
পাড়ায় আবারে সবচেয়ে সেই বুড়ুনি মেয়েটি কাঁদে ৪১২
পিতৃলোক, তোমরা কি তৃপ্ত হ'য়ে গেছো দূরে নিরবধিতে ৪৫৫
পুরোনো সময় সুর ছেড়ে ফেলে গেলো। ২৭৩
পৃথিবী এখন ক্রমে হয়েছে নিষ্ঠুর ২৬১
পৃথিবী প্রবীণ আলো হ'য়ে যায় নিরবধিতার নদীটির তীরে। ২৪১
পৃথিবী হয়েছে যার কোনখানে সমস্তের পাতিল নিচের ৩১৩
পৃথিবী মুর্তকে দূরে গেলে নিশ ৩৭৯
পৃথিবীতে এই অজস্রতা তবু আলো ৩০৩
পৃথিবীতে ছেড় নিশ বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু ২৫২
পৃথিবীতে ছেড় নিশ বেঁচে থেকে যখন হয়েছে পূর্ণ... ৪৫৭
পৃথিবীতে অতো ইতিহাসে অতো অন্ধ ৫০১
পৃথিবীর আলো অন্তরালে এই আমাদের জীবন ৬৮৩
পৃথিবীর উদাসের মাঠে মাঠে আমা খেলা করে ৩২৪
পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন দান ক'রে অনন্তের সময় আমার ৩৩১
পৃথিবীর বাধা— এই দেহের আড়ালে ১৭৯
পৃথিবীর যেই পারে থাকি আমি এই কথা আমার ৩৩৯
পৃথিবীর সাথে চ'লে ক্লান্ত হ'য়ে দুটি পাখে তবু অবসর ৩৩৫
পৌঁছায় ধূসর পাখা ছিঁড়ে আর পতঙ্গের পাখায় ১৮৯
প্রকৃতি থেকে অনন্ত জল জীবনটা এলো। ৫২৯
প্রথম মানুষ কবে ৪১৫
প্রান্তরের পারে তব জিজ্ঞাসার খেয়া ৮৭
প্রিয়ার পালেতে দুখ পেয়ে আর হাসিতে... ১১২

ফিরে এসো মনুষ্যত্বের আলো ২১১

বইটির শেষ তবু— খেলিবার আয়ু ৩৫৩
বলেন চাতক বীরেন তখন মেঘের ভিতরে... ৮২
বহুর মতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবন ৫৮৩
'বহু নিরেই দুটি মেয়ে আমার একটি কবিতা—' ৬৫৯
বসিলেন অবধ্য জীবে : 'যেমন নিজের আমে আমা— ২১৫
বড়ো-বড়ো গাছ থেকে পেঁচা ফেলেছে আমা ৬১৫
বহুদিন আমার এ-হৃদয়কে অবহেলা ক'রে হ'য়ে গেছে ৩৩৫
বাংলার অন্তরালে অন্ধকারের পাহাড়ে... ৯৭
বাংলার দুখ আমি বেসেছিলাম, আমি আমি পৃথিবীর তন ৩৩৯

বাতাবিলেবুর পাতা উড়ে যায় হাওয়ায়-- প্রান্তরে,-- ২৫৫
বাতাসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি– ঝরিতেছে ধীরে-ধীরে অপরাহ্ণ ভ'রে ৩৩৪
বাতাসের শব্দ এসে কিছুক্ষণ হরীতকী গাছের শাখায় ৪৮০
বার-বার সেইসব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত ৫৯৩
বাহিরের থেকে ফিরে এসো ৫৩২
বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড় ৩৫২
বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড় ৫১৯
বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভেছে আকাশ থেকে ৩৬৬
বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়... ২৫৮
বিস্মৃতি ধুলোর মতো জড়ো হয় যেইখানে ৬৪০
বুকে তব সুর-পরী বিরহ-মধুর ৯৫
বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা... ৫৯৬
বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই,– আমি বলি না তা। ৩৬৩
বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে ৬০০
বেবিলোন্ কোথা হারায়ে গিয়েছে,– ১১১
– বেলা ব'য়ে যায় ! ১০৭

ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি-সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আজ ৬৪৫
ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদে,– ক্লান্ত... ৮৯
ভিজে হ'য়ে আসে মেঘে এ-দুপুর– চিল একা নদীটির পাশে ৩১৯
ভেবেছিলাম এ-কথা স্থির মেনে নিতে পারি : ৫৫৯
ভোরের নদীর জলে হরিণ নামলো ৫৮২
ভোরের প্রথম রোদ প্রান্তরের দু-চারটে শালিখের মতো ৪৯৪
ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ ৪৭৬
ভোরের বেলায় তুমি-আমি– ৫০৬
ভোরের বেলার মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি, ৩৫২
ভোরের মানুষ এক প্রান্তরের পথে একা ঘুরে ৭১৪
ভোর ১৯১
ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় : ৫৮১
ভ্রমরীর মতো চুপে সৃজনের ছায়াধূপে ঘুরে... ৯৪

মকরসংক্রান্তি প্রাণে ৫০৭
'মমী'র দেহ বালুর তিমির জাদুর ঘরে লীন, ১০৬
মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা ৫০৮
মনে প'ড়ে গেলো এক রূপকথা ঢের আগেকার ১৩৮
মনে পড়ে সেই কলকাতা– সেই তেরোশো তিরাশি– ৭১৯
মনে হলো– হয়তো যেতেছি আমি ম'রে,– ৭০৫
মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিবো না আর ৩১৬
মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো। ২৯০
মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে ৩০৩
মনে হয় সমাবৃত হ'য়ে আছি কোন্ এক অন্ধকার ঘরে– ২৪৩
মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেলো নদীটির পারে ৪৭৭

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে— পুণ্য ভারতপুরে ১০০
মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে— ৫৭৭
মাছরাঙা চ'লে গেছে— আজ নয়, কবেকার কথা ৫৭০
মাঝে-মাঝে অন্য সব সত্য থেকে ছুটি ৬১৮
মাঝে-মাঝে মনে হয় ৬২৬
মাঝে-মাঝে মনে হয় এ-জীবন হংসীর মতন— ২২৭
মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে— সমস্ত দুপুর ভ'রে... ১৭৭
মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র ওই : ৩৫১
মাথার উপর দিয়ে কার্তিকের মেঘ ভেসে যায় : ৫৭০
মাথার উপর দিয়ে ভেসে যায় চিল— ৫৫৬
মানুষ অনেক দূরে চ'লে যায়— চ'লে যেতে চায় ৫৩৬
মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিলো ৫৬০
মানুষ সার্থক হয় মাঝে-মাঝে, তবু ৫৫০
মানুষের কবেকার অপলক সরলতা ৬৫৩
মানুষের ঘনবসতির ঢেউ নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে ৪৮২
মানুষের জীবনের ঢের পথ শেষ— ৫৪২
মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে— হাসির আবাস ৩৩২
মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায় ২৯৮
মানুষের মনে দীপ্তি আছে ৫৫৫
মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী— ১০৩
মালয়-সমুদ্রপারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের : ২৩৮
মিছেমিছি কেন ওই শিকারির সাথে ৬৭১
মৃগতৃষ্ণার পিছে ধাবমান হওয়া নয় আর: ৫৬৭
মৃত ? ৬১০
মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে ৫৪৫
মৃত্যু আর সূর্যকরোজ্জ্বল এই পৃথিবীর বুকের ভিতরে ৫২৬
মৃত্যু সাগর সরিয়ে শূন্যে বেঁচে আছি ৫৫৪
মৃত্যুরে বেসেছি ভালো সকলের আগে আমি... ৪৩৮
মেঘের কিনারে শুয়ে একবার নক্ষত্রের রাতে ৪৫৯
মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে ১২৩
মোর আঁখিজল ৪০৩

যখন অনেক স্বপ্ন দ্যাখা শেষ হয়েছে আমার ৭০৭
যখন খেতের ধান ঝ'রে গেছে— খেতে-খেতে প'ড়ে... ৮০২
যখন চলিয়া গেছি ওপারের দেশে,— ৭২১
যখন দিনের আলো নিতে আসে আমি ক্লান্ত— তবুও... ৬৪৭
যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রবো— অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে ৩১৫
যতোদিন আলো আছে আমাদের জাগিবার শেষ অবসর ৪৩০
যতোদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে ৩৮৫
যতোদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে ৩১০
যা পেয়েছি সে-সবের চেয়ে আরো স্থির দিন ৫৭৪

যারা এই জীবনের স্বাদ ৭০৩
যাহাদের পায়ে-পায়ে চ'লে-চ'লে জাগিয়াছে... ৪১৪
যদি আমি গেয়ে থাকি বাংলার পরিষ্কার আকাশের... ৪৪০
যদি আমি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায় ৩১৬
যদিও আজ তোমার চোখে আমি ছাড়া অন্যরা বিখ্যাত ৬৫৬
যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিলো একদিন ২৫৪
যদিও দিন কেবলি নতুন গল্পবিশ্রুতির ৩৮৯
যদিও প্রেমের মৃত্যু হ'য়ে গেছে এ-জীবনে ৭০৩
যুগসন্ধিতে ভারত যখন সহসা তিমিরময়– ৪০৬
যুবা অশ্বারোহী ৪১১
যে-কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর... ১১৩
যেখানে মনীষী তার মোম নিয়ে ব'সে আছে রাত্রির... ৬২৪
যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর, ২১৩
যেই ঘুম ভাঙে নাকো কোনোদিন ঘুমাতে-ঘুমাতে ৪১৭
যেইসব শেয়ালেরা– জন্ম-জন্ম শিকারের তরে ২৪০
যেন তা কল্যাণ সত্য চায়, তবু অবাধ হিংসার ৬৫৬
যে-শালিখ ম'রে যায় কুয়াশায়– সে তো আর ফিরে নাহি আসে ৩১৭
যেদিন ফুরাবো আমি পৃথিবীতে– ঘুম থেকে জেগে... ৪৩৯
যেদিন সরিয়া যাবো তোমাদের কাছ থেকে– দূর কুয়াশায় ৩১৩
যৌবনের সুরাপাত্র গরল-মদির ৭৩

রক্তনদীর তীরে কালো পৃথিবীর ৫৭৩
রশ্মি এসে পড়ে– ভোর হয়, ৫৪০
রাত আরো বাড়িতেছে– এক সারি রাজহাঁস... ৫৯৪
রাতের আঁধার বাড়লে পথে-প্রান্তরে কি ঘরে ৬৪৭
রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে ৫০০
রাতের কিনারে ব'সে নয় ৬২২
রাতের বাতাস আসে ৬০৪
রাইসর্ষের খেত সকালে উজ্জ্বল হ'লো– দুপুরে... ৫৯৯
রৌদ্র ঝিলমিল, ৭১

শতাব্দীর এই ধূসর পথে এরা ওরা যে যার প্রতিহারী ৪৯৭
শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায় ২৮৯
শহর-বাজার ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি পড়ে ৬৪৯
শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলের কোলাহলে ৭০৬
শিল্পের উন্মার্গ নিয়ে বেঁচে ছিলো যারা পৃথিবীতে ৬২৭
শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকালের মেঘে, ২০০
শীতের কুয়াশামাঠে, অন্ধকারে এইখানে আমি ৫০৯
শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে ৩৬৮
শীতের রাতের এই সীমাহীন নিস্পন্দ গহ্বরে ৫১৩
শীতের সকালবেলা ৬৬৭
শীতরাত আসিতেছে নেমে ৭১০

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা... ১৪৬
শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে,– এক আলো,– ৪৪১
শূন্য রূঢ় অসুন্দর কতোবার ঘুরেফিরে দেখিতেছি... ৬১৫
শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে ২১৫
শোনো–শোনো– নীলকণ্ঠ পাখিরা ৬৮৫
শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছো–– বহুকাল গেয়ে গেছো গান ৩২৫
শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন; ১৯৬
শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে ২১২

সকাল-সন্ধ্যাবেলা আমি সেই নারীকে দেখেছি ৪৯৬
সবার উপর তোমার আকাশপ্রতিম মুখে রয়েছে ৫৮৭
সবারি হাতের কাজ শেষ ক'রে নিতে হবে পৃথিবীতে... ৬১২
সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি ২০২
সবুজ মাটির পথে ব'সে আমি দেখিতে চেয়েছি জল... ৪৪২
সর্বদাই অন্ধকারে মৃত্যু এ চিন্তার মতন ৫১২
সর্বদাই এরকম নয়, তবু ৪৯৫
সফল উজ্জ্বল ভোর পৃথিবীতে আসে ৫১৮
সময় অনেক চিহ্ন লক্ষ্য ভেঙে ফেলে ৫৬৪
সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে, ৫৭৫
সময়ের উপকণ্ঠে রাত্রি প্রায় হ'য়ে এলো আজ ৫১৫
সময়ের কাছ থেকে যদি কিছু নিতে চায় বিহ্বল মানুষ ৬৬৬
সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয় ২৬৮
সময়ের পথে-পথে ঘুরে-ফেরে সারাদিন ৪৫১
সময়ের সুতো কেটে নিয়ে গেছে ঢের দিন ৪৭০
সমস্তদিন ৫২৩
সমস্ত দিন অন্ধকারে রৌদ্র ঢেলে ওই ৫৩৭
সমস্ত শরীর তার জড়ানো রয়েছে ফিট যুদ্ধের শোভায় ৪৬৩
সমুদ্রের জলে আমি দেহ ধুয়ে চেয়ে থাকি নক্ষত্রের... ৩৩৩
সমুদ্রের পারে এই নক্ষত্রের তলে যদি আজ আমি... ৪৩৮
সমুদ্রের প্রতিধ্বনিময় এক ৪৬০
সমুদ্রচিলের সাথে আজ এই রৌদ্রের প্রভাতে ৪৫১
সন্ধ্যা হয়– চারিদিকে মৃদু নীরবতা; ৩৪৪
সন্ধ্যা হ'য়ে আসে– সন্ধ্যা হ'য়ে আসে– ৩৪৩
সন্ধ্যার প্রথম তারা চিনিয়াছে তারে,– ৪৪৬
সরাইখানার গোলমাল আসে কানে ৭৬
সহসা ঝড়ের দিনে লুণ্ঠনের উর্ধ্বে উঠে চিল ৪৭৫
সান্টাক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্ণে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে ২৫৯
সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম, আলো ৫০১
সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলি... ১৯৩
সারাদিন পাখিগুলো কোন্ আকাশ থেকে কোন্... ৬৩৯
সারাদিন মিছে কেটে গেলো; ৩০৫

সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর দিন আর রাত্রি শুধু... ৪৩৮
সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ ২০৩
সুদর্শনা মিশে যায় অন্ধকার রাতে ৬১২
সুদীর্ঘকাল তারার আলো মোমের বাতির দিকে ৬৩১
সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো; ২০১
সুরঞ্জনা, ওইখানে যেও নাকো তুমি, ২৩৭
সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি– ২৯৩
সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে। ২৮৭
সূর্য কখন পশ্চিমে ঢলে মশালের মতো ভেঙে ৫১৯
সূর্য এলে মনে আসে পৃথিবীর এক-কোটি প্রান্তরের কথা ৬১৭
সূর্যের আকাশের মতো মানুষেরা অনুভাবনায় স্থির ৫৩০
সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার : ২২৩
সূর্যের উদয় সহসা সমস্ত নদী ৪৫৭
সূর্যগরিমার নিচে মানুষের উচ্ছ্রিত জীবন ৪৮৯
সে এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে ৪৯৮
সে এক বালক আছে কুড়ায় ঝিনুক-নুড়ি একাকী... ৪৪১
সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিলো ৪৮৯
সে কতো পুরোনো কথা– যেন এই জীবনের ঢের... ৫৯৫
সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি– ৩৪৮
সেই দূর পাতালের সাগরের সুরে এই পৃথিবীর... ৪৪৫
সেই ফুল মেখে দেবো আমি তার চুলে ৭০৮
সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হ'লো না ৪০৪
সেই শৈশবের থেকে এ-সব আকাশ মাঠ রৌদ্র... ৩৭৪
সেখানে জন্মেছে ব্যথা,– বুঝেছো তা– সেইখানে ৪৪৩
সেখানে রয়েছে আলো পাহাড় জলের সমবায় ৪৯২
সে-জাহাজ দেখেছে কি কেউ ? ৬৮৬
সেদিন এ-ধরণীর ১১৫
স্ট্রেচারের 'পরে শুয়ে কুয়াশা ঘিরিছে বুঝি তোমার... ৪৫৫
সোনার খাঁচার বুকে রহিবো না আমি আর শুকের মতন; ৩২৬
সোনালি অগ্নির মতো আকাশ জ্বলছে স্থির নীল... ৪৯২
সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি... ৩৯১
স্থির হ'য়ে আছে মন, মনে হয় তবু– ৭০২
স্বপ্নের ভিতরে বুঝি– ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে ১৯২
স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে ব'লে যায় : স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো; ১৯৮
স্বাতীতারা, কবে তোমায় দেখেছিলাম ৫২২
স্মৃতিই মৃত্যুর মতো,– ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি গম্ভীর... ৪৫৯

হঠাৎ তোমার সাথে কলকাতাতে সে এক সন্ধ্যায় ৬৪২
হলুদ কমলা ধূসর, মেঘের ফাঁক দিয়ে ৫২০
হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ২৪৫
হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, ১৮৫

হাজার বছর শুধু ..লা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো; ২০১
হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে ৪৫৮
হাড়ের মালা গলায় গেঁথে– অট্টহাসি হেসে ১০৯
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে ১৮৯
হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি– প্রান্তরের পরে ৩১২
হিজল-ঝাউয়ের ডাল জ্বলছে সূর্যের আলোড়নে ৫৬০
হৃদয়, অনেক বড়ো-বড়ো শহর দেখেছো তুমি; ২১৩
হৃদয় তুমি সেই নারীকে ভালোবাসো তাই ৫৪৩
হৃদয়ে যে স্রোত আছো অন্ধকারে লীন ৫৩৮
হৃদয়ের ক্লান্তি ভুলে, সারাদিন জীবনের খেতে কাজ... ৪৩১
হৃদয়ের প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়– চিতা শুধু প'ড়ে থাকে তার, ৩৩৬
হেঁয়ালি রেখো না কিছু মনে ৫৫৬
হে অগাধ সন্তানের জননী, হে জীবন, ৫৮৫
হে নদী আকাশ মেঘ পাহাড় বনানী ৫২৩
হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে ৩৫১
হে মৃত্যু, ২২১
হে হৃদয়, ৩৯২
হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী ৪৬৪
হে হৃদয় নীড় থেকে ঢের দূরে ধরা প'ড়ে গেছো ৬৪৯
হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ২৬৭

All day long ৭৩২
I have felt the breath of autumn wind. ৭২৯
In deep darkness ৭৩১
Long I have been a wanderer of this world. ৭৩০
The sailor has a sense of defeat as he gets up with a start ৭৩৩
The Sky is red ৭২৫
They have been long on this earth ৭২৬
We are closed in, fouled by the numbness of this concentration cell. ৭৩০

## প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

০১. কবিতার নিবিড়পাঠক ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই কবিতাসমগ্র।

০২. *ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, শ্রেষ্ঠ কবিতা, রূপসী বাংলা ও বেলা অবেলা কালবেলা*– জীবনানন্দকৃত এই ৮টি কাব্যগ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে প্রকাশকাল অনুসারে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

০৩. কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত বইগুলোর ক্ষেত্রে কবিকৃত সর্বশেষ সংশোধন-পরিমার্জন গ্রহণ করা হয়েছে।

০৪. *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে ৭৩টি সর্গসম্বলিত মূল পাণ্ডুলিপিকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

০৫. *শ্রেষ্ঠ কবিতায়* অন্যান্য গ্রন্থ থেকে নেয়া কবিতাগুলোর প্রকাশপুনরাবৃত্ত থেকে বিরত থাকা হয়েছে। সেগুলো এই কাব্যসমগ্রের কোন পৃষ্ঠায় আছে, *শ্রেষ্ঠ কবিতার* বিকল্প-সূচিতে তার উল্লেখ পাওয়া যাবে।

০৬. অগ্রন্থিত কবিতা অধ্যায়ে সর্বশেষ উদ্ধারকৃত কবিতাগুলো ছাড়াও জীবনানন্দ দাশের লেখা ইংরেজি কবিতা ও কবিকৃত নিজের কবিতার অনুবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

০৭. জীবনানন্দের কবিতার সামগ্রিক বিশ্লেষণসম্বলিত ভূমিকা এবং ভূমিকার সমান্তরালে গত ৭০ বছরের শ্রেষ্ঠ মূল্যায়নসমূহ।

০৮. পরিশিষ্ট-০১ : জীবনানন্দ দাশের বংশলতিকা।

০৯. পরিশিষ্ট-০২ : কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী [সমকালীন বিশ্বকবিতার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি সম্বলিত]।

১০. পরিশিষ্ট-০৩ : জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থ-পরিচিতি।

১১. পরিশিষ্ট-০৪ : কবিকৃত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা।

১২. পরিশিষ্ট-০৫ : বিকল্প পাঠ।

১৩. পরিশিষ্ট-০৬ : বিকল্প সূচি (প্রথম ছত্র সম্বলিত)।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ